এই লেখকের অন্যান্য বই

সুদূর ঝর্ণার জলে
স্বর্গের খুব কাছে
ছবিঘরে অন্ধকার
আমার একটুকরো পৃথিবী
তোমার তুলনায় তুমি

আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও বইটা ভালভাবে স্ক্যান করা সম্ভব হল না। মূল বইটা একবারে জরাজীর্ণ হয়ে ছিল,তাই কিছু কিছু জায়গায় পড়তে খুবই সমস্যা হবে,কিন্তু তারপরও এই বইটা সুখপাঠ্য। তাই অনেক কষ্ট করে বইটা এডিট করলাম। আপনাদের মতামত পেলে আমার কষ্ট সার্থক মনে করব।

-------অয়ন চট্টোপাধ্যায়

প্রায় পাঁচ হাজার মানুষের ভিড়ের মধ্যেও আমার ঠিক চোখে পড়লো, চারটি বাঙালী ছেলে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে হাত-পা নেড়ে গল্প করছে। আমার থেকে তারা অনেকখানি দূরে, তাদের কথা আমি শুনতে পাচ্ছি না, কিন্তু তারা যে বাঙালী তা চিনতে আমার একটুও ভুল হয় না। মনটা একটু চঞ্চল হয়ে উঠলো।

বাঙালী দেখলেই যে ছুটে যেতে হবে তার কোনো মানে নেই। বাঙালীরা এমন কিছু দ্রষ্টব্য ব্যাপার নয়। মাত্র কিছুদিন আগেই তো বাংলার জনসমুদ্র ছেড়ে এসেছি, আবার কিছুদিন বাদেই সেখানে ফিরে যাবো। তবু বিদেশে এসে অনবরত অপর ভাষায় কথা বলতে বলতে এক সময় যেন মুখে ফেনা উঠে যায়। তখন ইচ্ছে করে দুটো বাংলা কথা কইতে, একটু বাংলায় হাসাহাসি করতে। কিন্তু সেধে কারুর সঙ্গে ভাব জমাতে আমি কখনই পারি না। তা ছাড়া বিপদও আছে। লণ্ডন শহরের বড় রাস্তায় হামেশাই বাঙালীর দেখা পাওয়া যায়। একবার পিকাডেলি স্কোয়ারে একজন বাঙালী ভদ্রলোকের সঙ্গে ডেকে কথা বলতে গিয়েছিলুম, তিনি গম্ভীর দায়সারাভাবে দুটি একটি কথা বলে চলে গেলেন। হয়তো তিনি খুব বড় চাকরি করেন, আমার মতন এলেবেলে বাঙালীকে পাত্তা দিতে চান নি।

এটা অবশ্য লণ্ডন নয়, আমস্টারডাম শহরের কেন্দ্রস্থল। জায়গাটার নাম ডাম-স্কোয়ার, একটা পরিত্যক্ত রাজপ্রাসাদের সামনে বিশাল চত্বর, দেশ বিদেশের ভ্রমণকারীরা প্রায় সবাই বিকেলের দিকে এখানে এসে ভিড় জমায়। অনেকে অলসভাবে বসে থেকে পায়রাদের ছোলা খাওয়ায়। বড় বড় হোটেলগুলো এ পাড়াতেই। চত্বরটার চার পাশে বহু দোকান পর্যটকদের পকেট কাটবার জন্য হাজার রকম মনোহর দ্রব্য সাজিয়ে রেখেছে। এখানেই কাছাকাছি হল্যাণ্ডের অতি মূল্যবান হীরে এবং সুলভ রমণী পাওয়া যায়।

একটা সিগারেট ধরিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলুম। আমার তো কোথাও জরুরি যাবার তাড়া নেই, খানিকটা সময় কাটানো নিয়ে কথা। রাত সাড়ে আটটা বাজে, আকাশে রোদ্দুরহীন দিনের আলো। পৃথিবীর বহুদেশের মানুষের মুখ

আলাদাভাবে চেনা যায়, আর সব পোশাকের কী বিচিত্র রঙ ! এত মানুষের ভিড়েও নিজেকে সব সময় একলা মনে হয়।

একটু বাদে বাঙালী ছেলে চারটির মধ্যে দু'জন চলে গেল ডানপাশের রাস্তায়, আর দু'জন এগিয়ে আসতে লাগলো আমার দিকে। এসব দেশে অচেনা-মানুষের সঙ্গেও চোখাচোখি হয়ে গেলে হাসিমুখ করতে হয়। আমি তৈরি হয়ে রইলুম।

ছেলে দুটির সঙ্গে আমার চোখাচোখি হলো না, ওরা আমার পাশ দিয়ে এগিয়ে গেল। এক্ষেত্রে পিছু ডাকা চলে না। আমি আড়-চোখে দেখতে লাগলুম ওদের। ওরা একটু দূরে গিয়েও থমকে গেল। তারপর পিছিয়ে এসে আমার মুখোমুখি দাঁড়াতেই আমি একগাল হেসে বললুম, কী খবর ?

একটি ছেলে তার উত্তরে ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করলো, পাকিস্তানী ?

আমি মাথা নাড়লুম দু'দিকে।

অন্যজন জিজ্ঞেস করলো, কামিং ফ্রম বাংলাদেশ ?

এবারও আমি দুদিকে মাথা নেড়ে বললুম, না, ভারত।

ছেলে দুটি বাঙালী নয়। বেশ খানিকটা নিরাশই হলুম বলতে গেলে।

ওদের একজন আবার ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করলো, নতুন এসেছেন মনে হচ্ছে। কী চাকরি নিয়ে এলেন ?

আমি বললুম, আমাকে আবার কে চাকরি দেবে ? আমি এমনি ভবঘুরে হয়ে এসেছি।

—কী রকম লাগছে আমাদের দেশ ? হলাণ্ড বড় সুন্দর জায়গা কি না বলুন ? আমরা অনেক দেশ দেখেছি, কিন্তু আমাদের হলাণ্ডের মতন এত ভালো আর কোথাও লাগে না।

আমাদের হলাণ্ড ? এই বাঙালী-চেহারার ছেলে দুটি হল্যাণ্ডের নাগরিক ? আমার চট করে মনে পড়লো, সুরিনামের অনেক লোক এখন হল্যাণ্ডে থাকে। সুরিনাম এক সময় ডাচ কলোনি ছিল, সেখানকার অনেকেই হলাণ্ডের নাগরিক হয়ে আছে, তারা ভারতীয় বংশোদ্ভূত, এখনো পুজো-আচ্চা করে, হিন্দী গান শোনে। এরা কী তবে সুরিনামিজ ?

ওদের একজন বললো, আমরাও এক সময় ভারতীয় ছিলাম, মানে, আমাদের বাবা-মায়েরা। আমরা জন্মেছি ভারতে, তারপর পাকিস্তানে চলে যাই। এখন অবশ্য দশ বছর এ দেশে আছি।

—তা হলে আপনারা পাকিস্তান থেকে এসেছেন ! 'আমাদের হলাণ্ড' বললেন কেন ?

একটি ছেলে অন্যজনের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললো, ও এখানকার

সিটিজেনশীপ পেয়ে গেছে। আমি এখনও পাইনি, তবে শিগগির পেয়ে যাবো।

অন্য ছেলেটি হাসতে হাসতে বললো, প্রথমে ছিলাম ভারতীয়, তারপর পাকিস্তানী, তারপর ডাচ্। এক জীবনে তিনদেশের নাগরিক। চলুন না, কোথাও একটু বসে গল্প করা যাক ? আমাদের আরও দু'জন বন্ধু ছিল, এখনো গেলে তাদের ধরা যাবে। আপনার বিশেষ কোনো কাজ নেই তো ? উঠেছেন কোথায় ? আপনি হিন্দী জানেন ?

যুবক দুটির বয়েস তিরিশ-বত্রিশের মতন। একজনের নাম আলম, আর একজনের নাম মুনাব্বর। দু'জনেরই স্বাস্থ্য চমৎকার। ওদের সঙ্গে হাঁটতে লাগলুম চত্বরটার ডান পাশ দিয়ে। একটা রেস্তোরাঁর সামনে উঁকি দিয়ে আলম বললো, ঐ তো ভেতরে শমীম আর ইমতিয়াজ রয়েছে। চলুন, এখানে বসা যাক। এটা আমাদের আড্ডাখানা।

আমি প্রথমে একটু ইতস্তত করলুম। এতো আর কলকাতার চায়ের দোকান নয় যে চার আনা পয়সা দিয়ে এক কাপ চা খেয়ে তিন ঘণ্টা কাটিয়ে যাবো। এখানে এক কাপ চায়ের দাম অন্তত চার টাকা, তা ছাড়া এ পাড়ার দোকানে চা পাওয়া যায় কিনা তাও সন্দেহ। বিদেশে এলে কৃপণের মতন প্রতিটি পাই পয়সা হিসেব করে চলতে হয়। কিন্তু এতদূর এসে আর ফিরে যাওয়া যায় না।

শমীম আর ইমতিয়াজ আমাদের দেখে হৈ হৈ করে উঠলো এবং হিন্দীতে স্বাগত জানালো। হিন্দী কিংবা উর্দুও হতে পারে। এদের মধ্যে ইমতিয়াজের বয়েস একটু বেশী, মাথায় টাক আর শমীমের চেহারা ক্রিকেট খেলোয়াড়ের মতন। আমার পরিচয় পেয়ে ওরা হাত ধরে টেনে বসিয়ে দিয়ে বললো, বসুন, বসুন ! আপনার কাছে দেশের খবর শোনা যাক। এখানকার কাগজে আমাদের দেশের কোনো খবর থাকে না।

দেশের খবর মানে কোন্ দেশ ? পাকিস্তানের কতটুকু খবরই বা আমি জানি ? ভারতের খবর জানতে কি এদের আগ্রহ হবে ? এদের মধ্যে শমীম এসেছে জার্মানি থেকে বেড়াতে, ইমতিয়াজ তার দুলাভাই অর্থাৎ জামাইবাবু। চারজনেই কাজ করে জাহাজ কোম্পানিতে। গত আট বছরের মধ্যে কেউই পাকিস্তানে যায় নি।

আমাকে কিছু জিজ্ঞেস না করেই ওরা আমার জন্য একটা বীয়ারের অর্ডার দিল। মুনাব্বর কিছু নিল না, রোজার মাস, সে উপোস রেখেছে। শমীম তাকে উপরোধ করতে লাগলো, আরে ব্রাদার, খাও এক ঢোঁক। এই দূর দেশে কে আর দেখছে তোমাকে।

মুনাব্বর বললো, না, ভাই, জোর করো না। অনেক দিনের অভ্যেস, রোজার

সময় সারাদিন আমি কিছু খেতে পারি না।

আমি বললুম, এখানে রোজা রাখা তো মহা জ্বালা। রাত দশটা পর্যন্ত দিনের আলো থাকে।

মুনাব্বর বললো, শুধু কি তাই, রাত তিনটে থেকেই আকাশে দিনের আলো ফুটে বেরোয়, তার আগে জেগে উঠে নাস্তা সেরে নিতে হয়।

আলম বললো, এখন চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আঠেরো-উনিশ ঘণ্টাই দিন বলতে পারেন। আবার শীতকালে মোটে পাঁচ-ছ' ঘণ্টা দিনের আলো থাকে।

শমীম বললো, বীয়ার খাচ্ছো না বটে, কিন্তু মুনাব্বর খাঁ, সিগারেট টানছো যে অনবরত? তাতে রোজা থাকে?

মুনাব্বর লাজুকভাবে হেসে বললো, বিদেশে অত নিয়ম মানলে চলে না। কী বলেন, নীললোহিতদাদা? হিন্দুস্তানে তো সবাই সবাইকে দাদা বলে, তাই না?

আমি বললুম, সারা ভারতবর্ষে বলে না, বাঙালীরা বলে। কিন্তু আপনি তা জানলেন কী করে?

—আমি ঢাকায় ছিলাম যে। প্রায় সাত আট বছর ছিলাম। সেভেণ্টি ওয়ানের ওয়ারের সময় চলে আসি, কিছুদিন করাচিতে থেকে তারপর একেবারে এই দেশে। হিন্দুস্তানের ভরতপুরের নাম শুনেছেন? উত্তরপ্রদেশে, সেখানে আমার জন্ম, সেখান থেকে আমরা চলে যাই ঢাকায়।

আমি বললুম, আমার ঠিক আপনার উলটো। আমার জন্ম ঢাকায়, সেখান থেকে চলে আসি ভরতপুরে।

মুনাব্বর বিস্মিতভাবে আমার দিকে তাকিয়ে রইলো একটুক্ষণ। তারপর বললো, ঠিক বলছেন?

আমি বললুম, ঠিক ঢাকায় নয়, আমার জন্ম ফরিদপুরে। আর ভরতপুরের বদলে আমি চলে এসেছি কলকাতায়। কিন্তু একই তো ব্যাপার, তাই না?

ওরা চারজনে হো হো করে হেসে উঠলো, মুনাব্বর বললো, তা ঠিক বলেছেন। তবে আমাকে আবার ঢাকা ছাড়তে হয়েছিল, আপনাকে তো আর কলকাতা ছাড়তে হয়নি এর পরে।

আমি বললুম, ভবিষ্যতের ইতিহাসের কথা কে বলতে পারে? হয়তো এরপর কলকাতায় এক সময় বিদেশী খেদাও আন্দোলন শুরু হবে, তখন আমাদের আবার পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিতে হবে অন্য কোথাও। ধরা যাক, আন্দামানে।

শমীম বললো, ইতিহাসের মুখে মারো গোলি!

ইমতিয়াজ বললো, ইতিহাস আপনা আপনি হয় না, কিছু বদমায়েশ লোক এইভাবে ইতিহাস তৈরি করে।

এত বিদেশীদের মধ্যে এই চারজন চেনা-মুখের যুবককে আমার খুব আপন

মনে হয়। এরা বেশ অবলীলাক্রমে জোরে জোরে হিন্দী-উর্দুতে কথা বলে যাচ্ছে। রেস্তোরাঁটি বেশ বড়, অনেকগুলো টেবিল, আমরা বসেছি মাঝখানের একটা বড় টেবিলে। এদের ব্যবহারে কোনো রকম আড়ষ্টতা নেই, আমাদের পানীয় অর্ডার দেবার সময় এরা কথা বলছে বেশ চোস্ত ডাচ্ ভাষায়, তারপরই আবার আড্ডা শুরু করছে হিন্দী-উর্দুতে। আমি হিন্দী-উর্দু প্রায় কিছুই জানি না। কিন্তু ইংরিজীর বদলে ভাঙা ভাঙা ঐ ভাষায় কথা বলতে বেশ ভালো লাগছে।

এর মধ্যে তিনবার বীয়ারের অর্ডার দেওয়া হয়ে গেছে। এ দেশী বীয়ার খুব হালকা, সেরকম নেশা হয় না। একমাত্র আলমকেই দেখছি ভদ্‌কা চেয়ে নিয়ে মিশিয়ে নিচ্ছে ওর বীয়ারের সঙ্গে। আলম একটু বেশী হাসছে, বেশী জোরে কথা বলছে, জিভও একটু জড়িয়ে গেছে। সে সিগারেটও খায় সবচেয়ে বেশী। তিনটে পাঁচ মার্কা সিগারেটের একটা পুরো প্যাকেট এরই মধ্যে শেষ করে, অন্য একটা নতুন প্যাকেট খুলেছে। মুনাব্বর তাকে ভদ্‌কা নিতে বারণ করলো দু'বার, আলম শুনলো না।

আমি পকেটে হাত দিয়ে গোপনে গিল্‌ডারের হিসেব করতে লাগলুম। এক রাউণ্ডের অর্ডার আমার দেওয়া উচিত। স্টুয়ার্টের উদ্দেশ্যে আঙুল তুলতেই ইমতিয়াজ বললো, না, না, ওসব চলবে না। আপনি আমাদের অতিথি। আপনি বিদেশ ঘুরতে এসেছেন, অযথা পয়সা খরচ করবেন না। আপনি কোন্ হোটেলে উঠেছেন? হোটেলে পয়সা দেবেন কেন, আমার বাড়িতে চলে আসুন। দেশ থেকে অনেকেই এসে আমার ওখানে ওঠে। আমার তিনখানা ঘর আছে।

মুন্নাবর বললো, ও এখনও শাদী করে নি, আপনার কোনো অসুবিধে হবে না।

কথায় কথায় জানতে পারলুম, শমীম বিয়ে করেছে নিজের দেশের মেয়েকে, মুনাব্বরের স্ত্রী ডাচ্, আর আলম একটি ডাচ্ মেয়ের সঙ্গে লিভিং টুগেদার করে। এই লিভিং টুগেদার এখন এ-সব দেশে বেশ চালু হয়ে গেছে। হল্যাণ্ডে এসে কেউ কোনো ডাচ্ মেয়েকে বিয়ে করতে পারলেই তার নাগরিকত্ব পেতে আর কোনো অসুবিধে হয় না, তার কোনো সময় চাকরি না থাকলেও সে মোটা টাকা ভাতা পাবে।

ইমতিয়াজ বললো, এখানে ইণ্ডিয়ার লোকও বেশ কয়েকজন আছে। তাদের কারুর সঙ্গে আলাপ হয়েছে আপনার? আমি আলাপ করিয়ে দিতে পারি।

আমি বললুম, তাদের সঙ্গে আলাপ করবার জন্য আমি খুব ব্যস্ত নই। আপনাদের সঙ্গে গল্প করতেই তো আমার বেশ চমৎকার লাগছে।

আলম আমার পিঠে একটা চাপড় মেরে নেশাগ্রস্ত গলায় বললো, বুঝলেন নীললোহিতদাদা, এ দেশে এসে বুঝলুম, ধর্ম টর্মতে কিছুছু আসে যায় না। গায়ের রঙে কিছু আসে যায় না। তুমিও মানুষ, আমিও মানুষ, খাটো, রোজগার করো,

খাও-দাও, ফুর্তি করো। আয়ু ফুরিয়ে গেলে মরে যাও। ব্যাস, সোজা কথা।
শমীম বললো, দুঃখের বিষয় এ কথাটা আমরা নিজের দেশে থাকার সময় বুঝতে পারি না। বুঝতে হলো কিনা সাহেবদের দেশে এসে! দেশে থাকলে নীললোহিতের সঙ্গে এরকম আড্ডা মারতে পারতুম?
আমি বললুম, কেন, আমার তো মনে হচ্ছে, কলকাতারই কোনো দোকানে বসে আছি। আপনারা আমার কলকাতার বন্ধুদের মতন অনায়াসেই অমল, কমল, ফিরোজ, শামসের হতে পারতেন।
মুনাব্বর বললো, এটা আপনি ঠিক বললেন না, এটা আপনি একটু বেশী মিষ্টি করে বললেন। দেশে থাকলে আমাদের পেছনে স্পাই লেগে যেত।
কথা ঘোরাবার জন্য ইমতিয়াজ বললো, চলো এবার ওঠা যাক। ওহে মুনাব্বর, দেরি করে ফিরলে তোমার বিবি মাথায় কিল মারবে না?
মুনাব্বর বললো, আমার বিবি গেছে তার মায়ের সাথে দেখা করতে। আজ রাতে ফিরবে না। বরং আলমের গার্ল ফ্রেণ্ডই বকাবকি করবে। আলম কত বেশী খাচ্ছে দেখেছো?
আলম বললো, আরও খাবো, লাগাও আর এক রাউণ্ড।
ইমতিয়াজ বললো, না, আর না।
আলম বললো, আলবৎ আর এক রাউণ্ড হবে। এই নীললোহিত আমাদের মেহমান।
ইমতিয়াজ বললো, ওনার জন্য আর একটা দেওয়া যেতে পারে, আমিও সঙ্গ দিতে পারি ওঁকে, কিন্তু তুমি আর না। সিগারেটের প্যাকেটটা আমাকে দাও, আর একটাও খাবে না।
আলম বললো, ভয় পাচ্ছো কেন! মরি তো মরবো, নিজের খুশীতে মরবো।
মুনাব্বর বললো, বুঝলেন নীললোহিতদাদা, এই আলমের হার্টে একটা জবর গোলমাল দেখা দিয়েছে। সামনের মাসে অপারেশন হবে, খুব বড় অপারেশন। সিগারেট আর মদ খাওয়া একেবারে নিষেধ, কিন্তু ও কিছুতে মানবে না।
হার্টের রুগী এত সিগারেট খাচ্ছে শুনে আমিও আঁতকে উঠলুম। আলমের চোখ দুটো লালচে হয়ে গেছে, মাথার চুল উস্কোখুস্কো। সিগারেট টানছে গাঁজার মতন।
আলম জ্বলন্ত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বললো, বুঝলেন দাদা, আমার এই অপারেশানে দু' লক্ষ টাকা খরচ হবে। তাতেও বাঁচবো কি মরবো ঠিক নেই। দেশে থাকতে গরিবের ছেলে ছিলুম, এত টাকা দিয়ে অপারেশান হতো আমার? এমনিই মরতুম না? জাহাজের চাকরি নিয়ে সাগর পাড়ি দিয়েছিলুম, এ দেশে আছি এখন, এখানকার সোসাইটি সব চিকিৎসার খরচ দেয়…সেইজন্যই তো

জীবন নিয়ে এত ফুটানি! দু' লাখ টাকার চিকিৎসা…হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ…
তারপরই সে আবার হাঁক দিল স্টুয়ার্টের উদ্দেশ্যে।
আমি জিজ্ঞেস করলুম, দু' লাখ টাকার চিকিৎসা? কী হয়েছে ওর হার্টে?
ইমতিয়াজ বললো, এমনিতেই এদেশে চিকিৎসার খুব খরচ। তা ছাড়া ওর হার্টের একটা ভাল্‌ভ কাজ করছে না, সব টেকনিক্যাল ব্যাপার আমি বুঝি না, মোটমাট বেশ শক্ত অপারেশান। তবে ডাক্তার বলেছে, সম্পূর্ণ ভালো হয়ে যাবে। কিন্তু এরকম ভাবে যদি অত্যাচার করে…
আলম বললো, জীবনটা কার, আমার না তোমাদের? আমার জীবন আমি ইচ্ছে মতন খরচ করবো। অপারেশানের সময় যদি মরেই যাই, তা হলে তার আগে যে-কটা দিন বাকি আছে একটু খুশী মতন কাটিয়ে যাবো না?
মুনাব্বর আমাকে বললো, আপনি ওকে একটু বারণ করুন না। আমাদের কথা তো শোনেই না, আপনি নতুন লোক, যদি একটু পাত্তা…
মাত্র ঘণ্টা দু'-এক আলমের সঙ্গে আমার আলাপ। আমার কথা ও শুনবে কেন? আলম বরং আমার পাশে উঠে এসে বসলো, আমার সিগারেটের প্যাকেটটা কেড়ে নিয়েছে, আপনার থেকে দিন তো একটা। আপনার দেশের সিগারেট? চার্মিনার? দিন তো খেয়ে দেখি। আমি কয়েকটা বাংলা কথা জানি, বাংলা সিনেমা দেখেছি…হার্টের দরদ হলে আপনারা বলেন, মন খারাপ, তাই না?
মোট কথা প্রায় জোর জবরদস্তি করেই আলমকে নিয়ে আমরা উঠে পড়লুম একটু বাদেই।
সেই রাতে আমি আলমকে বহুক্ষণ স্বপ্নে দেখলুম।

॥ ২ ॥

আর্ট গ্যালারি কিংবা মিউজিয়াম খুব ভালো জিনিস, কত দেখার জিনিস থাকে, দেখলে কত জ্ঞান বাড়ে, কিন্তু বড্ড পা ব্যথা করে। আমাদের শরীরের মধ্যে পা দুটিই সবচেয়ে নগণ্য, কখনো আমরা পায়ের প্রতি বিশেষ নজর দিই না। পা দুটো আছে ভারবাহী গাধার মতন, আপন মনে নিজের কাজ করে যাবে, এই রকমই কথা। কিন্তু সেই গাধা দুটো হঠাৎ বিদ্রোহ করলে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্পও নস্যাৎ হয়ে যায়।
আমারও হলো সেই রকম দশা।
হল্যাণ্ডের আমস্টারডাম যেমন ছবির মতন সুন্দর শহর, সেই রকমই পৃথিবী-বিখ্যাত বহু ছবিতে ভরা। আমস্টারডামে এসে শুধু ডাচ্ চীজ, মাছ ভাজা

আর হাইনিকেন বীয়ার খেলেই তো হয় না, ডাচ্ শিল্পীদের ভুবন-বিজয়ী ছবিগুলি না দেখলে জীবন বৃথা। কোন্ কোন্ ছবি দেখবো, তা আগেই ঠিক করে এসেছিলুম, কিন্তু দেখা কি অত সোজা!

একে তো দেশ ছেড়ে বিদেশে এলেই আমার মতন লোকের বুকের ভেতরটা সব সময় শুকনো শুকনো লাগে, এই বুঝি হারিয়ে গেলুম, এই বুঝি হারিয়ে গেলুম মনে হয়। তা ছাড়া, এই সব জায়গায় সব সময় আমাদের পকেটের পয়সা আর সময় খরচ করতে হয় টিপে টিপে। সাহেবদের দেশে ট্যাক্সি চড়বার সৌভাগ্য নিয়ে আমি জন্মায়নি। আমস্টারডাম শহর অপূর্ব, সুশ্রী, ঝকঝকে ট্রাম চলে অবশ্য, কিন্তু একবার চড়বার পরই যখন টিকিটের দাম হিসেব করে দেখি আমাদের দেশের প্রায় দশ টাকার সমান, তখন গা কচ্-কচ্ করে। সুতরাং পা দুটিই প্রধান ভরসা।

হল্যাণ্ডের অধিকাংশ লোক ঠিক ততটাই বাংলা জানে, আমি যতটা ডাচ্ ভাষা জানি। সুতরাং তারা তাদের ভাষা আর আমি আমার ভাষা বললে যথেষ্ট হাস্যকৌতুক হয় বটে, কিন্তু রাস্তা চেনা যায় না। ইংরেজি জানা লোক এদেশের এয়ারপোর্টে কিংবা হোটেলে পাওয়া গেলেও পথে ঘাটে সব সময় তাদের সন্ধান মেলে না। সুতরাং ম্যাপ হাতে নিয়ে ঘুরতে হয় আন্দাজে। তিন-চার চক্কর ঘুরে আসবার পর দেখা যায়, আমি যে মিউজিয়ামটি খুঁজছি, সেটা ঠিক পেছনের রাস্তায়।

দ্রষ্টব্যস্থল খুঁজে পেলেও হাঁটার শেষ হয় না। এক একটা আর্ট গ্যালারি বা মিউজিয়ামে প্রায় পঞ্চাশটি ঘর, সব কটি ঘর ঘুরে দেখা মানেও তো কয়েক মাইলের পথ। অথচ কোনোটাই বাদ দিতে ইচ্ছে করে না। শুধু ভ্যান গঘের (এখানকার লোকেরা এই নাম অন্যরকম উচ্চারণ করে, আমাদের বাঙালী উচ্চারণই ভালো) ছবি নিয়েই একটি পাঁচতলা বাড়ির আর্ট গ্যালারি, তার সবটাই না দেখলে কি চলে! তারপর মিউনিসিপ্যাল মিউজিয়াম, রেমব্র্যাণ্টের বাড়ি...সকাল থেকে ঘুরতে ঘুরতে যখন রিজ্‌কস্ মিউজিয়ামের সামনে এসে দাঁড়ালুম, তখন বুকটা হঠাৎ দমে গেল।

এ যে এক বিশাল প্রাসাদ, এর সবটা এখন দেখতে হবে? পা দুটো যে আর চলতে চাইছে না। পায়েরও যে তেমন দোষ নেই। অথচ আমস্টারডামে এসে রিজ্‌কস্ মিউজিয়াম না দেখা তো মহা পাপের সমান। বেশী ভালো ভালো জিনিস একদিনে দেখতে নেই, কিন্তু আজকে এখানে ইতি দিয়ে যে আবার কালকে দেখবো তারও উপায় নেই, তা হলেই আর একদিন বেশী হোটেল খরচ।

কলকাতার ছেলে, অধিকাংশ সময়ই চটি পরে ঘোরবার অভ্যেস, কিন্তু সাহেবদের দেশে সর্বক্ষণ মোজা আর বুটজুতো পরে থাকতে হয়। পা দুটো চাইছে সেই বন্দীদশা থেকে মুক্তি পেতে। আগেকার আমলের পাথরের তৈরি প্রাসাদ, এখানে খালি পায়ে হাঁটতে তবু ভালো লাগতো। আমাদের দেশের মন্দির টন্দিরের মতন, এরাও এসব জায়গায় জুতো খুলে ঢোকবার নিয়ম করলে পারে না?

রিজ্‌কস্ মিউজিয়ামে ঢোকবার মুখেই নোটিশ ঝুলছে, 'চোর ও গাঁট কাটাদের থেকে সাবধান।' জিনিসটা বেশ চেনা চেনা লাগলো। প্রথমেই ছবি দেখতে শুরু না করে ডান দিকে ঢুকে গেলুম রেস্তোরাঁয়। কিছু খাদ্য-পানীয় দিয়ে শরীরকে কিছুটা তোয়াজ করা যাক। কিন্তু ওতে পেট এবং মন সন্তুষ্ট হলেও পা নামের গাধা দুটো খুশী হলো না। খাদ্য-পানীয় তো পা পর্যন্ত পৌঁছোয় না। তারা এখনও টনটনে প্রতিবাদ জানাচ্ছে।

রিজ্‌কস্ মিউজিয়ামে ছবির শুরু পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে। সেখান থেকে যাত্রা শুরু করে বর্তমানকাল পর্যন্ত এসে পৌঁছোতে অনেক ঘর পার হতে হয়। তাছাড়া আছে মহান শিল্পীদের আলাদা আলাদা ঘর। এই সব ছবি কি একদিনে সঠিকভাবে দেখা সম্ভব? কিন্তু এই জীবনে আর হয়তো কখনো আমস্টারডামে আসবো না, আর দেখাও হবে না।

ভ্রমর যেমন গোটা ফুলটার সৌন্দর্যের তোয়াক্কা করে না, শুধু মধুর সন্ধানে ঠিক মাঝখানটায় ঢুকে যায়, সেই রকমই, অধিকাংশ ভ্রমণকারী রিজ্‌কস্ মিউজিয়ামে এসে প্রথমেই ছুটে যায় রেমব্র্যাণ্টের 'নাইট ওয়াচ্' ছবিখানা দেখতে। এই বিশাল ছবিখানার নাম অনেকেই আগে থেকে শুনে আসে। লুভর-এর যেমন মোনা লিজা, রিজ্‌কস্-এর সেরকম নাইট ওয়াচ্। এখানে যে রেমব্র্যাণ্টের আরও অনেক ছবি আছে, কিংবা কাছাকাছি ঘরে ভারমীয়ের, গোইয়া, মুরিল্লো এবং ভ্যান ডাইকের দুর্লভ ছবি, তা গ্রাহ্য করে না অনেকেই।

আমারও প্রায় সেই অবস্থাই হলো। ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে 'নাইট ওয়াচ্' দেখার পর ভারমীয়ের-এর ঘরে সবে মাত্র চোখ বুলোতে শুরু করেছি, এমন সময় আমার পোষা গাধা দুটি বললো, এবার ছুটি দেবে কিনা বলো, নইলে কিন্তু তোমায় গাছের ওপর রেখে আমরা তলা থেকে মই কেড়ে নেবো!

সুতরাং অন্যান্য অ-দেখা শিল্পীদের উদ্দেশে সেখান থেকেই প্রণাম জানিয়ে ও ক্ষমা চেয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম, তারপর প্রায় সোজা দৌড়ে গিয়ে হোটেলের বিছানায়।

ঘণ্টা দু'এক বাদে আবার পা দুটি স্ববশে এলো। শরীর ও মন ঝরঝরে।

আবার নতুন উদ্যোগে কিছু শুরু করা যায়। কালই এই শহর ছেড়ে চলে যাবো, আজকের শেষ দিনটা এমনভাবে হোটেলের ঘরে শুয়ে নষ্ট হবে? ঘড়িতে বাজে মাত্র সাতটা, এটা সন্ধে না বিকেল না দুপুর তা বলা মুশকিল। বাইরে ঠিক দুপুরেরই মতন ঝকঝকে রোদ। আমাদের হোটেলের ঘরের জানালার ঠিক সামনেই দুটো বেশ বড় ঝাঁকড়া-চুলো সাইপ্রেস গাছ, ভ্যান গঘের অনেক ছবিতে এই সাইপ্রেস গাছ দেখা যায়, সুতরাং বাইরের দৃশ্যটি ভ্যান গঘের আঁকা একটা ছবি বলেই মনে হয়।

কিছুক্ষণ একটা বই খুলে বসে রইলুম, কিন্তু মনঃসংযোগ হলো না। বিদেশের মূল্যবান একটি অপরাহ্ন এমন ভাবে নষ্ট করতে ইচ্ছে করে না। আবার বেরিয়ে পড়লুম হোটেল থেকে।

কয়েক পা হাঁটার পর এমনই চমক লাগলো যে দাঁড়িয়ে পড়লুম হঠাৎ। স্বপ্ন দেখছি না তো? এটা কি বাস্তব কোনো শহর না রূপকথার একটা পৃষ্ঠা? ঘড়িতে দেখলুম, আটটা বেজে দশ, এখনো আকাশে রয়েছে পরিষ্কার দিনের আলো, এর মধ্যে চতুর্দিকের রাস্তাঘাট একেবারে জনশূন্য। চৌরাস্তার মোড়ে যেদিকে তাকাই, কোথাও একটাও মানুষ নেই, আমি ছাড়া। এও কি সম্ভব? দুপুরবেলা এই পথ দিয়ে গেছি, সেই সব দোকান চিনতে পারছি, কিন্তু কোথাও কোনো প্রাণের চিহ্ন নেই। সব দোকানেই কাচের দেয়াল, ভেতরে আলো জ্বলছে, বাইরে থেকে ভেতরের সব কিছু দেখা যায়, কিন্তু ক্রেতা-বিক্রেতা নেই।

কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলুম। খুব মিহি ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে, বাতাসে শীত শীত ভাব, আমি শুধু একটা সোয়েটার পরে আছি, ওর ওপরে আর একটা কোনো গরম জামা চাপালে আরাম লাগতো, কিন্তু আর কিছু আনিনি আমি। আমার রোমাঞ্চ হলো। এত বিখ্যাত এই শহরের এক চৌরাস্তায় আমি দাঁড়িয়ে আছি, চারপাশে বড় বড় বাড়ি, প্রত্যেক দিকে লাইন করা অজস্র দোকান, অথচ মাত্র সন্ধ্যে আটটায় সব একেবারে নিঃসাড়, একটা মানুষেরও দেখা পাওয়া যায় না।

আমার হোটেলটা শহরের এক প্রান্তে। কিন্তু কল্পনা করা যায় কি যে সন্ধে আটটার সময় টালিগঞ্জ বা দমদমের রাস্তায় একটিও মানুষ নেই?

একটা ট্রামের আওয়াজে চমক ভাঙলো। তা হলে ট্রাম চলছে! এখানকার ট্রাম এক-কামরা, আমাদের মতন ফার্স্ট ক্লাস-সেকেণ্ড ক্লাস নেই। তাকিয়ে দেখলুম, গোটা ট্রামে ঠিক তিনজন মানুষ বসে আছে। তারপর দেখলুম, গাড়িও চলছে রাস্তা দিয়ে। শহরটা ঘুমিয়ে পড়েনি। মনে পড়লো, এখানকার সমস্ত দোকানপাট ছ'টার সময় বন্ধ হয়ে যায়। তারপর আর কেউ রাস্তা দিয়ে হাঁটে

না। বড় বড় বাড়িগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখলুম। সমস্ত জানালার পর্দা টানা। রাস্তার ধারে বহু গাড়ি পার্ক করা আছে। এই সব গাড়ির ওয়াইপার কেউ চুরি করে না, হেড লাইট খুলে নেয় না! দোকানগুলোর কাচের দেয়াল ভেঙে কেউ চুরি করে না! পথ দিয়ে মানুষ হাঁটে না, তবু দোকানগুলোর মধ্যে আলো জ্বেলে রেখেছে কেন? মোড়ের ফোয়ারা থেকে জল পড়েই যাচ্ছে, কেউ দেখবার নেই, তবুও!

সোজা হাঁটতে লাগলুম আপন মনে। খানিকবাদে কোনো কোনো দোকানের ভেতর থেকে শব্দ পেতে লাগলুম। সেই সব দোকানের অন্দরমহল বাইরে থেকে দেখা যায় না, গাঢ় রঙের পর্দা ফেলা। সাইনবোর্ডে দেখলুম, সেটা একটা বার। অর্থাৎ হোটেল-রেস্তোরাঁ এখনো খোলা। একটা ঐ রকম দোকান থেকে পুতুলের মতন সুন্দর দুটি নারী-পুরুষ বেরিয়ে সামনের গাড়িতে উঠলো। অর্থাৎ প্রায় কুড়ি মিনিট পরে আমি খুব কাছাকাছি দু'জন জীবন্ত মানুষ দেখলুম। নির্জনতা জিনিসটা পাহাড় কিংবা সমুদ্রের ধারে ভালো, কিন্তু কোনো বড় শহরের রাস্তায় এরকম নির্জনতা খুবই অস্বস্তিকর।

খানিকক্ষণ হাঁটার পর মনে হলো, আমিও তো কোনো রেস্তোরাঁয় ঢুকে একটুক্ষণ বসলে পারি। তবে ঠিক কোনটায় ঢুকবো, তা ঠিক করতে একটু সময় লাগলো। যদি আমি ঢোকামাত্র সবাই আমার দিকে তাকায়? একটা রেস্তোরাঁর দরজা ঠেলে ভেতরে এক পা দিয়েও আবার বেরিয়ে এলুম। সেখানে অনেক ছেলেমেয়ে নাচছে। হয়তো ওখানে সবাই সবার চেনা, একমাত্র আমিই হবো বাইরের লোক!

আরও একটু হাঁটবার পর, আর একটা মোড়ে এসে মনঃস্থির করে একটা ছোট দোকান দেখে দরজা ঠেলে ঢুকে পড়লুম। ভেতরে আবছা আলো। চোখ সইয়ে নেবার পর বুঝলুম, সেটা একটা ট্যাভার্ণ জাতীয় জায়গা, ইংরেজরা যাকে বলে পাব্। এক পাশে গোটা চারেক টেবিল, অন্য পাশে লম্বা কাউণ্টারের সামনে অনেকগুলো হাই স্টুল, রেকর্ডে বাজনা বাজছে। প্রত্যেক টেবিলেই দু'জন করে নারী পুরুষ বসে আছে বলে আমি গিয়ে বসলুম কাউণ্টারের সামনের একটা হাই স্টুলে।

তারপর বার-টেণ্ডার মহিলার দিকে তাকিয়ে আমি ঠিক ভূত দেখার মতন চমকে উঠলুম। মহিলাকে দেখতে অবিকল আমার ছোট পিসীমার মতন! বছর পঞ্চাশেকের মতন বয়েস হবে, একটু মোটার দিকে চেহারা, নাক-চোখ-ঠোঁটের ভাব এমনকি থুতনিতে পর্যন্ত হুবহু আমার ছোট পিসীমার সঙ্গে মিল। ইনি মেমসাহেব বলে গায়ের রঙ তো ফর্সা হবেই, তা আমার ছোট পিসীমাও খুব ফর্সা

ছিলেন। আমার ছোট পিসীমাকে আমি স্মরণকাল থেকেই বিধবা অবস্থায় দেখেছি, সরু কালো পাড়ের ধুতি পরতেন, তাঁকে একটা গাউন পরিয়ে দিলে একদম এই মহিলার মতনই দেখাতো।

মহিলা আমার সামনে এসে ডাচ্ ভাষায় অনেক কিছু বললেন। উত্তরে আমি একটা আঙুল দেখিয়ে বললুম, বীয়ার। মদের নামগুলো আন্তর্জাতিক, বুঝতে কোথাও কারুর অসুবিধে হয় না।

মধ্যবয়স্কা মোটাসোটা মহিলাটি প্রায় নাচের ভঙ্গিতে উড়ে গিয়ে একটা পিপে থেকে এক গেলাস বীয়ার ঢেলে আনলেন, একটা প্লেটে খানিকটা চীজ্ আর বাদাম আমার সামনে রেখে একগাল হাসি উপহার দিলেন সেই সঙ্গে। যাক্, তা হলে আমি এখানে অনধিকারী নই।

বীয়ারের চুমুক দিতে দিতে আড় চোখে পরিবেশটা ভালো করে দেখে নিলুম। কাউন্টারে আমার পাশাপাশি আরও পাঁচ ছ'জন নারী-পুরুষ বসে আছে, তারা বেশ জোরে জোরে হাসাহাসি ও গল্প করছে নিজেদের মধ্যে। সবাই সবাইকে চেনে। ঘরের এক দিকের দেয়ালে একটা রঙীন বোর্ড, মাঝখানে একটা বৃত্ত আঁকা, একটু দূর থেকে একজন মহিলা ও তার এক সঙ্গী পাল্লকের তীর ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারছে সেই বৃত্তের দিকে। একে ডার্ট খেলা বলে, কিন্তু মনে হলো যেন এখানে কিছু জুয়ার ব্যাপার আছে। একবার মহিলাটি তাঁর সঙ্গীকে কিছু পয়সা বার করে দিলেন।

আমার পাশেই বসে আছেন এক হাসি-খুশী প্রৌঢ় তার পাশে অতিশয় পৃথুলা এক মহিলা। এঁরা স্বামী-স্ত্রী মনে হয়। বার টেণ্ডার মহিলাকে এরা নাম ধরে ডাকছে। কয়েকবার মনোযোগ দিয়ে শুনবার পর বুঝলাম, ওঁর নাম লিলি। আমার সেই পিসীমার নাম ছিল শেফালী। নামেও বেশ মিল আছে দেখছি। আমার ছোট পিসী মারা গেছেন বেশ কয়েক বছর আগে, হঠাৎ তার জন্য আমার কষ্ট হলো। বিধবা অবস্থায় ছোট পিসীমা একটা ম্লান জীবন কাটিয়ে গেলেন, আর এই লিলি কী রকম নাচতে নাচতে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

শুধু নাচ নয়, লিলি এক সময় গান গেয়েও উঠলো। রেকর্ডে একটা নতুন গান শুরু হতেই লিলি তার সঙ্গে গলা মেলালো, তারপর সেই পাবের সবাই। নিশ্চয়ই খুব একটা চেনা গান, এরা সবাই জানে। বেশ সহজ সুরের গান, অনেকটা আমাদের 'ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা'র মতন। গানটা শেষ হতেই একটা টেবিল থেকে একজন লোক কী একটা রসিকতা করতেই সবাই একেবারে হেসে গড়াগড়ি যেতে লাগলো এক সঙ্গে। কাউন্টারের একজন লোক গলা বাড়িয়ে ফটাস করে একটু চুমু দিয়ে ফেললো লিলির ঠোঁটে, আর লিলি কৃত্রিম কোপে

একটা কিল মারলো সেই লোকটির মাথায়। হায়, আমার ছোট পিসীমাকে কেউ কোনোদিন এইভাবে আদর করেনি। এইটুকু আনন্দ তো আমার ছোট পিসীমা পেতেও পারতেন, কী আর এমন দোষ আছে এতে।

হঠাৎ আমার এই জায়গাটাকে খুব চেনা মনে হলো। যেন আগে অনেকবার দেখেছি। জর্জ সিমেনোঁর উপন্যাসে ঠিক এই রকম ছোট খাটো কোনো ট্যাভার্ণের মাঝ বয়েসী ফুর্তিবাজ নারী পুরুষের ছবি থাকে। সিমেনোঁ অবশ্য বেলজিয়ামের কথা লিখেছেন, কিন্তু বেলজিয়াম আর হল্যাণ্ড কাছাকাছি দেশ, প্রায় একই রকম পরিবেশ। আমি যেন সেই রকম একটা উপন্যাসের মাঝখানে ঢুকে পড়েছি।

নাচতে নাচতে গান গাইতে গাইতে লিলি একবার আমার খালি গেলাসটা নিয়ে গিয়ে ভর্তি করে নিয়ে এলো। আমাকে জিজ্ঞেসও করলো না, আমি আবার চাই কি না। একটু অবাক চোখে তাকিয়েছি, লিলি আঙুল দিয়ে পাশের লোকটিকে দেখালো। পাশের লোকটি এক আঙুলে নিজের বুকে টোকা মেরে তারপর আমার গেলাসটার দিকে আঙুল ফেরালো, অর্থাৎ সে আমাকে ঐ বীয়ার খাওয়াচ্ছে। প্রত্যাখ্যান করা অভদ্রতা, তাই আমি বললুম, থ্যাঙ্ক য়ু। লোকটি তখন একগাদা কথা বলে গেল গড় গড় করে। এক বর্ণ বুঝলাম না। এখানে হাসির ভাষা ছাড়া অন্য কিছু দেওয়া যায় না। তার পাশের মহিলাটি বললো, সে নো নো ইংলিশ। ইউ জাপান!

আমাকে জাপানী বলে কস্মিনকালে কেউ ভুল করতে পারে, এরকম আমার ধারণা ছিল না। না হয় আমার নাকটা একটু বোঁচা, তা বলে গায়ের রঙ তো হলদে নয়। বললুম, নো, আই অ্যাম অ্যান ইণ্ডিয়ান।

মহিলাটির ইংরিজির দৌড় খুবই কম। তিনি আমায় জিজ্ঞেস করলেন, ইন্দোনেশিয়া? সিঙ্গাপুর?

আমি মাথা নেড়ে পুনরুক্তি করলুম।

এবারে তৃতীয় একজন মাথার পেছনে হাত দিয়ে হাতটা নাড়তে নাড়তে বললো, ইণ্ডিয়ান? ইণ্ডিয়ান?

অর্থাৎ মাথায় পালকের মুকুট বোঝাচ্ছে? আমাকে অ্যামেরিকার লাল ইণ্ডিয়ান ভেবেছে? কেন, আমাদের যে এত বড় একটা দেশ, সে দেশের নাম ওদের মনে পড়ছে না? ভাবতে লাগলুম, আমাদের দেশের কোন্ প্রতীক আছে যে যা দিয়ে চট করে এদের ভারতবর্ষ বোঝাতে পারি। হাতি? মহারাজা? তাজমহল?

আর একজন লোক জিজ্ঞেস করলো, টুরিস্ট? আফ্রিকা?

এতো মহা মুশকিলের ব্যাপার দেখছি। এরা কি কখনো ভারতীয় দেখেনি? আমাদের দেশ থেকে তো অনেকেই এখানে বেড়াতে আসে। এই আমস্টারডাম শহরেই তো বেশ কয়েকটি ভারতীয় দোকান দেখেছি। হয়তো এই পাড়ার লোকেরা আমাকেই প্রথম দেখছে। ম্যারি ম্যাকার্থির একটা উপন্যাসে পড়েছিলুম বটে, হল্যাণ্ডের লোকেরা নিজেদের দেশের বাইরের পৃথিবী সম্পর্কে খুব কম জানে, তারা বাইরেও খুব কম যায়। আমরা অবশ্য আমাদের দেশের ওলান্দাজ জলদস্যুদের অনেক গল্প পড়েছি, কিন্তু সে তো ইতিহাসের ব্যাপার। এখনকার ওলান্দাজরা নিজেদের দেশের মধ্যে গুটিয়ে রেখেছে।

সকলেরই অল্প অল্প নেশা হয়েছে। ওরা আমার সঙ্গে কথা বলতে চায়, কিন্তু ভাবের আদান-প্রদানের কোনো উপায় নেই। লিলিও থুতনিতে আঙুল দিয়ে মাঝে মাঝে আমার দিকে কৌতূহলে তাকাচ্ছে। এর মধ্যে আরও একজন লোক আর একটি বীয়ার অর্ডার দিল আমার জন্য। প্রতিদান হিসেবে আমিও অর্ডার দিলুম তিনটি বীয়ারের। তারপর মনে পড়লো, বার টেণ্ডারদেরও অফার করা যায়। লিলির দিকে আঙুল তুলে জিজ্ঞেস করলুম, ইউ? ওয়ান?

লিলি একগাল হেসে রাজি হয়ে গেল। আমার মনটা খুব হালকা হয়ে গেল এই জন্য যে, এরা আমাকে গ্রহণ করেছে, বাইরের লোক হিসেবে মুখ ফিরিয়ে রাখেনি।

ভাষা না বুঝেও বেশ মিশে গেলুম ওদের সঙ্গে। একটু বাদে দরজা ঠেলে ঢুকলো একজন লম্বা মতন লোক। দু'তিন জন লোক চেঁচিয়ে উঠলো, হেংক, ইংলিশ, ইংলিশ!

সেই লোকটি কাউণ্টারে এসে লিলিকে একটা ব্র্যাণ্ডির অর্ডার দিয়ে ওদের কী সব জিজ্ঞেস করতে লাগলো। ওরা আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললো, ইংলিশ, ইংলিশ।

অর্থাৎ হেংক নামের লোকটি ইংরেজি জানে, তার মারফৎ আমার সঙ্গে কথা হতে পারে।

হেংক আমার দিকে ফিরে বললো, টুরিস্ট? হুইচ কানট্রি?

আমি বললুম, ইণ্ডিয়া!

লোকটি বললো, ও, ইণ্ডিয়া? হাফ অফ দি পপুলেশান ভেরি পুয়োর, রাইট? নো ফুড, নো ড্রিংক, স্টার্ভ, রাইট?

লোকটি পাশ ফিরে এই কথা আবার অন্যদের বোঝালো নিজস্ব ভাষায়। অন্যরা এবার সবাই মাথা ঝাঁকালো। তারা এবার বুঝেছে। পৃথুলা মহিলাটি আমার দিকে চেয়ে বললো, হিন্দু? হিন্দু। নো ইট, ভেরি পুয়োর?

কে যেন ঠাস করে একটা চড় মেরেছে আমার গালে।

হায় আমার জনম দুঃখিনী জননী, পৃথিবীর কাছে এই তার পরিচয়। ভারতের নাম চিনতে পেরেই প্রথমেই ওদের মনে পড়লো ভারতের দারিদ্র্যের কথা? এদেশে এত প্রাচুর্য তাই দারিদ্র্য ওদের কাছে কৌতূহলের বস্তু। আমি একটু আগে ভারতের একটা প্রতীক খুঁজছিলুম, হাত পেতে যদি এদের কাছে ভিক্ষে চাইতুম এরা ঠিক বুঝতে পারতো।

হেংক-এর মারফৎ সবাই জানতে চাইছে ভারত কেন গরীব, সেই সব গরীবরা কী খেয়ে বেঁচে থাকে। কিন্তু আমার মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে, আর এদের সঙ্গে ভাব জমাবার ইচ্ছে নেই। ভারতের দারিদ্র্যের কথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই, কিন্তু লোকে ভারতের শুধু সেই পরিচয়টাই জানবে।

ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে একটু বাদেই বেরিয়ে পড়লুম সেই পাব্ থেকে। দশটা বেজে গেছে, এখনও ঠিক মতন অন্ধকার নামেনি। পা দুটো আবার ক্লান্ত লাগছে। গরীব ভারতীয় হয়ে একটু একটু মন খারাপ নিয়ে আবার হাঁটতে লাগলুম আস্তে আস্তে।

॥ ৩ ॥

পটল জিনিসটা যে কত মূল্যবান, তা বোঝা গেল প্যারিসে এসে। আমি খুব একটা তরিতরকারির ভক্ত নই, যা পাই তাই খেয়ে নিই। খাবার প্লাতে মাছ-মাংস আসবার আগে শাক-চচ্চড়ি যেন প্রেমিকার সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে প্রেমিকার দাদার সঙ্গে পাড়া-পলিটিক্স নিয়ে আলোচনা। সৈয়দ মুজতবা আলী লিখেছিলেন, যেন পণ্ডিত মশাইয়ের হাতে বেত খাওয়ার আগে কান মলা।

পটলের সঙ্গে পটল-তোলার সম্পর্ক আছে বলে বরং ও জিনিসটা সম্পর্কে আমার মনে একটু বিরাগ ভাবই আছে। প্যারিসে বসে যে পটলের গুণগান শুনতে হবে, তা কোনোদিন কল্পনাই করিনি

দেশ ছেড়ে বাইরে এলে টের পাওয়া যায়, বাঙালী যুবকরা রান্নায় কত পটু। যে-কোনো বাঙালী আড্ডায় রান্নার প্রসঙ্গ উঠবেই। তখন জানা যাবে যে অমুক ইঞ্জিনিয়ার কত ভালো মাছের ঝাল রান্না করেন, আর তমুক পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক ধোঁকার ডালনা রেঁধে কতজনকে মুগ্ধ করেছেন। এঁরা অবিবাহিত। আর যাঁরা মাঝখানে একবার দেশে গিয়ে বাঙালী মেয়ে বিয়ে করে এনেছেন, তাঁদের গিন্নিরাও কম যান না। ব্রেবোর্ন বা লোরেটোতে পড়া যে-সব বাঙালী মেয়ে দেশে থাকতে কোনোদিন রান্না ঘরে ঢোকেন নি, রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইতেন কিংবা ভারত নাট্যম নাচতেন, তাঁরাও বিদেশে এসে চিংড়িমাছের মালাইকারি

কিংবা ডিম-সন্দেশ বানাতে শিখে যান।

এক বাঙালী আড্ডায় ডঃ দাস হঠাৎ আমাদের সবাইকে নেমন্তন্ন করলেন সামনের শনিবারে। তা শুনে রায়বাবু বললেন, ঝিঙে-পোস্ত খাওয়াবেন তো ? আপনার হাতে কিন্তু পোস্তর রান্না দারুণ খোলে।

দাসবাবু বললেন, ঝিঙে-পোস্ত তো অনেকবার খেয়েছেন, আসুন না। এই শনিবারে আপনাদের মোচার ঘন্ট খাওয়াবো।

তাই শুনে এক মুখার্জি বললেন, মোচা ? আপনি মশাই মোচা কোথায় পেলেন ? আমি তো কখনো দেখি নি।

যেন দারুণ একটা রহস্যের সন্ধান দিচ্ছেন, এই ভাবে দাসবাবু বললেন, শুধু মোচা কেন, আমি থোড় পর্যন্ত পেয়েছি। কোথায় জানেন ? ভিয়েৎনামী বাজারে !

আমার মতন নতুন-আসা লোকের কাছে এসব কথা ধাঁধার মতন লাগে। ঝিঙে-পোস্ত, মোচার-ঘন্টা, থোড়…এরপর কি নিম বেগুনের কথাও শুনতে হবে ? এ যে আমার বিধবা দিদিমার রান্নার লিস্টি। প্যারিসের সব বিখ্যাত খাদ্য দ্রব্য ছেড়ে এসব কী ?

রায়বাবু বললেন, আমি ভিয়েৎনামী বাজারে যাই মাঝে মাঝে কাঁচা লঙ্কা কিনতে। একদম আমাদের দেশের মতন কাঁচা লঙ্কা কিনতে পাওয়া যায়, দারুণ ঝাল।

সদ্য দেশ থেকে আসা আর একজন রায়বাবু বললেন, কাঁচা লঙ্কা ? চলুন, চলুন, আজই কিনে আনি। কতদিন কাঁচা লঙ্কা খাইনি ! আমি তো লঙ্কা ছাড়া কোনো জিনিসের স্বাদই পাই না।

আমি জিজ্ঞেস করলুম, ভিয়েৎনামী বাজার ব্যাপারটা কী ?

তখন সবাই মিলে আমাকে বোঝালেন যে গত কয়েক বছর ধরে প্যারিসের শহরতলীতে প্রচুর ভিয়েৎনামের শরণার্থী এসে বসতি নিয়েছে। এমনকি তারা নিজস্ব বাজারও বসিয়ে ফেলেছে এর মধ্যে। ভিয়েৎনামীদের খাদ্য-অভ্যেসের সঙ্গে বাঙালীদের খুব মিল। দশ পনেরো বছর ধরে যে-সব বাঙালী এ দেশে আছেন, মাংস খেয়ে খেয়ে তাঁদের অরুচি ধরে গেছে, সেইজন্যই তারা বাঙালী খাবারের সন্ধানে ঐ সব বাজারে যান।

আমি বেশ ছেলেবেলায় একবার এই সব বিলেত টিলেত দেশ ঘুরে গিয়েছিলুম। তখন আমার ধারণা হয়েছিল, বিদেশেও বাঙালীরা ভাত খায় বটে, আর ফুল কপি-বাঁধা কপি-ঢ্যাঁড়শ এইসব কিছু কিছু তরকারিও পায়, তবে দেশের মতন রুই-কাৎলা-ইলিশ মাছ কিংবা পাঁঠার মাংস তো পায় না, কতগুলো

বিদঘুটে নামের সমুদ্রের মাছ খেয়ে মাছের স্বাদ মেটায় আর পাঁঠার মাংসের বদলে ভেড়ার মাংস খায়, যাতে বেশ বোঁটকা গন্ধ। লণ্ডন কিংবা নিউ ইয়র্কের মতন বড় শহরে, যেখানে অনেক ভারতীয়। সেখানে সিন্ধি বা গুজরাটিদের দোকানে পাঁপড়-আচার কিংবা মুসুরির ডাল পাওয়া যেত।

এবার এসে দেখছি সে সব কিছুই বদলে গেছে। এখন আর কিছুরই অভাব নেই, পাওয়া যায় সব কিছুই।

সদ্য দেশ থেকে আসা দ্বিতীয় রায়বাবু জিজ্ঞেস করলেন, কাঁকড়া ? কাঁকড়া যদি পাওয়া যেত, আমি নিজেই রান্না করে আপনাদের খাওয়াতুম।

দাসবাবু বললেন, কেন পাওয়া যাবে না ! আমার বাড়িতে টিনের কাঁকড়া আছে। আর যদি ফ্রেস চান তাও এনে দিতে পারি, আমাদের বাজারে প্রায়ই ওঠে।

কাঁকড়া পাওয়া যাবে শুনে দ্বিতীয় রায়বাবুর চোখ খুশিতে চকচক করে উঠলো।

এক মহিলা আমেরিকা থেকে ফেরার পথে প্যারিসে এসে থেমেছেন। তিনি বললেন, নিউ ইর্য়কে কী চমৎকার ইলিশ মাছ খেয়ে এলুম। বিশ্বাসই করা যায় না।

দ্বিতীয় রায়বাবু বললেন, ইলিশ ? নিশ্চয়ই কলকাতা থেকে নিয়ে গেছে। নাকি ঢাকা থেকে ?

তখন দু'তিনজন মিলে প্রায় ধমকে উঠে বললেন, কলকাতা-ঢাকা থেকে কেন আনবে ? এ দেশে পাওয়া যায় না ? ইলিশ কি আপনাদের নিজস্ব। ইলিশ সমুদ্রের মাছ, নদীতে ঢুকলে তখন বাংলায় তার নাম ইলিশ।

আমেরিকা-ফেরৎ মহিলাটি বললেন, ও দেশে বলে শ্যাড। অবিকল আমাদের ইলিশের মতন, তবে সাইজে আমাদের চেয়েও বড়। আমাদের দেশে কখনো আট-ন পাউণ্ড ওজনের ইলিশ দেখেছেন ? অত বড় ইলিশের স্বাদও কিন্তু খুব ভালো।

আমি জিজ্ঞেস করলুম, নিউ ইর্য়কে কোনো বাঙালী ইলিশের দোকান খুলেছে ? মহিলাটি হেসে বললেন, বাঙালীর দোকান কেন হবে ? বাঙালীরা কোথাও দোকান খোলে না ! সাহেবদের দোকান।

আমি একটু নিরাশই হলুম। সারা ভারতবর্ষে বাঙালী ছাড়া আর কেউ ইলিশ খায় না। আমার ধারণা ছিল ইলিশটা একেবারে বাঙালীদের নিজস্ব ব্যাপার। বাঙালী-সংস্কৃতি, বিশেষতঃ বাঙাল—সংস্কৃতির প্রধান অঙ্গ। কিন্তু নিউ ইর্য়কে সাহেবদের দোকানে যখন ইলিশ পাওয়া যায়, তখন নিশ্চয়ই সাহেবরাও খায় !

হায়, হায় !

আমেরিকা ফেরৎ মহিলাটি বেশ মাছ রসিক। তিনি বললেন, ওখানে বাফেলো বলে আর একরকম মাছ আছে, সেটা ঠিক কাৎলা মাছের মতন। আর কার্প মানে যে রুই, তাতো জানেনই। আর আছে ক্যাট ফিস্, ঠিক আমাদের দেশের বড় আড় মাছ !

দ্বিতীয় রায়বাবু বললেন, মাছের নাম বাফেলো ? ক্যাট ? দরকার নেই আমার, আমি কোনোদিন ওসব মাছ ছুঁয়েও দেখতে চাই না। তার চেয়ে আমার কাঁকড়াই ভালো।

মহিলাটি বললেন, বাফেলো একবার খেয়ে দেখবেন, কলকাতার রুই-কাৎলার স্বাদ ভুলে যাবেন। আমার তো ইচ্ছে আছে একবার নিউ ইয়র্ক থেকে একটা পাঁচ কেজি শ্যাড মাছ নিয়ে যাবো কলকাতায়, দেশের লোকদের দেখাবো।

আমি বললুম, এসব দেশে ভালো ভালো খাবার পাওয়া যায় জানি। কিন্তু আমাদের দেশের সব খাবারও যে পাওয়া যায়, তা জানতুম না।

তখনই উঠলো পটলের প্রসঙ্গ।

দাসবাবু বললেন, শুধু একটা জিনিস খেতে চাইলেও খাওয়াতে পারবো না। আলু-পটলের তরকারি !

প্রথম রায়বাবু বললেন, এত বছর ধরে অনেক খুঁজেও আমি পটল পাই নি কখনো।

চৌধুরীবাবু বললেন, দেশে গিয়ে সেই জন্যই আমি রোজ পটল ভাজা খাই।

সেনবাবু বললেন, কতদিন যে দেশে যাই নি !

তিনি যে দীর্ঘশ্বাসটি ফেললেন, সেটা দেশের জন্য, না পটলের জন্য তা ঠিক বোঝা গেল না। আমাদের দেশের আর সব তরকারি এই সব দেশে আসে, শুধু পটলের এই একগুঁয়ে গোঁয়ার্তুমি কেন ? ভিয়েৎনামীরাও কি পটল খায় না ?

চৌধুরীবাবু বললেন, যাই বলুন, আমাদের দেশে শীতকালে পটল ভাজা এক অপূর্ব জিনিস। এখানে শীত পড়লেই আমার সেই কথা মনে পড়ে।

আমেরিকা-ফেরৎ মহিলাটি হার মানবার পাত্রী নন। তিনি বললেন, আমরা কিন্তু ওদেশে পটল পাই। ফ্রেস নয় অবশ্য, টিনের।

দাসবাবু বললেন, ও জিনিস আমিও খেয়েছি। আমি টিনের খাবার তেমন পছন্দ করি না, তা ছাড়া ও জিনিসটার স্বাদও ঠিক পটলের মতন নয়।

মহিলাটি বললেন, স্বাদ ঠিক আমাদের পটলের মতন নয় বটে, কিন্তু দেখতে পটলের মতন তো বটে। কলকাতায় যে-রকম পটল পাওয়া যায়, নর্থ ইণ্ডিয়াতেও তো সে-রকম পাওয়া যায় না। আমরা ঐ টিনের পটল দিয়েই

তরকারি করে খাই।

চৌধুরীবাবু বললেন, আমেরিকা আজব দেশ, সে দেশে নিশ্চয়ই বাঘের দুধও পাওয়া যায়। আমরা ছেলেবেলায় শুনতুম, কলকাতায় নিউ মার্কেটে পয়সা ফেললে বাঘের দুধও পাওয়া যেতে পারে, সেটা কলকাতার ব্যাপারে সত্যি না হলেও নিউ ইয়র্কের ব্যাপারে নিশ্চয়ই সত্যি।

রায়বাবু বললেন, বাঘের দুধ পাওয়া যায় কি না খোঁজ করে দেখি নি, তবে হাতির মাংস পাওয়া যায় শুনেছি !

সবাই হেসে উঠলেও রায়বাবু সজোরে বোঝাবার চেষ্টা করলেন যে কথাটা সত্যি। এমনকি প্রমাণ হিসেবে তিনি একটা নিউজ উইক পত্রিকা এনে ছবি দেখালেন।

আমি বললুম, ফ্রান্সে যখন ঘোড়ার মাংস বিক্রি হয়, তখন আমেরিকায় হাতির মাংস তো পাওয়া যেতেই পারে !

দাসবাবু বললেন, আজকাল অনেক হাতির মতন চেহারার আমেরিকান দেখতে পাচ্ছি, বোধহয় ঐ মাংস খেয়েই...।

চৌধুরীবাবু বললেন, আর একটা জিনিস পাই না, সেটা হচ্ছে পান। আমি অবশ্য পানের ভক্ত নই, কিন্তু গত বছর বাবা-মা বেড়াতে এসেছিলেন আমার কাছে, পান পাওয়া গেল না বলে মা তো বেশীদিন থাকতেই চাইলেন না।

রায়বাবু বললেন, পান বোধহয়, লণ্ডনে পাওয়া যায়। ওখানে একটু যদি খোঁজ নিতেন...কিংবা আমি তো প্রায়ই লণ্ডন যাই, যদি আমাকে বলতেন...

সেনবাবু বললেন, আমেরিকায় পান পাওয়া যায় না ?

আমেরিকা-ফেরৎ মহিলা বললেন, খোঁজ করে দেখিনি, কিন্তু ক্যানাডায় পাওয়া যায়। টোরোন্টোতে জানেন তো রেডিওতে হিন্দী গান বাজে, হিন্দী সিনেমার হল আছে, তার সামনে পানের দোকান, ফুচ্‌কা, ঝাল মুড়ি...।

আর একজন মহিলা একটু দূরে বসে এক মনে একটা ছবির বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছিলেন। এতক্ষণ একটিও কথা বলেন নি। মহিলাটির রোগা পাতলা চেহারা, প্রথম বেড়াতে এসেছেন ফরাসী দেশে।

এবার তিনি বললেন, এসব কী হচ্ছে বলুন তো ? প্যারিসে বসে শুধু খাওয়া-দাওয়ার আলোচনা ! প্যারিসে জগৎ বিখ্যাত সব আর্ট গ্যালারি, মিউজিয়াম সেসব বাদ দিয়ে শুধু খাওয়ার কথা ! এই মুহূর্তে একজন ফরাসী ভদ্রলোক এ ঘরে ঢুকে পড়লে বাঙালীদের সম্পর্কে কী ভাববে বলুন তো।

প্রথম রায়বাবু হাসতে লাগলেন।

দাসবাবু হাসতে হাসতে বললেন, কী ভাববে আপনি জানেন ? ভাববে,

বাঙালীরা সত্যিই রসিক। তক্ষুনি আমাদের এই আলোচনায় যোগ দেবে। ফরাসীরা দারুণ খেতে ভালোবাসে!

চৌধুরীবাবু বললেন, আমাদের দেশের অনেকের ধারণা, ফরাসীরা বুঝি সবাই কবি আর শিল্পী।

আমি বললুম, প্রথমবার আসবার সময় আমারও সেই ধারণা ছিল। এয়ারপোর্টে পা দিয়েই দেখলুম, দুটি ছেলে হাত পা নেড়ে খুব কথা বলছে। আমার ধারণা হয়েছিল, ওরা কবি।

চৌধুরীবাবু বললেন, এয়ারপোর্টে কবি? খুব সম্ভবত তারা জোচ্চোর।

রোগা-পাতলা মহিলাটি ঝাঁঝালো সুরে বললেন, আপনারা নিশ্চয়ই আসল ফরাসীদের সঙ্গে মেশেন না, বাঙালীরা শুধু বাঙালী খাওয়া নিয়েই ব্যস্ত। ফরাসীদেশ নিশ্চয়ই কবি আর শিল্পীদেরই দেশ।

রায়বাবু-দাসবাবুরা সমস্বরে হাসতে লাগলেন।

চৌধুরীবাবু বললেন, আমরা ইংরেজদের বেনে বলি, কিন্তু ফরাসীরাও কম বেনে নয়। আমেরিকার মতন বড় বড় ডাকাত এ দেশে না থাকলেও ঠগ্-জোচ্চোর অসংখ্য। কবি-শিল্পী তো মাত্র হাতের এক মুঠো, বাকি সব ফরাসীরা বেশ স্বার্থপর ধরনের।

সেনবাবু বললেন, বেনেগিরি আর ডাকাতিতে ইংরেজরা যখন ওয়ার্লডের টপ্, সেইসময়ই সেদেশে শেক্সপীয়র জন্মায়। ফরাসীরাও যখন ব্যবসা বাণিজ্যে খুব উন্নতি করে, তখনই এদেশের কিছু লোক ভালো কবিতা লেখে, ছবি আঁকে।

চৌধুরীবাবু বললেন, ফরাসীরা কলোনিগুলোতে যা অত্যাচার করেছে, সেই তুলনায় ইংরেজরা তো অতি ভদ্র! এখনও তো ফ্রান্স নির্লজ্জের মতন সাউথ আফ্রিকার সঙ্গে ব্যবসা করে।

প্রথম রায়বাবু বললেন, ওসব কথা ছেড়ে দিন। ফরাসীরা শিল্প-সাহিত্য সত্যিই ভালোবাসে বটে, তবে খেতেও খুব ভালোবাসে। ভালো ভালো জিনিস খাওয়াও এদের কাল্চারের একটা অঙ্গ! চীজ্ আর ওয়াইন নিয়ে কত সূক্ষ্ম আলোচনা হয়...।

চৌধুরীবাবু বললেন, রাখুন মশাই কালচার। আমার অফিসের ফরাসীদের দেখছি তো, লাঞ্চের সময় হলেই ওদের আর জ্ঞান থাকে না। অমনি ছুটে গিয়ে গপ্ গপ্ করে খাবে। অত বেশী খায় বলেই এদের অনেকেরই পেটের রোগ।

রোগা-পাতলা মহিলাটি আমার দিকে কট্মট করে তাকিয়ে বললেন, আমরা কি পঁপিদু সেন্টারে যাবো না? বসে বসে এইসব আলোচনাই শুনবো?

আমি বললুম, যাক্ বাবা, আমার কি দোষ? সবাই গেলেই আমি যেতে

পারি।

দাসবাবু বললেন, আজ ছুটির দিন, আজ সেখানে মস্তবড় লাইন হবে। দু'তিন ঘণ্টা দাঁড়াতে হবে।

মুখার্জিবাবু বললেন, চলুন, তবু যাওয়া যাক। এঁরা মাত্র কয়েকদিনের জন্য এসেছেন। সব কটা আর্ট গ্যালারি দেখা হবে না। পঁপিদু সেণ্টার তো অবশ্যই দেখা উচিত।

চৌধুরীবাবু বললেন, যাচ্ছেন যান। কিন্তু গুণে দেখবেন তো সেখানে কতজন ফরাসী আছে? দেখবেন, বেশীর ভাগই বাইরের লোক।

যাবার উদ্যোগ-আয়োজন করতে করতেই বৃষ্টি এসে গেল। এই বৃষ্টির মধ্যে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যাবার ইচ্ছে কারুর নেই। রোগা-পাতলা মহিলাটি বেশ মন-মরা হয়ে গেলেন। আবার শুরু হলো আড্ডা।

আড্ডা স্থলটি প্রথম রায়বাবুর বাড়ি। দুপুর বেশ গাঢ় হতে তিনি প্রস্তাব করলেন, আজ আর বেরিয়ে কী হবে? এখানেই খিচুড়ি-টিচুড়ি কিছু রেঁধে পিকনিক করা যেতে পারে।

দ্বিতীয় রায়বাবু সঙ্গে সঙ্গে বললেন, আমি রান্না করতে রাজি আছি।

চৌধুরীবাবু বললেন, চলুন, তা হলে কিছু চিংড়িমাছ কিনে আনা যাক। আর ফুলকপি। খিচুড়ির সঙ্গে জমে যাবে!

ছোট একটা দল বাজারে যাবার জন্য তৈরি হতেই আমি জুটে গেলুম তাদের সঙ্গে। বাজারে যাওয়াও একটা অপূর্ব অভিজ্ঞতা।

বাজার মানে মার্কেট তো নয়, আজকালকার ভাষায় একে বলে শপিং মল। বিশাল জায়গা জুড়ে এক চমৎকার আধুনিক স্থাপত্যের নিদর্শন। এখানে সূঁচ-সুতো থেকে মোটরগাড়ি পর্যন্ত সবই পাওয়া যায়। দোতলা-তিনতলায় ওঠবার জন্য সিঁড়ির বদলে এলিভেটর, চতুর্দিকে শুধু কাচের দেয়াল, তার মধ্যে আলাদা-আলাদা জিনিসের ঘর। ইন্দ্রপুরীর মতন ঝকঝক করছে সব কিছু। আমার ছেলেবেলায় দেখা ফরাসীদেশের সঙ্গে এখনকার ফরাসীদেশের যেন অনেক অমিল। সেবারে দেখেছি প্রাচীন ঐতিহ্য, এবারে অনেক কিছুই টাট্‌কা-নতুন। মাঝখানের দু'দশকে ফরাসীদেশ যেন হঠাৎ বড়লোক হয়ে গেছে।

মাছ-মাংসের দোকানে গিয়ে চোখ একেবারে ছানাবড়া হবার জোগাড়। এত রকমের খাদ্য! চিংড়ি মাছই পাঁচ-ছ' রকম, বিরাট বিরাট লম্বা বান মাছ, তা ছাড়া গোল-চ্যাপ্টা-মোটা কতরকমের যে নাম না জানা মাছ, তার ঠিক নেই। মাংসের দোকানের বাইরে আস্ত আস্ত খরগোশ ঝোলানো। খাঁচার মধ্যে পায়রা রাখা

রয়েছে, যেটা পছন্দ হবে, সঙ্গে সঙ্গে সেটা কেটেকুটে ঠিক করে দেবে। সেসব এক-একটা পায়রার সাইজ আমাদের দেশের পায়রার তিনগুণ। তারপর হাঁস, ঘোড়া, হরিণ, ভেড়া, গরু, শুয়োর আরও যে কত ছাল ছাড়ানো জন্তু তার ঠিক নেই। এক সঙ্গে এত খাবার দেখলে গা গুলিয়ে ওঠে। পাশের তরকারির দোকানও কম যায় না, রাবণের সাইজের ফুলকপি আর ভীমের গদার সাইজের বেগুন। তার পাশের দোকানে অন্তত একশো রকমের কেক আর দুশো রকমের চীজ্। মনে হয় যেন এত খাবার এক অক্ষৌহিণী সৈন্যও খেয়ে শেষ করতে পারবে না।

আমি চৌধুরীবাবুকে চুপি চুপি জিজ্ঞেস করলুম, আচ্ছা, ফ্রান্সের অনেক দোকানেই এত থরে থরে খাবার সাজানো দেখি। এত খাবার কে খায়? অথচ পাশের দেশ পোল্যাণ্ডে এখন দারুণ খাদ্যাভাব চলছে। কাগজে রোজই পড়ি, সেখানে মাংসের দোকানের সামনে লম্বা লাইন। তাও সবাই পায় না। বাচ্চাদের খাবারের পর্যন্ত শর্টেজ। ফ্রান্সের এত খাবার, এর কিছুটা এরা পোলাণ্ডে পাঠিয়ে দিলে পারে না?

চৌধুরীবাবু বললেন, নীললোহিতবাবু, আপনাকে আমি বেশী সরল বলবো, ন বোকা বলবো? এরকম প্রশ্নের কোনো মানে হয়? বড়লোকের বাড়িতে কত খাবার দাবার থাকে, কত খাবার নষ্ট হয়, তা বলে কি বড়লোকরা সেইসব খাবা গরীবদের দিয়ে দেয়?

আমি থতমত খেয়ে চুপ করে গেলুম। সত্যিই আমি মাঝে মাঝে বড্ড বোকার মতন কথা বলে ফেলি। সেইজন্যই আমার চেনা শুনো লোকেরা মাঝে মাঝে বলে, নীললোহিতটা একটা হাবা গঙ্গারাম!

॥ ৪ ॥

রোমে গিয়ে রোমানদের মতন আচরণ করাই বিধিসঙ্গত, এবং মোগলদের হাতে পড়লে মোগলাই খানা খাওয়াই উচিত হলেও ফ্রান্সে এসে ফরাসী ভাষার কথা বলার চেষ্টা করা খুব একটা সুবিধাজনক নয়। ফরাসীরা ইংরেজি বোঝে না, কিংবা বুঝতে চায় না আর ভাঙা-ফরাসী শুনলে ভুরু একেবারে কপালের শেষ সীমায় তুলে আনে।

আমার এক বন্ধু ফ্রান্স ঘুরে এসে বলেছিল, প্যারিসের চ্যাম্পাস এলিসিস্ রাস্তাটা বড় সুন্দর। তাই শুনে আমরা হেসেছিলুম। আমরা জানি, ইংরেজি বানানে প্যারিসের ঐ বিশ্ববিখ্যাত রাস্তাটির নাম ঐ রকম হলেও, আসলে ঐ

রাস্তাটির নাম সাঁজেলিজে। কিন্তু আমাদের এই অল্প বিদ্যা ভয়ংকরী সম্বল করে ফ্রান্সে এলে কোনো লাভ হয় না। পথে কোনো ফরাসীকে যদি জিজ্ঞেস করি, সাঁজেলিজে কোন্ দিকে, সে অমনি ভুরু দুটো ধনুক করে ফেলে। পাঁচবার বললেও বোঝে না। আসলে সাঁ, জে লি জে এই প্রত্যেকটা মাত্রার উচ্চারণ অন্য রকম, যা আমাদের জিভে চট্ করে আসে না। একটু উচ্চারণের হেরফেরে খুব চেনা জিনিসও দুর্বোধ্য হয়ে যায়। কী এক প্রসঙ্গে একজন ফরাসী আমাকে পাঁচবার ধরে বললো, হ্রাদিয়ো, হ্রাদিয়ো! তখন আমারও ভুরুর অবস্থা সেই রকম। কী করে বুঝবো যে সে বলতে চাইছে রেডিও!

এক অক্ষর ফরাসী না জানলেও কিন্তু ফরাসীদেশের ট্রেনে চলাচল করতে কোনো অসুবিধে হয় না। এই চমৎকার ব্যবস্থা দেখে চমৎকৃত না হয়ে উপায় নেই। হাতে একটা ম্যাপ থাকলে কারুকে কিছু না জিজ্ঞেস করেও ইচ্ছে মতন যে-কোনো ট্রেনে চলাফেরা করা যায়। শুধু একটু ধৈর্য লাগে, প্রথম দু' একবার হয়তো স্টেশন ভুল হয়ে যায়। কিন্তু তাতে ক্ষতি নেই, এদেশে একবার ট্রেনে চাপবার পর বার বার স্টেশন বদলাবদলি করলেও অতিরিক্ত পয়সা লাগে না।

হোটেলে থাকার পয়সা নেই, তাই উঠেছি এক বাঙালীর বাড়িতে। অসীম রায় মশাইয়ের সঙ্গে আগে থেকে একটু চেনা ছিল, তিনি দয়া করে আশ্রয় দিয়েছেন। তাঁর বাড়ি একটু শহরতলীতে, প্যারিস থেকে কুড়ি-পঁচিশ মাইল দূরে। এদেশে শহরতলীতে থাকার তো কোনো অসুবিধে নেই, আমাদের কলকাতার মতন তো হাওড়া-শিয়ালদার দুই বিরাট সিংহ দরজা দিয়ে শহরে ঢুকতে হয় না লোকাল ট্রেন নামক আলুর বস্তায় বন্দী হয়ে!

অসীমবাবু প্রথম দিন একটু ট্রেনের ব্যবস্থাটা বুঝিয়ে দিলেন, তারপর থেকে আমি স্বাধীন। যখন খুশী যাই আসি। জানি যে যে-কোনো স্টেশনে নেমে দাঁড়ালেই পনেরো-কুড়ি মিনিটের মধ্যে ট্রেন আসবেই। ট্রেনে জায়গা পাবার কোনো সমস্যা নেই। যে-কোনো স্টেশন থেকেই দু'তিন বার ট্রেন বদলে আমার গন্তব্যস্থলে পৌঁছোতে পারবো। এক টিকিটেই যতবার খুশী ট্রেন বদলানো যায়। প্রত্যেক স্টেশনেই বিভিন্ন লাইনের ট্রেনের সব স্টেশনের তালিকা লেখা আছে বড় বড় অক্ষরে।

এক একটা স্টেশনকে মনে হয় ভুতুড়ে স্টেশনের মতন। কুলি-কামিন তো নেই বটেই, ইস্টিশান মাস্টার নেই, টিকিট চেকার নেই, এমন কি টিকিট ঘরও নেই! টিকিট কাটার যন্ত্র আছে, সেখানে পয়সা ফেললে টিকিট বেরিয়ে আসবে। পাতলা কাগজের টিকিট। গেট দিয়ে ঢোকার মুখে একটা ফুটোর মধ্যে সেই টিকিটটা ঢুকিয়ে দিলেই একটু দূরের আর একটা ফুটো দিয়ে টিকিটটা

বেরিয়ে আসবে। সেখানে যে লোহার ডাণ্ডাটা পথ আটকে ছিল, সেটাও সরে গিয়ে পথ করে দেবে সঙ্গে সঙ্গে।

আগের দিনের একটা পুরনো টিকিট ঢুকিয়ে দিলে কিন্তু সেটা আর বেরিয়ে আসবে না। ডাণ্ডাটাও সরে যাবে না। ঠিক চিনতে পারে। আবার এখানে সাত দিনের জন্য সীজন্ টিকিট কিনতে পাওয়া যায় বেশ সস্তা, সেও একখানাই পাতলা কাগজের টিকিট, আপাত দৃষ্টিতে দৈনিক টিকিট আর সীজন্ টিকিটের চেহারার কোনো তফাৎ নেই, গেটের ফুটোয় সেই টিকিট ঢোকালে গেটের যন্ত্র ঠিক বোঝে, দরজা খুলে টিকিটখানা ফেরত দেয়। সাত দিনের বেশী আট দিন ব্যবহার করতে গেলেই টিকিটখানা হজম হয়ে যাবে। আজব কাণ্ড একেই বলে!

স্টেশনে ঢোকবার গেট মাত্র কোমর সমান উঁচু। ডাণ্ডা খুলুক বা না খুলুক লাফিয়ে পেরিয়ে যাওয়া কিছুই শক্ত নয়। একটু হাই-জাম্প দিতে পারলেই হয়। তাছাড়া দেখবার তো কেউ নেই। এমনও হয়েছে যে কোনো দুপুরে আমি এরকম কোনো স্টেশনে দ্বিতীয় কোনো যাত্রী পর্যন্ত দেখিনি। সুতরাং টিকিট না কেটেও কেউ হয়তো কখনো এ রকম লাফিয়ে গেট পার হয়ে যায়। আমি একবারও চেষ্টা করিনি। যা সব ময়দানবের কারবার এদেশে। লাফিয়ে ডিঙোতে গেলে ঐ লোহার ডাণ্ডাটাও লাফিয়ে উঠে মাথায় মারে কি না তাই-ই বা কে জানে!

বাঙালী পাঠক মাত্রই জানে যে প্যারিস শহরের ট্রেনের নাম মেত্রো, এবং তা মাটির নিচে। শহরতলীর ট্রেন কিন্তু বেশীর ভাগ জায়গাতেই মাটির ওপর দিয়ে যায়, দুধারের সব দৃশ্য চোখে পড়ে। তবে শহরতলীতেও অনেক স্টেশনই বেশ উঁচুতে, সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসতে হয়। আমার স্টেশনটা সেই রকম। একদিকে সিঁড়ি, অন্যদিকে এলিভেটর। সে এলিভেটর সারা দিন আপনা আপনি চলছে, লোক থাকুক বা না-ই থাকুক। এমনও হয়েছে যে দুপুরবেলা ট্রেনে চেপে দেখেছি, গোটা ট্রেনে সব শুদ্ধ দশ-পনেরো জন যাত্রী, আমার কামরায় আমিই আলেকজাণ্ডার সেলকার্ক!

ভূতুড়ে স্টেশন এই জন্য বলছি যে, স্টেশন মাস্টার, কুলি, টিকিটবাবু এইসব কিছু নেই তো বটেই, সিগন্যাল বদল টদলও আপনা-আপনি হয়। সবই নাকি কমপিউটার নামক দৈত্যের কীর্তি। ট্রেন একেবারে কাঁটায় কাঁটায় ঠিক সময় প্লাটফর্মের ঠিক নির্দিষ্ট জায়গায় এসে থামে। আপনা-আপনি দরজা খুলে যায়, ঠিক এক মিনিট পরে আবার আপনিই দরজা বন্ধ হয়ে যায়, ট্রেন চলতে শুরু করে। আমার ধারণা, এই সব ট্রেনের কোনো ড্রাইভার থাকে না, অন্তত তাদের চোখে দেখা যায় না। আমি তো কখনো দেখিনি।

কামরার দু' পাশে বিরাট বিরাট কাচের জানলা। এক এক সময় মনে হয় পুরো ট্রেনটাই কাচ দিয়ে তৈরি। কাচের এত বেশী ব্যবহার যে সম্ভব, ভারতবর্ষের বাইরে না এলে বোঝা যায় না। আমস্টারডার্মের ভ্যানগগ্ মিউজিয়ামের চার-পাঁচতলা বাড়িটার সব দেয়ালই তো বলতে গেলে কাচের। পুরোনো মিউজিয়ামগুলোর সামনে বিশাল মোটা মোটা থাম, পুরু দেওয়াল, অট্টালিকার সৌন্দর্যই প্রথমে চোখ টানে। মনে হয় রাজপ্রাসাদ। লুভ্র্ মিউজিয়াম তো এককালে ফরাসী সম্রাটদের রাজপ্রাসাদই ছিল। সেই তুলনায় আধুনিক শিল্প ভবনগুলি অতি ছিমছাম। প্যারিসের নবতম শিল্প ভবন, যেটি প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি পঁমপিদু'র নামে নামাঙ্কিত, সেই বাড়িটির স্থাপত্য নিয়ে তো দেশ-বিদেশে পক্ষে-বিপক্ষে বহু আলোচনাই হয়েছে। অনেকে এখনো খেদের সঙ্গে বলেন, ওটা দেখলে কি আর্ট গ্যালারি মনে হয়, না কারখানা?

দূর থেকে পঁমপিদু সেন্টার দেখে প্রথমে আমিও খানিকটা হতাশ হয়েছিলুম বটে, প্রথম নজরে কারখানার মতনই মনে হয়। কিংবা মনে হয় একটা অসমাপ্ত অট্টালিকা, এখনো অনেক কাজ বাকি; শুধুমাত্র কঙ্কালটা তৈরি হয়েছে। চতুর্দিকে মোটামোটা পাইপ, আর নানা রকম তার ঝুলছে, দেয়াল-টেয়াল তোলা হয়নি। পরে, ভালো করে ঘুরে দেখে আমি বাড়িটির প্রতি রীতিমতন মুগ্ধ হয়ে পড়ি। মনে হয় যেন ভবিষ্যৎকালের ভাস্কর্য, আগামী শতাব্দীর কোনো প্রাসাদে এসেছি। অত বড় বাড়িতে সত্যিই কোনো দেয়াল নেই, সবই জানলা, ইস্পাত আর কাচ ছাড়া সিমেন্ট—কংক্রিটের ব্যবহারই হয়নি। বাড়িটাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে কাচের সুড়ঙ্গ, যার নাম স্যাটেলাইট, তারমধ্যে আছে চলন্ত সিঁড়ি। প্যারিসের নতুন বিমান বন্দরেও এই স্যাটিলাইটের খুব প্রাবল্য। প্রায় মাইল খানেকের পথ এক পা-ও না হেঁটে পার হওয়া যায়। যে-কোনো মিউজিয়ামে বা আর্ট গ্যালারিতে ঘোরাঘুরি করতে করতে পা ব্যথা হয়ে যায়, পঁমপিদু সেন্টারে সে অসুবিধে নেই, মানুষ দাঁড়িয়ে থাকে, সিঁড়ি দৌড়োয়।

প্যারিস-মুখী ট্রেনের কাচের জানলার ধারে বসে বাইরের দৃশ্য দেখতে দেখতে নিজের দেশের কথা মনে পড়ে। বেশ মনে আছে, ছেলেবেলায় আমরা প্রায়ই ট্রেনের জানলা দিয়ে ওঠা-নামা করতুম। তখন অত আগে থেকে রিজার্ভেশানের ব্যবস্থা ছিল না, যে আগে উঠে দখল করতে পারে, তারই জায়গা। পুজোর সময় দেওঘর-মধুপুরে যাবার সময় প্রত্যেক কামরার দরজার কাছে ভিড় ঠেলাঠেলি, সেই সময় বাবা-কাকারা আমাদের মতন ছোটদের চট্ করে জানলা গলিয়ে ভেতরে ঢুকিয়ে দিতেন।

এখন সব ট্রেনের জানলায় লোহার গরাদ। তাতে জানলা দিয়ে লোকজনের

ওঠানামা বন্ধ হয়েছে বটে কিন্তু আর একটা জিনিস বন্ধ করা যায় নি। বছরখানেক আগে আমি একদিন মেচেদা লোকালে চেপে হাওড়া ফিরছিলুম, তখন ঠিক দুপুর। কামরায় যথেষ্ট ভিড় থাকলেও আমি সৌভাগ্যবশতঃ জানলার পাশে একটা সীট পেয়ে দু'ধারের পানা-পুকুর ও সদ্য ধানকাটা শূন্য প্রান্তরের সৌন্দর্য উপভোগ করছিলুম, এমন সময় থপ্ করে এক তাল গোবর আমার কানের পাশে ও ঘাড়ে এসে লাগলো। এমনই চমকে উঠেছিলুম যে মনে হয়েছিল কেউ আমায় গুলি করেছে। সহযাত্রী অনেকেই হেসে উঠলো, যারা দাঁড়িয়ে ঝুলতে ঝুলতে যাচ্ছিল তাদের মনের ভাব যেন, খুব তো আরামে জানলার কাছে বসে যাওয়া হচ্ছিল, এবার হলো তো ? কয়েকজন বললো, তবু তো আপনার কিচ্ছু হয় নি, শুধু গোবর, এসব জায়গায় এই এ্যাত বড় সব থান ইঁট ছুড়ে মারে, এই তো পরশুদিনই একজনের মাথা ফেটে গেস্‌লো...।

এখানেও আমি এক দুপুরের ট্রেনের যাত্রী। এই কাচের ট্রেনে যদি কেউ ইঁট ছুঁড়ে মারে...কিন্তু কে মারবে, রাস্তায় তো একটাও লোক নেই ! এই সব শহরতলী অঞ্চলে দুপুর কেন, সকাল বা সন্ধেবেলাতেও কচিৎ পায়ে-হাঁটা মানুষ দেখা যায়। আর ফ্রান্সে এসে এ পর্যন্ত একটাও বাচ্চা ছেলে-মেয়ে দেখেছি কি না মনেই পড়ে না। ছোট ছেলে-মেয়েদের যে এরা কোথায় লুকিয়ে রাখে তা কে জানে !

বাইরের দু'ধারের দৃশ্যকেও দৃশ্য না বলে কাল্পনিক ছবি বললেই ভালো মানায়। পুতুলের বাড়ির মতন সব রঙীন, চুড়োওয়ালা বাড়ি। আমরা সমতল ছাদ দেখতে অভ্যস্ত, এদের সব বাড়ির ছাদ ত্রিকোণ। ফ্রান্সে আকাশ-ঝাড়ু বাড়ি অর্থাৎ স্কাই-স্ক্র্যাপার এখনো তেমন বেশী নয়। প্যারিস শহরে কয়েকটি উঠতে শুরু করেছিল, পরে, শহরের সৌন্দর্য নষ্ট হবে বলে সে-রকম বাড়ি তৈরি নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এখন শহরতলীর দিকে সে-রকম কিছু বাড়ি উঠলেও এখনো চোখকে তেমন পীড়া দেয় না। ট্রেনের জানলায় দু'পাশে অধিকাংশ বাড়িই ছবির বাড়ির মতন। ফরাসীদের বাড়ির সামনে যা-হোক ছোটখাট একটা বাগান থাকবেই। সেই সব বাগানে প্রধান ফলের গাছ দুটি, আপেল ও ন্যাসপাতি। এ ছাড়া আঙুর, বেদানা, স্ট্রবেরি ইত্যাদি। আমরা বরাবর জানি, খুব অসুখ-বিসুখ করলে সান্ত্বনা হিসেবে ঐ সব দামী ফল খেতে দেওয়া হয়। কিংবা হাসপাতালে কারুকে দেখতে গেলে নিয়ে যেতে হয়। কিন্তু সেই সব দুর্মূল্য ফল রাস্তার দু'পাশে ঝুড়ি ঝুড়ি ফলে আছে, এ কি আমাদের বাঙালী চোখে সহজে বিশ্বাস হয়।

এ ট্রেনের কামরায় আমি যখন উঠেছিলুম, তখন আর কেউ ছিল না। দু'

স্টেশন পরে একজন বছর পঁয়তিরিশেক বয়েসের ভদ্রমহিলা উঠেছেন, তার তিন স্টেশন পরে একটি কুচকুচে কালো যুবক। তার শরীরটি এমনই মজবুত যে কয়েক পলক তাকিয়ে দেখতে হয়। মহিলাটি একটি রঙীন পত্রিকা খুলে রেখেছেন চোখের সামনে, আর যুবকটি পা ছড়িয়ে প্রায় ত্রিভঙ্গ মুরারি অবস্থায় বসে বেশ গলা ছেড়ে গান শুরু করে দিল। ব্যক্তি স্বাধীনতার দেশ, এ দেশে কারুর কোনো ব্যবহারেই কেউ বাধা দেয় না। অন্যের খুব একটা অসুবিধে না হলেই হলো। ট্রেনের কামরায় গান জিনিসটা নিশ্চয়ই কোনো অসঙ্গত ব্যাপার নয়। আমি তো আমার দেশে যখন লোকাল ট্রেনে চাপি, তখন ভিড় আর গরমের মধ্যে যখন যখন ভিখারীরা এসে গান শোনায়, সেইটুকু সময়ই স্বস্তি পাই। আমাদের লোকাল ট্রেন খানিকটা সহনীয় করে রেখেছে ঐসব গায়করাই।

এই কালো ছেলেটির গানের গলা বেশ ভালো। এমন সুদেহী একজন যুবকের কণ্ঠস্বরও যে এত সুরেলা হবে, তা যেন ঠিক বিশ্বাস করা যায় না। হয়তো সে একজন পেশাদার গায়ক। গানের কথাগুলি ফরাসী, সুতরাং আমি ঠিক বুঝতে পারলুম না। কিন্তু সুরটা খুব বিষাদ মাখা। এই ছেলেটি ন্যাট কিং কোলের কোনো ভাই টাই নয়তো ? প্রকৃতির কি বিচিত্র খেলা, গান আর ঘুঁষোঘুঁষির মতন দুটি পরস্পর বিরোধী ব্যাপার কুচকুচে কালো মানুষরাই প্রায় একচেটিয়া করে রেখেছে।

আবার নিজের দেশের কথা মনে পড়লো। তুলনাও এসেই যায়। ভাবা যায় কি, খড়দা কিংবা এঁড়েদা স্টেশান থেকে আমি লোকাল ট্রেনে চপে শিয়ালদায় যাচ্ছি, কামরায় মাত্র তিনজন যাত্রী, তার মধ্যেও একজন আবার ন্যাট্ কিং কোলের ভাই, যে বিনা পয়সায় দুর্দান্ত গান শোনাচ্ছে ! একটা দেশে যে কত লোক বেকার, তা বোঝা যায় দুপুরবেলার ট্রেনে বা রাস্তায় জনসংখ্যা দেখে। আমাদের দেশে তো প্রত্যেকটি নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে কয়েক হাজার জন সংখ্যা বাড়ে। ফ্রান্সে নাকি জন সংখ্যা কমতির দিকে। এদেশে নাকি যে মা বেশী সন্তানের জন্ম দেয়, সেই মা সরকারের কাছ থেকে টাকা পায়। সত্য, সেলুকাস !

দু'পাশের রৌদ্র ঝলমল প্রকৃতি ছেড়ে ট্রেনটা যখন অন্ধকারে ডুব দেয়, তখন বুঝতে পারি প্যারিস শহরের হৃৎপিণ্ডের কাছাকাছি এসে গেছি। দিনে-দুপুরে ঘুটঘুটে অন্ধকারে ট্রেন যাত্রা আমি ঠিক পছন্দ করতে পারি না। এবারে নামবার জন্য তৈরি হই।

এক সময় প্যারিসে লে আল অঞ্চলে একটি বিখ্যাত কাঁচা বাজার ছিল। আগেকার অনেক গল্প-উপন্যাসে সেই নৈশ বাজারের বর্ণনা আছে। এখন সেই প্রাচীন বাজার ভেঙেচুরে প্রায় নিশ্চিহ্ন করে সেখানে সব নতুন হর্ম্য

আর—বিপণি তৈরি হয়েছে। সেটাই তো যুগের নিয়ম। কিন্তু আমি ছেলেবেলায় একবার ক্যানিং শহরের রাতের বাজার দেখতে গিয়েছিলুম। প্রায় কুড়ি বছর পরে আবার ক্যানিং-এ গিয়ে দেখি, বাজারের চেহারা অবিকল একই রকম আছে, শুধু রাস্তাঘাট বেশী ক্ষয়ে গেছে আর জল-কাদা বেড়েছে। কিন্তু গল্প-উপন্যাসে জল-কাদা মাখা প্যারিসের লে আল বাজারের যে বর্ণনা পড়েছি সে তুলনায় এখনকার লে আল চিনতেই পারা যায় না।

লে আল নামে দুটি স্টেশন আছে। একটি শুধু লে আল আর অন্যটি সাত্‌লে-লে আল। কিন্তু আমি যে ট্রেনে চেপেছি, তার কামরার নির্দেশনামা পড়ে দেখলুম, এ ট্রেন ও দুটো স্টেশনের কোনোটাই ছোঁবে না। যাবে শুধু সাত্‌লে নামে আর একটি স্টেশনে। চিন্তার কিছু নেই, ঐ সাত্‌লে-তে নেমে ট্রেন বদলে আমার অভীষ্ট স্টেশনে চলে গেলেই হবে।

সবগুলো নয়। কিন্তু প্যারিসের মেত্রোর কয়েকটি স্টেশন এতই সুন্দর আর চাকচিক্যময় যে শুধু স্টেশনটাই ঘুরে ঘুরে দেখতে ইচ্ছে করে। একতলা-দোতলা-তিনতলায় আলাদা আলাদা লাইন তো আছে বটেই তা ছাড়া গঠন শৈলীও বড় অপরূপ। লুভ্‌র্ নামে স্টেশনটিতে নামলেই বোঝা যায় যে বিশ্ব বিখ্যাত মিউজিয়ামের পাড়ায় এসে পড়া গেছে। কারণ, স্টেশনেই সমস্ত বড় বড় শিল্পীদের কাজের নমুনা রয়েছে। কোনো কোনো স্টেশন যেন পাতালের রাজপুরী। এত আলো, এত সাজ সজ্জা, এত দোকানপাট যে মনেই থাকে না, মাটির দু'তিন তলা নিচে রয়েছি।

সাত্‌লে স্টেশনটিও এ রকম বৃহৎ ও সুসজ্জিত। সেখানে নেমে একটি বৃত্তান্ত জেনে চমৎকৃত হলুম। সেখান থেকে সাত্‌লে-লে আল যেতে হলে ট্রেন বদলেও যাওয়া যায়, অথবা দুই স্টেশনের মাঝখানে চলন্ত রাস্তা ও চলন্ত সিঁড়ি আছে। সেখানে গিয়ে দাঁড়ালে বিনা পরিশ্রমেই পৌঁছনো যাবে। ধরা যাক, আমাদের বালি আর উত্তরপাড়ার মতন কাছাকাছি স্টেশান, ইচ্ছে করলে ট্রেনেও যেতে পারি, অথবা চলন্ত রাস্তাই আমায় নিয়ে যাবে!

আমি মস্কো যাইনি এখনো। প্রত্যক্ষদর্শীদের মুখে শুনেছি, মস্কোর পাতাল রেল নাকি আরও সুন্দর, স্টেশনগুলি প্রত্যেকটিই অপরূপ, মনোহর। আগে মস্কো যাই একবার, তারপর নিজের চোখে দেখে বিশ্বাস করবো। আমি বিলেতে একাধিকবার গেছি বটে, কিন্তু কার্য-কারণ বশতঃ একবারও টিউবে চড়া হয়নি। কেন জানি না, বিলেতের লোকেরা আমাকে বোধহয় কোনো মহারাজা-টহারাজা বলে ভুল করে। সেই জন্য গাড়িতে গাড়িতে ঘোরায়। যাই হোক, বিলেতের টিউব ট্রেন সম্পর্কেও খুব একটা আহা মরি প্রশংসা শুনিনি কারুর মুখে। নিউ

ইয়র্ক বা শিকাগো সাব ওয়ে চাপলে সর্বক্ষণ মনে হয় দম বন্ধ হয়ে আসছে। তা ছাড়া বেশ নোংরা। নিউ ইয়র্কের সাবওয়ের প্রত্যেক ট্রেনের ভেতরে-বাইরে হিজিবিজি দাগ কাটা। স্টেশনগুলো নিছক কালো, নিষ্প্রাণ, রাতের দিকে নিরিবিলিতে গেলে গা ছম্ ছম্ করে। নিউ ইয়র্কের একমাত্র গ্র্যাণ্ড সেন্ট্রাল স্টেশন ছাড়া আর কোনো স্টেশনেরই কোনো সৌন্দর্য নেই। নিউ ইয়র্ক কিংবা শিকাগোর শহরতলীর ট্রেন অবশ্য বেশ জমকালো, শিকাগোতে দোতলা ট্রেনও আছে। কিন্তু ভাড়া ভয়ানক বেশী। আর, দু' একটা জিনিস দেখলে আমাদেরও হাসি পায়।

সাধারণভাবে মনে হতে পারে যে পৃথিবীর যে-কোনো দেশের তুলনায় আমেরিকার ট্রেন অনেক বেশী যন্ত্র নির্ভর হবে। কিন্তু ঠিক তার উল্‌টো। শিকাগো বা নিউ ইয়র্কের শহরতলীর ট্রেনে চাপা মাত্র চেকার এসে টিকিট দেখতে চায়। শহরতলীর স্টেশনগুলো এঁড়েদা-খড়দার চেয়েও খারাপ। সব চেয়ে মুশকিল, রাত্তির বেলা ঠিক স্টেশন খুঁজে পাওয়া। স্টেশনগুলোতে টিম টিম করে আলো জ্বলে, কোথায় যে সে স্টেশনের নাম লেখা থাকে খুঁজেই পাওয়া যায় না। ফ্রান্সের মতন প্রত্যেক কামরায় পর পর সব স্টেশনের নাম লেখাও থাকে না। সেই জন্য, এই যন্ত্রযুগেও, প্রতিটি স্টেশন এলে ট্রেনের কণ্ডাকটরবাবু হেঁড়ে গলায় সেই স্টেশনের নামটা শুনিয়ে দেন। কিন্তু বাইরের লোকের পক্ষে সেই উচ্চারণ শুনে বোঝা অতি দুষ্কর। 'ম্যা ভ্যানন্' শুনে কার বাপের সাধ্য বোঝে, যে সেটা মাউন্ট ভার্নন? নিউ ইয়র্ক থেকে মাত্র পঁচিশ মাইল দূরের স্টেশনে এখনো কাঠের সিঁড়ির ওভার-ব্রীজ আছে, প্যারিসে বসে যা বিশ্বাসই করা যায় না।

অবশ্য, গোটা আমেরিকাতেই এখন ট্রেন-ব্যবস্থা অতি মুমূর্ষু। অর্ধেক রেল-রুট এর মধ্যেই বন্ধ হয়ে গেছে, দশ-পনেরো বছর পর হয়তো ট্রেন নামক প্রাণীটি এ দেশ থেকে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। সে দেশ এখন আকাশে উড়ন্ত। কোথাও কোথাও বাস ভাড়ার চেয়ে প্লেন ভাড়া সস্তা।

আমি প্যারিস ও শহরতলীর ট্রেন ব্যবস্থার কথা সবিস্তারে লিখলুম এই জন্য যে কয়েক বছর পরেই তো কলকাতার পাতাল রেল চালু হচ্ছে। তখন মিলিয়ে দেখতে হবে। আমার তো ধারণা, কলকাতার পাতাল রেল প্যারিসের চেয়ে, এমনকি, মস্কোর চেয়েও সুন্দর ও আধুনিক হবে অনেক বেশী।

॥ ৫ ॥

প্যারিস থেকে লণ্ডনে বিমানে উড়ে আসতে সময় লাগে একঘণ্টা। দুই

দেশের মধ্যে সময়ের ব্যবধানও একঘণ্টা। অর্থাৎ বিকেল পাঁচটার প্লেনে প্যারিস থেকে যাত্রা করলে আবার বিকেল পাঁচটাতেই লণ্ডনে পৌঁছানো যায়। মাঝখানকার একটা ঘণ্টা যে আমার আয়ু খরচ হয়ে গেল সেটা কী করে মেলাবো কে জানে। কিংবা এই এক ঘণ্টা আয়ু অন্য কোন সময়ে আবার ফেরৎ দিতে হবে।

হিথ্‌রো বিমানবন্দর সম্পর্কে আমাদের পূর্ব সংস্কার মোটেই ভালো নয়। অনেক রকম গল্প শুনেছি, খবরের কাগজেও অনেক রকম অপ্রীতিকর ঘটনার কথা পড়া আছে। ভারতীয়দের সেখানে নানারকম হয়রানি করা হয়, একবার আমাদের এক কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে পর্যন্ত ঢুকতে দেওয়া হয়নি, ভারতীয় মেয়েদের নাকি বিবস্ত্র করে কুমারিত্বের পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে, ইত্যাদি।

অনেকেই বিলেত যাবার আগে এনট্রি পারমিট সংগ্রহ করে নিয়ে যায়। আমার সেসব কিছুই নেই। হুড়ুড় ধাড়ুস করে বেরিয়ে পড়া, ওসব জোগাড় করার সময়ই পাইনি। হিথরো এয়ারপোর্টে নেমে আমার একটু একটু অস্বস্তি বোধ হলো। ঢুকতে দেবে তো?

অনেকদিন আগে, প্রায় বাল্যকালে আমি যখন লণ্ডনে এসেছিলুম, সেবার আমার ছবি হাতে নিয়ে এক মেমসাহেব এই এয়ারপোর্টে অপেক্ষা করেছিল আমার জন্য। আমাকে সে চেনে না, আমিও তাকে চিনি না, সেইজন্য আমার ছবি সে উঁচু করে তুলে ধরেছিল। এবার সেরকম কোনো ব্যাপার নেই, তাছাড়া অবস্থাও অনেক বদলে গেছে। এখন যা সম্পর্ক দাঁড়িয়েছে, তাতে আমার মনে হয়, কমনওয়েল্‌থ ব্যাপারটা ন্যাকামি ছাড়া আর কিছুই নয়। অন্য যে-কোনো দেশের মতন ব্রিটেনের সঙ্গেও ভারতের সরাসরি ভিসা ব্যবস্থা রাখাই উচিত। ভারতের অন্য কমনওয়েল্‌থ দোস্ত কানাডাও তো কয়েকদিন আগে ভারতীয়দের জন্য ভিসা'র সম্পর্ক করে দিল।

ইমিগ্রেশান কাউণ্টারে শ্বেতাঙ্গদের জন্য একরকম ব্যবস্থা, আর আমার মতন কালো বা খয়েরিদের জন্য অন্যরকম। দাঁড়ালুম একটা লাইনে। আগের লোকদের নানারকম জেরা করা হচ্ছে। তখনই ঠিক করে রাখলুম, যদি বেশী উলটোপাল্‌টা কথা বলে, সাফ্‌ বলে দেবো, যাবো না তোমাদের দেশে, যাও! বিলেত যেতেই হবে এমন কোনো মাথার দিব্যি কেউ দেয়নি। ফেরার টিকিট পকেটেই আছে, পরের প্লেনেই ফিরে যাবো।

আমার কাউণ্টারে এক তরুণী মেম। ব্যবহারের হেরফেরের জন্য সুশ্রী মুখকেও যে কত অসুন্দর লাগে, তা বোঝা যায় এই সময়। মেয়েটির বয়েস পচিশের বেশী না, চোখ-নাক-ঠোঁট সবই সুন্দর, কিন্তু মুখে একটুও হাসি নেই,

আর কী কঠোর দৃষ্টি! আমার পাশপোর্টটা বেশ খানিকক্ষণ উলটোপাল্‌টা দেখলো, তারপর নীরব নীরস গলায় বললো, তুমি লণ্ডনে এসেছো কেন?

কেন? সেরকম তো কোনো গূঢ় জরুরি উদ্দেশ্য নেই। সাঁওতাল পরগনা কিংবা সুন্দরবনে যাই কেন? সেইরকমই আল্‌গা উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছি। এসেছি আমার বাল্যবন্ধু ভাস্করের সঙ্গে আড্ডা দিতে আর পিকাসোর একটা আলাদা ধরনের ছবির প্রদর্শনী হচ্ছে সেটা দেখতে। কিন্তু এই কথা কি এই রুঢ়লোচনা যুবতীটি বিশ্বাস করবে? নাকি বলবো, ওগো, আমি তোমাদের দেশে চাকরিও খুঁজতে আসিনি কিংবা বেশীদিনের জন্য তোমাদের এই ছোট্ট দ্বীপটির ভারবৃদ্ধিও করতে চাই না।

সে কথা না বলে আমি শুধু বন্ধুর সঙ্গে আড্ডা আর ছবির প্রদর্শনীর কথাই জানালুম। মেয়েটি কয়েকপলক তাকিয়ে রইলো আমার মুখের দিকে। আমি ভাবলুম, এবার সে নিশ্চয়ই আমার কাছ থেকে সেই বন্ধুর ঠিকানা কিংবা তার কোনো চিঠিপত্র দেখতে চাইবে। কাঁধের ঝোলার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে চিঠি খুঁজছি, মেয়েটি অকস্মাৎ তার চেয়ার ছেড়ে উঠে গেল।

তারপর সে আর আসে না, আসেই না। আমি দাঁড়িয়ে আছি। আমার পাশপোর্টটা তার টেবিলের ওপর রাখা। একটুবাদে পাশের কাউণ্টার থেকে একজন উঠে এসে আমার পাশপোর্টটা নেড়েচেড়ে দেখে বললো, তুমি দাঁড়িয়ে আছো কেন? তোমায় তো ছেড়ে দিয়েছে!

খানিকটা বিভ্রান্ত অবস্থার মধ্যে আমি দিব্যি বেরিয়ে গেলুম বাইরে, আর কেউ একটাও প্রশ্ন করলো না।

হিথরো এয়ারপোর্টে যে আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করা হয়েছে তা আমি বলতে পারি না। একটিমাত্র প্রশ্ন করে আমায় ছেড়ে দিয়েছে, কোনোরকম কাগজপত্রও দেখতে চায়নি। কিন্তু ঐ মেয়েটি একবারও হাসলো না, আর হঠাৎ উঠে চলে গেল কেন? ঐ তাচ্ছিল্যটাই ভীষণভাবে গায়ে বেঁধে।

ভাস্কর বাইরেই দাঁড়িয়েছিল, উঠলুম ওর গাড়িতে। ও আবার শুধুমাত্র বাঁ হাতের দুটো আঙুল স্টিয়ারিং-এ রেখে গাড়ি চালায়। রাস্তার লোকজনদের ও ধুলো জ্ঞান করে। অনেকদিন আগে ভাস্কর দুটি উদ্দেশ্য নিয়ে বিলেতে এসেছিল। ইংরেজ মুচি দিয়ে জুতো পালিশ করাবে আর লণ্ডনে নিজের নামে একটা রাস্তা করে দিয়ে তারপর দেশে ফিরবে। ওর দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটি প্রায় সফল হয়ে এসেছে।

কয়েকদিন তো তুমুল আড্ডা ও ঘোরাঘুরি হলো। কিন্তু আমার মাঝে মাঝেই মনে পড়ে ইমিগ্রেশান কাউণ্টারের সেই মেয়েটির কথা। কেন সে অমন অদ্ভুত

ব্যবহার করলো ? তার চোখে আমি কি একটা মানুষ না ? রাস্তায়-ঘাটে, দোকানে কিংবা যে-কোনো জায়গায় কোনো ইংরেজ নারী-পুরুষের সঙ্গে কথা বলতে গেলে আমার দ্বিধা হয়, যদি ঐ রকম নীরব অভদ্রতা দেখায় !

মন ভালো করার জন্য গেলুম রাজকীয় শিল্প প্রদর্শনী ভবনে। টেম্‌স নদীর ধারে লণ্ডন ব্রীজের অদূরে নতুন তৈরি হয়েছে একই সঙ্গে নাট্যশালা, শিল্প প্রদর্শনী ভবন, চলচ্চিত্র ও কনসার্ট হল মিলিয়ে বিশাল এক সুরম্য হর্ম্য। সঙ্গে আছে রেস্তোঁরা, অথবা ইচ্ছে করলে ছাদে বসে নদী ও নগরীর শোভা দেখতে দেখতে নিজস্ব ওয়াইন ও স্যাণ্ডুইচের জলখাবার সেরে নেওয়া যায়।

এখানেই মহাসমারোহে চলছে পিকাসোর প্রদর্শনী, যার নাম পিকাসো'জ পিকাসো। অর্থাৎ পিকাসোর নিজের কাছে তাঁর নিজের আঁকা সারা জীবনের যে ছবির সঞ্চয় ছিল, তার উত্তরাধিকারীরা এই প্রথম তা বার করে দেখাচ্ছেন সর্বসাধারণকে। নিজের ছবির ব্যাপারে পিকাসো খুব আঁটিসুঁটি ছিলেন, অনেক ছবি ব্যাঙ্কের ভল্টে রেখে দিতেন, তা সবাই জানে। এই প্রদর্শনীটি বিশাল তো বটেই, এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পিকাসোর প্রথম যৌবন থেকে তার পরবর্তী শিল্পী-জীবনের পরিবর্তনগুলো পরিষ্কার বোঝা যায়।

এই সব ছবি সম্পর্কে বিশদ করে কিছু বলা আমার সাজে না। সে ভার রয়েছে শিল্পবোদ্ধাদের ওপর। আমি সাধারণ মানুষ, ছবি দেখতে ভালো লাগে তাই দেখি। তবু একটা কথা না বলে পারি না। ছবিগুলো দেখতে দেখতে অনেক সময় যেমন বিস্মিত হয়ে যাই; তেমনি মাঝে মাঝে আবার মর্মাহতও হতে হয়। অনেক ছবিতেই পিকাসোর শক্তিমত্তার পরিচয় পেয়ে হতবাক্ হয়ে যাবার মতন, মনে হয় এ লোকটা মানুষ নয়, দৈত্য, রেখা-রং-আয়তনকে ব্যবহার করার এক অলৌকিক শক্তি ছিল এর দখলে। নইলে এত বিস্ময়কর আর এত বেশী ছবি একটা মানুষ আঁকতে পারে এক জীবনে ? আবার অনেক ছবি দেখে একথাও মনে হয়, এসব কি ছবি, না ইয়ার্কি ? পৃথিবীর যাবতীয় শিল্প-বোদ্ধাদের বোকা বানাবার জন্য পিকাসো এসব নিজস্ব মজা করেছেন। একথাও বলতে ইচ্ছা করে, জীবনের অর্ধেক পর্যন্ত এই লোকটা প্রকৃত শিল্পী ছিল, বাকি জীবনটা ছিল উন্মাদ, আর স্রেফ প্রচারের জোরে বিশ্বের এক নম্বর শিল্পী হয়েছে।

একখানা বিকট মুখের সামনে দাঁড়িয়ে আমি ভাস্করকে জিজ্ঞেস করলুম, কী বুঝছিস ? এটাও শিল্প ?

ভাস্কর বললে, ব্যাটাচ্ছেলে এখান থেকে ফর্ম ভাঙা শুরু করেছিল। এরপর থেকে ও মানুষকে ক্রমাগত ভেঙে তুবড়ে দিয়েছে।

আমি বললুম, কিন্তু যে ছবি দেখে ভয় হয় কিংবা মুখ ফিরিয়ে নিতে ইচ্ছে হয়,

সে রকম ছবি আঁকার মানে কী ?

—ছবির বুঝি মানে থাকে ?

ক্রমশ ভাস্কর আর আমি দূরে দূরে সরে গেলুম। আমার গোড়ার দিককার ছবি দেখতেই ভালো লাগছিল। মনে হয় যেন নারীজাতি সম্পর্কে পিকাসোর সারাজীবনের কোনো শ্রদ্ধা ছিল না। প্রথমদিকে নগ্ন নারী শরীর নিয়ে তিনি অনেক কাণ্ড করেছেন। কিন্তু সেই সব নারীরা আমাদের কাছে কোনো ভাষাই প্রকাশ করে না। একজন ভাঙাচোরা চেহারার বৃদ্ধ বেহালাবাদকও পিকাসোর ছবিতে কত বাঙময়, সেই তুলনায় পিকাসোর নারীরা শুধুই যৌন-অবয়ব।

একজোড়া বৃটিশ দম্পতি মনোযোগ দিয়ে একটি ছবি দেখছিল, আমি পাশে গিয়ে দাঁড়াতে সরে গেল অন্যদিকে। তখন খেয়াল করলুম, আরও দু'একটা ছবি দেখার সময় আমি যেতেই এরা সরে গেছে। আমার ছায়া গায়ে লাগলে কি ওদের এঁটো হয়ে যাবার ভয় ? শিল্প প্রদর্শনীতে সাধারণত এমনভাবে আলোর ব্যবস্থা থাকে যাতে কারুর কোনো ছায়া না পড়ে। তবে কি আমার নিশ্বাস-প্রশ্বাসের হাওয়া ওদের গায়ে লাগলে গা জ্বলে যায় ?

কিংবা এমনও হতে পারে, এটা আমার মনের ভুল। নিছক কাকতালীয়। আমি পাশে দাঁড়িয়েছি। ওরা এমনিই অন্য ছবির কাছে চলে গেছে। ব্যাপারটা পরীক্ষা করে দেখবার জন্য এবারে আমি ইচ্ছে করে আবার ওদের পাশে গিয়ে দাঁড়ালুম। পুরুষটি তার সঙ্গিনীকে কী যেন বোঝাচ্ছিল, মাঝপথে কথা থামিয়ে ওরা সরে গেল তাড়াতাড়ি। এটাও কাকতালীয় ? আমার আবার মনে পড়ে গেল, এয়ারপোর্টের কাউন্টারের সেই তরুণীটির মুখ।

বিলেতে সকলেরই দু'চারজন পরিচিত ইংরেজ থাকে। কোথাও কোনো কবির সঙ্গে দেখা হয়, কোনো বন্ধুর সাহেব-মেম, বন্ধু-বান্ধবীর সঙ্গে আলাপ হয়। তারা কি কথা বলে না ? হাসে না ? তা কেন করবে না ? হাতে হাত ঝাঁকায়, অনর্গল গল্প করে।

কিন্তু অন্য কোথাও অপরিচিত ইংরেজের সঙ্গে চোখাচোখি হলেই, আমি যেন টের পাই, তারা সঙ্গে সঙ্গে মুখে একটা কঠিন আবরণ টেনে আনে। সারা শরীরে ফুটে ওঠে অপছন্দের ইঙ্গিত। ইংরেজ জাতি এমনিতেই থাকে খোলসের মধ্যে, চট্ করে কোনো অচেনার সঙ্গে ভাব করে না, কিন্তু আমাকে দেখামাত্র কেন কোনো ইংরেজের হাসি হাসি মুখ হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যাবে ? কলকাতার রাস্তায় কোনো সাহেবকে দেখলে আমি তো মুখ গোমড়া করি না।

আর একদিন একটা রেস্তোরাঁয় খেতে গেছি, পাশের টেবিলে এক প্রৌঢ় দম্পতি। আমরা বসবার খানিকটা পরেই সেই দম্পতি তাদের খাবার অসমাপ্ত

রেখে উঠে চলে গেল। যতক্ষণ তারা বসেছিল, ততক্ষণ তারা একটিবারের জন্যও আমাদের দিকে চায় নি। আমি চোরা চাহনিতে ওদের লক্ষ্য করছিলুম, ওরা পরস্পর একটাও কথা বলেনি পর্যন্ত।

আমি ভাস্করকে জিজ্ঞেস করলুম, ওরা হঠাৎ উঠে গেল কেন রে?

ভাস্কর বললো, নিশ্চয়ই বড় বাথরুম!

আমি বললুম, আমাদের পাশে বসে খাবে না, সেইজন্য উঠে গেল?

ভাস্কর আমার দিকে এমনভাবে তাকালো যেন আমি একটা উদ্ভট কথা বলছি।

তাহলে কি এটাও আমার মনের ভুল? হয়তো ওরা এমনিই উঠে গেছে। আমরাও অনেক সময় পুরো খাবার খাই না। কিংবা ওদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া চলছিল। কিংবা ওরা স্বামী-স্ত্রী নয়, লোকটি এসেছে পরস্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে, দূরে, অন্য কোনো লোককে দেখে উঠে গেছে।

কিংবা, ভাস্কর চোদ্দ-পনেরো বছর ধরে আছে বলেই ওর এসব চোখে পড়ে না, আমি নতুন এসেছি বলেই টের পাচ্ছি। কিংবা এয়ারপোর্টের সেই মেয়েটি আমার মাথার মধ্যে এই চিন্তা ঢুকিয়ে দিয়েছে।

শুনেছি, একসময় আমাদের দেশের ট্রেনে ফার্স্ট ক্লাসের কামরায় কোনো ভারতীয়কে দেখলে ইংরেজরা জোর করে নামিয়ে দিত। ইংরেজদের জন্য আলাদা পাড়া, আলাদা ক্লাব, আলাদা সুইমিং পুল ছিল, যেখানে ভারতীয়দের তারা ঢুকতে দিত না। ইংরেজদের সেই প্রতাপ অনেকদিন আগেই শেষ হয়ে গেছে। এখন খোদ লণ্ডন শহরে বসে ভারতীয়রা ইংরেজ পুলিসদের ঠ্যাঙানি দেয়। আমাদের মতন কালো মানুষদের গায়ের জোরে দূরে সরিয়ে রাখতে পারবে না বলেই কি ওরা এখন নিজেরাই দূরে দূরে সরে যায়? নিজের দেশে বসেও।

জওহরলাল নেহরু যে স্কুলে পড়তেন, সেই হ্যারো স্কুলের কাছাকাছি আমার বন্ধুর বাড়ি। ছোট টিলার ওপর স্কুল, তার পাশের উপত্যকাটি বসতি এলাকা। বেশ শান্ত, নির্জন পাড়া। লণ্ডনে দাঙ্গা হাঙ্গামা হলে আমরা কলকাতায় বসে উদ্বেগ বোধ করি আমাদের চেনাশুনো বন্ধুদের জন্য। কিন্তু সেরকম কোনো গোলমাল এই মিড্‌লসেক্সে হয়নি। সেরকম পাড়া আছে লণ্ডনে যেখানে সন্ধেবেলা রাস্তায় হাঁটলে মনে হতে পারে গুজরাট কিংবা পাঞ্জাবে চলে এসেছি। শুধু হিন্দী জানলেই সেখানকার দোকান-টোকানে কাজ চালিয়ে নেওয়া যায়। সিঙারা-কচুরির গন্ধ রাস্তায় ভুরভুর করে। একলা কোনো ইংরেজকে ক্বচিৎ দেখা যায় সেসব পাড়ায়।

কিন্তু আমরা যেখানে আছি সেটা পুরো সাহেবপাড়া। দু'একজন বাঙালীর বাড়ি আছে এখানে।

সন্ধেবেলা জমিয়ে আড্ডা হচ্ছে, আরও কয়েকজন এসেছেন, কথায় কথায় আমরা চলে যাচ্ছি প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে। একসময় অশোক বললো, ভাস্করদা, আপনার চেনা কেউ বাড়ি কিনবে? আমাদের পাশের বাড়িটা বিক্রি আছে, বেশ সস্তায় ছেড়ে দিচ্ছে...

ভাস্কর বললো, তোমাদের পাশের বাড়ি? কোন্‌টা? সেই বুড়োর, জেম্‌সন না কী যেন নাম...

—হ্যাঁ সেই বাড়িটা!

—মাত্র তো বছর দেড়েক আগে বাড়িটা বানালো...সুন্দর বাগান করেছে, আমি একদিন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলুম, বুড়োর সঙ্গে আলাপও হল,...হঠাৎ বাড়িটা বিক্রি করে দেবে কেন?

—তার পরের বাড়িটাতে একটা নিগ্রো ফ্যামিলি এসে উঠেছে।

—কবে?

—গত মাসে। ওরা সে বাড়িটা কিনেছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না, মোটকথা উঠেছে একটা নিগ্রো ফ্যামিলি (ওদেশে এখন নিগ্রো কথাটা উচ্চারণ করা নিষিদ্ধ, বলতে হয় ব্ল্যাক)...

—সেইজন্য বুড়ো তার অত শখের বাড়ি বেচে দেবে?

—মিসেস জেম্‌সনের একটু ইচ্ছে নেই, অত যত্ন করে বাগান করেছে, কিন্তু বুড়ো জিদ ধরেছে কোনো নিগ্রোর পাশে সে কিছুতেই থাকবে না। আমাদের সঙ্গে অবশ্য বুড়ো কোনোদিন খারাপ ব্যবহার করেনি...কিন্তু নিগ্রো শুনেই...

আমি মুচকি হাসলুম। বুড়ো জেম্‌সন কোনক্রমে খয়েরি ভারতীয়দের প্রতিবেশী হিসেবে সহ্য করেছিল, কিন্তু কুচকুচে কালো ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান তার পক্ষে অসহ্য। খোদ লণ্ডন শহরে বসেও পাশের বাড়ি থেকে একটা নিগ্রো পরিবারকে তাড়িয়ে দেবার ক্ষমতা তার নেই, সেইজন্য রাগ করে, সে নিজের বাড়ি ছেড়ে দূরে সরে যাচ্ছে।

এত সরতে সরতে শেষপর্যন্ত ইংরেজরা কোথায় যাবে?

॥ ৬ ॥

ব্রিটিশ মিউজিয়াম একদিনে দেখে ফেলা আর পাঁচ মিনিটে মহাভারত পড়ে শেষ করা একই ব্যাপার। অদ্ভুতকর্মা প্রতিভাবানদের পক্ষেই শুধু তা সম্ভব। সব কিছুই যে দেখতে হবে, সে রকম মাথার দিব্যি তো কেউ দেয়নি। গপ্

গপ্ করে গিলে খেলে কোনো খাবারেরই স্বাদ পাওয়া যায় না।

আমি অলসভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম ব্রিটিশ মিউজিয়ামের পাণ্ডুলিপি বিভাগে, হঠাৎ মনে হলো, একটু চা-ফা খেলে মন্দ হয় না। শিল্প নাকি মানুষের ক্ষুধা-তৃষ্ণা ভুলিয়ে দিতে পারে, আমার তো দেখছি উল্‌টো ব্যাপার। দু'-একঘণ্টা বাদে বাদেই চায়ের তেষ্টা পায়। তা ছাড়া এইসব জায়গায় সিগারেট টানা যায় না, মাঝে মাঝেই বাইরে যাবার ছুতো খুঁজতে হয়। ব্রিটিশ মিউজিয়ামেই এক জায়গায় স্যার ওয়াল্টার র‍্যালের ছবি দেখে আমি মনে মনে বলেছিলুম, কেন দাদা তামাকের ধোঁয়া টানার ব্যাপারটা চালু করেছিলে? এখন আমরা ঐ নেশার দাস হয়ে গেছি আর রাজ্যের লোক আমাদের ক্যানসারের ভয় দেখাচ্ছে!

রাস্তা খুঁজে ক্যান্টিনে পৌঁছে লণ্ডনের বিখ্যাত বিস্বাদ স্যাণ্ডুইচ আর ট্যালটেলে চা নিয়ে বসলুম। এত খারাপ খাবার খেয়েও ব্রিটিশ জাতি যে কী করে বিশ্বজয় করেছিল, তা ভাবলে অবাক লাগে। মোগলদের বুঝি, তারা মোগলাই খানা খেয়েছে, সেই রকম জবরদস্ত লড়াইও করেছে। আর ব্রিটিশরা নাকি সমরক্ষেত্রের তাঁবুতেও সন্ধেবেলা পোশাক না বদলে ডাইনিং টেবলে যেত না। ডাইনিং টেবলে গিয়ে যত রাজ্যের আলুনি-আঝালি সেদ্ধ খাবার খেত! লণ্ডন শহরের পাড়ায় পাড়ায় প্রচুর 'ফিস অ্যাণ্ড চিপ্‌সের' দোকান দেখতে পাওয়া যায়। মাছ জিনিসটাকেও যে কত অখাদ্য করা যায়, তার প্রমাণ দিয়েছে ইংরেজরা।

বিলিতি চা মানে তো আসলে আমাদেরই বা বাংলাদেশী বা সিংহলী চা। তবু এখানে চা খেয়ে যেন কিছুতেই দেশের মতন স্বাদ পাই না। একমাত্র সিগারেটের স্বাদটা এদেশে ভালো। তাও আমার মতন চার্মিনার খোরদের পক্ষে বেশ মুশকিল। এদেশে চার্মিনার বা সমতুল্য কোনো সিগারেট পাওয়া যায় না।

আমার থেকে দুটো টেবিল দূরে তিনটি ছোকরা বসে বেশ জোরে জোরে কথা বলছে। চেহারা দেখে বোঝা যায় ওরা ভারতীয়, কিন্তু বাঙালী নয়, কারণ ওদের পারস্পরিক ভাষা ইংরেজি। আমার সঙ্গে একবার চোখাচোখি হলো কিন্তু আমাকে পাত্তাই দিল না। প্রবাসে ভারতীয় মাত্রই ভারতীয়ের আত্মীয় নয়। অচেনা সাহেবেরা অনেক সময় ডেকে কথা বলে, কিন্তু এক ভারতীয়ের সঙ্গে অন্য ভারতীয়ের দেখা হলে দু'জনেই মুখ ঘুরিয়ে চলে যায়।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমি ওদের আলোচনা শুনছিলুম। যুবক তিনটিই চাকরি করে জার্মানিতে, ছুটিতে বেড়াতে এসেছে, কিন্তু লণ্ডন ওদের একটুও ভালো লাগছে না। ওদের কথা শুনে আমি রীতিমতন চমৎকৃত হলুম। লণ্ডন ওদের ভালো লাগছে না, কারণ এখানে জিনিসপত্রের দাম অত্যন্ত বেশী, শহরটাও

নোংরা, ছোট ছোট রাস্তা, বড্ড ভিড়, খাবার-দাবারের সুবিধে নেই, হোটেলের ঘরটা খুব ছোট আর বদ্ধ, পাঁচবার ডাকলেও কারুর সাড়া পাওয়া যায় না···। আমি একবার ভাবলুম, ওরা কি কলকাতার বর্ণনা দিচ্ছে?

দ্বিতীয় সিগারেটটি সবে শেষ করেছি, এই সময় দূর থেকে একজন মধ্যবয়সী ভদ্রলোক হেঁটে এলেন আমার দিকে। দু'দিন ধরে বেশ গরম পড়েছে লণ্ডনে, আমার মতন যারা সদ্য আগত, তারা প্রায় সবাই শুধু হাওয়াই শার্ট পরে বেরিয়েছে, কিন্তু এই ভদ্রলোকের পরনে পুরো-দস্তুর সুট-টাই। মুখে পাইপ। আমার টেবিলের সামনে এসে দাঁড়িয়ে তিনি প্রথমে আপদমস্তক আমায় নিরীক্ষণ করলেন, তারপর পরিষ্কার বাংলায় বললেন, আপনি···তুমি···নীলু না? দেবপ্রিয়র ভাইপো? তখন থেকে মনে হচ্ছে চেনা চেনা।

ভদ্রলোকের গায়ের রং এত পরিষ্কার আর হাব-ভাব এত সাহেবী যে আমি স্প্যানীশ বা ইটালিয়ান ভেবেছিলুম। কিন্তু ওঁর বাংলা উচ্চারণে একটুও টান নেই।

আমি বললুম, আজ্ঞে হ্যাঁ, কিন্তু আপনাকে তো আমি···

উনি বললেন, দেবপ্রিয়র সঙ্গে আমি পড়তুম। তাছাড়া, তুমি পদ্মনাথ লেনে আমাদের পাশের বাড়িতে খুব আসতে, ভাস্করের বন্ধু ছিলে···তোমাকে হাফ্-প্যান্টুল পরা অবস্থায় দেখেছি···

আমি সবিস্ময়ে বললুম, নীতিশদা?

উনি বললেন, ঠিক ধরেছো। তাহলে তোমার সঙ্গে একটু বসি? আমার হাতে আরও মিনিট কুড়ি সময় আছে।

নীতিশদার মাথার চুল কাঁচা-পাকা হয়েছে, চোখের নিচে ভাঁজ পড়েছে, কিন্তু চিনতে কোনো অসুবিধে হবার কথা নয়। চোখ দুটি বেশী ঝকমকে, অতি তীক্ষ্ণ নাক, এই রকমই দেখেছি ছেলেবেলায়। নীতিশদার দুটি বৈশিষ্ট্য ছিল। উনি ঘুড়ি ওড়াতে খুব ভালোবাসতেন এবং ইংরেজির দুর্ধর্ষ ছাত্র ছিলেন। আমরা জানতুম, নীতিশদার প্রথম থেকে শেষ লাইন পর্যন্ত পুরো হ্যামলেট মুখস্থ। কিন্তু শেষ যতদূর জানতুম, উনি চাকরি করতেন পুণায়।

অবশ্য লণ্ডনে এসে যে-কারুর সঙ্গে দেখা হলেও অবাক হবার কিছু নেই। যে-কোনো সময় যে-কারুর বাবার সঙ্গেও দেখা হয়ে যেতে পারে, এবং তিনি জিজ্ঞেস করতে পারেন, আরে: তুই এখানে?

অবশ্য, আমার বাবা বেঁচে নেই এই যা। আমার বাবার সঙ্গে অন্তত দেখা হবার সম্ভাবনা নেই লণ্ডনে।

নীতিশদা জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এখানে কী করছো?

আমি বললুম, ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছি।
—চাকরি-বাকরি পাওনি?
—না, আছে নাকি আপনার সন্ধানে?
নীতিশদা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে পাইপ ধরালেন। আমি একসময় নীতিশদাকে গুরুজনের মতন সম্ভ্রম করতুম, কিন্তু প্রবাসে নিয়ম নাস্তি এই ভেবে ফস্ করে জ্বেলে ফেললুম আর একটি সিগারেট।
—আপনি এদেশে কতদিন আছেন, নীতিশদা?
—তা বছর বারো হবে। ঠিক হিসেব ধরতে গেলে বারো বছর চার মাস, আমি জুনে এসেছিলুম।
অল্প বয়েস থেকেই যার হ্যামলেট মুখস্ত, তার পক্ষে পুণার বদলে লণ্ডনে বসতি নেওয়াই তো স্বাভাবিক। কিন্তু এর মধ্যে এত বছর কেটে গেছে?
—তুমি কোন্ ইয়ারে এসেছো, নীলু?
মাত্র চারদিন আগে।
এবারে আমাকে আর একবার ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করে নীতিশদা বললেন, আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল, তোমার গায়ে, জামা-কাপড়ে এখনো টাটকা দেশের গন্ধ। সিগারেট টানছোও ঠিক কলকাতার ছেলের মতন। তুমি কি এখানে কিছু পড়তে টড়তে এসেছো নাকি? ব্রিটিশ মিউজিয়ামে মেম্বারশীপ পেয়েছো? সে ব্যাপারে আমি সাহায্য করতে পারি।
—আমি এখানে মাত্র দু-চারদিন থাকবো।
—কোথায় যাচ্ছো?
—বালটিমোরে। সেখানে বিশ্ব-বখাটে সম্মেলন হচ্ছে, কিংবা বিশ্ব-নিষ্কর্মা সম্মেলনও বলতে পারেন, আমি সেখানে নেমন্তন্ন পেয়েছি।
নীতিশদা একটু হেসে বললেন, অসম্ভব কিছু না, ও দেশে সবই সম্ভব। ওরা বিশ্ব নর্দমা পরিষ্কার থেকে শুরু করে বিশ্বশান্তি পর্যন্ত যাবতীয় অবান্তর জিনিস নিয়েই কনফারেন্স করে। কিছুদিন আগেই শুনলুম, ওখানে বিশ্ব অনিদ্রা রোগীদের একটা সেমিনার হয়ে গেল। সবই বিশ্ব! যাই হোক এখানে একলা বসে আছো, কোনো মেয়ে বন্ধু টন্ধুর জন্য অপেক্ষা করছো নাকি?
—সেরকম একজনও জোটেনি এখনো। সিগারেট টানতে এসেছি। আপনি?
—আমার চারটের সময় একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। কিছুক্ষণ এখানে সময় কাটাতে এসেছি। আমি প্রায়ই আসি। তোমার লণ্ডন কেমন লাগছে?
—লণ্ডনের অনেক রাস্তাঘাট দেখলে বড্ড এলগিন রোড কিংবা ভবানীপুরের জন্য মন কেমন করে। ঠিক আমাদের ঐসব জায়গার মতন দেখতে, আমাদের মতন দোতলা বাস হেলে দুলে চলে, ছাতা হাতে নিয়ে লোকেরা বাসস্টপে দাঁড়িয়ে থাকে—

—তুমি ভুল করছো, কলকাতার মতন বাস এখানে চলে না, লণ্ডনের দোতলা বাসের গরিব সংস্করণ কলকাতায় চলে। এলগিন রোড-টোড অঞ্চল লণ্ডনের অনুকরণে তৈরি।
—তাই বুঝি! ভুলে গিয়েছিলুম।
—তোমরা লণ্ডন দেখে মুগ্ধ হও না, জানি। ঐ যে ঐ টেবিলের ছেলেগুলো তখন থেকে চ্যাঁচাচ্ছে, ঐ রকমভাবে লণ্ডনের নিন্দে করা…একটুও সভ্যতা বোধ নেই।
—কেন লণ্ডনে বসে বুঝি লণ্ডনের সমালোচনা করা যায় না?
—তা করুক না, কিন্তু এদেশে আস্তে কথা বলাই নিয়ম, তাও মানবে না? আর ঐ রকম ভুল ইংরিজি শুনলে আমার গায়ে কাঁটা দেয়। ওরা জার্মানি থেকে এসেছে…জার্মানিতে যারা চাকরি করে, তারা আজকাল নিজেদের খুব বড়লোক মনে করে। ওরা ভাবে ওদের চেয়ে আমরা অনেক গরীব হয়ে গেছি।
আমার হাসি পেয়ে গেল। বেশ মজার ব্যাপার। ওরা আর আমরা? ওরাও ভারতীয়, নীতিশদাও ভারতীয়। দেশ ছেড়ে বাইরে এসে দশ-বারো বছর থাকবার পর অনেকেই বেশ সৎ-মায়ের ভক্ত হয়ে পড়ে। ফ্রানসের ভারতীয়রা বলে, ইংলণ্ডটা আবার একটা দেশ নাকি, সর্বক্ষণ প্যাচপেচে বৃষ্টি, নয়তো কুয়াশা, ভালো চীজ বা ওয়াইন কিছুই পাওয়া যায় না, হোটেলগুলোতে গলাকাটা দাম…। ইংলণ্ডের ভারতীয়রা বলে, ফ্রান্স তো শুধু প্যারিস নিয়েই গর্ব করে, একটু ভেতরের দিকে যাও, দেখবে অনেক বাড়িতে এখনও খাটা-পায়খানা রয়েছে…লোকগুলো নিজেদের ভাষা ছাড়া দুনিয়ার আর কোনো ভাষা বোঝেও না, বুঝতেও চায় না। আর কি কঞ্জুষ! ফ্রান্সের যে-কোনো মিউজিয়াম বা আর্ট গ্যালারিতে যাও, সব জায়গায় হাত বাড়িয়ে আছে, পয়সা দাও! লণ্ডনের টেট গ্যালারি বা ব্রিটিশ মিউজিয়ামে কারুর এক পয়সা দিতে হয়?
সৎমায়ের পক্ষ নিয়ে কথা বললেও এই সব ভারতীয়দের সৎ-ভাইরা কিন্তু কখনো ওদের আপন মনে করে না।
নীতিশদা বললেন, আসল ব্যাপার কী জানো, এইসব ছেলেরা, যারা ফর্টিসেভেনের পর জন্মেছে, তাদের ইংলণ্ড বা ইংরেজ জাত সম্পর্কে আলাদা কোন মোহ নেই। আমরা যারা পরাধীন আমলে জন্মেছি, আমাদের মোহই বলো, শ্রদ্ধা-ভক্তি, ভয়, ঘৃণা—এইসব মিলিয়ে একটা অন্যরকম ধারণা আমাদের মনের

মধ্যে গেঁথে আছে এদের সম্পর্কে। আমাদের বাবা-কাকারা এখনো বলেন বিলেত, অর্থাৎ রাজার দেশ, এখনকার ছেলেমেয়েরা বলে লণ্ডন। এই যে ট্রাফালগার স্কোয়ার, পিকাডেলি সার্কাস, হাইড পার্ক কর্ণার এইসব জায়গা সম্পর্কে ছেলেবেলা থেকে এত পড়েছি যে ছবির মতন সব দেখতে পেতুম, কোনোদিন এসব জায়গায় পা দেবো ভাবলেই রোমাঞ্চ হতো। এখনকার ছেলেমেয়েদের পক্ষে এগুলো কিছুই না জাস্ট কতকগুলি টুরিস্ট স্পট…।

আমি জিজ্ঞেস করলুম, নীতিশদা, এখানে প্রথম পা দেবার সময় আপনার যে রোমাঞ্চ হয়েছিল, এই বারো বছর পরেও কি সেই রোমাঞ্চ টিঁকে আছে?

নীতিশদা বেশ জোর দিয়ে বললেন, নিশ্চয়ই! লণ্ডন আমার কাছে কখনো পুরোনো হয় না। এখন ব্রিটিশ জাতটা একটু নিস্তেজ হয়ে গেছে, পাউণ্ডের দাম রোজই হু-হু করে নেমে যাচ্ছে, তবু লণ্ডন হচ্ছে লণ্ডন। এরকম ওপ্‌ন সিটি পৃথিবীতে আর একটাও আছে? বিশ্বের যত বড় বড় জ্ঞানী-গুণী তাদের সবারই স্থান আছে এখানে!

—প্যারিসের লোকেরাও প্যারিস সম্পর্কে এই কথা বলে। যারা নিউইয়রকে থাকে, তাদের মতে নিউইয়র্কের মত ওপন সিটি নাকি আর হয় না।

—আরে প্যারিস শহরটাই হচ্ছে কৃত্রিম। শুধু সুন্দর করে সাজানো। ফ্রান্সের বাগানগুলো দেখেছো? একেবারে নিখুঁত না? ওরকম বাগান কি বাস্তব মনে হয়? সব গাছগুলোকে কাঁচি দিয়ে ছেঁটে ছেঁটে একেবারে খেলনার মতন করে রাখে। বীভৎস! প্যারিস শহরটাই সন্ধেবেলাকার পরের শহর। দিনের বেলা কী করতে হয় ওরা জানেই না। আর নিউইয়র্ক তো উটকো ব্যাপার, ওরা ভাবে কোনো কিছুই খুব বড় হলে তবে সুন্দর হয়! মানুষের চিন্তায় যা কিছু শ্রেষ্ঠ ফসল, তা তুমি পাবে লণ্ডনে। রবি ঠাকুর বলো আর কার্ল মার্কসই বলো, সবাইকেই আসতে হয়েছিল এখানে। এই লণ্ডনের রাস্তায় রাস্তায় গোটাকতক সেঞ্চুরির ইতিহাসের ধুলো মিশে আছে।

—এখন বড্ড বেশি ধুলো জমে গেছে মনে হয় না আপনার?

নীতিশদা বাঁকা চোখে আমার দিকে তাকিয়ে, একটুক্ষণ চুপ করে থেকে, তারপর বললেন, আমার সময় হয়ে গেছে, এবার আমায় উঠতে হবে। একদিন আসবে নাকি আমার ওখানে?

—নিশ্চয়ই, ঠিকানা দিন। বৌদি কি বাঙালী, না মেমসাহেব?

নীতিশদা প্রথমে কোটের ভেতরের পকেট থেকে পার্স বার করলেন, তারপর তার থেকে একটা কার্ড নিয়ে আমার হাতে দিয়ে বললেন, সাড়ে পাঁচটার পর আমি বাড়িতেই থাকি, যে-কোনো দিন এসো। বৌদি-টৌদি কেউ নেই…।

একটু অন্যমনস্কের মতন মাটির দিকে তাকিয়ে থেকে উনি আবার বললেন, তোমার থাকার জায়গার কোনো অসুবিধে নেই তো? আমার কাছেও এসে থাকতে পারো কয়েকদিন, তবে নিজে রান্না করে খেতে হবে।

—আমার থাকার জায়গা আছে নীতিশদা।

—তা হলে আমি চলি। সম্ভব হলে এসো…বাই বাই!

নীতিশদা চলে যাবার পর আমিও উঠে পড়লুম। একটা ব্যাপারে খট্‌কা লাগলো। নীতিশদা একবারও তো কলকাতার খবর জিজ্ঞেস করলেন না। সাধারণত অন্য সবাই জিজ্ঞেস করে, কলকাতার লোড-শেডিং-এর বর্তমান পরিস্থিতি, রাস্তার খোঁড়াখুঁড়ি, বাড়ি ভাড়া এবং রান্নার গ্যাস ঠিক মতন পাওয়া যায় কি না, জ্যোতি বসু আর ইন্দিরা গান্ধী ইত্যাদি। অন্তত পুরোনো চেনা শুনো লোকেরা কে কেমন আছে সে সম্পর্কেও নীতিশদার কোনো আগ্রহ নেই!

আরও কিছুক্ষণ ব্রিটিশ মিউজিয়ামে ঘোরাঘুরি করবার পর আর একটি অভিজ্ঞতা হলো।

মিউজিয়ামের দিকটায় বিভিন্ন ঘরে ঘরে প্রহরী থাকে। তাদের মধ্যে অনেকেই কালো মানুষ। কয়েকজনকে ভারতীয় বলেও মনে হয়। বড্ড বাজে চাকরি, সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত শুধু একটা ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা আর লোকজনের হাতের দিকে নজর রাখা। একটুক্ষণের জন্যও বসবার নিয়ম নেই।

সেইরকম একজন প্রহরীকে আমি জিজ্ঞেস করলুম, মিশরীয় সংগ্রহের দিকটা কোথায়?

প্রহরীটা সরাসরি উত্তর না দিয়ে বললো, তুমি কি ভারতবর্ষ থেকে আসছো?

আমি ঘাড় নাড়তেই সে আবার বললো, এখানে কী দেখতে তোমরা আসো? এই ব্রিটিশ জাতটা পৃথিবীর সব জায়গা থেকে চুরি করে কিংবা লুট করে এইসব জিনিস নিয়ে এসেছে, তা দেখতে তোমাদের ভাল লাগে? রাগ হয় না!

বেশ অবাকই হলুম আমি। এখানকার প্রহরীর চাকরি করেও এমন কথা বলছে? তাছাড়া কথা বলছে ইংরেজিতে, অন্য কেউ শুনেও তো ফেলতে পারে!

লোকটি নিজের থেকেই আবার বললো, আমি এসেছি উগাণ্ডা থেকে। এক সময় আমরা ভারতীয় ছিলুম। এখন আমার ব্রিটিশ পাশপোর্ট, কিন্তু এদেশের সরকার আমাদের সঙ্গে কী রকম খারাপ ব্যবহার করেছে জানো? আমাকে আসতে দিয়েছে, কিন্তু আমার মা আর ছোট ভাইকে ঢুকতে দেয়নি এদেশে। উগাণ্ডা থেকে ইদি আমিন আমাদের তাড়ালো, ব্রিটিশ সরকারও আমাদের

কোনো প্রটেকশান দিল না…এ জাতটা এত স্বার্থপর…

লোকটির চোখ-মুখ দিয়ে তিক্ততা আর ঘৃণা ঝরে পড়ছে। আমি বেশ একটু অপ্রস্তুত বোধ করলুম। উগাণ্ডার ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের সমস্যার কথা খবরের কাগজে পড়েছি, তাদের কারুকে আগে চোখে দেখিনি। লোকটি আমায় ছাড়তে চায় না। চাপা গলায় অনবরত ব্রিটিশ জাতির নিন্দে করে যেতে লাগলো। তার যোগ্যতা অনেক বেশী থাকলেও সে এখানে একটা বাজে চাকরি পেয়েছে, থাকার জায়গার দারুণ সমস্যা, ছোট ভাইটা মাকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত কানাডায় আশ্রয় পেয়েছে বটে কিন্তু চাকরির পারমিট জোগাড় করতে পারেনি, তাদের জন্য দুশ্চিন্তা…।

—তোমরা ভারতে ফিরে গেলে না কেন? সেখানে তোমাদের পুরো পরিবারটা একসঙ্গে থাকতে পারতে।

—ভারতে কি চাকরি পাওয়া যায়? সেখানে কে আমাদের খেতে দেবে? রিফিউজিদের প্রতি ভারত সরকার কী রকম ব্যবহার করে তার কিছু কিছু খবর আমরা শুনেছি, বাংলাদেশ ওয়ারের সময়কার ছবিও দেখেছি…। তুমি বলতে পারো, ভারতে গেলে আমাদের কিছু সুবিধে হবে?

এই লোকটিও একজন রিফিউজি। আমাদের পুরো জীবনটাই কেটে গেল রিফিউজিদের সমস্যা দেখতে দেখতে। লণ্ডনে এসেও নিস্তার নেই। খুব জোর নিয়ে লোকটিকে বলতে পারলুম না যে, ভারতে গেলে ওর সমস্যার সুরাহা হবে।

লোকটির পূর্বপুরুষ ছিল গুজরাটি। আমরা গুজরাটি শুনলেই ভাবি ব্যবসায়ী আর ধনী। এই লোকটি উগাণ্ডার কাম্পালায় ছিল একটি ব্যাঙ্কের কেরাণী ও কবি। ওর দুটি কবিতার বই আছে। এখানে এসে খুবই খারাপ অবস্থার মধ্যে আছে, কবিতা লেখা মাথায় উঠে গেছে।

মিউজিয়ামের একজন শ্বেতাঙ্গ অফিসারকে এদিকে আসতে দেখেও লোকটি সন্ত্রস্ত হলো না, বেপরোয়া ভঙ্গিতে আমার কনুই ধরে রেখে বললো, ভাবছি এখানে এই অপমানের মধ্যে থাকার চেয়ে ভারতে গিয়ে আধ-পেটা খেয়ে থাকাও ভালো। আমেদাবাদ শহরটা কী রকম বলতে পারো? সেখানে কোনো কেরাণীর চাকরিও পাওয়া যাবে না?

লোকটির কাছ থেকে অতিকষ্টে নিজেকে ছাড়িয়ে তাড়াতাড়ি পালিয়ে গেলুম অন্যদিকে। জীবন্ত মানুষের সমস্যার কথা শুনলে মিউজিয়াম দেখায় আর মন বসে না।

যে বন্ধুর বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছি সে সন্ধেবেলা মিউজিয়ামের সামনে গা

যে অপেক্ষা করবে, যথাসময়ে উপস্থিত হলুম তার কাছে। লণ্ডনে অসংখ্য বাঙালী, কে আর কজনকে চেনে, তবু আমার বন্ধুটি নীতিশদার নাম শুনে চিনতে পারলো। সে বললো, হ্যাঁ, ভদ্রলোক বেশ ভালো মানুষ। কিন্তু এখন বেশ অসুবিধের মধ্যে পড়েছেন। যে কম্পানিতে উনি চাকরি করতেন, সে কম্পানিটা উঠে গেছে। এখন পটাপট এরকম অনেক কম্পানিই উঠে যাচ্ছে। এই ডিপ্রেশানের বাজারে কোনো নতুন চাকরি পাওয়াও মুশকিল। তবে ঐ নীতিশবাবু খুব অহঙ্কারী, কারুর কাছে নিজের অসুবিধের কথা বলেন না।

নীতিশদা যে কতটা অহঙ্কারী তা আমিও বুঝতে পারলুম। উনি আমাকে একবারও দেশের অবস্থার কথা জিজ্ঞেস করেননি। যদি আমি ভেবে ফেলি যে উনি দেশে ফেরার ইচ্ছে পোষণ করছেন। এই স্বর্গপুরী লণ্ডন ছেড়ে দেশে ফেরা!

॥ ৭ ॥

লণ্ডন থেকে আবার প্যারিসে ফিরে আসাই ঠিক করলুম।

প্যারিসের একটা মস্ত গুণ কী, কোনো কিছু না করলেও, কোনো দ্রষ্টব্য স্থানে না গেলেও এমনি এমনিই ভালো লাগে। দ্রষ্টব্য জায়গাগুলিতে বড্ড ভিড়। শরৎকালটাতে যেন সারা পৃথিবীর ভ্রমণকারীরা ধেয়ে আসে ফ্রান্সে। এই সময় ঝকঝকে রোদ ওঠে, নীল আকাশ দেখা যায়, দিনের বেলায় বাতাসে একটুও শীতের ধার থাকে না, আমেরিকান ছেলেমেয়েরা তো শুধু একটা গেঞ্জি গায়ে ঘুরে বেড়ায়। প্যারিসে পার্কের অন্ত নেই, সব কটি পার্কে এই সব ভিন্‌ দেশী ছেলেমেয়েরা ঘাসের ওপর গড়াগড়ি দেয় আর সারাদিন ধরে রোদ শুষে নেয় গায়ে। রিভিয়েরা কিংবা ঐ ধরনের বিখ্যাত সমুদ্রতটে নিশ্চয়ই রোদ-শোষকদের ভিড় আরও অনেক বেশী, কিন্তু সে সব জায়গায় যাওয়া আমার পকেটের সাধ্যে কুলোবে না।

ইংলণ্ডে আমার বন্ধু ভাস্কর ঐ রকম একটা ছোটখাটো সমুদ্রতীরে নিয়ে গিয়েছিল। জায়গাটার নাম শুবেরিনেস, লণ্ডন থেকে গাড়ি-দূরত্ব ঘণ্টা দুই আড়াই। রোদ্দুর বড় ভালোবাসে ইংরেজরা, রোদ ওদেশে দুর্লভ। লণ্ডনের থেকে প্যারিসে রোদ বেশী। রোদ কম পায় বলে ইংরেজ মেয়েরা ফরাসিনীদের চেয়ে বেশী ফর্সা। আমাদের চোখে অবশ্য এটা ধরা পড়ার কথা নয়, কিন্তু শুনেছি প্যারিসের ফলি বার্জার কিংবা বিখ্যাত নৈশ ক্লাবগুলিতে যে-সব স্বল্পবাসা সুন্দরীদের নাচ দেখানো হয়, সেই সব মেয়েদের বেশীর ভাগই আনা হয় ইংল্যাণ্ড থেকে। কারণ, মঞ্চের আলোয় তাদের উরু বেশী ফর্সা দেখায়। বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের

চতুর্দিকেই সমুদ্রতীর, কিন্তু ওদের তেমন বিখ্যাত কোনো বীচ শুবেরিনেসকে তো বীচ্ না বলে তার অ্যাপোলজি বলা উচিত। আমাদের দীঘা চেয়েও অনেক খারাপ অবস্থা, সমুদ্রকে মনে হয় এঁদো ডোবা, ঢেউ টেউ কিচ্ছু দেখা যায় না, সমুদ্র একটা আছে এই পর্যন্ত। সেখানেই বেলাভূমিতে পা ফেলার জায়গা নেই, বালির ওপর নিঃসাড়ভাবে শুয়ে আছে হাজারখানেক নারী পুরুষ, ঠিক যেমন সিনেমায় দেখা যায়। সেখানকার মেয়েদের পোশাক, সৈয়দ মুজতবা আলীর ভাষায়, "আমার টাই দিয়ে তিনটে মেয়ের জাঙ্গিয়া হয়ে যায়!"

আমাদের তো অত রোদ-প্রীতি নেই আর অত সাহেব মেমদের সামনে আমরা খালি গাও হতে পারি না, সুতরাং আমি রীতিমত দর দর করে ঘেমেছিলুম। ঐ ঘামেই আবার সাহেবদের আনন্দ। একটা নাকি পারফিউম বেরিয়েছে, যা মাখলে ঘামের গন্ধ পাওয়া যায়। যাই হোক, শুবেরিনেস-এর নমুনা দেখেই বুঝেছিলুম এই রকম সময় বিখ্যাত সমুদ্রতীরগুলিতে কত ভিড়।

শুধু পার্কে নয়, শরৎকালীন প্যারিসের অনেক রাস্তাও এমন ভিড়ে গিস্‌গিস্ করে যে হাঁটতে গেলে মানুষের গায়ে ধাক্কা লাগে। এমন ভিড় আমার পছন্দ নয়। তার চেয়ে একটু জনবিরল কোনো পথে চুপ করে বসে থাকা অনেক ভালো। রাস্তার ওপরেই অনেক রেস্তোরাঁর চেয়ার টেবিল, সেখানে এককাপ কফি নিয়ে বসে থাকা যায়, অনেকক্ষণ পার হয়ে গেলে পরিচারকটি যদি কাছে এসে ঘোরাঘুরি করে তখন আর এককাপ কফির অর্ডার দিলেই হলো, কিংবা এক বোতল সাদা ওয়াইনের অর্ডার দিতে পারলে তো আর কোনো কথাই নেই। বসে বসে শুধু পথের মানুষ দেখা।

অনেক বেশী সংখ্যায় টুরিস্টদের শুভাগমনে সরকার খুশী হয়, ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধা হয় বটে কিন্তু অভিজাত ফরাসী নাগরিকরা নাক সিঁটকোয়। টুরিস্টদের অত্যাচার এড়াবার জন্য তারা এই সময় প্যারিস ছেড়ে চলে যায়। অনেকে বলে, শরৎকালে প্যারিসের রাস্তায় ফরাসীদের দেখতেই পাওয়া যায় না, সবাই বিদেশী। কথাটা অতিরঞ্জিত নিশ্চয়ই, শহরসুদ্ধ সব লোক চলে গেলে অফিস-দোকানপাট চলছে কী করে, তা ছাড়া সবাই বেড়াতে যাবে, এত পয়সা ফরাসীদের নেই।

টুরিস্টদের দেখলেই চেনা যায়। আমি প্রথমে রাস্তার চলন্ত মানুষদের পায়ের বিভিন্ন রকম জুতো দেখি, তারপর পোশাক, তারপর মুখ। বিশেষ বিশেষ মেয়েকে দেখে একাধিকবার তাদের সর্বাঙ্গে তাকাতেই হয় অবশ্য।

আমাদের ধারণা, টুরিস্ট বুঝি বেশীর ভাগই আমেরিকান। তা ঠিক নয়। প্যারিসে সারা পৃথিবী থেকে মানুষ আসে, এখন টুরিস্টদের মধ্যে জাপানীদের মুখ

বেশ চোখে পড়ে। এখন তো জাপানীরাই বড়লোক। তা ছাড়া টুকরো টাকরা কথাবার্তা শুনে চিনতে পারা যায় জার্মান এবং রাশিয়ানদের। এ ছাড়াও অনেককে দেখে বোঝা যায়। তারা আর যে জাতই হোক, আমেরিকান নয়। ভারতীয়ও কিছু আছে, হঠাৎ হঠাৎ চোখে পড়ে কোনো রঙীন শাড়ির উড়ন্ত আঁচল, প্যারিসের রাস্তায় বাংলা কথা শোনাও আশ্চর্য কিছু নয়। একটি যুগল আমার পাশ দিয়ে বাংলা বলতে বলতে চলে গেল। স্পষ্ট বুঝতে পারলুম তারা চাপা গলায় ঝগড়া করছে। ওরা স্বামী-স্ত্রী নিঃসন্দেহে এবং স্বামীটির জন্য মায়া হলো আমার। নিউ ক্যাসেলে কয়লা কিংবা বেরিলিতে বাঁশ নিয়ে যাবার মতন লোকটি প্যারিসে এসেছে নিজের স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে, এখন তার ঠ্যালা তো সামলাতে হবে।

অল্প বয়েসী টুরিস্টদের মধ্যে অবশ্য অ্যামেরিকানই বেশী। অ্যামেরিকান ছেলে মেয়েরা ছাত্র অবস্থাতেই যত পয়সা রোজগার করতে পারে, সেরকম পয়সা রোজগারের সুযোগ বোধহয় পৃথিবীর আর কোনো দেশের ছাত্র-ছাত্রীদের নেই। তা ছাড়া দুনিয়া চষে বেড়াবার ঝোঁকও ওদের আছে। সতেরো-আঠেরো বছরের ছেলেমেয়ে যখন তখন দেশ ছেড়ে বিশ্বের যে-কোনো প্রান্তে চলে যায়, এটা আমাদের দেশে বসে কল্পনা করাও শক্ত।

ছেলেবেলায় আমাদের কাছে সাহেবদের যে ইমেজ ছিল, তা একেবারে ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। হ্যাট-কোট-টাই পরলে তবেই না সাহেব! এখন হাজার জনের মধ্যে পাঁচ জন টুপি পরে কিনা সন্দেহ, অফিস-চাকুরে ছাড়া অন্যরা এক'শো জনের মধ্যে দশ জনও বোধহয় টাই পরে না। আমেরিকান ছেলেরা তো তোয়াক্কাই করে না এসব কিছুর, একটা ব্লু জিন আর যে-কোনো ধরনের একটা গেঞ্জিই তাদের পক্ষে যথেষ্ট। মেয়েরাও ব্লু জিন পরে কিন্তু তাদের উর্ধ্বাঙ্গের পোশাকের কোনো ফ্যাসান নেই। আমি অন্তত একশ'টি আমেরিকান মেয়ে দেখলুম, তাদের মধ্যে কোনো দু'জন এক রকম জামা পরেনি। রূপের জন্য অবশ্য আমেরিকান মেয়েদের তেমন খ্যাতি নেই, সে দেখতে হয় সাধারণ ফরাসী মেয়েদের। অফিস ভাঙার সময় টুরিস্টদের ছাপিয়ে যায় সাধারণ ফরাসীদের ভিড়। তাদের আলাদা করে চেনা যায়, কারণ তাদের চলার গতি দ্রুত, যেন বাড়ি ফেরার খুব তাড়া। ফরাসী মেয়েরা উগ্র সাজ পোশাক করে না। নিশ্চয়ই তারা সযত্ন প্রসাধন করে বাড়িতে, কিন্তু সে প্রসাধনকে তারা চাপা দিতেও জানে, তাদের মুখ চোখ দেখে কক্ষনো তা বোঝা যায় না। এ ছাড়াও তাদের মধ্যে কী যেন একটা আলগা লাবণ্য আছে, চোখ টেনে রাখে। রূপ নিয়ে সবাই জন্মায় না, অথচ ফরাসীদের মধ্যে কুরূপা মেয়ে প্রায় চোখেই পড়ে না।

তার মানে ওরা অন্য একটা কিছু জানে।

মেয়েদের প্রসঙ্গে অন্য একটা কথা বলতে ইচ্ছে হলো।

প্যারিসে মমার্ত আর প্লাস পিগাল্-এর মাঝখানে একটা এলাকায় নারী মাংসের বাজার আছে। নারী মাংস যে কতরকমভাবে রান্না করে পরিবেশনের ব্যবস্থা আছে, তার আর ইয়ত্তা নেই। পীপ শো, লাইভ শো, সেক্স শপ্, সেক্সসাইটমেন্ট, এরোটিকা হ্যানো আর ত্যানো। এরকম এলাকা লণ্ডনে আছে, হামবুর্গে আছে, আরও কোন্ কোন্ দেশে আছে কে জানে। আমস্টারডামে ঐ পাড়াটি তো জগৎ সুখ্যাত বা কুখ্যাত। ওরকম একটা শো-ও দেখার ইচ্ছে আমার হয়নি। তা বলে আমি নীতিবাগীশ তো নই, বরং মেয়েদের প্রতি আমার বেশী আসক্তির দুর্নাম আছে। বেশী আসক্তি আছে বলেই মেয়েদের নিয়ে এরকম ঢালাও ব্যবসার ব্যাপারটায় আমার গা ঘিন ঘিন করে। এই ব্যবসা চালায় পুরুষেরা, পুরুষ-শাসিত সমাজ এই ব্যবস্থা টিকিয়ে রেখেছে।

মমার্ত থেকে প্লাস পিগাল্-এর দিকে রাত্তিরবেলা হেঁটে আসতে আসতে চোখে পড়ে রাস্তার ধারে ধারে গালে রং মেখে মেয়েরা দাঁড়িয়ে আছে আধো অন্ধকারে। তাদের চোখের ভাষা বুঝতে ভুল হয় না, তারা তাদের শরীর কিছুক্ষণের জন্য বিক্রি করতে চায়। কাছাকাছি পীপ্ শো বা লাইভ শো-গুলোর কুৎসিত বিজ্ঞাপনের তুলনায় এই সব মেয়েদের দাঁড়িয়ে থাকা আমার একটুও খারাপ মনে হয় না। পেটের দায়ে মানুষ কত কী করে, রিক্সা টানে, ধনীদের ঘাড়ে চাপিয়ে পাহাড়ের ওপর তীর্থস্থানে নিয়ে যায়, খনির মধ্যে বিষাক্ত গ্যাসের ভেতরে গিয়ে জীবনের ঝুঁকি নেয়, সেই রকম মেয়েরাও শরীর খাটিয়ে গ্রাসাচ্ছাদন জোগাড় করতে পারে। কোন্ মেয়ে কার সঙ্গে শোবে এবং তার বিনিময়ে সে টাকা নেবে কিংবা গয়না উপহার নেবে কিংবা শুধুই ভালোবাসা চাইবে, সেটা মেয়েরাই ঠিক করবে। কিন্তু মেয়েদের শরীরটা নিয়ে পুরুষেরা রোজগার করবে, এই ব্যাপারটাই আমার সহ্য হয় না।

মমার্ত প্লাস পিগাল-এর ঐ রাস্তায় হেঁটে আমার একটা নতুন শিক্ষাও হলো। ঐ সব লাইভ শো, পীপ্ শোতে কিন্তু দলে দলে লোভী লোকরা ছুটে যায় না। ক্রমশই ঐ সব ব্যবসায়ীরা রেট কমাতে বাধ্য হচ্ছে। এককাপ কফির চেয়ে একবারের রমণ দৃশ্য দেখতে খরচ কম হয়। চার আনা আট আনাতেও পীপ্ শো দেখা যায়। দালাল আর ফড়েরা বাইরে দাঁড়িয়ে ডাকাডাকি করে, পারলে রাস্তা থেকে লোক ধরে নিয়ে যায়। অর্থাৎ ভেতরে অনেক জায়গা তখনও খালি আছে। অথচ, প্যারিসের যে কোনো আর্ট গ্যালারির সামনে প্রতিদিনই লম্বা লাইন।

প্যারিসে এখন 'লেডি চ্যাটার্লির প্রেমিক' নামে নতুন ছবিটি দেখানো হচ্ছে, সিনেমা হলের সামনে তার বিশাল হোর্ডিং। সেই হোর্ডিং-এর পুরো বর্ণনা না লেখাই ভালো। কিন্তু সে সিনেমা হলের সামনে একটুও ভিড় নেই, হাউস ফুল হওয়া তো দূরের কথা। কিছু কিছু সিনেমা হলে হার্ড কোর পর্নোগ্রাফি এখন দেখানো হয় অবাধে। সেখানেও বেশী ভিড় হয় না। লোকে ছুটে যায় না। অথচ, এসব দেশে সত্যিকারের কোনো ভালো থিয়েটার দেখতে গেলে টিকিট কাটতে হয় অন্তত একমাস আগে, তাও সহজে পাওয়া যায় না। কুরুচি জেতে না। শেষ পর্যন্ত শিল্পই জেতে।

প্যারিসের দুটি দোকানে আমার দু'রকম অভিজ্ঞতা হলো।

পঁতনফ অঞ্চলে একদিন একটা ঠিকানা খুঁজে গিয়ে রাস্তা হারিয়ে ফেললুম। তারপর এ রাস্তা সে রাস্তার গোলোকধাঁধা। বাড়ি ফেরার কোনো অসুবিধে নেই, মাটির নিচে নেমে গিয়ে যে-কোনো মেত্রো ধরলেই হলো। কিন্তু সেই ঠিকানায় একবার যেতে হবে, শহরের ম্যাপটাও সঙ্গে আনিনি। পথের লোককে জিজ্ঞেস করি, কিন্তু ভাষার মস্ত বাধা।

আমি ইংরিজিও জানি না, ফরাসীও জানি না। তবু ব্যাকরণ-ভুলো ইংরিজিতে কোনো রকমে কাজ চালাতে পারি, আর ফরাসীজ্ঞান বলতে কয়েকটি মাত্র শৌখিন বাক্য আর কবিতার লাইন, রাস্তার ঠিকানা প্রসঙ্গে তা বলতে যাওয়াও বিপদ। অনেক চেষ্টা করেও কারুর কাছ থেকে কোনো সাহায্য পাওয়া গেল না। একটা বিস্ত্রোতে ঢুকে সেখানকার পরিচালকটিকে বোঝাবার জন্য ইংরেজি-ফরাসী মিলিয়ে ধ্বস্তাধ্বস্তি করছি, লোকটি কিছুই বুঝছে না, এক সময় সে দোকান থেকে বেরিয়ে রাস্তার উল্টোদিকে কিছু দূরের আর একটা দোকান দেখিয়ে দিল। সে দোকানের নাম লেখা ইংরিজিতে, হ্যামবার্গার কর্ণার। তা হলে নিশ্চয়ই ঐ দোকানে কেউ ইংরিজি জানে।

সে দোকানে ঢুকতেই একটি তরুণী মেয়ে বললো, ইয়েস, মে আই হেল্প ইউ ?

কানে যেন সুধাবর্ষণ হলো। ইংরেজি ভাষাকে আগে কোনো দিন এত ভালো লাগেনি।

খাবারের দোকানে ঢুকে কিছু না কিনে প্রথমেই ঠিকানা জিজ্ঞেস করা কি উচিত ? একটু একটু খিদেও পেয়েছে, আমি তাই প্রথমেই সস্তা দেখে একটা হট্ ডগের অর্ডার দিলুম। সেটি পাবার পর বললুম, চিলি সস্ নেই ?

মেয়েটি বললো, না, তা তো নেই, তবে তুমি কেচ্ আপ নেবে, মাস্টার্ড নেবে ?

দোকানে আর একটি মাত্র খরিদ্দার এক কোণে বসে আছে, আমি বসলুম কাউন্টারে। তারপর বললুম, আমি একটা ঠিকানা খুঁজছি, তুমি এই রাস্তাটা কোথায় বলতে পারো!

মেয়েটি হেসে ফেলে বললো, আমিও তো প্যারিসে নতুন এসেছি। এদিককার রাস্তা চিনি না। তুমি কি ভারতীয়?

—হ্যাঁ। আর তুমি?

—আমি ব্রিটিশ। তিন মাসের জন্য চাকরি নিয়ে এসেছি, আবার লণ্ডনে ফিরে গিয়ে ইউনিভার্সিটিতে পড়বো। তুমি ভারতবর্ষের কোন্ জায়গা থেকে এসোছো?

—কলকাতা। তুমি নাম শুনেছো?

হ্যাঁ। কেন শুনবো না। তার মানে তুমি বেঙ্গলি? আমি আগে লণ্ডনে দু'একজন বেঙ্গলি মীট করেছি।

দোকানের মেয়ে সাধারণত কোনো খরিদ্দারের সঙ্গে এত কথা বলে না। কিন্তু মেয়েটি বেশ আলাপী ধরনের। অনেক কথা বলতে চায়। সে কি শুধু ইংরেজিতে কথা বলবার জন্য? ভুলভাল হলেও আমাদের ইংরিজি তো আমেরিকানদের মতন নয়, পুরোনো দাসত্বের সূত্রে তাতে এখনো কিছু ব্রিটিশ ঝোঁক আছে।

কথা বলতে বলতে হট্ ডগ শেষ করার পর আমি বললুম, কফি? মেয়েটি আঙুল দিয়ে পাশে দেখিয়ে দিল। অর্থাৎ এখানে কফি বানিয়ে পরিবেশন করা হয় না, পাশে মেশিন আছে সেখান থেকে নিজেকে নিয়ে আসতে হয়। আমি উঠতে যাচ্ছি, মেয়েটি বললো, আচ্ছা, বসো, বসো, আমি এনে দিচ্ছি।

মেশিন থেকে কাপে কফি ঢেলে মেয়েটি আবার আমাকে মিষ্টি হেসে জিজ্ঞেস করলো, তুমি দুধ চিনি খাও তো?

আমি আগেই লিখেছি যে লণ্ডনে চেনাশুনো ইংরেজরা ছাড়া অন্য অচেনা ইংরেজরা কেমন যেন আলগা আলগা ব্যবহার করে। পাশে দাঁড়ালে সরে যায়। কথা বললে উত্তর দিতে চায় না। কিন্তু দেশের বাইরে এসেছে বলেই কি এই মেয়েটি আমার সঙ্গে এমন ভালো ব্যবহার করছে? যেন ইংরেজি ভাষার সূত্রে আমার সঙ্গে ওর দূর সম্পর্কের একটা আত্মীয়তা আছে। আমি ভারতীয় জেনেও আমাকে কফি বানিয়ে দিল!

ঠিকানা জানা হলো না বটে কিন্তু একটি অপরিচিতা ইংরেজ মেয়ের হাসি তো উপহার পাওয়া গেল।

দ্বিতীয় দোকানটি মমার্তে। বিদ্যুৎ-গাড়িতে চেপে উঠে এসেছি টিলার ওপরে। ধপধপে সাদা গির্জাটির পেছনেই জ্বল জ্বল করছে পূর্ণিমার চাঁদ। ঠিক যেন আকাশে আঁকা। কিন্তু সে সৌন্দর্য রসিয়ে উপভোগ করার উপায় নেই, এত ভিড় চারদিকে। এক সময়ে এখানে বড় বড় শিল্পীরা আসতেন, এখন নকল শিল্পীতে ভরে গেছে জায়গাটা। একটুক্ষণ ঘোরাঘুরি করে মনে হলো, এবার ফিরে যাওয়াই ভালো।

কাল সকালে প্যারিস ছেড়ে চলে যাবো, কিন্তু এখান থেকে কোনো জিনিস তো কেনা হলো না। একটা ছোটখাটো কিছু স্মৃতিচিহ্ন। ঢুকে পড়লুম একটা সুভেনিরের দোকানে। সব জিনিসের আগুন দাম, টুরিস্টদের গলা কাটবার জন্যই এগুলো তৈরি। এ তো আমার পোষাবে না। দোকানে ঢুকে কিছু না কিনলে খারাপ দেখায়, তাই একটা ডট্ পেন পছন্দ করলুম।

কাউন্টারে দাম দিতে গেছি, মেয়েটি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ফরাসীতে অনেক কিছু বলে গেল। তার মধ্যে শুধু হিন্দু শব্দটি বুঝতে পারলুম। মাথা নেড়ে বললুম, হ্যাঁ।

মেয়েটি তার ব্লাউজের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে একটা হার বার করে দেখালো আমাকে। সেটা একটা ছোট ছোট রুদ্রাক্ষের মালা।

তারপর সে খুবই ভাঙা ইংরিজিতে, ফরাসী উচ্চারণে, বললো, আমি তোমার দেশে যাচ্ছি।

আমি জিজ্ঞেস করলুম, কোথায়?

সে আবার বললো, তোমাদের দেশে।

আমি বললুম, তা তো বুঝলুম, কিন্তু আমাদের দেশ তো অনেক বড়, তুমি ঠিক কোন্ জায়গাটায় যাচ্ছো?

সে আমারই ডট পেনটা নিয়ে একটা কাগজে বানান করে লিখলো। ভুল বানান সত্ত্বেও বোঝা গেল সেটা হরিদ্বার। তারপর আবার সে কী একটা নাম বলতে গিয়ে উচ্চারণ করতে না পেরে কাগজে লিখলো। এবার লিখেছে মুক্তানন্দস্বামী। তার গুরু।

মেয়েদের বয়েস আন্দাজ করার মতন শক্তি আমার নেই। তবু মনে হয়, পঁচিশ থেকে বত্রিশের মধ্যে ফেলা যায় তাকে। ঐ বয়েসের একটা ফরাসী মেয়ে এমন চালু দোকানের মায়া ছেড়ে কেন কোনো এক মুক্তানন্দস্বামীর শিষ্যত্ব নেবে, আর কেনই বা হরিদ্বারের মতন মাছ মাংস বিহীন জায়গায় গিয়ে থাকবে? কিন্তু মেয়েটিকে এই প্রশ্ন করেও কোনো লাভ নেই, তার ইংরেজি জ্ঞান এতই কম! দুটো একটা ইংরেজি শব্দের সঙ্গে বাকিটা সব ফরাসী মিলিয়ে সে আমাকে অনেক

কিছু জিজ্ঞেস করছে, মনে হয় ঐ মুক্তানন্দস্বামী বিষয়ে সে আমার কাছ থেকে শুনতে চায়। কিন্তু আমি তো ঐ স্বামীজীর নাম আগে শুনিনি, হরিদ্বার বিষয়েও আমার বিশেষ আগ্রহ নেই।

মেয়েটি আমার কাছে যা জানতে চায়, সে বিষয়ে আমি কিছু বলতে পারবো না। মেয়েটির কাছ থেকে আমি যা জানতে চাই, তা-ও ও আমায় বোঝাতে পারবে না। সুতরাং আমি হাসি হাসি মুখ করে তাকিয়ে রইলুম ওর মুখের দিকে।

॥ ৮ ॥

বিমানটি দোতলা।

মোট কত মাইল এখন পাড়ি দিচ্ছি, ঠিক আন্দাজ নেই। সাত-আট হাজার মাইল তো হবেই। নিচে আটলান্টিক মহাসমুদ্র। জানলার ধারে সীট জোগাড় করেছি, কিন্তু বাইরে চোখ মেলে কিছুই দেখার নেই। প্রথমে যেন কিছুক্ষণ নিচে সমুদ্রের অস্পষ্ট চেহারা চোখে পড়েছিল, তারপর শুধু পাতলা-ধোঁয়া-ধোঁয়া। কলকাতা থেকে আসামে কিংবা ত্রিপুরায় বিমান যাত্রায় নানারকম মেঘের খেলা দেখতে পাওয়া যায়। কোথাও যেন দুর্গ, কোথাও মর্মর প্রাসাদ, কোথাও ধপধপে সাদা রঙের শিশুরা ছুটোছুটি করছে বরফের মধ্যে—এই সব কল্পনাতেই দিব্যি সময় কেটে যায়। কিন্তু এই সব জাম্বো-মাম্বো বিমানে কোনো বাইরের বৈচিত্র্য নেই, মেঘের খেলা নেই। এত উঁচুতে কিছুই দেখা যায় না। আর উঁচু মানে কি, মাউন্ট এভারেস্টের ডগার চেয়েও অনেক উঁচু দিয়ে উড়ে যাচ্ছে এই বিশাল রূপালি পাখী।

আমি ইকোনমি ক্লাসের যাত্রী, অর্থাৎ ট্রেনের থার্ড ক্লাসের মতন, সেইজন্য বসতে দিয়েছে একেবারে লেজের দিকে। কিন্তু বিমানটি দোতলা, একথা জানবার পরই খালি মনে হচ্ছে, একবার ওপরটা দেখে আসবো না? কিন্তু প্রথম প্রথম ঠিক সাহস হয় না।

আমার পাশের দু'জন যাত্রীই দু'জন গোমরামুখো মধ্যবয়সী পুরুষ। একজন তো ওঠামাত্র কোমরের কষি আলগা করে (সীট বেল্ট খুলে) ঘুমোতে লাগলেন, যেন এই সকাল দশটাই তাঁর ঘুমোবার সময়। অন্য লোকটি প্রায় একটি দৈত্য, প্রথমে দু'তিনবার ঘন ঘন আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করে বোধহয় আমাকে একটি চুনোপুঁটি জ্ঞান করলেন। তারপর আমার প্রতি আর ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করে, এবং আমাকে দারুণ বিস্মিত করে তিনি লোরকার একটি কবিতার বই খুলে বসলেন। আমার ধারণা ছিল, বিমানযাত্রীরা আর্থার হেইলি ছাড়া অন্য কারুর বই পড়ে না।

এই রকম দৈত্যাকার লোকও কবিতা পড়ে?

এই সব বিশালবপু বিমানে তিন থাক করে বসবার জায়গা থাকে প্রত্যেক সারিতে। মাঝখানের দিকে যারা বসে আছে, তাদের মধ্যে বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে এক শ্বেতাঙ্গিনী আর একটি বছর চারেক বয়েসের বাচ্চা। মেয়েটি প্রায় যুবতীই মনে হয়, পরনে একটা লম্বা গেরুয়া রঙের সেমিজ, (যার অন্য নাম ম্যাক্সিও হতে পারে) গলায় রুদ্রাক্ষের আলখাল্লা। ছেলেটির পায়ে জুতো নেই।

ছেলেটি বেশ সুন্দর রকমের দুরন্ত, প্রায়ই ছুটে চলে যাচ্ছে এদিক-ওদিক। তার মায়ের অবশ্য সেজন্য একটুও ব্যস্ততা নেই, সে মন দিয়ে পাশের এক যাত্রীর সঙ্গে গল্পে ব্যস্ত। বাচ্চাটি একবার আমার কাছে চলে এলো, সে জানলার কাছে দাঁড়াতে চায়। ফুটফুটে বাচ্চাটি, মাথায় সোনালি চুল। কিন্তু সাহেবের বাচ্চা খালি পায়ে ছুটছে, এটা যেন কেমন কেমন লাগে। যদিও প্লেনের মধ্যে পুরু করে কার্পেট পাতা, তা হলেও তো চার-পাঁচশো লোকের জুতোর ধুলো রয়েছে এই কার্পেটে। ছেলেটা কি জুতো খুলে ফেলেছে? প্লেন তো বেশীক্ষণ ছাড়ে নি। সাধারণত বাচ্চারা জুতো খুলে ফেলতে চাইলে মায়েরা বেশ আপত্তি করে, সে রকম কিছু শুনিনি।

বাচ্চাটিকে আদর করতে ইচ্ছে করে, কিন্তু সাহস পাই না। আমি হাঁটু গুটিয়ে তাকে জানলার কাছে জায়গা করে দিয়ে হেসে বললুম, হ্যালো! বাচ্চাটি অবিকল সত্যজিৎ রায়ের ছবির বাচ্চাদের মতন গাঢ় চোখে আমার দিকে তাকায়, কিন্তু কোনো উত্তর দেয় না। বরং পট্ করে মুখে একটা আঙুল পুরে দেয়। ছি ছি ছি, সাহেব-বাচ্চার এরকম খারাপ অভ্যেস? তারপরই ছেলেটি আবার আমাদের ঠেলেঠুলে চলে যায় অন্যদিকে। বাচ্চাটি সত্যিই জুতো খুলে রেখেছে, না খালি পায়েই বিমানে উঠেছে, তা জানবার জন্য দারুণ কৌতূহল হয় আমার। উঁকি-ঝুঁকি দিয়েও কিন্তু তার জুতো দেখতে পেলুম না।

দু'তিন ঘণ্টার বিমান যাত্রা একরকম আর এ যাত্রা অন্যরকম। অন্তত দশ-এগারো ঘণ্টা থাকতে হবে এই এক জায়গায়। সুতরাং কিছুক্ষণের মধ্যেই পরিবেশটা অনেকটা বৈঠকখানার মতন হয়ে গেল, অনেকেই উঠে ঘোরাঘুরি করতে লাগলো এদিকে ওদিকে, কেউ কেউ অন্যদের সঙ্গে জায়গা বদলা-বদলি করলো। বাথরুমগুলোর সামনে দু'তিনজন করে নারী-পুরুষ দাঁড়িয়ে, চোখে-মুখে উদাসীন উদাসীন ভাব।

আমিও জায়গা ছেড়ে উঠে পড়লুম।

প্রথম থেকেই ইচ্ছে, দোতলাটা একবার দেখে আসা। দোতলা বাস দেখেছি, কিন্তু দোতলা প্লেন তো আগে দেখা হয়নি। ওখানে কি বিশেষ কেউ বসে, ডবল

ভাড়া দেয়, আমি উঠতে গেলে বাধা দেবে ? সবাই যখন ঘোরাঘুরি করছে, তখন মনের ভুলে একবার ওপরে ঘুরেই আসা যাক না।

ফার্স্ট ক্লাসের পাশ দিয়ে ওপরে ওঠবার সিঁড়ি। একটু একটু গা ছমছম করছে। এখন তো আর রাজা-মহারাজা নেই, ওপরে উঠলেই একালের কোটিপতিদের দেখতে পাবো। উঠে এসে একটু নিরাশ হলুম। বিমানের একতলাটি যত বড়, সেই তুলনায় দোতলাটি বেশ ছোট, সেখানে যারা বসে আছে তাদের কারুর চেহারাই কোটিপতিদের মতন নয়। অবশ্য কোটিপতি আমি কখনো দেখিনি, তাদের চেহারায় কী বিশেষত্ব থাকে তাও আমার জানা নেই, তবু একটা কিছু তো আলাদা থাকবে ! এ যে সব সাধারণ চেহারা ! এদের মধ্যে শাড়ী-পরা এক মহিলা এবং আরও একজন দাড়িওয়ালা ভারতীয়কেও দেখলুম। এরা কি কোটিপতি ? নাঃ, তাহলে হয়তো ওপরের জায়গাগুলোর আলাদা কোনো ব্যাপার নেই, দোতলা বাসের মতন ওপরেও এক ভাড়া।

ফার্স্ট ক্লাসে যারা বসে আছে, তাদের মুখে একটা আলাদা ছাপ ঠিকই নজরে পড়ে। কারুর কারুর মুখে স্পষ্ট অহঙ্কার, কেউ কেউ অহঙ্কার চাপা দিয়ে ঔদার্যের ভাব ফুটিয়ে তোলা রপ্ত করে। বড় মানুষদের একটা বৈশিষ্ট্য হলো, তারা অন্যদের সামনে হাসে না। যে যত বড় মানুষ, সে তত গম্ভীর।

ফার্স্ট ক্লাসের ঠিক পরের সারিতেই পাশাপাশি তিনজন লোক বসে আছে, তিনজনের গায়েই এক রকমের ওভারকোট। অন্যরা কোট ফোট খুলে রেখেছে, কিন্তু এরা তিনজন কোটপরা অবস্থাতেই পরস্পর কী একটা আলোচনায় মগ্ন।

লোকজন স্টাডি করবার আর বিশেষ অবকাশ হলো না, কারণ লক্ষ্য করলুম খাবার দেওয়া হচ্ছে। পাছে আমারটা ফস্কে যায়, তাই তাড়াতাড়ি গিয়ে বসে পড়লুম নিজের জায়গায়।

প্লেন ছাড়বার কিছুক্ষণ পরেই একবার চা আর কেক দিয়েছে, এর মধ্যেই আবার খাবার ! দূরপাল্লার বিমান যাত্রায় শুনেছি খুব ঘন ঘন খাবার দেয়। তাতে খানিকটা একঘেয়েমি কাটে। দশ-বারো ঘণ্টা ধরে ঠায় বসে থাকা, এর মধ্যে কাজ তো মাত্র দুটো, খাওয়া আর বাথরুমে যাওয়া। আমার অবশ্য বিমানের বাথরুমে ঢুকতে ভয় হয়, মনে হয়, ভেতরে ঢোকবার পর দরজা যদি আর না খোলে ? কেউ যদি আমার চিৎকারও শুনতে না পায় ?

খাবারের বহর দেখে চক্ষু চড়কগাছ হবার উপক্রম। একটা গোল রুটি ও মাখন, এক গেলাস ফলের রস, বড় এক চাকা মাংস, খানিকটা ভাত, অনেকটা আলু সেদ্ধ, একবাটি স্যালাড, দু'রকম সস্, এক প্যাকেট চীজ, আর এক কৌটো আইসক্রিম। এত খাবার কেউ একসঙ্গে খেতে পারে ? খাবার নষ্ট করতেও গা

কষকষ করে। এত দামী সুখাদ্য !

আমার পাশে কবিতা পাঠক দৈত্যটি খাবারের সঙ্গে ওয়াইনের অর্ডার দিয়েছিলেন। পর পর দু'বোতল ওয়াইন সমেত সে সমস্ত খাবার দাবার চেটেপুটে শেষ করলো। তারপর তৃপ্তির সঙ্গে একটি সিগারেট ধরিয়ে আড়চোখে তাকালো আমার দিকে।

আমি অন্য খাবারগুলোর যতদূর সম্ভব যত্ন করলেও পাঁউরুটি-মাখন, চীজ ও আইসক্রিম ছুঁইনি। কত লোক আইসক্রিম ভালোবাসে, অথচ আমাকে ওটা ফেলে দিতে হবে, আইসক্রিম আমার জিভে ঠেকাতেই ইচ্ছে করে না কক্ষনো। এত ঘোরাঘুরির পরও মাঝে মাঝে সব কিছুই আমার কাছে অবিশ্বাস্য লাগে। সত্যি কি পঁয়তিরিশ হাজার ফিট উঁচুতে আটলাণ্টিক মহাসাগরের ওপরে একটা জেট বিমানের পেটের মধ্যে বসে আছি ? সেই আমি, যে কিনা এইমাত্র কয়েক বছর আগেও কলেজ স্ট্রিট কফি হাউসের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতুম, যদি চেনাশুনো কারুর সঙ্গে দেখা হয় তা হলে ভেতরে ঢুকে এককাপ কফি খাওয়াতে বলবো তাকে। কতদিন পকেটে ট্রাম-বাস ভাড়া থাকেনি বলে হেঁটে গেছি শ্যামবাজার। সেই আমি বিলিতি আইসক্রিম ফেলে দিচ্ছি ?

চীজের প্যাকেটটা না খুলেই টপ্ করে রেখে দিলুম কোটের পকেটে। মাখন আর আইসক্রিম তো পকেটে নেওয়া যায় না, গলে যাবে। পাশের লোকটা দেখে ফেলেছে নাকি ?

ঘুমন্ত লোকটি জেগে উঠে খাবার টাবার ঠিক খেয়ে নিয়েছে। এবার সে আমাদের উদ্দেশ করে বললো, ইট্ ওয়াজ ড্যাম্ হট্ ইন প্যারিস। আমার আশঙ্কা হচ্ছে, নিউইয়র্কও গরম হবে এই সময়।

দৈত্যটি বললো, গরমতর।

পাক্কা সাহেবেরা প্রথম আবহাওয়া সমাচার দিয়ে আলাপ শুরু করলো। তারপর তাদের কথাবার্তা চললো এই প্রকার :

—গত মাসে আমি টরোনটোতে ছিলুম, বড্ড গরমে কষ্ট পেয়েছি।

—আসল গরম হচ্ছে ওয়াশিংটন ডি সি-তে। প্যাচপেচে ঘাম।

—আমি তো এ সময় ওয়াশিংটন ডি সি-তে যাই না। তবে জেনিভায় বেশ মনোরম আবহাওয়া।

—তা ঠিক।

—আমি টরোনটোতে মাত্র দু'দিন থাকবো, তারপরই ফিরে আসছি জেনিভায়। সেখানেই থাকবো কিছুদিন। অবশ্য মাঝখানে একবার জাপান ঘুরে আসতে হবে।

—তোমার কি জেনিভাতেই অবস্থিতি ?

—হ্যাঁ। সেখানে আমার শাখা অফিস। বাকি সময়টা আমায় মনট্রিয়েলে থাকতে হয়।

—আমিও মনট্রিয়েলেই যাচ্ছি।

—সেখানে তুমি...

—না, সেখানে আমার অফিস নয়, এমনিই।

এক মাসের মধ্যেই ওদের একজন টরোণ্টো-জেনিভা-জাপান ঘোরাঘুরি করবে, যেন ব্যাপারটা কিছুই না। এইসব লোকের পক্ষেই তো বিমানে উঠেই সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়া স্বাভাবিক।

এসব কথাবার্তার চেয়ে উঠে পড়া ভালো। এক চক্কর ঘুরে আসা যাক আবার। মনে করা যেতে পারে, আমি মহাসমুদ্রের ওপর দিয়ে হাঁটছি।

বাথরুমের কাছের ফাঁকা জায়গাটায় সেই গেরুয়া শেমিজ-পরা শ্বেতাঙ্গিনীটি একজন সাফারি-স্যুট পরা ভারতীয় যুবকের সঙ্গে হাত-পা নেড়ে অনেক কথা বলছে। সিগারেট টানার ছলে আমি একটু কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম এবং আবিষ্কার করলুম যে মেয়েটির পায়েও জুতো নেই। যুবকটির মুখ ভর্তি কালো দাড়ি, সে বেশ সাবলীলভাবে কথা বলে যাচ্ছে মেয়েটির সঙ্গে।

দু' একটা কথাতেই বোঝা গেল ব্যাপারটা। আচার্য রজনীশকে ভারত থেকে উৎখাত করায় মেয়েটি খুবই ক্ষুব্ধ। সে বলছে, এই কি গণতান্ত্রিক, ধর্ম-নিরপেক্ষ ভারতবর্ষের স্বরূপ ? সেখানে যে-কোনো মানুষের ধর্মচর্চার অধিকার আছে, তা হলে আচার্য রজনীশের কী দোষ ?

ভারতীয় যুবকটি বললো, ধর্ম কাকে বলে ? আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রে আছে...

শ্বেতাঙ্গিনী বললে, তোমাদের দেশে তন্ত্রচর্চা হয় নি ? আচার্যও তো এক রকম তন্ত্র সাধনাই করছিলেন...

—শোনো, গুরু হতে গেলে যোগ সাধনায় যে উর্ধ্বমার্গে উঠতে হয়...

—কী করে তুমি জানলে যে ভগবান রজনীশ সেই উর্ধ্বমার্গে ওঠেন নি ? আমি পাঁচ বছর পুণায় ঐ আশ্রমে ছিলুম।

এই সব ধর্মটর্ম আমার মাথা গুলিয়ে দেয়। এ আলোচনাও আমায় আকৃষ্ট করলো না। শুধু একটা খট্‌কা রয়ে গেল। মেয়েটি পাঁচ বছর ধরে পুণার আশ্রমে থাকার পর মনের দুঃখে ভারত ছেড়ে ফিরে যাচ্ছে। তা হলে ঐ চার বছরের শিশুটি জন্মালো কী করে ? ও কি প্রকৃতির দান ?

অন্য প্রান্তে হেঁটে গিয়ে সেই ছোট ছেলেটিকে আবার দেখতে পেলুম। সে একজন যাত্রীর ওয়াইনের বোতল উল্টে দিয়েছে, বিমান-সখীরা তাই নিয়ে

ব্যতিব্যস্ত, যাত্রীটি কিন্তু বাচ্চাটাকে কোলে বসিয়ে আদর করছে।

হঠাৎ মনে হলো, এই সময় একটা হাইজ্যাকিং হলে মন্দ হতো না। একঘেয়েমির বদলে বেশ একখানা নাটক দেখা যেত। প্রত্যেক মাসে দুটো-তিনটে হাইজ্যাকিং-এর কথা কাগজে পড়ি, এই প্লেনে সে রকম হতে দোষ কি ? প্লেনখানা ত্রিপোলি কিংবা হাভানায় ঘুরিয়ে নিয়ে যাবে, বেশ একখানা জমজমাট মজা হবে। সর্বক্ষণ পিস্তল আর হাতবোমা নিয়ে শাসাবে দু'-তিনটে ছোকরা, তার মধ্যে একটি মেয়ে থাকলে তো কথাই নেই। পরে আমি রয়টারের প্রতিনিধির কাছে রসিয়ে রসিয়ে বলবো আমার রোমহর্ষক অভিজ্ঞতার কথা।

ঐ যে একই রকম ওভারকোট-পরা তিনজন, এখনো ফিসফিস্ করে কথা বলে যাচ্ছে, ওরা হাইজ্যাকার হতে পারে না ? ওভারকোট খোলেনি কেন ? ওরা কি আরব ? প্যালেস্টাইনের বিপ্লবী ? তিনজনই বেশ শক্ত সমর্থ যুবা পুরুষ। হাইজ্যাকার হবার সমস্ত যোগ্যতাই ওদের আছে। হয়তো ওদের আরও দু' চারজন সঙ্গী বা সঙ্গিনী ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে অন্য জায়গায়।

ঠিক এই সময় ওভারকোটের মধ্যে একজন উঠে দাঁড়াতেই আমার বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠলো।

এইবার কি সত্যি শুরু হবে সেই নাটক ? ছেলেটি দৃঢ় পা ফেলে ফেলে ককপিটের দিকেই যাচ্ছে না ? এবার পাইলটের ঘাড়ের কাছে রিভলবার উঁচিয়ে ধরবে ?

ইচ্ছে হলো, লোকটির পেছনে পেছনে যাই। অন্য দুই ওভারকোটের দিকে তাকালুম। তাদের মুখ পাথরের মতন স্থির। ওদের ওভারকোটের আড়ালে কী, বোমা না মেশিনগান ?

হঠাৎ প্লেনের ভেতরের সব আলো নিভে গেল। এমনই চমকে গেলুম যে ঢাক-ঢোল বাজতে লাগলো বুকের মধ্যে। তা হলে তো আর কোনো সন্দেহই নেই। এত প্লেনে চড়েছি আগে, কোনো দিন তো এক সঙ্গে সব আলো নিভে যেতে দেখিনি ?

টুং টাং শব্দের পর মাইক্রোফোনে ভেসে উঠলো একটি ঘোষণা :

ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ আপনারা দয়া করে যে-যার নিজের আসনে বসুন। অনুগ্রহ করে জানলার শেড্‌গুলো টেনে দিন যাতে বাইরের আলো না আসে। আপনাদের এক্ষুণি একটা ফিলম দেখানো হবে। সুপারম্যান টু।

দূর ছাই। আশা করেছিলুম জলজ্যান্ত নাটক, তার বদলে সিনেমা।

॥ ৯ ॥

দিল্লি থেকে আমস্টারডাম আসবার পথে এক মধ্যবয়স্কা ভারতীয় মহিলার

সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল। তিনিই ডেকে আলাপ করেছিলেন আমার সঙ্গে। বিমানসেবিকা সেই ভদ্রমহিলার কথা কিছুই বুঝতে পারছিল না, সেই জন্য ভদ্রমহিলা আমায় ডেকে হিন্দীতে অনুরোধ করেছিলেন যে, তিনি নিরামিষ ছাড়া আর কিছু খান না, সে-কথা ঐ মেম-মেয়েটিকে বুঝিয়ে দিতে।

ভদ্রমহিলা একা চলেছেন এবং একবর্ণ ইংরেজি জানেন না। ওঁর হিন্দীও এত দুর্বোধ্য যে আমার পক্ষে সব কথার মর্মোদ্ধার করা শক্ত। তাঁর পাশের সীটটা খালি ছিল বলে তিনি বারবার ডেকে আমার সঙ্গে কথা বলতে চাইছিলেন।

তাঁর বৃত্তান্ত যে-টুকু আমি বুঝলুম, তাতেই আমি চমৎকৃত হলুম।

ভদ্রমহিলার বাড়ি পাঞ্জাবের একটি গ্রামে। ওঁর তিন ছেলের মধ্যে একজন সাত বছরের মেয়াদে জেল খাটছে, সে আছে দিল্লির তিহর জেলখানায়। বাকি দু' ছেলের মধ্যে একজন লণ্ডনে অন্যজন ক্যানাডায়। ওঁর স্বামী মারা গেছেন এক বছর আগে। এক মেয়ে আছে বিবাহিতা। শরিকদের অত্যাচারে উনি নিজের বাড়িতে একা একা আর টিঁকতে পারছিলেন না, তাই কিছুদিন ছিলেন মেয়ের কাছে। কিন্তু মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে অনেক লোক, সেখানে তাঁর বেশীদিন থাকা ভালো দেখায় না বলে তিনি আবেদন জানিয়েছিলেন প্রবাসী পুত্রদের কাছে। এর মধ্যে সাড়া পাওয়া গেছে এক ছেলের কাছ থেকে, যে লণ্ডনে থাকে। সে একটি বিমানের টিকিট পাঠিয়ে দিয়েছে।

ভদ্রমহিলার এক ছেলে কেন জেল খাটছে, সে কথা আমি জিজ্ঞেস করিনি। তবু, সাত বছরের মেয়াদ যখন, তখন পেটি কেস নিশ্চয়ই নয়, রক্তারক্তির ব্যাপার আছে মনে হয়।

মেয়ের দেওরকে ভজিয়ে, তাকে নিয়ে ভদ্রমহিলা এসেছিলেন দিল্লি। জীবনে তাঁর সেই প্রথম দিল্লি আসা। তিহর জেলে গিয়ে ছোট ছেলের সঙ্গে দেখা করে এসেছেন। তারপর মেয়ের দেওর তাঁকে তুলে দিয়েছে এই বিমানে।

অবস্থায় পড়লে মানুষ কত কী করতে পারে। আমাদের বাংলার কোনো গ্রামের ইংরেজি না-জানা প্রৌঢ়া মহিলা একা একা প্লেনে চেপে বিলেত যাচ্ছেন, একথা কল্পনা করতেই আমাদের কষ্ট হয়।

ভদ্রমহিলা শাড়ী পরেননি, পরেছিলেন শালোয়ার-কামিজ। বিলেত যাবার জন্য বিশেষ কিছু সাজ-পোশাক করেছেন এমন মনে হয় না। পাঞ্জাবের ট্রেনের থার্ড ক্লাসে এরকম পোশাক ও চেহারার মহিলা আগে অনেক দেখেছি। বয়েস পঞ্চান্নর কম নয়, আবার পঁয়ষট্টিও হতে পারে। মনে হয়, ওঁর স্বাস্থ্য এই কিছুদিন আগেও বেশ মজবুত ছিল, সদ্য ভাঙতে শুরু করেছে। সঙ্গের হাতব্যাগটি এমনই ক্যাটকেটে সবুজ রঙের যে সেদিকে তাকানো যায় না। আমাদের ভারতীয়

ব্যবসায়ীরা অধিকাংশই বর্ণ-কানা। বেশীর ভাগ জিনিসপত্রের ডিজাইনেই রঙের এমন অসামঞ্জস্য যে চক্ষুকে পীড়া দেয়।

আমি বারবার উঠে গেলেও উনি আমার সঙ্গে চোখাচোখি হলেই হাতছানি দিয়ে ডেকে এটা ওটা জিজ্ঞেস করছিলেন। ওঁর প্রতিটি বাক্য আমি দু'তিনবার জিজ্ঞেস না করে বুঝতে পারছিলুম না। সেই বিমানে অন্য আরও কয়েকজন ভারতীয় যাত্রী ছিল। আমার হিন্দীতে অল্প-জ্ঞানের জন্য আমার মনে হচ্ছিল, উনি আমার বদলে অন্য কোন হিন্দী জানা কারুকে ডেকে ওঁর মনের কথা বললে পারতেন। কিন্তু উনি আমায় ডাকলে তো আমি অন্য লোক ভজিয়ে দিতে পারি না।

একবার উনি একটা খাম খুলে ওঁর ছেলের ঠিকানা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আমি লণ্ডনের এই রাস্তাটা চিনি কি না।

আমাকে উনি কেন লণ্ডন বিশেষজ্ঞ ভেবে বসলেন কে জানে! যাই হোক, ঠিকানাটা সাসেক্সের। এইটুকু জানি, লণ্ডন শহর থেকে বেশ দূরে। আশা করি, ওঁর ছেলে ঠিক সময় হিথ্রো বিমানবন্দরে উপস্থিত থাকবে।

জিজ্ঞেস করলুম, ছেলেকে চিঠি দিয়েছেন তো?

এমনই ভাষার ব্যবধান যে উনি আমার এ প্রশ্নটাও বুঝতে পারছিলেন না। বারবার জিজ্ঞেস করতে লাগলেন, কেয়া দিয়া? কেয়া দিয়া?

তখন আমার মনে পড়লো, খত্। চিঠির হিন্দী খত্। বললুম, খত্ ভেজ্ দিয়া তো?

এবার উনি বললেন যে, হ্যাঁ, তাঁর মেয়ের দেওর একটা তার ভেজে দিয়েছে লণ্ডনে।

আমি আবার মনে মনে প্রার্থনা করলুম, মেয়ের দেওরটি আশা করি ঠিকানা ঠিক লিখেছে এবং ভারতীয় ডাক ও তার বিভাগ সুপ্রসন্নভাবে তারটি যথাসময়ে পাঠিয়েছে।

এরপর ভদ্রমহিলা আর একটি চমকপ্রদ কথা বললেন। লণ্ডন-প্রবাসী সেই ছেলেকে তিনি আট বছর দেখেননি। তিনি শুনেছেন যে, সে একটি আংরেজি মেয়েকে বিয়ে করেছে।

আমি জিজ্ঞেস করলুম, আপনার স্বামী মারা যাবার পরও আপনার ছেলেরা কেউ দেশে আসেনি?

উনি বললেন, না। এবং এমনভাবে বললেন যে এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

হয়তো ওঁদের সমাজে পিতৃশ্রাদ্ধের ব্যাপারে অনুষ্ঠানের বাড়াবাড়ি নেই।

অনেকে বলে পাঞ্জাবে এখন এমনই সমৃদ্ধি এসেছে যে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে আলাদাভাবে পাঞ্জাবকে ইটালি বা স্পেনের সঙ্গে তুলনা করা যায়। তা হয়তো ঠিকই। ভদ্রমহিলার ছেলেরা তো বেশ সাহেবই হয়ে গেছে মনে হয়। বাঙালী ছেলেরা বোধহয় এখনো বিধবা মাকে একা বিদেশের প্লেনে চাপাতে সাহস পায় না।

একটা চিন্তা মনের মধ্যে খচ্‌খচ করছিল। আট বছর যে ছেলে দেশে ফেরেনি এবং যে মেম বিয়ে করেছে, তার বিলেতের সংসারে কী করে সে এই ইংরেজী না জানা গ্রাম্য মাকে মানিয়ে নেবে? আশা করি, ভদ্রমহিলা সুখেই থাকবেন।

আমস্টারডাম এয়ারপোর্টে নামবার জন্য তৈরি হচ্ছি, ভদ্রমহিলা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, লণ্ডন এসে গেছে?

আমি বললুম, না, এখান থেকে আপনাকে প্লেন পালটাতে হবে।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তবে কি এই জায়গাটার নাম পারস্‌?

ভদ্রমহিলা লণ্ডনকে বলেন লোন্দন আর ক্যানাডাকে বলেন কাণ্ডা। সুতরাং পারস্‌ যে প্যারিস হবে, তা আমি বুঝতে পারলুম একবারেই।

আমি জানালুম যে প্যারিস নয়, আমরা এক্ষুনি পৌঁছোচ্ছি আমস্টারডামে। এতক্ষণে ভদ্রমহিলার চোখ মুখে ভয়ের ছাপ দেখা দিল। তিনি বললেন, আমি তো লোন্দন যাবো, তবে কি আমি ভুল হাওয়াই জাহাজে উঠেছি?

ভুল বাস বা ভুল ট্রেনের মতন ভুলে বিমানে চড়া অত সহজ নয়। অনেকগুলো চেকিং হয়। তবু আমি সীট বেল্ট খুলে ভদ্রমহিলার কাছে এসে বললুম, দেখি আপনার টিকিট।

টিকিট কে এল এম-এরই বটে। এবং ঐ বিমান কোম্পানীর সব প্লেন আমস্টারডামে থামবেই। ভদ্রমহিলাকে এখান থেকে অন্য প্লেন ধরতে হবে লণ্ডনের জন্য। কিন্তু উনি এবার আমার কথা বিশ্বাস করলেন না। উনি লণ্ডনে যাবেন, অন্য কোথাও নামবেন না। ওঁকে তো কেউ এই জায়গায় নামবার কথা আগে বলে দেয়নি। মেয়ের দেওর ওঁকে বলেছে যে একবার হয়তো পারসে নামতে হতে পারে। কিন্তু এটা কোন্‌ জায়গা?

হয় দেওর মশাই ভুল করেছে কিংবা আমস্টারডাম একটু শক্ত নাম বলে ভদ্রমহিলা ভুলে গেছেন। আমি দু'-তিনবার বোঝাবার চেষ্টা করলুম, কিন্তু উনি আমায় বেশ সন্দেহ করতে লাগলেন।

তখন আমি ভাবলুম, দূর ছাই। আমার কি দায়িত্ব! যাদের প্যাসেঞ্জার, সেই কম্পানি বুঝবে কী করে ওঁকে পাঠাতে হবে লণ্ডনে।

আমি নেমে পড়লুম।

তারপর কোন্‌ দিকে কাস্টমস্‌, কোন্‌ দিকে ইমিগ্রেশন এই সব খোঁজাখুঁজি করছি, সেই সময় ভদ্রমহিলা ভিড়ের ভেতর থেকে দৌড়ে এসে আমার হাত চেপে ধরে বললেন, এ বেটা! তুমি কোথায় চলে যাচ্ছো? আমি এখন কোথায় যাবো?

অন্য দেশের বিমান বন্দরে সদ্য নেমে অন্য কারুর ব্যাপারে মাথা ঘামাবার সময় থাকে না। সবাই নিজের কাজে ব্যস্ত। মালপত্র ছাড়াবার জন্য উদ্বেগ, বাইরে যদি কেউ অপেক্ষা করে থাকে তার সঙ্গে দেখা করার তাড়াহুড়ো তো থাকবেই। তবু একজন বয়স্কা মহিলা বেটা বলে ডেকে যদি বিপদের সময় কোনো সাহায্য চান, তবে কি এড়িয়ে যাওয়া যায়?

ওঁকে সঙ্গে নিয়ে আমি বিমান কোম্পানির কাউন্টারে গিয়ে ওঁর টিকিটের এনডোর্সমেন্ট করিয়ে ফ্লাইট নম্বর জেনে নিলুম। তারপর নির্দেশ অনুযায়ী সেই ফ্লাইটের বিমানের রাস্তাটা দেখিয়ে বললুম, এবার এদিকে চলে যান, ওরা আপনাকে লণ্ডনে পৌঁছে দেবে।

তিনি তখনও আমার হাত ধরেছিলেন। এরপর একটা অদ্ভুত কথা বললেন, তুমিও আমার সঙ্গে লোন্দন চলো। এখান থেকে কতদূর?

আমার হাসি পেল। একি অমৃতসর থেকে লুধিয়ানা যে ওঁকে এখন আমি লণ্ডনে পৌঁছে দিয়ে আসবো। আমার এখন থাকার কথা আমস্টারডামে।

অনেক মিষ্টি কথায় বুঝিয়ে আমি ওঁকে ওঁর বিমানের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এলুম এবং একজন কোমল-মুখ এয়ার হস্টেশকে দেখে তাঁকে বুঝিয়ে দিলুম যেন লণ্ডনে নামার পর মহিলাকে একটু সাহায্য করেন। ভদ্রমহিলা জলে-পড়া মানুষের মতন মুখ করে বারবার আমার দিকে পেছন ফিরে তাকাতে তাকাতে চলে গেলেন ভেতরে।

ভদ্রমহিলা পাঞ্জাবিনী বলেও ওঁর নাম জিজ্ঞেস করা হয়নি। সুতরাং ওঁর কি ধর্ম তা আমি জানি না। সেইজন্য আমি মনে মনে বললুম, হে গুরু নানক, হে হজরত মহম্মদ, হে শ্রীকৃষ্ণ, আপনারা দয়া করে এই অসহায় মহিলাকে ঠিকঠাক ওঁর ছেলের সঙ্গে দেখা করিয়ে দেবেন লণ্ডন বিমান বন্দরে।

সেই মহিলার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল ভূমধ্যসাগর পেরুবার সময়। এরপর অনেকদিন কেটে গেছে, আমি যখন আবার আটলান্টিক মহাসমুদ্র ডিঙিয়ে যাচ্ছি, সেই সময়, যাত্রার একেবারে শেষ দিকে লক্ষ্য করলুম যে বিমানের এক কোণে সেই মহিলা বসে আছেন।

বেশ চমকে উঠলুম প্রথমে।

এর মধ্যেই তিনি লণ্ডন ছেড়ে ক্যানাডায় চলেছেন? উনি বলেছিলেন যে দুই

ছেলের কাছেই সাহায্য চেয়ে চিঠি দেওয়ায় ক্যানাডার ছেলে উত্তর দেয়নি, লণ্ডনের ছেলে টিকিট পাঠিয়ে দিয়েছিল। তাহলে বোধহয় ক্যানাডার ছেলেটির সুমতি হয়েছে। মাকে সে বেশী ভালোবাসে। সে হয়তো লণ্ডনের ভাইকে জানিয়েছে যে, মা তোর কাছে থাকবে কেন, আমার কাছে পাঠিয়ে দে।

কিংবা এর উল্টো দিকও থাকতে পারে।

আমার গল্প বানানো অভ্যেস কি না, তাই মনে মনে একটা অন্য রকমও ভেবে ফেললুম। লণ্ডনের মেম বিয়ে করা ছেলে মাকে নিয়ে বোধহয় বিড়ম্বনায় পড়েছিল। হয়তো তার বাড়িতে খুব মদ খাওয়ার পার্টি হয়, ওঁর মেম বউয়ের বান্ধবীরা প্রায়ই এসে নাচানাচি করে, সেখানে এই গ্রাম্য মহিলার উপস্থিতি তো একটা মূর্তিমান অসঙ্গতি। বাচ্চা-কাচ্চা থাকলে অনেক সময় মা-কে কাছে রাখলে সুবিধে হয়, বুড়ি মাকে দিয়ে বিনা পয়সার ন্যানী কিংবা আয়ার কাজ চালিয়ে নেওয়া যায় বেশ। কিন্তু মেমের বাচ্চারা কি এই ইংরেজি না-জানা ঠাকুমার কাছে থাকতে চাইবে। সেইজন্যই কি তিতিবিরক্ত হয়ে তাঁর লণ্ডনের ছেলে মাকে এখন ক্যানাডার ভাইয়ের কাঁধে চালান করে দিচ্ছে?

ভদ্রমহিলার সঙ্গে দেখা করবো কি করবো না, এই নিয়ে ইতস্তত করছিলুম। কে আর সাধ করে অন্যের সমস্যা কাঁধে নিতে চায়। আগেরবার তবু আমাদের গন্তব্য ছিল আলাদা, এবার তো নামতে হবে টরোন্টোতেই একসঙ্গে।

ভদ্রমহিলা আমাকে দেখেন নি, দেখলে নিশ্চয়ই ডাকতেন। আমি কিছুক্ষণ ঐ দিকটা এড়িয়ে রইলুম, কিন্তু শেষ পর্যন্ত গল্পটা জানবার অদম্য কৌতূহলই আমাকে ঠেলে নিয়ে গেল। কী হলো লণ্ডনে?

কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলুম, নমস্তে, ভালো আছেন?

ভদ্রমহিলা সাদা চোখ তুলে তাকালেন আমার দিকে। চিনতে পারেননি।

মুখখানা ম্লান, তবে সেই জলে-পড়া ভাবটি আর নেই। এক মাসের লণ্ডনের অভিজ্ঞতা ওঁকে অনেকখানি পাল্টে দিয়েছে মনে হয়। পোশাক অবশ্য একই রকম, শুধু আগেরবার পায়ে সস্তা রবারের চটি দেখেছিলুম, এবারে নতুন জুতো। লণ্ডনের ছেলে মাকে অন্তত একজোড়া জুতো দিয়েছে।

বললুম, সেই যে আগেরবার প্লেনে দেখা হয়েছিল, তারপর আমস্টারডাম এয়ারপোর্টে....

উনি বললেন, হাঁ হাঁ।

কণ্ঠস্বরে সে রকম কোনো উৎসাহ নেই। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন একদৃষ্টে।

আবার জিজ্ঞেস করলুম, লণ্ডনে দেখা পেয়েছিলেন আপনার ছেলের?

কোনো অসুবিধা হয়নি তো?

উনি বললেন, না। ছেলে তার পায়নি। সেইজন্য হাওয়াই আড্ডায় আসেনি। ওখানে একজন দেশী লোক নিজের বাড়িতে নিয়ে গেল, পরদিন ছেলের ঠিকানায় পৌঁছে দিল।

—তা লণ্ডন কি আপনার ভালো লাগলো না? এত তাড়াতাড়ি চলে এলেন?

আগেরবারের মতন এবারে আর গল্প করার মতন কোনো উৎসাহ নেই ভদ্রমহিলার। শুধু বললেন, এবার কাণ্ডায় অন্য ছেলের কাছে যাচ্ছি।

সীট বেল্ট বাঁধার নির্দেশ শোনা গেল বলে আমি ফিরে এলুম নিজের জায়গায়। তবু কৌতূহল জেগে রইলো। লণ্ডনের মতন অচেনা শহরে এই ভারতীয় গ্রামের মহিলা প্রথম দিন প্লেন থেকে নেমে ছেলেকে দেখতে পাননি! তখন কী রকম মনের অবস্থা হয়েছিল ওঁর?

দিল্লির টেলিগ্রাম ঠিক সময়ে লণ্ডনে পৌঁছোয়নি। বিলেতর টেলিগ্রাম ঠিক সময় ক্যানাডায় পৌঁছেছে তো? ক্যানাডার ডাক-ব্যবস্থার ওপরেও খুব একটা ভরসা করা যায় না। ভারতের মতন এখানেও ঘন ঘন ডাক ধর্মঘট হয়। চিঠি আসতে পনেরো-কুড়ি দিন লেগে যায়। টরেন্টোর ছেলে ঠিকঠাক উপস্থিত থাকবে তো? লণ্ডনে যে দিশী লোকটি ওঁকে একদিনের জন্য আশ্রয় দিয়ে সাহায্য করেছিলেন, তিনি নিশ্চয়ই খুব দয়ালু, এখানে যদি সে রকম দয়ালু লোক না থাকে? তাছাড়া আগেই শুনেছি, খালিস্তানের দাবীতে অনেক পাঞ্জাবী এসে টরোন্টো বিমান বন্দরে আস্তানা গেড়ে আছে, তাদের জন্য ক্যানাডার সরকার বিব্রত। যদি ভদ্রমহিলাকে ক্যানাডায় ঢুকতে না দেয়?

টরেন্টো থেকে বিমান বদলে আমার এডমান্টন যাবার কথা। আমার ভিসা, কাস্টমস্ চেকিং সেখানেই হবে। ভেবেছিলুম, টরেন্টোতে নেমে কিছুক্ষণ সময় পাবো, ততক্ষণ দেখে যাবো ভদ্রমহিলার কোনো গতি হয় কি না।

কিন্তু টরেন্টোতে নামামাত্র ঘোষণা শুনতে পেলুম, এডমান্টনের ফ্লাইট এক্ষুণি ছাড়বে। তার জন্য যেতে হবে ইন্টারন্যাল এয়ারপোর্টে, যেটা অন্য বাড়িতে। সুতরাং ছুটতে হলো সঙ্গে সঙ্গে। পাঞ্জাবী মহিলাটির কাহিনীর শেষ পরিণতি আমার জানা হলো না।

॥ ১০ ॥

টরেন্টোর আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর থেকে ঘরোয়া বিমান বন্দরে হুড়োহুড়ি করে যেতে হবে, সুটকেসটা তুলতে গেছি, এমন সময় একজন লোক পাশে এসে

সেটির দিকে হাত বাড়ালো। চেহারা দেখলেই চেনা যায়।

কুলি না বলে পোর্টার বলাই উচিত। কুলি শুনলেই মনে হয় যারা মাথায় করে মালপত্র বয়ে নিয়ে যায়। আর পোর্টার মানে স্মার্ট পোশাক পরা, ছোট ঠেলা গাড়ি নিয়ে ঘোরে। আমার সুটকেসটা যে কারুর বয়ে নিয়ে যাওয়া দরকার তা-ও নয়, এতদিন তো নিজেই বয়েছি। তা ছাড়া ইওরোপের নানান বিমান বন্দরে অনেক ছোট ছোট হাতে ঠেলা গাড়ি ছড়ানো থাকে, যে-কোনো একটা টেনে এনে নিজের মালপত্র নিজেই যেখানে সেখানে নিয়ে যাওয়া যায়। দিল্লি ছাড়বার পর কুলি বা পোর্টার দেখিনি এ পর্যন্ত। বহু ঘন্টা বিমান যাত্রার পর মাথা ভোঁ ভোঁ করে, সম্পূর্ণ নতুন দেশে একটু হকচকিয়েও যেতে হয়। ভাবলুম এদেশে বুঝি এরকমই নিয়ম, তাই লোকটিকে সুটকেস নিতে দিলুম।

তারপর কাস্টমস ইত্যাদির ফর্মালিটি মেটাবার পর পরবর্তী বিমানের অপেক্ষা স্থলে এসে পৌঁছুতেই সেই লোকটি এসে আমার হাতে লাগেজ ট্যাক গুঁজে দিল। অর্থাৎ আমার সুটকেস আবার যাত্রার জন্য তৈরি হয়েছে।

ভালো কথা। এবার ?

লোকটি লম্বা-চওড়া, কুচকুচে কালো। গম্ভীরভাবে বাঁ হাতের তালুটা বাড়িয়ে দিল আমার দিকে।

একটা কিছু রেট থাকা উচিত, কিন্তু কোথাও তা লেখা নেই। কিংবা, পয়সা নেবার নিয়ম আছে কি না কে জানে, লোকটির ভাব-ভঙ্গি একটু গোপন গোপন। যেন প্রকাশ্যে পয়সা চাইতে সে লজ্জা পাচ্ছে।

পকেটে হাত দিয়েই আমি প্রমাদ গুণলুম ! যাঃ, টাকা বদলানো তো হয়নি ! এক একটা দেশে যাওয়া মানেই নতুন করে টাকা পয়সার হিসেব রাখা। তা ছাড়া প্রত্যেক দেশের আলাদা আলাদা সিকি আধুলি সহজে চেনাও যায় না। আমেরিকান ডলার আর কেনেডিয়ান ডলারের চেহারা প্রায় এক রকম হলেও মূল্য আলাদা। আমেরিকান ডলার আমাদের ন'টাকা, আর কেনেডিয়ান ডলার পৌনে আট টাকার মতন।

আমার পকেটে রয়েছে ফ্রেঞ্চ ফ্র্যাংক। সেই এক ফ্র্যাংকের দাম আবার দু' টাকার কাছাকাছি। সেই হিসেবে কত টাকা একে দেওয়া যায় ? আমাদের দেশে দু' টাকা দিলেই চলে, সাহেবদের দেশে দশ টাকা দিলে হবে না।

একটা পাঁচ ফ্র্যাঙ্কের নোট বার করতেই পোর্টারটি বললো, নো, নো, নো, ডলার, ডলার !

আমি তাকে কাঁচুমাচুভাবে বললুম, ক্ষমা করবেন, আমার টাকা বদলানো হয়নি। এখন আর সময়ও নেই। আপনি দয়া করে এটাই নিন, আপনি তো

এয়ারপোর্টের কাউন্টার থেকে যে-কোনো সময়ই বদলে নিতে পারেন !

লোকটি আবার জিজ্ঞাসা করলো, তোমার কাছে সত্যিই ডলার নেই ?

আমি বললুম, সত্যি।

এবার সে জিজ্ঞেস করলো, এটা কত ?

এই রে, আবার জটিল অঙ্কের হিসেবের মধ্যে ফেললে। পাঁচ ফ্র্যাঙ্কে তো এক কেনেডিয়ান ডলারের কাছাকাছিই হবে। সেটা তো আমার চেয়ে এদেরই ভালো করে জানবার কথা। কানাডার এক অংশে প্রচুর ফরাসীর বাস, তারা আন্দোলন করে নিজেদের দাবি আদায় করে নিয়েছে। ফরাসী এখন কানাডায় অন্যতম রাষ্ট্রভাষা, সব জায়গায় ইংরেজির পাশাপাশি ফরাসী লেখা থাকে। সুতরাং খোদ ফরাসী দেশের টাকার হিসেব এরা জানে না ?

বললুম, এক ডলার !

লোকটি এমন একটা চোখ করে তাকালো যেন আমার মতন বে-আদপ সে জন্মে দেখেনি। মাত্র এক ডলার দেওয়ার অসম্ভব প্রস্তাব করছি তাকে ?

ঝটিতি আর একখানা পাঁচ ফ্র্যাঙ্কের নোট বার করে লজ্জা লজ্জা মুখে দিলুম তার হাতে। সাহেব কুলিকে অপমান করে ফেলছিলুম আর একটু হলে। হোক না গায়ের রং আমার চেয়েও কালো, তবু তো ইংরিজি বলে !

লোকটি তখনও হাত বাড়িয়েই আছে। মুখখানা অপ্রসন্ন।

এবার আমার পকেট থেকে বেরুলো একটা দশ ফ্র্যাঙ্কের নোট। পাঁচ ফ্রাঙ্ক আর নেই। এত বড় নোটটা দিয়ে দেবো ? উপায় কি !

এবারে লোকটি নোটগুলি ভাঁজ করতে লাগলো। আমি খুব চাপা ব্যাঙের সুরে জিজ্ঞেস করলুম, ঠিক আছে ? এবারে ঠিক আছে তো ?

লোকটি একটি ধন্যবাদ পর্যন্ত দিল না। চলে গেল।

আমার তখন গা কচ্‌কচ্‌ করছে। প্রায় চল্লিশটা টাকা চলে গেল কুলি খরচ ? অথচ সুটকেসটা আমি নিজেই বইতে পারতুম। লোকটি বোধহয় আমার জন্য ঠিক পাঁচ মিনিট সময় খরচ করেছে।

নতুন দেশে এলে এরকম একটা না একটা বোকামি হয়েই যায়। কালো পোর্টারটি আমায় ঠকিয়েছে। ফর্সা, রাঙা কোনো পোর্টার হলে কি এমনি ভাবে আমার কাছ থেকে বেশি নিতো ?

ফ্লাইট নাম্বার দেখে গেটের দিকে এগোচ্ছি, সেই সময় সেই পোর্টারটি আবার স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমার কাছে এসে বললো, তোমার ফ্লাইট দু' ঘণ্টা বাদে ছাড়বে !

যাচ্চলে ! তা হলে তো ধীরে সুস্থে সুটকেস আনা যেত, টাকা বদলে নেওয়া

যেত, শুধু শুধু চল্লিশটা টাকা গচ্চা যেত না।

ইচ্ছে হলো, লোকটিকে দু'একটা কড়া কথা শোনাই। কিন্তু সাহস নেই। লোকটির চোখে মুখে একটা রাগ রাগ ভাব, যেন আমার মাথায় আরও কিছু কাঁঠাল ভাঙার মতলবে আছে।

সে বললো, অনেক সময় আছে, তুমি ইচ্ছে করলে এখন টাকা বদলে নিয়ে আসতে পারো।

আমি বললুম, দরকার নেই।

লোকটিকে এড়াবার জন্য চলে গেলুম টেলিফোন বুথের দিকে।

পয়সা না থাকলেও টেলিফোন করার কোনো অসুবিধে নেই। আহা, এ সব দেশের টেলিফোন দেখলে নিজের দেশের টেলিফোনের জন্য বড্ড মায়া হয়। আমাদের দেশের টেলিফোন যেন অবোধ শিশু, ভালো করে কথা বলতেই শেখেনি এখনো। কিংবা কখনো কখনো টেলিফোনকে মনে হয়, কানা-খোঁড়া-বোবা। আমাদের তুলনায় এদের টেলিফোন যেন আগামী শতাব্দীর!

প্রথম কথা, ডায়াল করার ব্যাপারটাই উঠে গেছে। দেয়ালে দেয়ালে ঝোলানো থাকে শুধু রিসিভারটা, তার গায়েই আছে এক-দুই লেখা বোতাম। সেগুলো টিপলেই পিপি শব্দ হয়, আর সঙ্গে সঙ্গে কানেকশান হয়ে যায়। ঠিক যেন একটা খেলনা। অথচ সেই খেলনার বোতাম টিপেই তক্ষুনি তক্ষুনি দেশের যে-কোনো জায়গায় তো বটেই, প্যারিস-লণ্ডন, জাপান-হংকং-সিঙ্গাপুর পর্যন্ত কানেকশান পাওয়া যায়, কোনো অপারেটরের সাহায্য ছাড়াই। এক মাত্র ভারতবর্ষের সঙ্গে এভাবে কথা বলা যায় না।

যে-কোনো পাবলিক জায়গাতেই গাদাখানেক টেলিফোন ছড়ানো। পকেটে পয়সা থাক বা না থাক, এমন কি নম্বর জানা না থাকলেও যে-কোনো দূরের বন্ধুর সঙ্গে কথা বলা যায়। পয়সা না থাকলে অবশ্য অপারেটরের সাহায্য নিতে হয়। অপারেটর আমার নামটা জেনে নিয়ে আমার চাওয়া নম্বরটায় রিং করে জিজ্ঞেস করবে, এই নামের লোকের সঙ্গে তোমরা কথা বলতে চাও? তখন সে হ্যাঁ বললেই হলো। পয়সাটা অবশ্য তাকে দিতে হবে।

টেলিফোন করলুম এডমাণ্টনে দীপকদার বাড়িতে। মহিলা কণ্ঠ শুনে বুঝলুম, টেলিফোন ধরেছেন জয়তীদি। এই রে, জয়তীদি কি আমায় চিনতে পারবেন? গত বছর দীপকদা এসেছিলেন কলকাতায়, তখন বলেছিলেন, একবার চলে এসো না আমাদের দিকে। তোমাদের অ্যাডভেঞ্চার করতে ইচ্ছে করে না? কোথায় থাকি জানো? প্রায় আলস্কার কাছে, আমাদের বাড়ি থেকে সোজা হেঁটে

গেলেই উত্তর মেরু। এক্সকারশান টিকিট সস্তায় পাওয়া যায়, চলে এসো!

সেই ভরসাতেই এসেছি, অবশ্য ইওরোপ থেকে চিঠিও দিয়েছি একটা। এখন জয়তীদি যদি আমায় চিনতে না পারেন...।

যথা সম্ভব মধুর গলা করে বললুম, জয়তীদি, আমার নাম নীললোহিত...কলকাতায় দু' তিনবার দেখা হয়েছিল...মনে আছে কি? দীপকদা বাড়িতে আছেন?

জয়তীদি ঝরঝর করে হেসে বললেন, কেন চিনতে পারবো না? তোমার জন্যই তো রান্না করছিলুম, হ্যাঁ, ভালো কথা, তুমি ঝাল খাও তো? আচার খাও? তুমি কোথা থেকে কথা বলছো?

—টরোণ্টো থেকে, রাত দশটায় পৌঁছোবো।

—জানি...দীপকদা বেরিয়ে গেছেন ফেরার পথে এয়ারপোর্ট থেকে তোমায় নিয়ে আসবেন।

—তা হলে দেখা হচ্ছে।

ফোন রেখে বেশ নিশ্চিন্ত মনে একটা চেয়ারে এসে বসলুম। কত সহজে ব্যাপারটা মিটে গেল। টরোণ্টো থেকে এডমাণ্টন ঘড়ির হিসেবে আরও চার ঘণ্টার পথ। এ জন্য গ্রাহাম বেলকে ধন্যবাদ দিতে হয়।

সদ্য আমেরিকা-ফেরৎ তাপসদার একটা কথা মনে পড়লো। তিনি আফসোস করে বলেছিলেন, ভাই কলকাতায় কি এমন কোনোদিন আসবে, যখন কেউ বাড়িতে টেলিফোন রাখতে চাইলে টেলিফোন কম্পানিতে খবর দেওয়া মাত্র একদিনের মধ্যে টেলিফোন এসে যাবে, আর কোনো দিন খারাপ হবে না।

আমি বলেছিলুম, সামনের সেঞ্চুরিতে নিশ্চয়ই সে-রকম দিন আসবে।

তাপসদা আর একটা অত্যাশ্চর্য গল্প বলেছিলেন। উনি ছিলেন আমেরিকার খুব ছোট একটা শহরে। সেখানে টেলিফোনের অফিস একটা দোকানের মতন। নানা রকম রঙ ও আকৃতির টেলিফোন সেখানে সাজানো থাকে, লোকে ফার্নিচার পছন্দ করবার মতন এসে টেলিফোন কিনে নিয়ে যায়। কয়েকটি মেয়ে সেই দোকানে থাকে, তারাই টেলিফোনের কানেকশানের ব্যবস্থা করে, তারাই বিল নেয়।

একবার তাপসদা বিশেষ দরকারের কলকাতায় ট্রাঙ্ক কল করেছিলেন। মাসের শেষে বিল এলে দেখা গেল, তাঁকে ভুলে দু'বার ট্রাঙ্ক কলের চার্জ করেছে। উনি বিল নিয়ে গেলেন সেই দোকানে। অভিযোগ-বাক্যটি শেষ করবার আগেই একটি মেয়ে বললো, তুমি ঐ টেলিফোনে সরাসরি অ্যাকাউণ্টস ডিপার্টমেণ্টে কথা বলো! এক কোণের টেবিলে একটি টেলিফোন রাখা আছে,

যেটা তুললেই পার্শ্ববর্তী শহরের হেড অফিসের অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টের কেউ ধরবে। তাপসদা সেখানে বললেন তাঁর ব্যাপারটা। অ্যাকাউন্টসের অদৃশ্য মেয়েটি এক মিনিট মাত্র সময় নিয়ে রেকর্ড দেখে নিয়ে বললো, কিন্তু তোমার তো দুটো কল-ই হয়েছে, একটা সন্ধে সাড়ে সাতটায়, আর একটা পৌনে দশটায়। তাপসদা বললেন, না, তা ঠিক নয়। প্রথম কল্‌টায় কলকাতার বাড়িতে রিং হয়ে গেছে, কেউ ধরেনি। দ্বিতীয়বার কথা হয়েছে। সুতরাং প্রথমবার বিল হবে কেন ? মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে বললো, ও, প্রথমবার কথা হয়নি ? ঠিক আছে ! তুমি তোমার বিল থেকে প্রথম কলের চার্জটা বাদ দিয়ে বিল জমা দিয়ে দাও !

ব্যাস, মিটে গেল সমস্যা !

তাপসদাকে বলেছিলুম, সামনের সেঞ্চুরিতে আমাদের কলকাতাতেও নির্ঘাৎ এসবও এরকম সহজ হয়ে যাবে।

বসে বসে এই সব কথা ভাবছি এমন সময় সেই কালো পোর্টারটিকে আবার আমার দিকে আসতে দেখলুম। কী ব্যাপার, আবার কী চায় ? একটু ভয় ভয় করতে লাগলো এবার। আমায় খুব বোকা মনে করেছে নিশ্চয়ই লোকটা ! আমি তাড়াতাড়ি একটা বই খুলে মেলে ধরলুম চোখের সামনে।

লোকটি আমার কাছে এসে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানতে লাগলো। কিছু হয়তো বলতে চায়। কিন্তু ওর সঙ্গে গল্প করবার বিশেষ উৎসাহ বোধ করলুম না। বিলেত-আমেরিকা থেকে যতজন আমাদের দেশে ফিরে আসে, কারুর মুখে আজ পর্যন্ত আমরা কোনো নিগ্রো (ইংরেজিতে এখন নিগ্রো কথাটা নিষিদ্ধ হলেও বাংলায় অচল নয়। বাংলায় আমরা কোনো খারাপ অর্থে নিগ্রো কথাটা ব্যবহার করি না, বরং কালো কথাটাই বাংলায় একটু কেমন কেমন) বন্ধুর গল্প শুনিনি। অনেকে মেম বিয়ে করে আসে, কিন্তু কেউ আজ পর্যন্ত নিগ্রো বিয়ে করে ফিরেছে শোনা গেছে কি ? অথচ কালো মেয়েদের মধ্যে সুন্দরী কম নেই। কালো লোকরা কালোদের ধার ঘেঁষে না। শুনেছি নিগ্রোরাও ভারতীয়দের তেমন পছন্দ করে না।

এ লোকটাও তো মওকা বুঝে আমার কাছ থেকে চল্লিশ টাকা হাতিয়ে নিয়েছে, ওর সঙ্গে আবার কথা কিসের ?

মনে হচ্ছে লোকটির বিশেষ কোনো কাজ নেই, এদিকে-ওদিকে অলসভাবে ঘুরছে। বোধহয় আর কারুর সুটকেস হাতাবার মতলবে আছে। কিন্তু নতুন বিমান না এলে সে সুযোগ পাবে কেন ?

বই পড়ায় ডুবে গিয়েছিলুম, হঠাৎ চমকে গেলুম। ক'টা বাজে ? আমার ঘড়িতে তো এখনও ইওরোপের সময়। এখানে ফ্লাইট ছাড়ার আগে তেমন

অ্যানাউন্সমেন্ট হয় না, টি ভি-তে দেখানো হয় কোনও প্লেন কখন ছাড়ছে। আমার প্লেন ছেড়ে গেল নাকি ?

এই রকম সময়ে দারুণ একটা আতঙ্ক এসে যায়। এই প্লেনে যদি উঠতে না পারি তা হলে টিকিট নষ্ট হয়ে যাবে কি না···দীপকদা ফিরে যাবেন এয়ারপোর্ট থেকে···আমি এখানে সারা রাত কোথায় থাকবো···

পড়ি মরি করে ছুটলুম গেটের দিকে। সত্যি দেরি হয়ে গেছে। প্লেনটা ছেড়ে যায়নি অবশ্য, কিন্তু শেষ দু'তিন জন লোক বোর্ডিং পাশ জমা দিয়ে ঢুকে যাচ্ছে। আমার বোর্ডিং পাশ পকেট থেকে বার করে হাঁপাতে হাঁপাতে দাঁড়ালুম সেখানে।

সেই সময় পিঠে একটা টোকা। মুখ ফিরিয়ে দেখি সেই কালো পোর্টারটি। দারুণ বিরক্ত হয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিলুম, তার আগেই সে হাত বাড়িয়ে হ্যাণ্ড ব্যাগটা এগিয়ে দিল। আমার হ্যাণ্ড ব্যাগ। সর্বনাশ, অতি ব্যস্ততায় আমি ওটা ফেলে এসেছিলুম। ওর মধ্যে আমার পাশপোর্ট, টাকা পয়সা, টিকিট ফিকিট সব !

লোকটিকে ধন্যবাদ জানাবারও অবকাশ পেলুম না, শুধু এক ঝলক হাসি কোনো রকমে ছুঁড়ে দিয়ে চলে গেলুম বিমানের দিকে।

॥ ১১ ॥

আমাদের দেশের সঙ্গে তুলনা করলে ক্যানাডাকে মনে হয় মরুভূমি। না, মরুভূমির তুলনাটা ঠিক হলো না। বরং বলা উচিত একটি উর্বর, অতি জন-বিরল দেশ। কয়েকটা বড় শহর বাদ দিলে শত শত মাইল যেন জায়গা খালি পড়ে আছে। আমেরিকায় যেমন গ্রাম নেই, আছে অসংখ্য ছোট শহর, সেই রকম ছোট শহর ক্যানাডাতেও আছে, আরও ছোট, ধু-ধু করা মাঠের মধ্যে দু' তিনটে মাত্র বাড়ি, এমনও চোখে পড়ে।

ক্যানাডার রাস্তাগুলোও আমেরিকার চেয়ে বেশী চওড়া মনে হয়, কারণ রাস্তায় গাড়ি কম। তা বলে যে এদেশের লোক গাড়ি কিনতে পারে না তা নয়, প্রত্যেক পরিবারেই অন্তত দুটো করে গাড়ি, কিন্তু লোক সংখ্যাই তো কম। এত বড় দেশ ক্যানাডার জনসংখ্যা, আমাদের দেশের তুলনায় নস্যি ! তবু সারা দেশটায় আষ্টেপৃষ্ঠে চওড়া চওড়া মসৃণ রাস্তা ছড়িয়ে আছে।

ইতিহাসেই দেখা যায় মানুষের মধ্যে যাযাবর বৃত্তি রয়ে গেছে এখনও। নিজ বাস-ভূমে শস্য-ফলমূলের অনটন দেখলেই মানুষ বারবার অন্য বাসভূমির সন্ধানে ছুটে যায়। স্বদেশ প্রেম একটা আইডিয়া মাত্র, যা নিয়ে কবিরা অনেক আবেগের মাতামাতি করেছে এবং যুদ্ধবাজ ও রাজনীতিবিদরা তাতে ইন্ধন জুগিয়ে এসেছে নিজেদের স্বার্থে। আসলে, যেখানে ভালো খাবার-দাবার,

স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তা আছে, সেখানে ছুটে যাওয়াই মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। গ্রাম ছেড়ে যে-কারণে মানুষ শহরে চলে আসে, সেই কারণেই কলকাতা-বোম্বাই লণ্ডনের মতন পিঁপড়ে শহর ছেড়ে মানুষ ক্যানাডা-অস্ট্রেলিয়ায় গেছে নতুন সম্ভাবনার প্রত্যাশায়।

সাহেবরা আগে গিয়ে দখল করে নিয়েছে বলে ক্যানাডা সাহেবদের দেশ। কিন্তু পিছু পিছু অ-সাহেবরাও গেছে। ভারতীয়রা গেছে এ শতাব্দীর গোড়া থেকেই, জাপানীরা গেছে, আফ্রিকা ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ থেকে গেছে, আর চীনেরা গিয়ে বসতি স্থাপন করেনি, পৃথিবীতে এমন কোনো জায়গাই নেই। কিন্তু তেলে-জলে যেমন মিশ খায় না, সেই রকম সাদা-কালো-হলদে-খয়েরি জাতিগুলির মধ্যে মেশামেশির কোনো ব্যাপারই ঘটেনি, ক্রমশ দূরত্ব যেন আরও বেড়েই চলেছে।

সাদায়-কালোয় ভেদাভেদের কথা যেমন প্রায়ই শোনা যায়, তেমনি দূরত্ব ঘোচাবার কথাও মাঝে মাঝেই ওঠে। কিন্তু কালো-হলদে-খয়েরি জাতিগুলির মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের কোনো উদ্যমই নেই। খয়েরিরা কালোদের চেয়ে সাদাদের বেশী পছন্দ করে, তাদের সঙ্গে কাঁধ ঘষাঘষি করতে চায়, আবার সাদারা এখন খয়েরিদের চেয়ে বেশী পচ্ছন্দ করে হলদেদের। এই রকম রঙের খেলা চলছে আর কি। ভারতী মুখার্জি নামে একজন লেখিকা, যাঁর স্বামী কেনেডিয়ান, অনেক দিন ছিলেন ওদেশে, বর্ণ-বিদ্বেষের ব্যাপারে তিতি বিরক্তি হয়ে তিনি গত বছর কাগজে বিবৃতি দিয়েছেন যে, জীবনে আর তিনি ওদেশে ফিরবেন না।

বর্ণ বিদ্বেষ নিয়ে অবশ্য কিছু বলা আমার মানায় না। কারণ আমি আসছি এমন একটা দেশ থেকে, যার মতন বর্ণ বিদ্বেষী দেশ সারা পৃথিবীতে আর একটিও নেই। আমাদের দেশে এখনও কাগজে বিয়ের বিজ্ঞাপনে পাত্রীর রঙ ফর্সা না কালো সেটাই প্রধান ব্যাপার। আমাদের দেশে হরিজনদের এখনো পুড়িয়ে মারা হয়, আরও যা সব আছে তা বলার দরকার নেই।

এই প্রসঙ্গে একটা মজার ঘটনা মনে পড়লো।

অনেক সময় হয় না যে পৃথিবীর অন্য প্রান্তে গিয়ে একজনের সঙ্গে নতুন আলাপ হলো, তারপর কথায় কথায় জানা গেল, উনি আমার ভাই বোন, অনেক আত্মীয় বন্ধুকে চেনেন, আর আমিও ওঁর আত্মীয়-বন্ধুদের অনেককে খুব ভালো চিনি, শুধু আমাদের দু' জনেরই আগে দেখা হয়নি! সেইরকমই এ দেশে এসে আলাপ হলো মীর চন্দানি নামে একজনের সঙ্গে, তাঁর স্ত্রী উগাণ্ডার ক্রিশ্চান, এক কালের ক্ষীণ যোগাযোগ ছিল আমাদের দেশের গোয়ার সঙ্গে। মীর চন্দানির সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলার পরই আমরা আবিষ্কার করলুম যে, এককালে উনি

কলকাতায় আমাদের ঠিক পাশের বাড়িতেই থাকতেন, ওঁর দাদার ছেলে আমার খুব বন্ধু, উনিও আমার বাবাকে খুব ভালো চিনতেন। তখন উনি ছিলেন অবিবাহিত, সে প্রায় পনেরো বছর আগেকার কথা। মীর চন্দানি খুব আবেগের সঙ্গে কলকাতার স্মৃতি রোমন্থন করতে লাগলেন। কথায় কথায় জিজ্ঞেস করলেন, অশোককে মনে আছে? সে কেমন আছে?

আমি জিজ্ঞেস করলুম, কোন্ অশোক?

উনি বললেন, সেই যে অশোক···পড়াশুনোয় খুব ভালো ছিল, ওর পদবী ছিল বোধ হয় মিত্র, তাই না?

এখন ব্যাপার হয়েছে কী, সেই সময় আমরা কলকাতায় যে পাড়ায় থাকতুম, সেই পাড়ায় একই রাস্তায়, খুব কাছাকাছি বাড়িতে দু'জন অশোক মিত্র থাকতেন, দু'জনেই পড়াশুনোয় ভালো। এতে আশ্চর্যের কিছু নেই, সাংবাদিকতার জগতে যদি দু'জন অমিতাভ চৌধুরী থাকতে পারেন, তাহলে এক পাড়ায় দু'জন অশোক মিত্র থাকা কিছু অস্বাভাবিক নয়। একজন ফর্সা ছিপছিপে, লম্বা, অন্যজন কালো, মাঝারি উচ্চতা। দু'জনকে আলাদা করে বোঝাবার জন্য আমরা বলতুম, কালো অশোক, ফর্সা অশোক।

সেই জন্যই জিজ্ঞেস করেছিলুম, কোন্ অশোক বলুন তো? কালো রঙের?

মীর চন্দানি বললেন, না, না, সে বেশ ফর্সা ছিল, কোয়াইট হ্যাণ্ডসাম্···

আমি বললুম, বুঝেছি, তবে সেই অশোক মিত্রের সঙ্গে আমার ভালো পরিচয় ছিল না, কালো অশোককেই বেশী চিনতুম।

মীর চন্দানি বললেন, নাও আই রিমেমবার কালো অশোকও একজন ছিল বটে···

কথাবার্তা হচ্ছিল ইংরেজিতে, হঠাৎ পাশ থেকে শ্রীমতী মীর চন্দানি দারুণ ঝাঁঝের সঙ্গে বলে উঠলেন তোমাদের লজ্জা করে না, তোমরা ভারতীয়দের সম্পর্কে কথা বলতে গিয়েও একজনকে কালো বলছো?

আমি প্রথমটায় হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলুম। ভদ্রমহিলা এমন রেগে উঠলেন কেন?

কোনো রকমে বোঝাবার চেষ্টা করলুম যে, না, না, না, এর মধ্যে বর্ণ বিদ্বেষের কোনো ব্যাপার নেই, একই নামের দু'জন লোকের একজন কালো, অন্যজন ফর্সা, সেটা বোঝাবার জন্যই—

ভদ্রমহিলা আবার ধমক দিয়ে বললেন, ফের বলছো কালো-ফর্সা? অল ইণ্ডিয়ানস আর ব্ল্যাকস। সেটা তোমরা মানতে চাও না! কালো-জাতি বলে তোমাদের গর্ববোধ নেই, দ্যাখো তো চীনে বা জাপানীদের···।

সাহেবদের চোখে সব ভারতীয়ই যে কালো, এটা সত্যিই আমাদের মনে থাকে না। আমরা আফ্রিকান বা ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান কালোদের অপছন্দ করি, নিজেরা খয়েরি সেজে সাদাদের কাছাকাছি যেতে চাই। অবশ্য আমার গায়ের রং এমনই ছাতার কাপড়ের মতন যে আমার পক্ষে কোনোদিন খয়েরি সাজবারও উপায় নেই।

ক্যানাডার জনসংখ্যা যে বিরল সেটা সব সময়েই মনে পড়ে। একটি বাঙালী মেয়ে ক্যানাডায় এসে বলেছিল, ইচ্ছে করে গড়িয়াহাট থেকে এক গুচ্ছের লোক এনে এখানে ছড়িয়ে দিই!

গড়িয়াহাটের চেয়েও শ্যামবাজার কিংবা শিয়ালদায় ভিড় অনেক বেশী। হাঁটতে গেলে মানুষের গায়ে ধাক্কা লাগেই। পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় শহর বোধ হয় এখন মেক্সিকো সিটি। একটি মেক্সিকান মহিলাকে জিজ্ঞেস করেছিলুম, তোমাদের শহরে হাঁটতে গেলে কি মানুষের সঙ্গে মানুষের ধাক্কা লাগে? সে আমতা আমতা করে বলেছিলো না, মানে, বাজারে কিংবা মেলায় হাঁটতে গেলে সেরকম হতে পারে,...না কিন্তু রাস্তায়...তো! টোকিও, নিউইয়র্কের মতন বাঘা বাঘা শহরের তুলনায় আয়তনে বা জনসংখ্যায় কলকাতার স্থান বেশ নিচে। তবু কলকাতার মতন এমন ভিড় বোধ হয় আর কোথাও নেই।

ক্যানাডা এত ফাঁকা বলে যে আমাদের দেশের বেকাররা সে দেশে দলে দলে ছুটে যেতে পারবে, সেরকম সুদিন আর নেই। এখন কড়াকড়ি এবং ভিসা ব্যবস্থা হয়েছে। সাদা মানুষ হলে এখনো ক্যানাডায় বসতি নেবার সুযোগ আছে অবশ্য, কিন্তু ভারতীয়দের প্রবেশ অধিকার কমে আসছে ক্রমশই। মাঝে মাঝে শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে ভারতীয়দের মারামারিও হয়। সেরকম খবর তো আমরা দেশের কাগজেও পড়ি। এখানে এসে টরণ্টোর একটা ঘটনা শুনলুম। একটি বাঙালীর নতুন তৈরি সুদৃশ্য বাড়ির জানলার কাঁচ পাড়ার কোনো লোক ঢিল মেরে ভেঙে দেয়। একবার নয়, দুবার। বাঙালী ভদ্রলোকটি পুলিশে খবর দিলেও সুরাহা হয় না। পুলিশ বলে, কে ভেঙেছে সেটা না বলতে পারলে পুলিশ কাকে ধরবে? পরের বার ভদ্রলোক তক্কে ছিলেন। একটি ছোকরা যেই কাঁচে ঢিল ছুঁড়েছে, অমনি তিনি ছুটে গিয়ে ছেলেটিকে জাপ্টে ধরলেন, এবং টানতে টানতে তাকে নিয়ে গেলেন থানায়। এবারেও পুলিশের কোনো গা নেই। ছেলেটিকে ছেড়ে দিয়ে পুলিশ ঐ ভদ্রলোককে বললেন, এ ছেলেটিই যে ঢিল ছুঁড়েছেন তার প্রমাণ কী? আর কেউ দেখেছে? কোনো সাক্ষী ছিল?

অর্থাৎ শুধু চোর ধরলেই হবে না, চুরি বা গুণ্ডামির সময় একজন সাক্ষীও রাখতে হবে, আর তাকেও ধরে নিয়ে যেতে হবে থানায়। সাহেব পুলিশের কি

অপূর্ব কৃতিত্ব।

সেই বাঙালী ভদ্রলোককে তাঁর এক পাঞ্জাবী বন্ধু পরামর্শ দিয়েছিলেন, ওসব পুলিশ-টুলিশে অভিযোগ করে কোনো কাজ হবে না, বাড়িতে ডাণ্ডা রাখবেন, কেউ কাচ ভাঙতে এলে সোজা কয়েক ঘা কষিয়ে দেবেন!

বাঙালীরা অবশ্য ডাণ্ডা চালাতে তেমন দক্ষ নয়, অনেক জায়গাতেই তাদের চুপ করে সহ্য করে যেতে হয়। কিন্তু পাঞ্জাবীরা ছেড়ে কথা কয় না, বেশ কয়েকবার তারা হামলাবাজদের বে-ধড়ক মার দিয়েছে!

দীপকদার বাড়ি এডমাণ্টন শহর থেকে একটু দূরে সেই সেণ্ট অ্যালবার্ট নামে একটা ছোট্ট ছিমছাম সুন্দর জায়গায়। ক্যানাডায় টরেণ্টো, মন্ট্রিয়েল, কুইবেকের মতন শহরগুলোর তুলনায় এডমাণ্টন আমাদের কাছে তেমন পরিচিত নয়। কিন্তু এখন ওদের এডমাণ্টনই সবচেয়ে দ্রুত বর্ধমান শহর, কারণ যে-প্রদেশের এটি প্রধান শহর, সেই আলবার্টায় সম্প্রতি প্রচুর পেট্রল বেরিয়েছে। পেট্রল মানেই বহু টাকার ছড়াছড়ি, অনেক রকম নতুন ব্যবসা এবং মধু-সন্ধানী বহু মানুষের ভিড়। এডমাণ্টনে এমন ঝকঝকে ও বিশাল শপিং মল দেখেছি যে, মনে হয় ওরকম দোকান-সমারোহ ইওরোপেও নেই।

এডমাণ্টন থেকে সেণ্ট অ্যালবার্টে যেতে মাঝখানে একটি নদী পড়ে। সে নদীর নাম সাস্‌কাচুয়ান। যাওয়া-আসার পথে সেই নদীটার দিকে বারবার উৎসুকভাবেই তাকাই। নতুন নামের নদী দেখতে পেলেই আমার মনটা চঞ্চল হয়ে ওঠে।

সাস্‌কাচুয়ান নদীর পাশে উদ্যান আছে, জলে বোটিং হয়, ছিপ নিয়ে কেউ মাছ ধরার জন্য বসেও থাকে, কিন্তু কোনোদিন কারুকে স্নান করতে দেখিনি। নদীর জলে কিছু লোক দাপাদাপি না করলে সে নদীকে যেন ন্যাড়া ন্যাড়া দেখায়। ঠাণ্ডার জন্য নয় কিন্তু, জুলাই-আগস্টে ক্যানাডায় বেশ গরম পড়ে। জামার তলায় গেঞ্জি ভিজে যায়। ভয়টা বোধ হয় পলিউশনের। উত্তর আমেরিকার অধিবাসীরা স্নান করতে বা সাঁতার কাটতে খুব ভালোবাসে, সেই রকমই ওদের আবার পরিষ্কার বাতিক। অনেক বাড়িতেই নিজস্ব পুকুর আছে, যার পোশাকী নাম সুইমিং পুল। সেগুলো আসলে বড়সড় চৌবাচ্চা, আগাগোড়া সিমেণ্ট বাঁধানো, জলের রঙ কৃত্রিম নীল, সামান্য ধুলোবালি বা একটা গাছের পাতা পর্যন্ত পড়বার উপায় নেই। প্রত্যেক শহরে পাবলিক সুইমিং পুলও আছে অনেক, যেখানে পয়সা দিয়ে সাঁতার কাটা যায়। কিন্তু বাড়ির কাছে নদী থাকলেও কেউ নামবে না। বিংশ শতাব্দীর সভ্যতাকে বলা চলে নদী-ঘাতক। পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই নদীগুলোকে নানানভাবে বেঁধে দুর্বল করে ফেলেছে।

তাছাড়া দু' পাড়ের নদীগুলোকে অনবরত সব নদীতে নোংরা ঢালছে।

জয়তীদির এক বান্ধবীর ভাই একদিন কাছাকাছি একটা ছোট হ্রদে গিয়েছিল মাছ ধরতে। তারপর সে সত্যি কয়েকটা মাছ পেয়েছিল, ফেরার পথে জয়তীদিকে একটা মাছ উপহার দিয়ে গেল। মাছটার চেহারা একটু অদ্ভুত, অনেকটা যেন শোল মাছ আর কাৎলা মাছ মেশানো। একটা নতুন জাতের মাছ খাওয়া হবে ভেবে আমি বেশ উৎসাহিত হয়েছিলুম, রাত্তিরবেলা জয়তীদি অম্লান বদনে বললেন, সে মাছটা তো আমি ফেলে দিয়েছি!

দীপকদা মাছের ভক্ত নন, তাঁর কোনো তাপ-উত্তাপ দেখা গেল না। কিন্তু আমি চমকে উঠে বললুম, সেকি! আস্তো মাছটা?

জয়তীদি বললেন, কী জানি কী অচেনা মাছ, তা ছাড়া যে লেক থেকে ধরেছে, সেটা পলিউটেড কি না কে জানে! এখানকার জল যা নোংরা···।

নতুন ধরনের মাছ অবশ্য খাওয়া হলো কয়েকদিন পরেই। দীপকদাদের এক বন্ধু দিলীপবাবু একদিন আমাদের খাওয়ার নেমন্তন্ন করলেন। খাওয়ার টেবিলে যখন মাছ এলো, তখন তিনি বললেন, এ মাছ কোথাকার জানেন তো, উত্তর মেরুর।

দীপকদা একটু বাড়িয়ে বলেছিলেন, ওদের বাড়ি থেকে উঁকি দিয়ে উত্তর মেরু দেখা যায় না। তবে অ্যালবার্টার ওপর দিকেই ক্যানাডার সীমান্ত প্রদেশ, তারপর হিম রাজ্য। ম্যাপে দেখলে এখান থেকে উত্তর মেরু খুব দূর মনে হয় না। দীপকদার বন্ধু দিলীপবাবু সরকারি কর্মচারী, কাজের জন্য তাঁকে সীমান্ত প্রদেশে যেতে হয়, সেখান থেকে তিনি নিয়ে এসেছেন উত্তর মেরুর রুই মাছ।

উত্তর মেরুর মাছ খাচ্ছি, ভাবলেই রোমাঞ্চ হয় না? অবশ্য এস্কিমোরাও কোনোদিন গঙ্গার ইলিশ খেলে একই রকম রোমাঞ্চিত বোধ করবে বোধ হয়।

কয়েকদিন ক্যানাডায় থেকেই আমি বেশ পুরোনো হয়ে গেলুম। মাঝে মাঝে দীপকদাদের বাড়িতে আমি একদম একাই থাকি। দীপকদা পণ্ডিত মানুষ, তিনি এখানকার একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ বিদ্যার অধ্যাপক। জয়তীদি কলকাতা থেকে অর্থনীতিতে এম এ পাশ করে এসে অনেকদিন ক্যানাডায় ঘর-সংসার করেছেন। ইদানীং তাঁর শখ হয়েছে আবার পড়াশুনো করার, তিনি ভর্তি হয়েছেন আর একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে। ওদের দুটি মেয়ে জিয়া আর প্রিয়া কাছাকাছি একটা স্কুলে পড়ে। সকাল বেলা ছোট-হাজরি খেয়ে ওরা চারজনেই চলে যায়। তারপর বাড়িতে আমি একলা।

একদিন মনে হলো, শুধু শুধু জয়তীদিদের বাড়িতে রয়েছি আর দু' বেলা অন্ন ধ্বংস করছি, বিনিময়ে আমারও কিছু করা উচিত। এ দেশে সবাই কাজের মানুষ,

চুপচাপ কেউ বসে থাকে না। জয়তীদির বাড়ির ঘর ঝাঁট দিয়ে, বাসনপত্তর মেজেও তো খানিকটা সাহায্য করা যায়।

এদেশে কেউ কাজ করলেই তার জন্য পারিশ্রমিক পায়। শারীরিক কাজে বেশী দক্ষিণা। ছেলেও যদি বাড়ির বাগান পরিষ্কার করে, তা বলে বাবার কাছ থেকে মজুরির টাকা চায়। ঘর মোছা, বাসন মাজার জন্য আমিও জয়তীদির কাছ থেকে বেশ মোটা মাইনে দাবি করতে পারি! তা হলে আমার চিন্তা কী, পরবর্তী বেড়াবার খরচটাও এইভাবে তুলে ফেলা যাবে!

॥ ১২ ॥

জয়তীদিকে যাদবপুরের ছাত্রী অবস্থায় যে-রকম দেখেছিলুম, এখনো চেহারাটা ঠিক সেই রকমই আছে। ছিপছিপে লম্বা তন্বী, ঠোঁটে সব সময় একটা চাপা হাসির ভাব, জীবনটাকে যেন উনি একটা কৌতুক হিসেবে নিয়েছেন। সাহেবদের দেশে প্রবাসী হয়ে আছেন প্রায় চোদ্দ-পনেরো বছর, উনি যখন মাঝে মাঝে দেশে বেড়াতে আসেন, তখন সবাই ওঁকে দেখে অবাক হয়। ইওরোপ-আমেরিকার খাদ্যে এখন এত বেশী প্রোটিন আর দুধ-মিষ্টির আধিক্য যে সকলেরই ধাত মোটা হয়ে যাবার দিকে। সাহেব মেমদের মধ্যে এত বেশী মোটা মোটা চেহারা আগে দেখা যেত না। এমনকি অনেক তরুণ-তরুণীর চেহারাও ভীম ভবানী বা হামিদা বানুর মতন। চেহারা ঠিক রাখার জন্য এখন ওরা শুরু করেছে জগিং, অর্থাৎ আস্তে আস্তে দৌড়োনো। সকাল নেই, দুপুর নেই, রাত নেই দেখা যাবে কোনো নির্জন রাস্তায় একজন নিঃসঙ্গ মানুষ আপন মনে ছুটে চলেছে! অনেক সময় এমনও দেখা যায়, কোনো অফিসের বড় সাহেব লাঞ্চ আওয়ারের বিরতির সময় কোট-প্যান্ট-টাই খুলে একটা গেঞ্জি আর জাঙ্গিয়া পরে নিয়ে ছুটতে বেরিয়ে গেলেন!

অনেক বাড়িতে গেলেই খাওয়া সম্পর্কে একটা আতঙ্কের ভাব দেখা যায়! এটা খাবো না, ওটা খাবো না! খেলেই ওজন বৃদ্ধি। অথচ কোনো রকম বাড়াবাড়ি না করেই জয়তীদি ফিগারটি রেখেছেন বেতস লতার মতন। অবশ্য মানিকদাও যেমন রোগা সেই রকম লম্বা। মানিকদার খাদ্য হচ্ছে দুটি কফি আর সিগারেট, দিনে প্রায় তিরিশ কাপ কালো কফি আর পঞ্চাশ-ষাটটা সিগারেট। মাঝে দু'একদিন জয়তীদির অনুরোধে মানিকদা সিগারেট একটু কমালেন, তখন কফি আর সিগারেট সমান হয়ে গেল, দুটোই পঁয়ত্রিশ!

ওঁদের দুই মেয়ে, জিয়া আর প্রিয়া। জিয়ার বয়েস এগারো, সে ইংরিজিতে কবিতা লেখে, পিয়ানো বাজায় এবং বাংলা ভোলেনি। কিন্তু প্রিয়ার বয়েস মাত্র ছয় হলেও তার ব্যক্তিত্ব অনেক বেশী, বাড়িতে তার উপস্থিতি সে কক্ষনো

অন্যদের ভুলতে দিতে চায় না। তার প্রতি কারুর অমনোযোগী হবার উপায় নেই। দুই বোনে কখনো ঝগড়া হলে ছোট বোনটিই প্রত্যেকবার জেতে এবং বড় বোনটি কেঁদে ফেলে। প্রিয়াও কবিতা লেখে। পিয়ানো বাজায়, বাংলা সে বলতে ভুলে গেলেও বুঝতে পারে সবই এবং তার মধ্যে অলিম্পিক-বিজয়িনী বালিকা-জিমনাস্ট হবার সব রকম সম্ভাবনাই আছে।

এসব দেশে যেমন ভালো টাকা রোজগার করা যায়, সেই রকম খাটতেও হয় প্রচণ্ড। ফাঁকি দেবার কোনো উপায় নেই। হঠাৎ ছুটি নেবার উপায় নেই। সারা সপ্তাহ সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত কারুর প্রায় নিঃশ্বাস ফেলারও সময় নেই বলা যায়। সবাই তাকিয়ে থাকে শনি-রবিবারের জন্য। সে ছুটির দিন দুটো ফুরিয়ে যায় দেখতে দেখতে, কারণ তখন সারতে হয় সারা সপ্তাহের জমে থাকা বাড়ির কাজ।

এ দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদেরও ফাঁকি দেবার কোনো পথ নেই। কারণ পড়াশুনোর খরচ খুব বেশী। আমাদের মতন সবাই তো আর ঢালাও ভাবে বি-এ, এম-এ ক্লাসে ভর্তি হয়ে যায় না। স্কুল-ফাইনালের সমতুল্য পড়া শেষ করলেই একটা কিছু চাকরি পাওয়া যায়। কোনো দোকান-কর্মচারি কিংবা ট্রাক-ড্রাইভারের উপার্জন কোনো অফিস-কেরাণির চেয়ে কম নয়। গ্রে-হাউণ্ড বাসের ড্রাইভারদের তো রীতিমতন ভারিক্কী অফিসার অফিসার মনে হয়। সুতরাং উচ্চ শিক্ষার ইচ্ছে যদি থাকে কারুর, তাকে বেশ টাকা খরচ করে কষ্ট করে পড়তে হবে। যেহেতু এদেশের ছেলে-মেয়েরা বাবা-মায়ের কাছ থেকে টাকা নেয় না, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার খরচ জোগায় নিজের রোজগারে, সেই জন্য তারা জানে, একটা টার্মে ফেল করলে, পরের টার্মের জন্য তাকেই আবার টাকা জোটাতে হবে, তাই সে দিন-রাত পড়াশুনো করে তাড়াতাড়ি পাশ করার চেষ্টা করে।

উচ্চ শিক্ষার কোনো বয়েস নেই এদেশে। আর্থিক কারণে কেউ পড়াশুনো ছেড়ে দিয়ে দু'পাঁচ বছর বাদে আবার শুরু করতে পারে। চাকরিতে উন্নতির কারণে যোগ্যতা অর্জনের জন্যও অনেকে মাঝ বয়েসে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্স নেয়। পঁযট্টি বছরের কোনো ঠাকুমার হঠাৎ মনে হলো, জীবনে ভালো করে অঙ্কটা শেখা হয়নি, এখন শিখলে কেমন হয়? তিনি নিয়ে নিলেন একটা অঙ্কের কোর্স। কিংবা কেউ হয়তো যৌবন বয়সে পড়াশুনো অসমাপ্ত রেখে চাকরি বা বাণিজ্যে ঢুকে পড়েছিলেন, তারপর জীবনে টাকা পয়সা রোজগার হয়েছে অনেক, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি নেওয়া হয়নি বলে মনে একটা ক্ষোভ থেকে গেছে, সেইজন্য পরিণত বয়েসে আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হয়ে গেলেন।

অবশ্য সবাইকেই কলেজে গিয়ে নিয়মিত ক্লাস করতে হয় না। তার জন্য আছে মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়। এখানে চিঠিপত্রে কিংবা টেলিফোনেও পাঠ নেওয়া যায়। বিজ্ঞান সম্মত পাঠ ব্যবস্থা আছে, পরীক্ষার মান সমান। মানিকদা এ রকমই একটি মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিভাগীয় প্রধান। তাঁর চাকরি, বলতে গেলে, ঘুমের সময়টুকু বাদ দিয়ে আর সব সময়ের জন্য। তিনি এ শহর ছেড়ে যখন তখন বাইরে চলে যেতে পারেন না, তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়কে জানিয়ে যেতে হবে। ইউনিভার্সিটিতে তিনি তো সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত কাটান বটেই, তা ছাড়াও তাঁর বাড়িতে যখন তখন তাঁর ছাত্র-ছাত্রীরা ফোন করে যে-কোনো প্রশ্নের উত্তর জানতে চাইতে পারে।

জয়তীদিরও এতদিন পরে পড়াশুনো করবার শখ হয়েছে। বিদেশে এসে প্রায় বারো বছর চুপচাপ থাকার পর উনি আবার ভর্তি হয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ে। আমি থাকতে থাকতেই জয়তীদির পরীক্ষা শুরু হলো। ওরে বাবা, সে কি পরীক্ষার পড়া সারা বাড়ি একেবারে তটস্থ। জয়তীদি শোবার ঘরে পড়ছেন, বসবার ঘরে পড়ছেন, রান্না ঘরে পড়ছেন, এমন কি বোধহয় বাথরুমে গিয়েও পরীক্ষার পড়া পড়ছেন। সন্ধের সময় একটু ঘুমিয়ে নিয়ে ঘড়িতে অ্যালার্ম দিয়ে রাত বারোটার সময় জেগে সারা রাত পড়াশুনো। অবশ্য জয়তীদির খাটুনি সার্থক, রেজাল্ট বেরুলে দেখা গেল উনি নব্বই-এর ঘরে নম্বর পেয়েছেন। জয়তীদিকে জিজ্ঞেস করলুম, আপনি ফার্স্ট হয়েছেন নিশ্চয়ই? উনি ফরাসী কায়দায় কাঁধে ঢেউ তুলে বললেন, কী জানি!

এ দেশে বেশীদিন থাকলে একাকিত্ব বোধ আসতে বাধ্য। সারা সপ্তাহ কাজ, আর শুধু নিজের পরিবারের মধ্যে আবদ্ধ থাকা। এর মধ্যেই আনন্দের উপকরণ সংগ্রহ করে নিতে হয়। জয়তীদি অধিকাংশ সময় নিজেকে ডুবিয়ে রাখেন গানের মধ্যে। রবীন্দ্র-অতুলপ্রসাদ সঙ্গীতের কত যে স্টক ওঁর গলায় তার ঠিক নেই। যখন তখন মুক্তোর মতন নিখুঁত সুরের কথাগুলো ওঁর কণ্ঠ থেকে ঝরে পড়ে। দীপকদারও খুব রেকর্ড কেনার শখ, একদিন হঠাৎ ঝাঁ করে ঋতু গুহর নতুনতম এল পি খানা কিনে নিয়ে এলেন। সেদিন বাইরে বর্ষা, পাশে চায়ের সঙ্গে মুড়ি-বাদাম-কাঁচা লঙ্কা, তার সঙ্গে ঋতু গুহর গলার গান শুনতে শুনতে ভুলে যাই ক্যানাডায় না কলকাতায় আছি।

এরকম মাঝে মাঝে ভুলে যাওয়া যায়। কাছাকাছি, অর্থাৎ পনেরো-কুড়ি মাইলের মধ্যে বেশ কিছু বাঙালী আছেন। পনেরো-কুড়ি মাইল তো এদেশে কোনো দূরত্বই না, কুড়ি-পঁচিশ মিনিটের ব্যাপার। গাড়ি ছাড়া রাস্তায় ঘোরাঘুরির কথা কেউ চিন্তাও করে না। এ রকম দুপুরে জয়তীদির এক পিসতুতো

দিদি-জামাইবাবুরা থাকেন, সেখানে যাওয়া হয় মাঝে মাঝে। তাছাড়া আরও কয়েকটি বাঙালী পরিবারের সঙ্গে ওঁদের ঘনিষ্ঠতা আছে। এক এক সপ্তাহান্তে এক এক বাড়িতে আড্ডা বসে।

সব বড় শহরেই ভারতীয়দের ক্লাব আছে। ভাষার ব্যবধানের জন্য বাঙালী-গুজরাতি-পাঞ্জাবীদের আলাদা প্রতিষ্ঠানও থাকে। এড মাণ্টনের বেঙ্গলি ক্লাবের উদ্যোগে মাঝে মাঝে নাচ-গানের জলসা, থিয়েটার হয় নিজেদের, কখনো সখনো দেখা হয় বাংলা ফিল্ম্। বাচ্চাদের বাংলা শেখাবার জন্য একটা সানডে স্কুলও করেছেন এঁরা। অবশ্য যেখানে বাঙালী থাকবে, সেখানে যে দলাদলিও থাকবে, তা বলাই বাহুল্য। এঁর সঙ্গে ওঁর ঝগড়া, ইনি উপস্থিত থাকলে উনি আসবেন না, অমুকের স্ত্রী তমুক বাড়িতে গিয়ে অন্য একজনের নামে কী যেন বলেছে, এরকম টিপিক্যাল বাঙালী ব্যাপারও যে এখানে বেশ সচ্ছন্দে প্রবাহিত, তা দু'দিন থেকেই টের পেয়ে যাই।

দীপকদাদের বিশিষ্ট বন্ধু বিমল ভট্টাচার্য ওসব সাতে পাঁচে নেই। প্রথম দিন আলাপেই উনি আমাকে একটা বিড়ি উপহার দিলেন। অতি দুর্লভ বস্তু। গত বছর দেশ থেকে এক বাণ্ডিল বিড়ি এনেছিলেন, তার মধ্যে শেষ দুটি মাত্র বাকি ছিল।

এর পর থেকে উনি ক্রমাগত নানা রকম জিনিস উপহার দিয়ে যেতে লাগলেন। দেশলাই-এর ছদ্মবেশে রেডিও, কলমের ছদ্মবেশে লাইটার কিংবা আলপিনের মধ্যে ঘড়ি, এইসব জিনিস ওঁর খুব পছন্দ। অতদিন দেশ ছাড়া, তবু চেহারায়/পোশাকে ও ব্যবহারে উনি একেবারে মজলিশী বাঙালী। ওঁর স্ত্রী মীরার মুখখানি সব সময় হাসিতে ঝলমলে আর অফুরন্ত প্রাণশক্তি। দারুণ রান্না করেন, আর সবাইকে ডেকে ডেকে খাওয়াতে ভালোবাসেন। রাত দুপুরে একদল ছেলে যদি ঘুম ভাঙ্গিয়ে তুলে ওঁকে বলেন, মীরাদি, আপনার হাতের খিচুড়ি খেতে খুব ইচ্ছে করছে, উনি অমনি ঝাঁ করে খিচুড়ির সঙ্গে আরও নানান পদ রেঁধে ফেলবেন।

ওদের আর এক বন্ধু দিলীপ চক্রবর্তী, যিনি আমাকে উত্তর মেরুর রুই মাছ খাইয়েছিলেন, তিনি একটু স্বভাব-লাজুক। মানুষটি অতি মাত্রায় ভদ্রলোক। তাঁর স্ত্রী পর্ণার যেমন মিষ্টি স্বভাব, তেমনই রান্নার হাত। দেশে থাকলে এই সব মহিলারা অতি উচ্চপদস্থ অফিসারের স্ত্রী হিসেবে গণ্য হতেন। কোনোদিন রান্না ঘরে ঢুকতেন কিনা সন্দেহ, সংসারের ভার থাকতো ঠাকুর-চাকরের ওপর। কিন্তু এখানে যেহেতু সবাইকেই নিজের হাতের রান্না করতে হয়, সেইজন্য রান্নার নানা রকম এক্সপেরিমেন্ট করতে করতে হাতটি অতি সুস্বাদু হয়ে যায়। জয়তীদিও

ছানার সন্দেশ বানাতে জানেন। দেশে থাকতে আমি যত না মিষ্টি খেয়েছি, তার চেয়ে বেশী মিষ্টি খেতে হয়েছে এখানে এসে। যে-কোনো বাড়িতে গেলেই সন্দেশ-রসগোল্লা খেতে হয়, সবই বাড়িতে তৈরি।

একটু দূরে থাকেন ডাক্তার মিহির রায়। ছিমছাম পরিচ্ছন্ন ধরনের মানুষ। তাঁর স্ত্রী সুপর্ণাও খুব সপ্রতিভ আর হাসি খুশী মহিলা। ওঁদের বাড়িতে একদিন নেমন্তন্ন খেতে গিয়ে ডাক্তার রায় অনেক পুরোনো পুরোনো বাংলা গানের রেকর্ড বাজিয়ে শোনালেন। সেই সন্ধ্যায় সেই ঘরের আবহাওয়া যেন পুরোপুরি কলকাতার হয়ে গেল। কিংবা বড় জোর বলা যায় শিলং কিংবা পুণা।

দীপকদা, বিমলবাবু আর দিলীপবাবু এক সঙ্গে হলেই তাস খেলতে বসেন। ব্রীজ। আমার অনেকদিন তাস খেলার অভ্যেস নেই, বিদ্যেটা একটু ঝালিয়ে নিয়ে ওঁদের পার্টনার হতে লাগলুম প্রায়ই। অনেক বাড়িতে যেমন একটা বেকার গলগ্রহ ভাগ্নে বা ভাইপো থাকে, আমার অবস্থা প্রায় সেই রকম। দীপকদা-জয়তীদিদের বাড়িতে আশ্রিত হয়ে আছি, ওঁদের যেখানে যেখানে নেমন্তন্ন হয়, আমিও সেখানে সেখানে ওঁদের সঙ্গে যাই, অনেকে চোখের ইশারায় জিজ্ঞেস করে, এ আবার কে?

দীপকদা আমাকে ছাড়ছেনও না, আর এখানে আমার কিছু করবারও নেই। সারাদিন ফাঁকা বাড়িতে শুয়ে বসে বইটই পড়ি, কারণ একা একা শহরে ঘুরে বেড়াবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। সন্ধেবেলা ওঁরা বাড়ি ফিরলে কিছুক্ষণ আড্ডা হয়।

এখানে বাঙালীদের আর একটি মিলন-উপলক্ষ্য হলো হিন্দী ফিলম। ভিডিও ক্যাসেটে সমস্ত হিন্দী ফিলম পাওয়া যায়, এমনকি যে-সব ছবি এখনো ভারতে রিলিজ করেনি, সেইসব টাটকা ছবিরও। কিছু কিছু দক্ষিণ ভারতীয় ফিলমেরও ক্যাসেট পাওয়া যায় কিন্তু বাংলা ফিলমের এখনো সে সৌভাগ্য হয়নি। এই ক্যাসেটগুলো কেনারও দরকার নেই, ভাড়া পাওয়া যায় সব জায়গায়, তাও ক্রমশই বেশ সস্তা হয়ে যাচ্ছে, যেমন ধরা যাক এক ডলার! বাড়ি থেকে বেরুতে হবে না, ঘরে বসেই ভি সি আর-এ দেখা যাবে পুরো একটা ফিল্ম। সিনেমা যেহেতু একা দেখে সুখ নেই তাই শুক্কুর-শনিবার রাত্তিরে কোনো না কোনো বাড়ি থেকে ডাক আসে, এই আমার বাড়িতে শিলশিলা এসেছে চলে এসো! কিংবা ইয়ারানা কিংবা এক দুজে কে লিয়ে কিংবা কাতিলোঁ কি কাতিল! মার-দাঙ্গা-কান্নাকাটি-নাচ-গান-প্রেম-বিরহ-স্নেহ-প্রতিহিংসা ইত্যাদি সব কিছুই থাকে প্রত্যেক ফিলমে।

এই রকম ডাক এলে দীপকদাদের সঙ্গে আমিও চলে যাই। কয়েক সপ্তাহ

পরেই আমি আবিষ্কার করলুম, যে-আমি দেশে থাকতে কক্ষনো ঐ সব সিনেমা দেখি না, সুদূর ক্যানাডায় এসে সেই আমি রীতিমতন হিন্দী-সিনেমার ফ্যান হয়ে গেছি। অন্যদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে ধর্মেন্দ্রর ও অমিতাভ বচ্চনের তুলনামূলক আলোচনা করছি!

॥ ১৩ ॥

মাঝে মাঝে আমি ভাববার চেষ্টা করি, এইসব দেশের সঙ্গে আমাদের দেশের কোথায় কোথায় মিল।

একটু ফাঁকা জায়গা দিয়ে গাড়ি করে যেতে যেতে মনে হয়, এখন অনায়াসেই ভাবতে পারি যে নিজের দেশেরই কোনো জায়গা দিয়ে যাচ্ছি। আকাশ তো একই রকম, দূরের মাঠও একই রকম। গাছ পালার, চেহারা একটু আলাদা হলেও কিছু আসে যায় না, কাশ্মীর বা শিলং-এর গাছ আর পুরুলিয়া-বর্ধমানের গাছও তো আলাদা। রাস্তার পাশে খানা-ডোবা দেখলে আমার বড্ড আনন্দ হয়, খুব চেনা লাগে। নোংরা জলের সে রকম খানা-ডোবা এদেশে একেবারে দুর্লভ নয়।

কিন্তু তফাৎ আসলে অনেক। পৃথিবীর এপিঠ আর ওপিঠ, তফাৎ হবে না?

যে-কোনো বাড়ি দেখলেই মনে পড়ে যায়, অন্য দেশে আছি। খুব বরফ পড়ে বলে কোনো বাড়িরই ছাদ সমতল নয়। এ দেশের সাধারণ লোকের বসত বাড়ি একতলা বা দোতলা এবং প্রায় পুরোটাই কাঠের তৈরি, এইসব বাড়ির ছাদ সমতল হলে ওপরে বরফ জমে ছাদ ভেঙে পড়বে। এরকম চুড়োওয়ালা বাড়ি আমাদের দেশের শৈল নিবাসগুলিতে কিছু কিছু চোখে পড়লেও সেগুলোকে আমরা সাহেবী বাড়ি বলেই জানি।

বাড়ির পরেই গাড়ি। এতরকমের গাড়ি তো আমাদের দেশে দেখবার উপায় নেই। এক জায়গায় যদি তিরিশটা গাড়ি থেমে থাকে, তবে তিরিশটাই আলাদা মডেলের। গাড়িগুলি চলে নিঃশব্দে, ভেতরে বসে থাকলে তো কোনো আওয়াজই পাওয়া যায় না, আর প্রায় প্রতিটি গাড়িই শীততাপ নিয়ন্ত্রিত। গাড়িতে হর্ন থাকে একটা অলঙ্কার হিসেবে, কেউ হর্ন বাজায় না। দৈবাৎ কারুর হর্নে হাত লেগে গেলে সে লজ্জায় জিভ কাটে। কোনো গাড়ির পিছনে হর্ন দেওয়া মানে তাকে প্যাঁক দেওয়া। একমাত্র যারা নতুন বিয়ে করে চার্চ থেকে বেরোয়, তখন তারা প্যাঁ প্যাঁ করে হর্ন বাজাতে বাজাতে যায়। সে রকম ভাবলে আমাদের দেশের প্রত্যেকটি গাড়িই নতুন বিবাহিতদের।

এরা পৃথিবীর প্রায় সব দেশের গাড়ি কেনে। যার যে-রকম গাড়ি পছন্দ তা কিনতে বাধা নেই। আমাদের ভারতবর্ষে যে বিদেশী গাড়ি নিষিদ্ধ তার জন্য আমাদের গর্ব হবার কথা। আমরা নিজেদের গাড়ি বানাই, এশিয়ার অনেক গরীব দেশ মোটর গাড়িতে স্বনির্ভর নয়। বেশ ভালো কথা। কিন্তু এদেশের লোকরা যখন জিজ্ঞেস করে, তোমাদের গাড়ি দিন দিন খারাপ হচ্ছে কেন, তখন উত্তর খুঁজে পাই না। আমরা অনেকেই বলি, পুরোনো মডেলের অ্যাম্বাসাডর কিংবা ফিয়াট এখনকার নতুন গুলোর তুলনায় অনেক ভালো। এদেশের বিচারে এটা অত্যন্ত অদ্ভুত। যন্ত্রপাতির জিনিস তো দিন দিন আরও উন্নত, আরো ভালো হবার কথা! আমাদের দিশি গাড়িগুলোর কলকব্জা দিন দিন নিকৃষ্ট হচ্ছে আবার দামও বেড়ে যাচ্ছে। এদের গাড়ি দিন দিন উন্নত মানের ও বেশী আরামদায়ক হচ্ছে, সেই তুলনায় দামও কমছে। জাপানী গাড়ির সস্তা দামের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে তো আমেরিকায় গাড়ি-কোম্পানিগুলির ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা। জাপান না হয় শিল্প-জাদুকরদের দেশ, কিন্তু শুনছি ছোট্ট দেশ উত্তর কোরিয়া আরও সস্তা আরও মজবুত গাড়ি নিয়ে এখানকার বাজারে ধেয়ে আসছে। তবে কেন ভারতীয় গাড়ি এখানকার রাস্তা দিয়ে চলবে না?

চালককে সাবধান করে দেবার জন্য এখানকার গাড়িতে নানা রকম শব্দ হয় ও আলো জ্বলে ওঠে তো বটেই, কোনো কোনো গাড়ি আবার কথাও বলে। কেউ হয়তো ব্যাক লাইট না নিভিয়ে ভুল করে নেমে পড়ছে, অমনি গাড়ি বলে উঠলো, ওগো প্রিয়, তুমি যে বাতি নেভাতে ভুলে গেছ! নিভিয়ে দিয়ে যাও, লক্ষ্মীটি! তাও পুরোনো স্ত্রীর মতন ঘ্যানঘ্যানে গলায় নয়, নতুন প্রেমিকার মতন সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরে!

গাড়ির পরে রাস্তা। ভালো রাস্তা যে আমাদের দেশে নেই তা নয়, চওড়া রাস্তাও কিছু কিছু আছে, কিন্তু মাইলের পর মাইল, একশো, দুশো, পাঁচশো, হাজার মাইল একই রকম মসৃণ বিশাল রাস্তার কথা কি আমরা কল্পনা করতে পারি? একটাও ট্রাফিক লাইটে থামতে হবে না এই রকম ভাবে এক শো দুশো মাইল চলে যাওয়া যায়। শহরের বাইরে সব রাস্তায় যাওয়া-আসার পথ আলাদা। দু'দিকে চারটে চারটে আটটা গাড়ি চলতে পারে, এমন রাস্তা উত্তর-আমেরিকা মহাদেশটাকে আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে।

দেখে শুনে মনে হয়, এদেশে গাড়ি চালানো খুব সহজ। এত সহজ বলেই বোধহয় এদেশে গাড়ি দুর্ঘটনা হয় বেশি।

পুরো দেশটাই গাড়ি নির্ভর। ছুতোর মিস্ত্রি, কলের মিস্ত্রি-পোস্টম্যান-স্কুল শিক্ষক এমনকি অনেক ছাত্র-ছাত্রীরও নিজস্ব গাড়ি আছে। যে-কোনো লোক

তার দু'তিন মাসের মাইনে জমিয়ে বেশ ঝকমকে তকতকে একটা সেকেণ্ডহ্যাণ্ড গাড়ি কিনতে পারে। আর একেবারে নতুন গাড়িও কেনা যায় পাঁচ ছ' মাসের মাইনেতে। একটা পরিসংখ্যান দেখছিলুম, আমেরিকায় লোকের নিম্নতম আয় সাড়ে আট শো ডলার। ডলারকে টাকাই ধরতে হবে এদেশের মান অনুযায়ী। আমাদের দেশের গরীবদের কথা বাদ দিচ্ছি, কিন্তু ব্যাঙ্কের পিওন বা কয়লাখনির শ্রমিকের আয় ঐ রকমই টাকা। তারা গাড়ি করে ঘুরছে, এমন চিন্তা করা যায়? এদেশে কিন্তু আড়াই-তিন হাজার ডলারে বেশ চালু গাড়ি পাওয়া যায়। আর পরিসংখ্যান যাই বলুক, দোকান কর্মচারি বা ছুতোর মিস্তিরির রোজগার মাসে বারোচোদ্দ শ ডলারের কম নয়।

মনে করুন, আপনার বাড়ির জলের পাইপে গুরুতর গণ্ডগোল দেখা দিয়েছে। শীতের সময় কলে গরম জল না এলে কিংবা কমোডের ফ্ল্যাশ ঠিক মতন কাজ না করলে সারা বাড়িতে দারুণ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। আপনার বাড়ির নোংরা জল তো আর রাস্তায় যাবার উপায় নেই, তেমন হলে মিউনিসিপ্যালিটি এমন ফাইন করবে যে আপনার ঘটি-বাটি বন্ধক দিতে হবে। সুতরাং জলের পাইপ খারাপ হওয়া মাত্র আপনি ডাক্তারকে কল দেবার মতন টেলিফোনে কলের মিস্তিরিকে খবর দিলেন। মিস্তিরি মশাই যে-মুহূর্তে টেলিফোন ধরলেন, সেই মুহূর্ত থেকে তাঁর সময়ের হিসেব হবে। অবশ্য তিনি আসবেন ঝড়ের বেগে নিজস্ব গাড়ি হাঁকিয়ে, এসেই চটপট কাজ শুরু করে দেবেন। ধরা যাক, ঊনপঞ্চাশ মিনিট পর আপনার কল দিয়ে আবার ঝরঝর করে জল পড়তে লাগলো, আপনি সন্তুষ্ট হয়ে ঘাড় নাড়লেন। তখন মিস্তিরিমশাই পকেট থেকে ক্যালকুলেটর বার করে, ধরুন মিনিটে দেড় ডলার হিসেবে তাঁর মজুরি কত হয় তা হিসেব করে ফেললেন। আপনার সাড়ে তিয়াত্তর ডলার খসে গেল।

আপনার মনে হতে পারে, ওরে বাপ্‌রে, এত রেট কলের মিস্তিরির! তা তো হবেই, কারণ তিনি তো প্রত্যেকদিনই ঘন ঘন কল পান না। খরচ বাঁচাবার জন্য প্রত্যেকেই বাড়ির ছোটখাটো কাজ নিজের হাতে করে। মিস্তিরি মশাই হয়তো গড়ে মাসে তিরিশবার কল পান, সেইজন্যই তিনি উচ্চ রেট করে রেখেছেন, যাতে সমাজের আর পাঁচজনের মতন তিনিও সমান মর্যাদায় জীবন কাটাতে পারেন। কলের মিস্তিরির কাজ করেন বলে তিনি আর পাঁচজনের চেয়ে কোনো অংশে ছোট নন!

হাতি কেনা সহজ, কিন্তু তার প্রতিদিনের খাদ্য জোগাড় করাই যে আসলে বিরাট খরচের ব্যাপার, গাড়ির বেলাতেও সেইরকম তেল। ভারতে দিন দিন তেলের দাম আকাশ ছুঁচ্ছে, সেই তুলনায় এদেশে তেলের দাম অবিশ্বাস্য রকম

সস্তা। এক গ্যালন (সাড়ে চার লিটার) তেলের দাম পাঁচ সিকে থেকে একটাকা চল্লিশ পয়সার মধ্যে। এটা অবশ্য ডলারের হিসেব, টাকার হিসেবেও মাত্র এগারো-বারো টাকা! আমাদের দেশে যে ব্যক্তির আয় এক হাজার টাকা, সে যদি দেড় টাকায় পাঁচ লিটার পেট্রোল পেত, তাহলে নিশ্চয়ই ট্রাম-বাস এড়াবার জন্য যে-কোনো উপায়ে মরীয়া হয়ে একটা গাড়ি কিনে ফেলতো।

এদেশে তেল পাওয়া যায় দু'তিন রকম, লেডেড, আন লেডেড, সুপার লেডেড। গাড়ির তেল পোড়া ধোঁয়ায় স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয় বলে এরা এখন চিন্তিত। সেইজন্য গাড়ির যন্ত্রপাতি পাল্টানো হচ্ছে, তেলও শুদ্ধ করা হচ্ছে।

এখানে একজন অধ্যাপকের একটি চমৎকার সুদৃশ্য দোতলা বাড়ি আছে, তাঁর দুটি গাড়ি, একটি স্ত্রীর জন্য, একটি নিজের জন্য, দুটি টিভি, তার মধ্যে একটি বাচ্চাদের ভিডিও খেলার জন্য, ডিস ওয়াশিং মেশিন আছে। তিনি তিনটি মেয়েকে পড়াবার খরচ চালান। এর মধ্যে একজন তাঁর স্ত্রী। তা ছাড়া এই অধ্যাপকের প্রচুর বই ও রেকর্ড কেনবার এবং ছবি তোলা ও ভ্রমণের শখ আছে। এবং আমার মতন ভ্যাগাবণ্ড ঘুরতে ঘুরতে এখানে এসে পড়লে তিনি অম্লানবদনে দিনের পর দিন আশ্রয় দেন। অর্থাৎ আমি দীপকদার কথা বলছি।

এঁর সঙ্গে আমাদের দেশের অধ্যাপকদের তুলনা করলে নিশ্চয়ই দীর্ঘশ্বাস ফেলতে হবে। অবশ্য দীপকদা নিজের গাড়ি নিজেই ধোয়া মোছা করেন, বাড়ির বাগানের ঘাস কাটেন, বাড়ি রঙ করার সময় নিজেই ব্রাস আর রঙ নিয়ে বাড়ির ছাদে উঠে যান এবং একদিন অন্তর অন্তর বাড়ির বাসন পত্তর মাজেন। আমাদের দেশের অধ্যাপকরা করেন এসব কি কাজ?

****

হঠাৎ দেশ থেকে জয়তীদির মেজদি এসে উপস্থিত হলেন।

এঁরও চেহারা বেশ ছিপছিপে, তবে জয়তীদির মতন অতটা নন। চোখে চশমা, দারুণ ছটফটে। ভদ্রমহিলার চশমা দিনে অন্তত দশবার হারায়। সারা বাড়ির লোক চশমা খোঁজায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে। প্রতি এক ঘণ্টা-দু ঘণ্টা অন্তরই মেজদি সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে অসহায় মুখ করে বলবেন, এই, আমার চশমাটা কোথায় রেখেছি? অমনি আমরা সবাই বেসমেণ্ট থেকে রান্নাঘর পর্যন্ত সব জায়গায় চশমা খুঁজতে শুরু করি। কখনো হয়তো মেজদির চশমা চোখেই আছে, তবু দীপকদা মজা করে জিজ্ঞেস করেন, মেজদি, আপনার চশমা? অমনি তিনি ব্যস্ত হয়ে বলে ওঠেন, তাই তো, কোথায় রাখলুম এই মাত্র?

মানুষের নাম ভুল করার ব্যাপারেও জুড়ি নেই মেজদির। আমার সংক্ষিপ্ত নীলু নামটির বদলে তিনি কখনো শম্ভু, কখনো মহেন্দ্র, কখনো ধনঞ্জয় ইত্যাদি কত নামেই যে ডাকেন, তার ঠিক নেই। আমি অবশ্য প্রত্যেকবারই সাড়া দিয়ে যাই।

জয়তীদির ব্যক্তিত্ব আছে খুব, তিনি ছটফট করেন না, তিনি তাঁর এই ভুলোমনা মেজদিটিকে সামলাবার চেষ্টা করেন সব সময়। এক এক সময় বোঝাই যায় না, ওঁদের দু'জনের মধ্যে কে বড় কে ছোট।

যাই হোক, এই মেজদি এসে পড়ায় বেশ জমে গেল। জয়তীদির পরীক্ষা হয়ে গেছে, তাঁর মেয়েদেরও ছুটি, দীপকদা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এক মাসের ছুটি নিয়েছেন, সুতরাং প্রায়ই নানান জায়গায় বেড়াতে যাওয়া শুরু হলো। কোনোদিন বাইরের হোটেলে খাওয়া, কোনোদিন সিনেমা, কোনোদিন দূরের কোনো শপিং মহল ঘোরাঘুরি।

এছাড়া সপ্তাহান্তে এর ওর বাড়ি নেমন্তন্ন তো লেগে আছেই।

এর মধ্যে একদিন একটা জিনিস দেখে চমৎকৃত হলুম।

দীপকদা জয়তীদি এই বাড়িটা বিক্রি করে আর একটা বড় বাড়ি কেনার কথা ভাবছেন। এদেশে ভাড়া বাড়িতে থাকা সাঙ্ঘাতিক খরচের, তার চেয়ে কিছু টাকা জমিয়ে বাড়ি কিনে ফেলা অনেক সহজ। অনেক রকমের ঋণ পাওয়া যায়, বাড়ি কিনলে ইনকামট্যাক্সের অনেক সুবিধে হয়। এদেশে যেমন লোকেরা ঘন ঘন গাড়ি বদল করে, সেইরকম কয়েক বছর অন্তর বাড়িও পাল্টায়। পুরোনো বাড়ি বিক্রি করে নতুন বাড়ি কেনার মধ্যে কী সব অঙ্কের ব্যাপারও আছে।

মেজদি আসার পর জয়তীদি নতুন বাড়ি দেখতে শুরু করলেন। আমিও ওঁদের সঙ্গী।

এমনভাবে যে বিক্রির জন্য বাড়ি সাজানো থাকে, তা কোনোদিন স্বপ্নেও ভাবিনি।

এখানে বাড়ি তৈরি ও বিক্রির নানারকম কম্পানি আছে। তারা বাড়ি তৈরি করে নিখুঁত ভাবে সাজিয়ে রেখে দেয়, ইচ্ছুক ক্রেতারা সেইসব বাড়ি ঘুরে ঘুরে দেখতে পারে। সেসব কী বাড়ি, দেখলে চোখ কপালে উঠে যায়।

কোনো কোনো পাড়ায় এরকম নতুন বাড়ি পর পর সাজানো আছে। এগুলোকে বলে শো-হাউজ। কোনো একটা বাড়িতে গিয়ে ঘণ্টা বাজালেই একজন কেউ দরজা খুলে দিয়ে অভ্যর্থনা করবে। তারপর সেই লোকটি বা ভদ্রমহিলাটি সঙ্গে ঘুরে ঘুরে সারা বাড়ি দেখাবে, অথবা, ইচ্ছুক ক্রেতারা নিজেরাই ইচ্ছে করলে যে-কোনো জায়গায় ঘুরে দেখতে পারে। সমস্ত বাড়িতে

কার্পেট পাতা, জানালায় রঙ মেলানো পর্দা, দেয়াল আলমারির রঙ ও ডিজাইন অনুযায়ী বিশেষ রকমের চেয়ার ও টেবিল, খাট, বিছানা। এমনকি বসবার ঘরে যেটা তাশ খেলার টেবিল, তার ওপরে রাখা আছে দু'সেট তাস, টেবিলে কাপ-ডিস ও টি পট, কোনো কোনো দেয়ালে ছবি পর্যন্ত। অর্থাৎ এই মুহূর্তে দাম চুকিয়ে দিয়ে যে-কেউ এক্ষুনি এই বাড়িতে বসবাস করতে পারে।

ঠিক যেন হলিউডের কোনো সিনেমার সেট, এক্ষুনি শুটিং শুরু হবে।

বাড়ি বিক্রি কম্পানির যে প্রতিনিধি সেখানে উপস্থিত, তাকে বললে যে-কোনো আসবাব বা কার্পেট-এর রঙ বদলে দেবার ব্যবস্থা করবে। দাম কী রকম? দাম বলবে, দেড় লক্ষ টাকা...আস্কিং। অর্থাৎ ঐ টাকা চাওয়া হলেও দরাদরির সুযোগ আছে।

বাড়িগুলো বাইরে থেকে প্রায় এক রকম দেখতে হলেও, প্রত্যেক বাড়িরই ভেতরের ব্যবস্থা আলাদা। কত রকম ডিজাইনই যে মন থেকে বার করতে পারে!

আমরা ঘুরে ঘুরে এরকম বেশ কয়েকটা বাড়ি দেখে ফেললুম। আমি নিজেই এমন ভাব করতে লাগলুম, যেন এক্ষুনি একটা বাড়ি কিনে ফেলতে পারি, নেহাৎ দোতলায় ওঠার সিঁড়িটা পছন্দ হচ্ছে না। কোনো বাড়ি দেখতে গিয়ে রক্ষয়িত্রীকে গম্ভীরভাবে জিজ্ঞেস করি, বাথরুমে পিংক রঙের বাথটবটা বেশ ভালোই লাগছে কিন্তু সনা বাথের ব্যবস্থা নেই?

আমরা কালো লোক হলেও এইসব বাড়ি কোম্পানির প্রতিনিধিরা আমাদের মোটেই অবজ্ঞা করে না, আমরা সত্যিই ক্রেতা কিনা তাতেও সন্দেহ করে না। ক্যানাডায় ভারতীয়রা বেশ সচ্ছল সম্প্রদায় হিসেবে পরিচিত।

কুড়ি পঁচিশটা বাড়ি দেখার পরও জয়তীদির বা তাঁর মেজদির একটাও বাড়ি পছন্দ হলো না। আমিও বাড়ি দেখে ক্লান্ত হয়ে গেলুম।

অতিথি কথাটার মানে বোধহয় এই যে, এক তিথির বেশী থাকে না। দীপকদার বাড়িতে আমার পনেরো দিনের বেশী কেটে গেছে। ইংরেজিতে একটা কথা আছে যত তোমার আতিথ্যকে লম্বা করবে, তত তোমার সমাদর কমে যাবে। কিংবা, আরও বলে, মাছ এবং অতিথি দু'দিন পরেই পচা গন্ধ ছাড়তে শুরু করে। সুতরাং এবার আমার কেটে পড়াই উচিত।

একদিন কাঁচুমাচু মুখ করে দীপকদাকে বললুম, দীপকদা...মানে...এবার তাহলে আমি যাই...আমার অন্য জায়গায় যাবার কথা আছে...যদি দয়া করে একটু এয়ারপোর্টে পৌঁছে দেন...।

দীপকদা বললেন পাগল নাকি! এক্ষুনি কোথায় যাবে? তোমায় কি আটকে

রেখেছি এমনি এমনি ? মেজদি এসে গেছেন, এবার আমরা অনেক দূরে বেড়াতে যাবো।

সত্যি সত্যি এর দু'দিন পরেই আমরা বেরিয়ে পড়লুম দূর পাল্লার ভ্রমণে।

॥ ১৪ ॥

আজ সকালে ছিলুম মিদ্‌নাপুরে, কাল দুপুরে চলে গেলুম ম্যাড্রাসে। এমনিতে শুনলে এমন কিছু আশ্চর্য মনে হয় না, কিন্তু এই মিদ্‌নাপুরের সঙ্গে মেদিনীপুরের কোনো সম্পর্ক নেই, আর ঐ ম্যাড্রাস আমাদের ম্যাড্রাস থেকে প্রায় চোদ্দ-পনেরো হাজার মাইল দূরে।

ক্যানাডার ক্যালঘেরি শহরের একটা অঞ্চলের নাম মিদ্‌নাপুর। কেন ঐ নাম তা কেউ জানে না। খুব সরল অনুমান এই যে বাংলার মেদিনীপুর জেলা থেকে কোনো সাহেব কোনো সময়ে ক্যানাডায় চলে গিয়ে বসতি নিয়েছিলেন, এবং মেদিনীপুরের প্রিয় স্মৃতি অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য সেই নামটিই রেখেছেন। এ রকম নাম অনেক আছে।

এই বিশাল দেশে এসে মুষ্টিমেয় শ্বেতাঙ্গরা নিশ্চয়ই প্রথমে দিশেহারা হয়ে গিয়েছিল। প্রায় কুমারী, উর্বর ভূমি, ভেষজ ও খনিজ সম্পদেও প্রকৃতি অকৃপণ। একটার পর একটা অঞ্চল দখল করতে করতে এগিয়ে নাম রাখার ব্যাপারে অভিযাত্রীরা খুব সমস্যায় পড়েছিল। প্রথম অভিযাত্রীদল যত বেশী যোদ্ধা ছিল, তত কল্পনা শক্তি তাদের ছিল না। তাই জায়গার নাম রাখার ব্যাপারে তারা অনেকসময় পূর্ব পরিচিত নামের সঙ্গেই একটা করে নিউ জুড়ে নতুন উপনিবেশ বানিয়েছে। যেমন নিউ ইয়র্ক, নিউ ইংল্যাণ্ড, নিউ অর্লিয়েন্স, নিউ হ্যাম্পশায়ার, ইত্যাদি। তারপর যার যা পরিচিত নাম এলোপাথারি বসিয়ে দিয়েছে। দিল্লি-বোম্বাই কলিকাতা-মাদ্রাজ এর নামেও শহর আছে উত্তর আমেরিকায়। কলকাতা নামে একাধিক জায়গা এখানে আছে শুনেছি। কিন্তু আমি নিজের চোখে দেখিনি বা যাইনি! মাদ্রাজ দেখেছি। এমনকি মস্কো নামের একটা শহরের পাশ দিয়েও আমরা গেছি। সেই শহরটি আইডাহো আর ওয়াশিংটন রাজ্যের সীমানায়।

এ রকম নতুন নাম এখনো হচ্ছে। এরই মধ্যে একদিন কাগজে পড়লুম, আচার্য রজনীশ ভারত থেকে বিতাড়িত হয়ে তাঁর দলবল সমেত আমেরিকার উত্তর অঞ্চলে একটা কলোনি করেছেন। তার নাম হয়েছে রজনীশনগর। স্থানীয় লোকেরা অবশ্য এই নতুন নাম পত্তনে আপত্তি জানিয়েছে, কাগজে চিঠি

লেখালেখি হচ্ছে যে আচার্য রজনীশ এবং তাঁর চ্যালারা ব্যভিচারী এবং কমুনিস্ট, সুতরাং তাদের কলোনিকে যেন শহরের মর্যাদা না দেওয়া হয়!

এডমান্টন থেকে বেরিয়ে আমরা প্রথমে এসে থেমেছিলুম ক্যালঘেরিতে। দুশো মাইলের কিছু বেশী দূরত্ব, সে রাস্তা দীপকদা মেরে দিলেন পৌনে তিন ঘণ্টায়।

দীপকদার দু'খানা গাড়ির মধ্যে একটি ছোট্ট ছিমছাম, অন্যটি ঢাউস। এই দ্বিতীয় গাড়িটিই নেওয়া হয়েছে। এ গাড়িতে ফার্স্ট ক্লাস, সেকেণ্ড ক্লার্স, থার্ড ক্লাস আছে। সামনের সীট অর্থাৎ ফার্স্ট ক্লাসে তিনজন বসতে পারে। সেকেণ্ড ক্লাসে চারজন। আর থার্ড ক্লাসে মুখোমুখি দু'সারি সীট, প্রয়োজনে সেগুলো তুলে দিলে দু'তিনজন বিছানা পেতে শুয়েও যেতে পারে।

অত যাত্রী নেই অবশ্য আমাদের। দীপকদা, জয়তীদি আর ওঁদের দুই মেয়ে জিয়া আর প্রিয়া। এ ছাড়া জয়তীদির মেজদি, শিবাজী রায় নামে আর একজন যুবক আর আমি তো আছিই।

ক্যালঘেরিতে একদিন থামা হলো। কারণ এখানে মেজদির ঘনিষ্ঠ বান্ধবী থাকেন একজন। কলকাতায় যিনি এষা মুখার্জি নামে খ্যাতনাম্নী ছিলেন, তিনি এখানে এসে হয়েছেন এষা চৌধুরী। এষা দেবীর মুখ দিয়ে সর্বক্ষণ কথার ফুলঝুরি ছোটে আর সর্বক্ষণ মুগ্ধ হয়ে তা শুনতে ইচ্ছে করে। মেয়েদের মধ্যে এ রকম 'কথা-শিল্পী' কদাচিৎ দেখা যায়। ওঁর স্বামী শ্যামলবাবু মৃদুভাষী কিন্তু সুরসিক। মাঝে মাঝে টুকটুক করে এক আধটা মন্তব্য ছাড়েন। বান্ধবীকে পেয়ে এষা চৌধুরী দারুণ খুশী হয়ে হৈ চৈ এবং পার্টি লাগিয়ে দিলেন। সেই সুবাদে আমরাও বেশ খাতির যত্ন পেলুম।

ক্যালঘেরি শহরটি অতি মনোরম। পেট্রোলিয়ামের কল্যাণে দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি ঘটছে, এবং অদূর ভবিষ্যতে এখানে অলিম্পিক সংঘটনের জন্য শহরটি তৈরি হচ্ছে।

ক্যালঘেরি টাওয়ার একটি বিশাল উঁচু ব্যাপার, যার ওপরে উঠলে পুরো শহরটি দেখা যায়। এ শহরেও সত্তর-আশীতলা বাড়ির অভাব নেই। টাওয়ারটি তার চেয়েও উঁচু, এবং চূড়ায় যে রেস্তোরাঁটি রয়েছে, সেটি আস্তে আস্তে ঘোরে। অর্থাৎ এক জায়গায় টেবিল নিয়ে বসে খাবার খেতে খেতেই আমরা পুরো শহরের দৃশ্যপটটি উপভোগ করতে পারলুম।

এষা দেবী এত হাসি-খুশী মানুষ, তবু মাঝে মাঝে তাঁর খুব মন খারাপ হয়। এখানে মন টিকছে না। দেশে ফিরে যেতে ইচ্ছে হয়। আমাদের দেখে যেন দেশের জন্য আরও উতলা হয়ে উঠলেন। কিন্তু দেশে ফেরার অনেক বাস্তব

অসুবিধে আছে। শ্যামলবাবু যে বিষয়ের বিশেষজ্ঞ, সে ব্যাপারের উপযুক্ত চাকরি আমাদের দেশে বেশী নেই।

এষাকে আমাদের কলকাতার এক বিখ্যাত মহিলা নাকি বলে দিয়েছিলেন, দ্যাখ, যখন খুব মন খারাপ হবে, তখন রেফ্রিজারেটারের দরজা খুলে ভেতরটাতে তাকিয়ে থাকবি। ওসব তো আর দেশে ফিরে গেলে পাবি না! খুব ন্যায্য কথা। ওরকম খাঁটি দুধ, পাঁচ রকমের মাংস, পনেরো রকমের কেক প্যাসট্রি ইত্যাদি যা সব সময় সবার বাড়িতে মজুত থাকে, তা কলকাতায় পাওয়ার কথা চিন্তাও করা যায় না।

কিন্তু আমি ভাবলুম, উপনিষদের মৈত্রেয়ী যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, যা নিয়ে আমি অমৃত হবো না, তা নিয়ে আমি কী করবো! আর কলকাতার মৈত্রেয়ী কি না বললেন, খাবার-দাবারের কথা? কালের কী বিচিত্র গতি! অবশ্য, ইস্কুল-কলেজের 'এসে'-তে ছেলেমেয়েরা অনেকেই মৈত্রেয়ীর ঐ উক্তির কোটেশান দেয় বটে, কিন্তু মৈত্রেয়ীর ঐ আদিখ্যেতার কথা শুনে যাজ্ঞবল্ক্য তার উত্তরে যে কী রকম কড়কে দিয়েছিলেন, তা অনেকেই জানে না। জানাবার দায়িত্বও আমার নয়। সুতরাং একালের মৈত্রেয়ী যাজ্ঞবল্ক্য-এর মতন সঠিক জ্ঞানের কথাই বলেছেন বটে। রবীন্দ্রনাথও লিখেছেন, "জেনো, বাসনার সেরা বাসা রসনায়"!

ক্যালঘেরি থেকে বেরুবার পরই আমাদের সত্যিকারের যাত্রা শুরু হলো। বলতে গেলে নিরুদ্দেশ যাত্রা।

আমাদের শেষ পর্যন্ত একটা লক্ষ্যস্থল আছে বটে, কিন্তু কোন্ পথে কিংবা কবে সেখানে পৌঁছোবো, তার ঠিক নেই। অনেকগুলো ম্যাপ সঙ্গে নেওয়া হয়েছে। নেভিগেটারের দায়িত্ব প্রথমে শিবাজী রায় নিয়েছিলেন যদিও, কিন্তু একদিন পরেই আমরা সর্বসম্মতিক্রমে তাঁকে পদচ্যুত করলুম, সে দায়িত্ব নিলেন জয়তীদি। তাঁর যেমন তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, তেমনি চোখ সজাগ। এ সব রাস্তায় একবার ডানদিক বা বাঁ দিক ঘুরতে ভুল করলেই পঞ্চাশ-একশো মাইল ঘোরপথের ধাক্কা। নেভিগেটার হওয়ার বদলে শিবাজী রায় মজার কথা বলে আমাদের আনন্দ দেবার ভার নিলেন। আমার ওপর ভার রইলো, যথা সময়ে কফি কিংবা আপেল খাওয়ার কথা মনে করিয়ে দেওয়া আর মেজদির চশমা খোঁজার। চলন্ত গাড়িতেও সেই মহিলা ঘণ্টায় দু'বার করে চশমা হারাতে লাগলেন।

ব্রিটিশ কলাম্বিয়ার নাম বাল্যকালে ভূগোলে পড়েছি শুধু। সেই রাজ্য ধরে এখন চলেছে আমাদের গাড়ি। পথের দু'পাশে জঙ্গলময় পাহাড়। এগুলোই বোধহয় রকি মাউন্টেনস। এদিকে জনবসতি খুবই কম। তবে আধ ঘণ্টা, এক

ঘণ্টা পর পরই এসে যাবে গ্যাস স্টেশন, খাবার জায়গা, রাত্রি বাসের জন্য মোটেল।

পথ দিয়ে যেতে যেতেই রাস্তার দু'ধারে অনবরত নির্দেশ দেখা যাবে, আর কত মাইল দূরে গ্যাস স্টেশন। সেখানে কী কী সুযোগ-সুবিধে আছে। মোটেল আছে কি না। এদেশের রাস্তাটাই যেন একটা শিল্প। এই শিল্পকে নিখুঁত করার জন্য এদের যত্নের অন্ত নেই।

আরও একটা চমৎকার জিনিস আছে রাস্তার ধারে ধারে। তার নাম রেস্ট এরিয়া। গাড়ি চালাতে চালাতে যদি কখনো ক্লান্তি বা একঘেয়েমি আসে তার জন্য এই বিশ্রামের ব্যবস্থা রয়েছে। তরু ছায়াময় একটি চমৎকার নিরিবিলি জায়গা, সেখানে রয়েছে বসার জায়গা, পানীয় জল, বাথরুম, আর টেলিফোনের ব্যবস্থা। সবই বিনা পয়সায়। গাড়ি থামিয়ে সেখানে যতক্ষণ খুশী আলস্য করা যায়। সঙ্গের খাবার-দাবার খেয়ে নেওয়া যায়। এই জায়গাগুলিকে দেখলে আমার ঠিক মরুদ্যানের কথা মনে হয়। চল্লিশ-পঞ্চাশ মাইল অন্তর অন্তর এ রকম একটি করে মরুদ্যান। এখানকার গাছগুলো অধিকাংশ ইউক্যালিপটাস, তাই বাতাসে চমৎকার সুগন্ধ।

সঙ্গে খাবার থাক বা না-ই থাক, খিদে বা তেষ্টা পেলে পছন্দমত খাবার জায়গা পেতে একটুও অসুবিধে নেই। পকেটের উত্তাপ অনুযায়ী নানা রকম পান-ভোজনালয়। যার পকেট গরম সে যদি ওয়াইন বা বীয়ার সহযোগে পাঁচ-সাত কোর্সের লাঞ্চ-ডিনার খেতে চায়, তারও ব্যবস্থা আছে। আবার সস্তায় চট্ করে কিছু একটা খেয়ে নেবার জায়গাও অসংখ্য। সস্তায় সবচেয়ে ভালো খাবারের দোকানের রাজা হলো ম্যাকডোনাল্ড। এদের দোকানের সংখ্যা যে কত লক্ষ তা বলা আমার পক্ষে অসাধ্য। যে-কোনো ছোট শহরেই একটা করে ম্যাকডোনাল্ড। আর আশ্চর্য ব্যাপার, এদের সব দোকানেই এদের খাবার একই রকমের ভালো, আর দামও এক। সুরা বা মদিরা বিক্রি করে না এরা, এদের মতন চমৎকার আলুভাজা ও কফি পাঁচতারার হোটেলগুলোও দিতে পারে না, আর এদের হ্যামবার্গারের স্বাদ তো জগৎ বিখ্যাত। এদের সব দোকানই দারুণ খোলামেলা, বাইরে ভেতরে প্রচুর বসবার জায়গা, সেই রকমই পরিচ্ছন্ন, ঝকঝকে, তকতকে। কাউন্টার থেকে নিজেদেরই খাবার আনতে হয়। এঁটো গেলাস-প্লেট খরিদ্দাররা নিজেরাই যথাস্থানে রেখে দিয়ে আসে। ম্যাকডোনাল্ডের তুল্য সস্তা, বিশুদ্ধ ও সুস্বাদু খাবারের দোকান আমাদের সারা দেশে একটাও নেই। এ দেশে ম্যাকডোনাল্ড তো কয়েক লক্ষ বটেই, তাছাড়াও ওদের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া 'বার্গার কিং' বা ঐ জাতীয় নামের আরও অন্যান্য কম্পানির দোকান

আরও কয়েক লক্ষ।

বৃটিশ কলম্বিয়া ছেড়ে আমরা ওয়াশিংটন প্রদেশের সীমানা দিয়ে ঢুকে পড়লুম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে।

এখানকার চেক পোষ্টে ইমগ্রেশন অফিসারটির বয়েস বাইশ-তেইশ বছরের বেশী নয়। প্রায় সাড়ে ছ' ফুট লম্বা হলেও মুখখানা একেবারে বালকের মতন। প্রথমে সে মন দিয়ে আমাদের ভিসা ইত্যাদি পরীক্ষা করলো, তারপর সন্তুষ্ট হতেই সে উচ্ছ্বসিত হয়ে আমাদের সঙ্গে খুব আন্তরিক ব্যবহার করতে লাগলো। কোন্ রাস্তা দিয়ে গেলে আমাদের পথ সংক্ষিপ্ত হবে, কোথায় রাত কাটানো বেশী আরামদায়ক, আর ক্যালিফোর্ণিয়ায় ঢোকবার সময় গাড়িতে কিন্তু আপেল-টাপেল জাতীয় কোনো ফল রেখো না, জানো তো মেড্ ফ্লাই (ভূমধ্যসাগরের মাছি) নিয়ে ওখানে কত ঝামেলা হচ্ছে। আমাদের গাড়ি ছাড়ার সময় সে হাতছানি দিয়ে আমাদের বিদায় জানালো পর্যন্ত। কোনো বিমানবন্দরে আমরা কক্ষনো এ রকম ভালো ব্যবহার পাই না। বিমান বন্দরের অফিসাররা যেন মানুষ নয়, সবাই এক একটি যন্ত্র।

আমেরিকা ও ক্যানাডার প্রাকৃতিক দৃশ্য প্রথম প্রথম এক রকম হলেও আমেরিকার ধরন-ধারণই যেন একটু আলাদা মনে হয়। রাস্তার নিয়ম কানুনের বেশ কড়াকড়ি। এখানকার হাইওয়েতে গতি সীমা পঞ্চান্ন মাইল মাত্র, সেটা সত্যি দুঃখের ব্যাপার। এখানকার গাড়িগুলো অশ্বশক্তির বদলে যেন বাঘ-শক্তিতে চলে, ঘণ্টায় একশো কুড়ি কি দেড়শো মাইল বেমালুম চলে যেতে পারে, সেই সব গাড়িকে পঞ্চান্ন মাইলের বল্গায় বেঁধে রাখার কোনো মানে হয়। এক দশক আগেও মার্কিন দেশের গাড়ি গড়ে সত্তর থেকে নব্বই মাইল গতিতে চলতো। কিন্তু মাঝখানে একবার তেল সংকটের সময় নাকি হিসেব করে দেখা হয়েছে যে, পঞ্চান্ন মাইল গতিতে চললেই গাড়ির তেল সবচেয়ে কম খরচ হয়। তা ছাড়া দুর্ঘটনার আশঙ্কাও কম।

গতিসীমা ভঙ্গ করলেই ফ্যাসাদ। জরিমানা, লাইসেন্স বাতিল থেকে কারাদণ্ড পর্যন্ত হতে পারে। মোড়ে মোড়ে ট্র্যাফিক পুলিশ থাকে না বটে কিন্তু হেলিকপটার, এরোপ্লেনে উড়ে উড়ে পুলিশ রাস্তার গাড়ির গতি মাপে। তা ছাড়া আছে র‍্যাডার যন্ত্র। এবং ভ্রাম্যমাণ পুলিশের গাড়িতো আছেই। নির্জন রাস্তায় ঝোপ ঝাড়ের আড়ালে মোটর বাইক চেপে লুকিয়ে থাকে পুলিশ, কোনো গাড়ি একটু নিরিবিলি দেখে নিয়ম ভঙ্গ করলেই এসে ক্যাঁক করে চেপে ধরবে।

গাড়ি চালাবার সময় মদ্যপান নিষিদ্ধ। এমন কি গাড়িতে ছিপিখোলা কোনো মদের বোতল রাখাও অপরাধ। যখন তখন পুলিশ এসে গাড়ি থামিয়ে চেক

করতে পারে। আগে থেকে মদ খাওয়া থাকলেও তিন পেগের বেশী হলেই ব্রিদালাইজার পরীক্ষায় ধরা পড়ে যাবে।

দীপকদা এই প্রসঙ্গে একটা মজার গল্প শোনালেন।

একবার তিনি এক পার্টি থেকে তাঁর এক বন্ধুর গাড়িতে ফিরছিলেন। সঙ্গে ছিলেন বন্ধুর স্ত্রী। মধ্যরাত্রি পেরিয়ে গেছে। বন্ধুটি বেশ খানিকটা হুইস্কি পান করলেও বেপরোয়া ভাবে ধরেছিলেন গাড়ির স্টিয়ারিং হুইল, ভেবেছিলেন ঠিক বাড়ি পৌঁছে যাবেন। গাড়িটা মাঝে মাঝে দু'একবার লগ্‌বগ্ করতেই হঠাৎ কোথা থেকে একটা পুলিশের গাড়ি প্যাঁ-পোঁ করতে করতে এসে ধরে পড়লো। একেবারে শেষ মুহূর্তে গাড়ি থামিয়ে বন্ধুটি বুদ্ধি খাটিয়ে চট্ করে নিজে স্টিয়ারিং থেকে সরে গিয়ে নিজের স্ত্রীকে বসিয়ে দিলেন সেই জায়গায়। যেন উনিই চালাচ্ছিলেন গাড়ি। ভদ্রমহিলার পায়ে তখন জুতো নেই, উনি গুটিশুটি মেরে ঘুমোচ্ছিলেন একটু আগে। সেই অবস্থাতেই কোনোক্রমে সামনে সপ্রতিভ হয়ে বসলেন।

পুলিশ ভদ্র মহিলাকে বললেন, নেমে এসো! তুমি বদ্ধ মাতাল অবস্থায় গাড়ি চালাচ্ছো।

ভদ্রমহিলা বললেন, বাজে কথা! আমি এক ফোঁটা খাইনি।

পুলিশ বললো, বটে! এই রাস্তার মাঝখানের লাইন দিয়ে এক শো গজ সোজা হেঁটে দেখাও তো!

ভদ্রমহিলা দিব্যি এক শো গজ সোজা হেঁটে দেখিয়ে দিলেন।

তখন সেই পুলিশ অফিসার তার টুপি ছুঁয়ে বললেন, লেডি, তুমি একটু আগে যে-রকম গাড়ি চালাচ্ছিলে, তাতে আমি দিব্যি গেলে বলতে পারি তুমি অন্তত দশ পেগ খেয়েছো। কিন্তু তোমার সহ্য করার ক্ষমতা আছে বটে। বাপস! তোমার ক্ষুরে ক্ষুরে দণ্ডবৎ!

তারপর পুলিশটি ভদ্রমহিলার মট্‌কা-মারা স্বামীকে ডেকে বললো, এই, তোমার লাইসেন্স আছে? দয়া করে তুমি তোমার এই ভয়ংকরী স্ত্রীটির বদলে নিজে গাড়ি চালাও!

গল্পটা শুনে আমরা হেসে উঠলুম। তারপর আমি জিজ্ঞেস করলুম। দীপকদা, গল্পটা তো খুব আপনার এক বন্ধুর নামে চালালেন। আসলে নিশ্চয়ই আপনার আর জয়তীদির অভিজ্ঞতা?

জয়তীদি হাসতে হাসতে বললেন, না, তখন আমি ছিলুম না, তার মানে তখনও আমাদের বিয়ে হয়নি। সেই আমলে ও-ও মাঝে মাঝে হুইস্কিতে টইটম্বুর হতো নিশ্চয়ই। নইলে বন্ধুর বদলে ও নিজে সেদিন গাড়ি চালায়নি কেন?

সত্যি এখানকার পুলিশের গাড়ি দেখলেই গা ছমছম করে। গাড়ির মাথায় লাল-নীল আলো সব সময় ঘোরে, আর পুলিশের গাড়ি যখন কারুকে তাড়া করে তখন এক সঙ্গে অনেকগুলো শিয়ালের ডাকের মতন শব্দ হয়। আর কি স্মার্ট চেহারা ও পোশাক এখানকার পুলিশদের, যেন আইন ভঙ্গকারীদের ধরাই ওদের ধ্যান জ্ঞান।

আমেরিকার রাজপথের প্যাট্রোল পুলিশকে কেউ কোনোদিন ঘুষ দিতে পেরেছে এমন কথা শুনিনি।

হয়তো আমরা কখনো অপূর্বসুন্দর এক হ্রদের পাশ দিয়ে যাচ্ছি, অন্য পাশে নানা রঙের গাছের সারি, হঠাৎ পাশ দিয়ে একটা পুলিশের গাড়ি যেতেই আমরা শিউরে উঠি। দৃশ্য উপভোগ করার বাসনা মাথায় উঠে যায়। যেন আমরা অপরাধী। এখানকার পুলিশদের অসীম ক্ষমতা, যে-কোনো ছোট জায়গার শেরিফ ইচ্ছে করলেই আমাদের বিনা বিচারে জেলে ভরে দিতে পারে।

দীপকদা একটু হাত খুললেই আমাদের গাড়িটা একেবারে উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারেন বটে কিন্তু অসীম ধৈর্যের সঙ্গে পঞ্চান্ন মাইলেই চালাচ্ছেন।

কিছু একটা হিসেবের ভুলে আমরা চলে গেলুম আইডাহো প্রদেশে। এখানে তো আমাদের যাবার কথা নয়। আমাদের পথ তো অরিগন রাজ্য দিয়ে, সেখানে স্পোকেন নামে মোটামুটি একটা বড় জায়গায় আমরা রাত কাটাবো ঠিক করেছি।

আইডাহো একটা পাণ্ডব বর্জিত দেশ বললেই হয়। শহর যেন নে-ই, শত শত মাইল ফাঁকা জায়গা। সন্ধের পর গা ছমছম করে। সবাই ঝুঁকে পড়ে ম্যাপ দেখতে লাগলুম, এ জায়গা ছেড়ে আমাদের অরিগনে ঢুকতেই হবে।

অন্যমনস্কভাবে দীপকদা বুঝি অ্যাকসিলারেটারে একটু জোরে চাপ দিয়ে ফেলেছিলেন, হঠাৎ দেখি মোড়ের মাথায় আলো জ্বেলে পুলিশের গাড়ি অপেক্ষা করছে আর আমাদের থামতে ইঙ্গিত করছে।

থামতে আমরা বাধ্য। বুক দুপ্ দুপ্ করছে। সবাইকে জেলে পাঠাবে? দীপকদার লাইসেন্স কেড়ে নেবে?

পুলিশ অফিসারটি বললো, তোমরা বাষট্টি মাইল স্পীডে গাড়ি চালাচ্ছিলে।

দীপকদা কাঁচুমাচু মুখ করে বললেন, হয়তো!

পুলিশটি বললো, হয় তো নয়, সত্যি।

তারপর গাড়ির মধ্যে উঁকি দিয়ে দেখলো আমাদের। খুব সম্ভবত ভারতীয় নারীদের দেখেই মন গলে গেল তার। সে বললো, ঠিক আছে এই তোমাদের ফার্স্ট ওয়ার্নিং দিয়ে ছেড়ে দিলুম, আর এরকম কোরো না!

॥ ১৫ ॥

গায়ে যদি জামা না থাকে
পায়ে যদি জুতো না থাকে
তা হলে কেউ খাবারও দেবে না!

প্রথম একটি দোকানের দরজার বাইরে এ রকম লেখা দেখে অবাক হয়েছিলুম। এর মানে কী? তা হলে আমাদের ঢুকতে দেবে তো?

কলকাতায় যেমন প্যান্ট-হাওয়াই শার্ট আর চটি পরে ঘুরে বেড়াই, এদেশে এসে এখনো সেই বেশ পরিবর্তনের কোনো প্রয়োজন বোধ করিনি। আমি টাই পরেছিলুম জীবনে মাত্র একবারই। বন্ধুদের কাছ থেকে গিঁট বাঁধা শিখে নিয়ে একদিন তো টাই পরে আয়নার সামনে দাঁড়ালুম। তারপর সাঙ্ঘাতিক চমকে উঠলুম। এ কে? আমার মনে হলো, আমি যেন আমার বাবা-মায়ের ছেলেই নয়, অন্য কেউ, মারামারির সিনেমায় খলনায়কের শাগরেদ! সেই যে টাই খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলুম, আর জীবনে ছুঁইনি। কত লোককে টাই পরলে কী সুন্দর দেখায়, শুধু আমাকেই কিনা অন্য লোকের মতন, তাও আসল খল-নায়ক নয়, তার শাগরেদের মতন!

টাই পরতে পারি না বলেই নিজের দেশে আমার ভদ্রগোছের কোনো চাকরিও জুটলো না। খোদ্ ইংলণ্ডেও বোধ হয় এখন অনেক ছেলে গলায় টাই না বেঁধে চাকরির ইন্টারভিউ দিতে যায়, কিন্তু ভারতবর্ষে তা হবার উপায় নেই। মৃণাল সেন একটা সিনেমায় এ ব্যাপার খুব ভালো দেখিয়েছেন!

আমি পারতপক্ষে মোজা আর শু-ও পরতে চাই না, চটি দিয়েই কাজ চালাই। অবশ্য তেমন ঠাণ্ডার জায়গায় গেলে পরতেই হয়।

আমাদের সঙ্গের শিবাজী রায় নামের যুবকটি বিলেত-আমেরিকায় আসবে বলে দামী নতুন বুট জুতো কিনে এনেছে। আর একেবারে নতুন জুতো আনলে যা হয় তাই হয়েছে, দুই গোড়ালিতে বিরাট ফোস্কা। তাকে তো চটি জুতো পরতেই হচ্ছে, তা ছাড়া গোড়ালিতে ব্যাণ্ডেজ।

সুতরাং দোকানের বাইরে যখন লেখা দেখি, 'নো শার্ট, নো শু, নো সার্ভিস', তখন আমাদের পা সম্পর্কে সচেতন হতে হয়। শু মানে তো আর চটি জুতো নয়। দেখাই যাক না কী হয়, এই ভেবে ঢুকে পড়া গেল। কেউ কোনো আপত্তি করলো না, কেউ আমাদের পায়ের দিকে তাকালোও না।

তা হলে 'নো শু' মানে খালি পা। 'নো শার্ট' মানে খালি গা? খালি গায়ে,

খালি পায়ে কেউ সাহেবদের দোকানে খেতে আসে ? একি আমাদের হরিদাসপুরের চায়ের দোকান ? কিন্তু সাহেবদের দেশে সবই সম্ভব। সত্তরের দশকে যখন এই দেশটা হিপিতে ভরে গিয়েছিল, তখন সেই সব ছেলেমেয়েরা প্রথমেই পা থেকে জুতো বর্জন করেছিল, তারপর ছেলেরা খুলে ফেলেছিল গায়ের জামা, এমনকি, প্রথম প্রথম টপ্‌লেসের যুগে, অনেক মেয়েও উর্ধ্বাঙ্গ কোনো পোশাকে ঢাকতো না।

হিপিদের যুগ প্রায় শেষ। খানিকটা সেই ফ্যাসান চলে যাবার জন্য। খানিকটা মরাল মেজরিটি এবং অন্যান্য সংস্থার দমননীতির জন্য। মার্কিন দেশের অভিভাবকশ্রেণী এখন ছেলেমেয়েদের সুপথে আনবার জন্য বদ্ধপরিকর। সেই জন্যই এরকম ব্যবস্থা।

ক্রমশ প্রায় দোকানের বাইরেই এই রকম নোটিশ চোখে পড়ে। বুড়ো সাহেব মেমরা দোকানে ঢোকবার আগে এই নিয়ে ঠাট্টাও করে। বুড়ি হয়তো তার স্বামীকে বললো, ডিয়ার, তুমি জুতো পরে এসেছো তো ? বুড়ো বললো, ডার্লিং, তুমি জামা পরে আসতে ভুলে যাওনি তো, চোখে ভাল দেখতে পাচ্ছি না !

ম্যাকডোনাল্ড বা বার্গার কিং জাতীয় ফাস্ট্ ফুডের দোকানে এরকম নোটিশ চোখে পড়ে না অবশ্য। অনেকক্ষণ গাড়ি চালাবার পর কেউ সেখানে থেমে খালি পায়ে গেঞ্জি গায়ে ঢুকে পড়তে পারে। হিপি না হলেও খুব গরমের সময় অনেক ছেলে খালি গায়েও বেরিয়ে পড়ে।

কিন্তু ছোট ছোট কিছু সাজানো গোছানো ব্যক্তিগত মালিকানার হোটেলে অনেক রকম মজার নিয়মকানুন। প্রথম দরজা ঠেলে ঢুকলেই একটা ছোট অপেক্ষা করার জায়গা, সেখানে কিছু আসন পাতা, এবং আর একটি নোটিশ, প্লীজ ওয়েইট হিয়ার টু বী সীটেড। অর্থাৎ ভেতরে অনেক খালি টেবিল পড়ে থাকলেও ইচ্ছে মতন যে-কোনোটায় গিয়ে বসা যাবে না। একজন পরিচারিকা এসে জিজ্ঞেস করবে, আপনারা ক'জন ? কোন্ ধরনের টেবিল পছন্দ। তারপর সে সঙ্গে করে আমাদের একটি টেবিলে নিয়ে গিয়ে বসাবে।

এই সব ছোট হোটেলেও দাম খুব বেশি লাগে না, কিন্তু এইটুকু বিলাসিতা করা যায় যে মেনিউ কার্ড দেখে অর্ডার দেওয়া যায় ইচ্ছে মতন, বাচ্চাদের জন্য দুধের কথা বলা যায়। একটা খাবারের সঙ্গে আর একটা খাবার মিশিয়ে নতুন কিছু বানিয়ে নেওয়া যায়। এবং অধিকাংশ জায়গাতেই পরিচারিকাদের ব্যবহার বেশ আন্তরিক। অবশ্য আমরা যাকে পরিচারিকা ভাবছি, সে-ই হয়তো মালিক। সে নিজেই অর্ডার নেয়, খাবার বানায়, টেবিলে এনে দিয়ে যায় এবং ক্যাশ কাউন্টারে সে-ই দাম নেয়।

এখানে পরিবেশনের কায়দাটাও অদ্ভুত।

বাংলাদেশের লোকেরা প্রথমে মাছ-মাংস দিয়ে শুরু করে, একেবারে শেষকালে খায় ডাল। ভারতের কোনো কোনো প্রদেশে খাওয়া শুরু হয় মিষ্টি দিয়ে, শেষকালে নোন্‌তা। সেই রকম এখানেও প্রথমেই এনে দেবে কফি। অর্থাৎ ক্ষুধার্ত অবস্থায় খালিপেটে খেতে হবে দু'তিন কাপ কফি। তারপর এনে দেবে স্যালাড। সেটাও শুধু খেতে হবে। স্যালাডের ব্যাপারেও অনেক কায়দা আছে, অর্ডার নেবার সময় পরিচারিকা খুব সীরিয়াস মুখ করে জিজ্ঞাসা করবে, স্যালাডের সঙ্গে আপনি কী ড্রেসিং চান ? যেন এর উত্তরের ওপর অনেক কিছু নির্ভর করছে। কোন্ স্যালাডের সঙ্গে কোন্ ড্রেসিং চলে, এটা আপনার জানা দরকার। আপনি চুপ করে থাকলে পরিচারিকা অনেকগুলি ড্রেসিং-এর নাম বলবে। আমরা অনভিজ্ঞ হিসেবে ইতস্তত করলে জয়তীদি আমাদের সাহায্য করবার জন্য বলেন, তোমরা কি এইটা, না ঐটা, না সেইটা চাও ? এর মধ্যে একটার ওপর একটু বেশী জোর দেবেন, যাতে, আমরা বুঝতে পারি, ঐটাই এক্ষেত্রে বলা উচিত। আমি অবশ্য দেখেছি, চোখ-কান বুজে 'ফ্রেঞ্চ ড্রেসিং' বললেই সব জায়গায় বেশ কাজ চলে যায়।

স্যালাড নামের তেল মেশানো ঘাস-পাতা খাওয়া শেষ করলে তারপর আসবে আসল মাংস-টাংস।

জয়তীদির মেজদি নিজে সর্বক্ষণ নানান কিছু হারাচ্ছেন বা ভাঙছেন বটে, কিন্তু অন্য কেউ যাতে কোনো রকম নিয়মকানুন না ভাঙে, সে ব্যাপারে খুব সজাগ।

কফি খাবার পর হয়তো আমি ফস্ করে সিগারেট ধরিয়েছি, অমনি মেজদি বলে উঠলেন, এই গোবিন্দ, তুমি যে এখানে সিগারেট খাচ্ছো—

আমি নিরীহ মুখে জিজ্ঞেস করলুম, গোবিন্দ কে ?

মেজদি বললেন, ও গোবিন্দ নয়, কী যেন, বিশ্বম্ভর ! তুমি যে সিগারেট ধরালে—।

আমি আবার বললুম, বিশ্বম্ভর বলেও তো কারুকে দেখতে পাচ্ছি না।

জয়তীদি হাসতে হাসতে বললেন, মেজদি, তুই কী রে ! নীলু এই ছোট্ট নামটা তুই মনে রাখতে পারিস না। যত সব খট্‌কা খট্‌কা নাম...।

মেজদি এতে লজ্জিত না হয়ে বরং অবাক হয়ে বললেন, সত্যি রে, আমার যে কী হয়, কিছুতেই নামটা...জানিস, একদিন আমি বাবাকে দাদা বলে ডেকেছিলুম ? দু'তিনবার বলেছি, দাদা শোনো, দাদা শোনো—। বাবা তো

অবাক।
দীপকদা বললেন, মেজদি, আপনি আমাকেও একদিন দর্জি বলে ডেকেছিলেন। একবার না তিনবার!
মেজদি এবার প্রতিবাদ করে বললেন, যাঃ, মোটেই আমি দর্জি বলিনি—
দীপকদা বললেন, হ্যাঁ, বলেছেন। আমি প্রতিবাদ না করে চুপ করে ছিলুম, কারণ, আমি তখন বাথরুম পরিষ্কার করছিলুম, আপনি ভাগ্যিস আমায় মেথর বলেননি!
জয়ন্তীদি বললেন, বাথরুম পরিষ্কারের সঙ্গে দর্জির কি সম্পর্ক রে, মেজদি? তুই আমাকে দু'একবার খুকুমা বলে ডেকে ফেলিস, তার না হয় মানে রয়েছে।
শিবাজী বললো, আমাকে উনি একবার বিপ্লব, আর একবার মহেন্দ্র বলে ডেকেছেন!
প্রিয়া বললো, ছোট্টিমা ওয়ানস্ অর টোয়াইস আমায় ডেকেছেন পুপলু! বাঃ! বাঃ!
এমনকি প্রিয়াও বললো, সী ওয়ান্‌স কল্‌ড মী পুঁচকি!
যাক সবারই যখন নতুন নাম হয়েছে, তখন আর ক্ষোভের কোনো কারণ নেই।
অপ্রতিভ ভাবটা কাটাবার জন্য মেজদি বললেন, কিন্তু নীলু যে এখানে সিগারেট ধরালো, ওরা যদি কিছু বলে?
মেজদির দুশ্চিন্তার কারণ হলো এই যে, এখানকার হোটেল-রেস্তোরাঁয় যেখানে সেখানে বসে সিগারেট খাওয়া যায় না। এ ব্যাপারে বেশ কড়াকড়ি আছে। সিগারেটের বিরুদ্ধে প্রচুর আন্দোলন চলছে। ব্যক্তি স্বাধীনতার দেশ বলেই আইন করে সিগারেট খাওয়া বন্ধ করা যায় না, তাছাড়া ব্যবসায়ীদের স্বার্থও আছে নিশ্চয়ই। আমেরিকান পুরুষরা তো ক্যানসারের ভয়ে সিগারেট খাওয়া ছেড়েই দিয়েছে বলতে গেলে, মেয়েরা অবশ্য এখনো অকুতোভয়ে চালিয়ে যাচ্ছে। সিনেমায়, বাসে, ট্রেনে, হোটেলে কয়েকটি মাত্র সীট নির্দিষ্ট করা থাকে, যেখানে ধূমপায়ীরা বসতে পারে শুধু, সে নিয়ম ভঙ্গ করলে অনেক টাকা জরিমানা হতে পারে।
মেজদিকে আশ্বস্ত করবার জন্য আমি টেবিলের ওপরের অ্যাসট্রেটা দেখিয়ে বললুম, এখানে নিষেধ থাকলে কি এটা রাখতো।
আমার থেকে মনোযোগ সরিয়ে মেজদি এবার বললেন, ইস, শিবাজীর কিছু খাওয়া হলো না!
সত্যি, এই যুবকটিকে নিয়ে আমরা খুব বিপদে পড়েছি।

দেশে সে বাবা-মায়ের কাছে প্রতিজ্ঞা করে এসেছে যে গরু কিংবা শুয়োর খাবে না। এই ম্লেচ্ছদের দেশে গরু-শুয়োর বাদ দিয়ে কি চলা সম্ভব? অনেক দোকানে ও ছাড়া কিছুই পাওয়া যায় না। কোথাও হয়তো মুর্গী পাওয়া যায়, কিন্তু সেই মুর্গীও যে গরু বা শুয়োরের চর্বির তেলে ভাজা নয়, তা হলপ করে বলা যাবে না। তাছাড়া এদেশের মুর্গী অতি বিস্বাদ। ইঞ্জেকশান দিয়ে ফোলানো-ফাঁপানো ঢাউস চেহারার মুর্গী, দু'একদিন খাওয়ার পরেই অখাদ্য লাগে। কোথাও কোথাও মাছ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সে যে কোন্ জাতের মাছ তা কে বলবে! এদেশের প্রায় সবই সমুদ্রের মাছ। আমাদের এই শিবাজীর শুধু পুকুরের রুই-কাৎলা আর ভেড়ির ভেটকী ছাড়া অন্য কোনো মাছ পছন্দ নয়।
তবে মনের জোর আছে বটে ছেলেটির, অন্য সব কিছু অপছন্দ বলে সে শুধু, আলুভাজা আর কফি খেয়ে ডিনার সেরে নেয়।
কিন্তু আমরা ভালো ভালো খাবার খাচ্ছি, আর একজন শুধু আলু ভাজা আর কফি, এ কি সহ্য করা যায়? আমাদের বিবেকের যন্ত্রণা হয়। বিশেষত মেজদি খুবই কাতর হয়ে পড়েন। ঘরের ছেলেকে ঠিক ঠাক কীভাবে ঘরে ফিরিয়ে দেওয়া হবে, সেই নিয়ে আমরা চিন্তা করি।
মাঝে মাঝে এই রকম খাবার জন্য থামা, আবার পথ চলা। এক একদিনে আমরা সাতশো আটশো মাইল এগিয়ে যাই। পথে পুলিশের কাছ থেকে আর কোনো বিপদ আসে না। আসলে পুলিশ সম্বন্ধে আমরা যত ভয় পেয়েছিলুম, ততটা কিছু ভয়ের নয়। এদেশের পুলিশ ঠিক ভক্ষক নয়, রক্ষকই বটে।
আইডাহো কিংবা অরিগন রাজ্যে বাইরের টুরিস্ট বেশী আসে না। আমেরিকার নাম ডাকওয়ালা রাজ্যগুলির তুলনায় এরা অপাঙক্তেয়। এখানে বড় বড় শহর নেই, সেরকম কিছু দ্রষ্টব্য নেই। তবে প্রকৃতির সমারোহ বড় অপূর্ব। কত পাহাড়, বন, নদী আমরা পেরিয়ে যাই। রাস্তার পাশে মাঝে মাঝে এক একটা হরিণের ছবি আঁকা বোর্ডে লেখা থাকে ডিয়ার ক্রসিং। মনে হয় ওটা কথার কথা। কিন্তু সত্যি সত্যি একদিন রাতে আমরা মস্ত শিংওয়ালা একটা হরিণকে হুড়মুড়িয়ে রাস্তা পার হতে দেখলুম। সামনের গাড়ি হর্ন বাজিয়ে পেছনের গাড়িগুলোকে জানিয়ে দেয়, হরিণ যাচ্ছে, দেখো, দেখো, চাপা দিও না যেন!

আমরা সবাই দেখলুম, শুধু মেজদিই দেখতে পেলেন না। চশমা খুঁজে পাননি সেই মুহূর্তে।
আমেরিকায় গ্রাম নেই, সবই ছোট শহর। প্রত্যেকটি শহরে ঢোকবার মুখে

লেখা থাকে, সেখানকার জনসংখ্যা কত, সেখানে কী কী পাওয়া যায়। কোনোটার জনসংখ্যা তিনশো উনিশ, কোনোটার দুশো সাতাশী। কোনোটার বা শুধু ঊনচল্লিশ। এইসব শহরেও কিন্তু একটা ব্যাঙ্ক বা একটা সুপার মার্কেট আছে। নামও কি সুন্দর সুন্দর সেইসব শহরের, বিড়ালের থাবা, শুকনো ঝরনা, বুনো ফুল…এই রকম।

এক জায়গায় আমরা চমকে উঠলাম। সেই শহরটির নাম গোস্ট টাউন। তার জনসংখ্যা সাতাশ! ম্যানড্রেকের গল্পে আমরা সবাই ভূতের শহরের কথা পড়েছি। এই কি সেই? রাস্তার দু'পাশে বাড়ি, কিন্তু পথ একেবারে জনশূন্য। সাতাশজনই তাহলে ভূত!

জিয়া লাফিয়ে উঠলো, আমরা এখানে থাকবো! আমরা এখানে থাকবো!

এমনকি মেজদিরও খুব উৎসাহ!

কিন্তু সবদিক বিবেচনা করে সেখানে থামা হলো না। মোটেল নেই, কোনো ভূতের বাড়িতে তো আশ্রয় চাওয়া যায় না?

রাত দশটার পর আমরা মোটেল খুঁজি রাত্রিবাসের জন্য। আমাদের অন্তত দুটো ঘর দরকার, একটি মেয়েদের আর একটি ছেলেদের জন্য। অনেক মোটেলের বাইরে নো ভ্যাকেন্সির আলো জ্বলে। দু'এক জায়গায় দামে পোষায় না। কোথাও বা একটির বেশী ঘর খালি নেই।

দ্বিতীয় রাত্রে আমরা রাত প্রায় একটার সময় মনোমতন একটি মোটেল পেলুম। একটি উনিশ কুড়ি বছরের মেয়ে একলা কাউণ্টারে জেগে বসে আছে। সম্ভবত কোনো কলেজের মেয়ে, রাত্রে চাকরি করে। এ দেশের মেয়েদের এই সাহস আর কাজ করার ক্ষমতা দেখে সত্যিই মুগ্ধ না হয়ে পারা যায় না।

মনোমতন ঘর পাওয়া গেল। মেয়েটি নিজেই এসে ঘর খুলে সাজিয়ে দিয়ে গেল বিছানা টিছানা।

জামা কাপড় ছেড়ে সবে আমরা সুস্থ হয়ে বসেছি, শিবাজী তার অভ্যাস মতন রঙীন টিভির চ্যানেল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কোনো ওয়েস্টার্ন ফিলম্ খুঁজছে, এমন সময় বাইরে পর পর দু'বার গুলির শব্দ হলো।

আমরা পরস্পরের মুখের দিকে তাকালুম।

দীপকদা বললেন, যাই হোক না কেন, দরজা খুলে বাইরে যাবার কোনো দরকার নেই!

॥ ১৬ ॥

গভীর রাতে দু'বার গুলির শব্দ ও কিছু লোকের পায়ের আওয়াজ শুনেও

আমরা বাইরে আসিনি। নিজের দেশ হলে অন্তত জানলার খড়খড়ি তুলে উঁকি মারতুম, কার কী হলো জানবার চেষ্টা করতুম। এখানে সব সময় এই কথাটা মনে থাকে, এটা আমার দেশ নয়, এখানে কোনোরকম ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ার দরকার নেই। বেশী কৌতূহল থাকাও ভালো নয়।

ঘুম ভাঙার পর প্রথম দরজা খুলে বাইরে এসে মনে হয়, সব কিছুই ছিল রাত্রির দুঃস্বপ্ন। কী সুন্দর, কী শান্ত এই সকাল, আকাশ কী পরিচ্ছন্ন নীল, অদূরেই নিবিড় সবুজ গাছপালা, মনে হয় একটু হেঁটে গেলেই দেখতে পাবো, ঘাসের ওপর ছড়িয়ে আছে শিউলি ফুল।

মোটেলটিতে প্রায় পঞ্চাশটি ঘর, এর চত্বরে প্রায় গোটা চল্লিশেক গাড়ি। আগেকার দিনের সরাইখানার চত্বরে এরকমই গাড়ির বদলে ঘোড়া বাঁধা থাকতো।

অধিকাংশ ঘরেরই দরজা জানলা বন্ধ, যাত্রীদের এখনো ঘুম ভাঙেনি।

কাল রাত্তিরে লক্ষ্য করিনি, আজ দেখলুম, ঘরের বাইরে একটা নোটিশ আছে, 'অনুগ্রহ করে শয়ন কক্ষে মাছ রাখবেন না।'

স্বভাবতই অবাক হলুম। এ আবার কী ব্যাপার? এখানে কি শুধু বাঙালীদের আড্ডা নাকি? নইলে এমন মৎস্য-প্রীতি আর কার হবে?

দীপকদা বুঝিয়ে দিলেন যে, কাছাকাছি নিশ্চয়ই কোথাও মাছ ধরার বিখ্যাত জায়গা আছে। মৎস্য শিকারীরা সন্ধের পর ক্লান্ত হয়ে ফিরে মাছ আর বঁড়শি-টড়শি ঘরেই রেখে শুয়ে পড়ে। তাতে ঘরের মধ্যে আঁশটে গন্ধ হয়ে যায়।

শিবাজী বললো, কাল রাত্তিরেই আমি বলেছিলুম না যে মাছের গন্ধ পাচ্ছি?

তা সে বলেছিল বটে। কিন্তু আমরা পাত্তা দিইনি। আমরা ভেবেছিলুম, অনেকদিন ও মাছ খায়নি বলে মনের দুঃখে মাছের গন্ধ কল্পনা করেছে।

এখানে মাছ ধরার ব্যাপারটা অদ্ভুত। অনেকেরই মাছ ধরার নেশা বটে, কিন্তু ধরলেও অনেকেই সে মাছ খায় না। শুধু ধরাতেই আনন্দ। কিছু সরকারি নিয়মেরও কড়াকড়ি আছে। এক পাউণ্ড ওজনের কম কোনো মাছ কেউ ধরলেও সেটা আবার জলে ছেড়ে দিতে হবে। ছিপ ফেলে পুঁটি কিংবা মৌরলা মাছ ধরার কথা কেউ কল্পনাও করতে পারে না।

হায়, ধনে-জিরে-কাঁচা লঙ্কা দিয়ে কুচো মাছের ঝোলের যে কী অপূর্ব স্বাদ, তা এরা কোনোদিন জানলো না।

আমাদের চা তেষ্টা পেয়েছে। মোটেলে আমরা যে সুইট নিয়েছি, তাতেই রান্নার ব্যবস্থা আছে বটে কিন্তু আমাদের সঙ্গে কোনো সরঞ্জাম নেই। তবে সব

মোটেলের কাছাকাছিই বা সংলগ্ন রেস্তোরাঁ থাকে।

দোকানটি ছোট। তবে বাইরে লেখা আছে 'মাইক্রোওয়েভ ইজ অন'। অর্থাৎ চটপট গরম খাবার পাওয়া যাবে।

বিলেত-আমেরিকার খুব আধুনিক যন্ত্রপাতিও আমাদের দেশের ধনীদের কাছে খুব তাড়াতাড়ি চলে আসে। মাইক্রোওয়েভ উনুনও এসে পড়েছে কিনা জানি না, তবে আমি কোথাও দেখিনি। এ দেশে এখন মাইক্রোওয়েভ-এর ধুম চলছে!

বৈজ্ঞানিক তত্ত্বটি আমি ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারবো না, তবে ব্যাপারটা মোটামুটি এই রকম। একটা চৌকো কাচের বাক্সের মতন উনুন। এতদিন পর্যন্ত যত রকম উনুনেই আমরা রান্না করেছি, তা সে কয়লা-গ্যাস-ইলেকট্রিক যাই হোক না কেন, তার উত্তাপ আসে শুধু তলা থেকে। কিন্তু মাইক্রোওয়েভ উনুনে উত্তাপ আসে তলা-ওপর-ডান পাশ-বাঁপাশ অর্থাৎ সব দিক থেকে। সুতরাং বেগুন ভাজতে গেলে যে-রকম বারবার ওল্টাতে হয়, কিংবা মাংস চাপিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে হয় অনেকবার, এতে তার কিছু দরকার হচ্ছে না। চার পাশ দিয়ে উত্তাপ আসছে বলে রান্নাও হয়ে যাচ্ছে, খুব তাড়াতাড়ি। বিভিন্ন পদের রান্নার জন্য উত্তাপ কম-বেশী করার ব্যবস্থা তো আছেই।

দোকানে দোকানে এই জিনিসের খুবই চল হয়ে গেলেও সবাই বাড়িতে এখনো মাইক্রোওয়েভ-উনুন কেনেনি। আমাদের কলকাতায় যখন প্রথম গ্যাসের উনুন চালু হয়, তখন অনেকে বলেছিল, গ্যাসের রান্না খেলে পেটেও গ্যাস হবে। গত শতাব্দীতে কাঠের জালের বদলে কয়লা চালু হবার সময় অনেকে বলেছিল, কয়লার রান্না হজম হয় না। এখনো অনেকে মাইক্রোওয়েভ সম্পর্কে ঐ রকম কথাই বলছে। মানুষের স্বভাব বিশেষ বদলায়নি তা হলে।

দোকানটিতে প্রথম খরিদ্দার হিসেবে ঢুকলুম আমরা সদলবলে। একটি সোনালি-চুল মহিলা সহাস্যে আমাদের অভ্যর্থনা করলেন। ঘরটা টাটকা কফির সুগন্ধে মদির।

দোকানটির নাম সিডার কাফে। জায়গাটির নাম সিডার সিটি। শহর মানে নিশ্চয়ই আড়াই শো তিন শো নাগরিক, কারণ এখানে ইতস্তত ছড়ানো কয়েকটি বাড়ি ছাড়া শহরের আর কোনো চিহ্ন দেখতে পাইনি। একটু পরেই এখানে একটা দৃশ্য দেখে আমি চমৎকৃত হয়েছিলুম।

মিনিউ দেখে আমরা খাবারের অর্ডার দিলুম। জিয়া আর প্রিয়াকে নিয়ে কোনো সমস্যা নেই, ওরা এদেশে জন্মেছে, কোন্ দিন সকালে মন ভালো করবার জন্য ঠিক কোন্ রকম খাবার দরকার, তা ওরা জানে। ঝটপট নিজেদের পছন্দ জানিয়ে দেয়। আর শিবাজীর কোনো খাবারই পছন্দ হবে না বলে তাকে

নির্বাচনের কোনো সুযোগই দেওয়া হয় না। জয়তীদিই কার্ডে চোখ বুলিয়ে বলে দেন, শিবাজী, তুমি এগ্-স্যাণ্ডুইচ খাও, তাছাড়া তোমার কিছু নেই।

কোনোরকম ভোট না নিয়েই জয়তীদি আমাদের দলের নেত্রী হয়ে গেছেন। আমরা যাতে গয়ং গচ্ছ ভাব না দেখিয়ে তাড়াতাড়ি আবার পথে বেরিয়ে পড়তে পারি, সেই জন্য আমাদের তাড়া দেবার ভার তাঁর ওপর। সেই জন্য আমাদের চোখের দিকে তাকিয়ে তিনি বলতে লাগলেন, তোমরা কে কী নেবে, চটপট বলো, চটপট...।

সবচেয়ে মুশকিল মেজদিকে নিয়ে। কিছুতেই উনি মন ঠিক করতে পারেন না। সসেজ বা হট্ ডগের মতন সাধারণ খাবার ওঁর পছন্দ নয়, উনি চান নতুন নতুন নাম। কালকেই উনি বেশ কায়দায় স্প্যানিশ নাম দেখে একটা অর্ডার দিয়েছিলেন, আসলে দেখা গেল সেটা কাবলি-ছোলার মিষ্টি ঘুঘনি। অখাদ্য!

আজও তিনি একটা ফ্রেঞ্চ নামের খাবার চাইলেন। আমরা কফি দিয়ে প্রাথমিক পর্ব শুরু করলুম।

ঠিক এই সময় কাচের দরজা ঠেলে ঢুকলো দুটি ছেলে আর দুটি মেয়ে। ওরা এসে বসলো ঠিক আমাদের পাশের টেবিলে।

প্রথম দর্শনেই কেমন যেন চেনা চেনা লাগলো ওদের। এমনিতে সাহেব মেমদের মতই চেহারা ও পোশাক, কিন্তু মাথার চুল যেন বেশী কালো, একটি মেয়ের মাথায় লম্বা চুল, একটি ছেলের মাথায় বাবড়ি। ওদের ধরন ধারণ দেখে আর একটা ব্যাপারও মনে হয়, ওরা ঠিক আমাদের মতন ভ্রমণকারী নয়, কাছাকাছি কোনো জায়গা থেকে এসেছে চা-জল খাবার খেতে।

জয়তীদি ওদের দিকে মৃদু ইঙ্গিত করে আমাদের বললেন, ওরা লাল ভারতীয়।

শিবাজী উত্তেজিত ভাবে বললো, রেড ইণ্ডিয়ানস্?

জয়তীদি ধমক দিয়ে বললেন, আস্তে! বাংলায় কথা বলো। ওদের শোনাবার দরকার!

আমরা আড় চোখে বারবার ওদের দেখতে লাগলুম। রেড ইণ্ডিয়ান শুনলে রোমাঞ্চ হয়ই। হলিউডের কল্যাণে ওদের সাংঘাতিক সব মারামারির ছবি আমরা কত দেখেছি। এখনো সিনেমায় মাথায় পালকের টুপি আর মুখে লাল রঙ মাখা দুর্ধর্ষ ইণ্ডিয়ানদের দেখতে পাই বটে, কিন্তু বাস্তবে ওদের সে রকম অস্তিত্ব নেই। আসল রেড ইণ্ডিয়ানদের মেরে মেরে প্রায় নিঃশেষই করে ফেলা হয়েছে। এক সময় এই কথাটা খুব চালু ছিল: একজন ভালো ইণ্ডিয়ান হচ্ছে একজন মৃত ইণ্ডিয়ান! মুষ্টিমেয় যারা বেঁচে ছিল, এই কিছুদিন আগে পর্যন্তও তাদের

আমেরিকার বিভিন্ন জায়গায় এনক্লেভে ঘিরে রাখা হতো, অনেকটা খোঁয়াড়ের জানোয়ারের মতন। এখন অবশ্য ততটা বাধা নিষেধ নেই। ওদের ছেলে-মেয়েরাও ইস্কুলে গিয়ে লেখা পড়া করে, মূল জন-জীবনের সঙ্গে মিশে গেছে। দেশের ব্যাপারে ওদের কোনো ভূমিকাই নেই। সিনেমায় এক্সট্রার পার্ট করবার সময় ওরা অনেকে মাথায় পালকের টুপি ফুপি পরে নেয়।

ভারতীয় হিসেবে অবশ্য, আমাদের চেয়ে ওরা অনেক বেশী বিখ্যাত। আমরাই শুধু ওদের রেড ইণ্ডিয়ান বলি, কিন্তু বাকি পৃথিবী ওদের জানে শুধু ইণ্ডিয়ান হিসেবে। উচ্চারণটা অনেকটা ইনজান্-এর মতন। অসংখ্য গল্পের বইতে, কমিক স্ট্রিপে ঐ ইণ্ডিয়ানদের কথাই থাকে। ইওরোপ-আমেরিকার শিশু-কিশোররা জানেই না যে ঐ ইণ্ডিয়ান ছাড়া আর কোনো ইণ্ডিয়ান আছে। অনেক জায়গাতে আমি নিজেই দেখেছি, আমি ইণ্ডিয়ান শুনে অনেক ছোট ছেলে-মেয়ে আমার দিকে বড় বড় চোখ করে তাকিয়েছে।

আমিও এই প্রথম 'লাল ভারতীয়' চাক্ষুষ দেখলুম, ওরা নিজেদের মধ্যে মগ্ন ভাবে মৃদু স্বরে গল্প করছে।

লুই লামুর নামে একজন মারামারির গল্পের লেখকের খুব ভক্ত আমাদের শিবাজী। ঐ সব বই পড়ার ফলে লাল ভারতীয়দের বিষয়ে তার অনেক জ্ঞান। সে বললো, এই দেশটা তো ওদেরই ছিল, সাদা চামড়ারা জোর করে ছিনিয়ে নিয়েছে⋯।

অধিকাংশ বাঙালীর মতনই শিবাজীরও আবেগের সময় বাংলার বদলে অনর্গল ইংরিজি কথা এসে যায়। সেইজন্য বারবার সে জয়তীদির কাছে ধমক খায়।

এরপর, নাটকের ঠিক দ্বিতীয় দৃশ্যের মতনই দরজা ঠেলে ঢুকলো আর একটি দল। এই দলে নারী নেই, তিনজন পুরুষ ও একজন কিশোর।

ওদের দেখে আমি দারুণ চমকে উঠলুম। এও কি সম্ভব? ওদের একজন তো জন ওয়েন! সেই রকম লম্বা চওড়া, সেই বৃষস্কন্দ, সেই মুখে একটু অবহেলার হাসি। পোশাকও অবিকল। মাথায় স্টেট্সান, কোমরে চওড়া বেল্ট, দু'দিকে দুই রিভলবার। এক্ষুণি দু' হাতে দুটো রিভলবার তুলে নিয়ে দুম্ দুম্ শুরু হয়ে যাবে। কত ছবিতে জন ওয়েনকে এরকম দেখেছি।

তারপর মনে পড়লো, জন ওয়েন তো বেঁচে নেই। কিছুদিন আগে ক্যানসারে মারা গেছেন। তাহলে কি কেউ ইচ্ছে করে জন ওয়েন সেজেছে? পাশের লোক দুটোও চেনা চেনা, একজন রবার্ট ডি নিরো আর একজন ক্লিন্ট ইস্টউড নয়? প্রত্যেকেই সশস্ত্র, কিশোরটির হাতে একটা রাইফেল। চক্চকে খাঁকি প্যান্ট আর

সাদা গেঞ্জি পরা সবাই।

প্রথমে ভাবলুম, এখানে কি সিনেমার কোনো সুটিং হবে? আমরা ভুল করে ঢুকে পড়েছি?

আমি ফিসফিস করে জয়তীদিকে জিজ্ঞেস করলুম, এদের মধ্যে কি কেউ সিনেমার⋯

জয়তীদি হেসে বললেন, যাঃ!

তবু আমার মনে হলো, এরা যেন অতীতের একটা পৃষ্ঠা থেকে উঠে এসেছে। এরকম অস্ত্রধারী আমেরিকানদের তো রাস্তা ঘাটে চলাফেরা করতে আগে কখনো দেখিনি। এরা পুলিশও নয়, কারণ পুলিশ সাদা গেঞ্জি পরে রাস্তায় বেরুবে না। আর তিনজনের সঙ্গেই জন ওয়েন, রবার্ট ডি নিরো আর ক্লিন্ট ইস্টউডের কী আশ্চর্য সাদৃশ্য!

জন ওয়েন প্রথমে ঘাড় ঘুরিয়ে দুই টেবিলের দু'রকম ভারতীয়দের দেখলেন। তারপর কিশোরটির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, হোয়াট উইল য়ু হ্যাভ, সন্?

ঠিক সেই রকম গলা, আর এইরকম সংলাপও আমি জন ওয়েন-এর অনেক ছবিতে শুনেছি। নিজের ছেলেকে 'সন্' বলে সম্বোধনটা আমার বেশ ভালো লাগে। বাংলায় আমরা এরকম বলি না। অবশ্য সংস্কৃতে 'বৎস' ছিল।

দীপকদা বললেন, কাছাকাছি বোধহয় শিকারের জায়গা আছে। কাল রাত্তিরে আমরা নিশ্চয়ই শিকারের গুলির শব্দই শুনেছিলুম।

আমি অবশ্য কথাটা খুব একটা বিশ্বাস করতে পারলুম না। কোমরে পিস্তল গুঁজে কেউ শিকারে যায়? এদের তিনজনেরই চেহারা ওয়েস্টার্ন ছবির নায়কের মতন। এমনও তো হতে পারে, কোনো কারণে এই জায়গাটা গত শতাব্দীতে রয়ে গেছে। এই তিনজন আউট ল এসেছে এই শহর দখল করতে, এখুনি এসে পড়বে গ্যারি কুপার কিংবা বার্ট ল্যাঙ্কাস্টারের মতন চেহারার কোনো শেরিফ, তারপর শুরু হয়ে যাবে ডিসুম্ ডিসুম্!

ক্লিন্ট ইস্টউডের দেখা গেল ভারতীয় মেয়েদের খুব পছন্দ। সে প্রায়ই ত্যারচা চোখে চাইছে জয়তীদির ও মেজদির দিকে। রবার্ট ডি নিরো মনোযোগ দিয়েছে এক প্লেট সসেজে। জন ওয়েন এক আঙুলে টেবিলে টক্ টক্ করে কী যেন বাজনা বাজাচ্ছে। আর কিশোরটি তার রাইফেলটি একবার নিজের ডান পাশে আবার বাঁ পাশে রাখছে।

'লাল ভারতীয়'দের টেবিল থেকে একটি তরুণী মেয়ে উঠে দাঁড়ালো। আমাদের ডিঙিয়ে সে ফিল্মের নায়কদের টেবিলটার দিকে চাইলো, সে দৃষ্টিতে

কী রাগ না বিদ্রূপ না ঘৃণা ? মেয়েটি কি ভাবছে, এই লোকগুলোই আমাদের সর্বস্ব কেড়ে নিয়েছে, ওদের জন্যই আমরা নিজের দেশে পরবাসী।

এইবার কি শুরু হবে লড়াই ? 'লাল ভারতীয়'-দের কাছেও নিশ্চয়ই লুকানো অস্ত্র আছে। মেয়েটি ওরকম উঠে দাঁড়িয়ে এক দৃষ্টে চেয়ে আছে কেন ? এবার ও কোনো গালাগালি দেবে ?

মেয়েটি বললো, হাই এড্‌ !

রবার্ট ডি নিরো খাওয়া থেকে মুখ তুলে মেয়েটিকে দেখলেন। তাঁর মুখ ভরে গেল ঝলমলে হাসিতে। চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়িয়ে সে বললো, হাই জোয়ি ! হাউ হ্যাভ য়ু বীন !

সে প্রায় দৌড়ে গিয়ে মেয়েটিকে জড়িয়ে ধরে ফটাফট চুমু খেল তার দুই গালে। মেয়েটির সঙ্গীরা উঠে দাঁড়িয়ে হাত ঝাঁকালো ওর সঙ্গে। তার পর রবার্ট ডি নিরো ওদের নিয়ে এলো নিজের টেবিলে অন্যদের সঙ্গে পরিচয় করাবার জন্য। জন ওয়েন মেয়ে দুটির গালে পিতার মতন স্নেহে চুম্বন ছোঁয়ালেন।

তারপর কী একটা কথায় সবাই মিলে এক সঙ্গে হেসে উঠলো।

॥ ১৭ ॥

আমরা চলেছি একটার পর একটা পাহাড় ডিঙিয়ে, উপত্যকার মাঝখান দিয়ে। প্রশান্ত মহাসাগরের ধারে ধারে কোস্ট রেঞ্জ, অন্যদিকে কাস্‌কেড রেঞ্জ আর সিয়েরা নেভাডা পর্বতমালা, এর মাঝখানের উপত্যকাতেই প্রধান জনবসতি।

প্রকৃতি এখানে খুবই উদার আর উন্মুক্ত। আমরা এখানে সমুদ্র দেখিনি বটে কিন্তু মাঝে মাঝে এক একটা হ্রদ দেখেই সমুদ্র বলে ভ্রম হয়। আর সেই সব হ্রদের নামও কত মজার, গুজ্‌ লেক। ক্লিয়ার লেক, হনি লেক, পিরামিড লেক, মোজেজ লেক ইত্যাদি। এক সময় এখানে আগ্নেয়গিরিও ছিল, কারণ একটি বিশাল হ্রদের নাম ক্রেটার লেক।

মাঝে মাঝেই পার হতে হয় নদী। কিন্তু নদীগুলোর নাম জানতে না পারলে বড় অস্বস্তি লাগে। একটা নদীর বুকের ওপর দিয়ে বেয়াদপের মতন গাড়ি চালিয়ে চলে গেলুম, সেই নদীটির নামও জানলুম না, তাকে কোনো ধন্যবাদও দিলুম না, এ বড় অন্যায়। এর মধ্যে একটা নদীর নাম পেলুম স্নেক। আর বিশাল কলামবিয়া নদীকে চিনতেও কোনো ভুল হবার কথা নয়। পাস্‌কো নামের জায়গাটা ছাড়িয়ে কলমবিয়া নদীর তীরে আমরা একটু থামলুম। আর কোনো কারণে নয়, সেই নদীকে একটু সম্মান জানাবার জন্য।

প্রকৃতির সুন্দর জায়গাগুলিকে এরা আরও বেশী আকর্ষণীয় করে রাখে। কত রকম থাকবার জায়গা আর নানান যানবাহনের সুযোগ। দশ-পনেরো মাইল দূর থেকেই অনেক রকম প্রলুব্ধকর বিজ্ঞপ্তি। এই রকম রয়েছে অনেকগুলি ন্যাশ্‌নাল পার্ক আর ঝর্না আর পার্বত্য নিবাসের খবর।

চিলকুইন নামে একটা চমৎকার জায়গায় আমরা মধ্যাহ্নভোজ সেরে আবার যাত্রা শুরু করতেই ক্ল্যামাথ ফলসের অনেক রকম নিশানা দেখা যেতে লাগলো পথের পাশে। এটা বেশ নাম করা জলপ্রপাত, ঐ নামে একটা মস্ত বড় হ্রদও আছে। এমন নিবিড় জঙ্গল ঘেরা পথ যে ঐ দিকে মন টানে।

দীপকদা জিজ্ঞেস করলেন যাবে নাকি ক্ল্যামাথ ফল্‌সে ? তবে ওখানে একদিন থাকতে হবে, সব দেখতে অনেক সময় লাগবে।

আমরা সবাই রাজি, কিন্তু একটা ছোট অসুবিধে দেখা দিল। জিয়া আর প্রিয়া নাম্নী বালিকাদুটিকে ডিজ্‌নিল্যাণ্ড দেখাবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, ওরা সে জন্য অধৈর্য হয়ে উঠেছে। পুরো দুটো দিন কেটে গেছে গাড়িতে, ঐ বয়সে সর্বক্ষণ গাড়ির মধ্যে চুপচাপ ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতে কেনই বা ভালো লাগবে !

সুতরাং আমরা ঠিক করলুম, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ক্যালিফোর্নিয়ায় ঢুকে পড়াই ভালো।

আজ শনিবার, তাই পথে গাড়ির ভিড় অনেক বেশী। অনেক গাড়ির মাথায় তাঁবু কিংবা নৌকো চাপানো। কেউ কেউ গাড়ির সঙ্গে টেনে নিয়ে চলেছে একটা ট্রেলার, অর্থাৎ নিজের শয়নকক্ষটি সঙ্গে নিয়েই বেড়াতে বেরিয়েছে। যেটা অদ্ভুত লাগে, সেটা হলো বেশীর ভাগ গাড়িই চালাচ্ছে কোনো নিঃসঙ্গ বৃদ্ধ কিংবা বৃদ্ধা, এরা একলা একলা বেড়াতে যায়, কোনো সঙ্গী জোটেনি। কোনো কোনো গাড়িতে রয়েছে শুধু দুটি বা তিনটি মেয়ে, তাদের কোনো পুরুষ বন্ধু নেই।

ইচ্ছে করেই কিনা কে জানে, দীপকদা পথ ভুল করে চলে এলেন ক্ল্যামাথ ফল্‌সের কাছাকাছি। জিয়া আর প্রিয়া ঠিক বুঝতে পেরে আপত্তি জানালো। এত কম বয়েসে নিছক প্রকৃতি মন টানে না। আমরা ক্ল্যামাথ হ্রদের এক পাশে এক চক্কর মেরে আবার অন্য পথ ধরলুম।

পাহাড় থেকে রাস্তা নেমে এলো সমতলে। বনরাজিও বিরল হয়ে এলো ক্রমশ। জায়গাটার নাম উইড্‌। নামের সঙ্গে খুব মিল আছে পরিবেশের। দু'পাশে খয়েরি রঙের আগাছা শুধু, এই রকমই মাইলের পর মাইল। রীতিমতন এক ঘেয়ে। এই রকম জায়গা দিয়ে যেতে যেতে ঘুম পেয়ে যায়। শুধু দীপকদার

ঘুমোবার উপায় নেই, সারা পথ ওঁকে একাই গাড়ি চালাতে হচ্ছে। যেমন খাওয়া, সেইরকম ঘুম সম্পর্কেও বিশেষ আগ্রহ নেই দীপকদার। সারাদিনের এত ধকলের পর রাত্রে যেখানে আমরা থাকি, সেখানে পৌঁছেও দীপকদা ঘুমের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন না। তখন হাত পা ছড়িয়ে অন্তত ঘণ্টা দুয়েক আড্ডা না দিলে তাঁর চলে না।

জয়তীদি হঠাৎ বলে উঠলেন, ঐ দ্যাখো শাস্তা!

আমরা চমকে উঠলুম। শাস্তা, তার মানে মাউণ্ট শাস্তা, তা হলে তো আমরা ক্যালিফোর্নিয়ায় ঢুকে পড়েছি।

আমি জিজ্ঞেস করলুম, ক্যালিফোর্নিয়ার চেক পোস্ট পড়ল না? কোনো ঝঞ্ঝাট হলো না?

আমরা আসবার পথেই বারবার শুনে আসছিলুম, ক্যালিফোর্নিয়ার চেক পোস্টে নাকি অনেক ঝঞ্ঝাট হবে। বাক্স-প্যাটরা সব খুলে দেখবে।

কিছুদিন ধরেই কাগজে পত্রে খবরের নায়ক হয়েছে ভূমধ্যসাগরের মাছি, যার সংক্ষিপ্ত নাম মেড-ফ্লাই। ভূমধ্যসাগর থেকে নাকি এক ঝাঁক দুষ্টপ্রকৃতির মাছি উড়ে এসে এখানকার সব ফল বিষাক্ত করে দিয়েছে। ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যটিরই আর এক নাম অরেঞ্জ স্টেট। এখানকার আঙুর খুব বিখ্যাত। ক্যালিফোর্নিয়ার ওয়াইন এখন ফরাসী ওয়াইনের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে। সুতরাং ঐ মাছির উপদ্রবে হৈ হৈ পড়ে গেছে এখানে, মাছি দমন করার কতরকম প্রস্তাবই শোনা যাচ্ছে। এমনকি বিখ্যাত কলামনিষ্ট আর্ট বুখওয়াল্ডও এক দারুণ মজার রচনা লিখে ফেলেছেন এই মাছি বিষয়ে। যাই হোক, এই সব কারণেই, বাইরের কোনো রাজ্য থেকে আর কোনো রকম বিষাক্ত ফল যাতে এখানে না ঢুকতে পারে, সেই জন্য সীমান্তে খুব কড়াকড়ি চলছে। আমাদের সঙ্গে যে কলা আর আপেল ছিল, তা সব শেষ করে ফেলতে হয়েছে সকালেই। মেজদি বারবার আমাদের বলছিলেন, কলা খাও। কলা খাও, শিগগির!

জয়তীদি বললেন, চেক পোস্ট তো কখন পেরিয়ে এসেছি, তোমরা তখন ঘুমোচ্ছিলে।

—বাক্সটাক্স খোলেনি!

—নাঃ! আমি বললুম আমাদের সঙ্গে ফল টল কিছু নেই, তাই শুনেই ছেড়ে দিল।

আমি বললুম, দেখা যাচ্ছে সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র!

জয়তীদি এমন একটা ভ্রূভঙ্গি করলেন, যার অর্থ, ছেলেমানুষ হয়ে আর অত পাকামি করতে হবে না!

দীপকদা বললেন, দ্যাখো, এবার মাউণ্ট শাস্তা খুব ভালো করে দেখা যাচ্ছে।

মাউণ্ট শাস্তার চূড়াটি সত্যি বড় সুন্দর। ঠিক মনে হয়, একটা সাদা রঙের টুপি পরে আছে। এই পাহাড়টির উচ্চতা চোদ্দ হাজার ফিটের চেয়ে সামান্য কিছু বেশী। আমরা হিমালয়ের দেশের লোক, আমাদের কাছে চোদ্দ হাজার ফিটের পাহাড় তো নিছক ছেলেমানুষ!

কিন্তু ক্যালিফোর্নিয়ার এই পাহাড়টির বৈশিষ্ট্য এই যে, এর মাথায় সারা বছর বরফ থাকে, সেইজন্য এই গ্রীষ্মেও এর মাথায় সাদা টুপি।

ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যটিকেই অবশ্য চির বসন্তের দেশ বলা যায়। পাহাড়, জঙ্গল এমনকি এক প্রান্তে মরুভূমি থাকলেও ক্যালিফোর্নিয়ার অধিকাংশ জায়গাতেই সারা বছর বড় মনোরম আবহাওয়া, বেশী গরমও নেই, শীতও নেই। গাছপালাও আমাদের অনেকটা চেনা। দু'দিকের দুই রাস্তার মাঝখানে চোখে পড়ে দোপাটি ফুলের গাছ। অজস্র ফুল ফুটে থেকে আপনা আপনি ঝরে যায়।

রাস্তাটা গেছে মাউণ্ট শাস্তার পাশ দিয়ে ঘুরে ঘুরে। এক এক জায়গা থেকে পাহাড়টিকে এক এক রকম দেখায়। কোনো সময় বেশ রোগা, কোনো সময় হৃষ্ট পুষ্ট। মাথার টুপিটা কখনো গোল, কখনো মেক্সিকানদের মতন, আবার কখনো গান্ধী টুপির মতন। পাহাড়ের কোলে কোলে নির্জন সবুজ উপত্যকা দেখলেই আমার মন কেমন করে। যেন এইখানে একটা কুটির বেঁধে আমার থেকে যাওয়ার কথা ছিল। চুপচাপ, অনেক দিন। কিন্তু থাকা হয় না, এই সব জায়গা স্মৃতিতে ছবি হয়ে যায়।

খুব ভালো করে মাউণ্ট শাস্তাকে দেখবার জন্য আমরা এক জায়গায় থামলুম। খাড়া পাহাড়ের এক পাশ অনেকখানি ঢালু হয়ে নেমে গেছে, নিচে এক জলাশয়, সেটা নদী, না হ্রদ না কোনো বাঁধ তা বোঝবার উপায় নেই। একেবারে জনশূন্য স্থান, শুধু রয়েছে একটা টেলিফোন বুথ আর একটা ময়লা ফেলার জায়গা। স্থানটির রম্যতার জন্য এখানে অনেকেই গাড়ি থামিয়ে কিছুক্ষণ বসতে চাইবে। খাবার দাবারের প্যাকেট ও টিন যেখানে সেখানে ফেলে যাতে নোংরা করা না হয়, তার জন্য প্রায়ই নোটিশ থাকে যে যেখানে সেখানে ঐ সব ফেললে পাঁচ শো ডলার ফাইন হবে। বিশেষ কেউ তা মানে না অবশ্য। এখানে সেখানে বিয়ারের টিন গড়াতে দেখা যায়।

শুরু হলো ছবি তোলার পালা। দীপকদা ছবি তোলার ব্যাপারে একজন শিল্পী, তাঁর ক্যামেরায় নানারকম লেনস্, অনেক ভেবে চিন্তে তিনি একখানা দু'খানা ছবি তোলেন মাত্র। কিন্তু এদেশের বাচ্চা ছেলেমেয়েরাও ফটাফট ছবি

তুলতে পারে। যেমন জিয়ার আছে পোলারয়েড ক্যামেরা, সে পটপট করে শাটার টিপছে আর অমনি হাতে গরম রঙীন ছবি বেরিয়ে আসছে। এমনকি সাত বছরের মেয়ে প্রিয়াও ঐ ক্যামেরায় ছবি তুলে ফেললো কয়েকখানা।

জয়তীদি বললেন, বড্ড ভালো লাগছে জায়গাটা, তাই না?

দীপকদা বললেন, বেশী ভালো লাগা ভালো নয়। তা হলে আর উঠতে ইচ্ছে করবে না।

মেজদি বললেন, সত্যিই আমার এ জায়গাটা ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছে না।

আমি একটু দূরে বসেছিলুম। হঠাৎ লাফিয়ে উঠে বললুম, সাপ! সাপ! র‍্যাটল স্নেক।

অমনি একটা হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। প্রথমে সবাই নিরাপদ দূরত্বে চলে যাবার পর আবার কাছে এলো। র‍্যাটল স্নেকটিকে দেখা গেল না, আমি পুরোপুরি বানিয়ে বলেছি কিনা তা-ও ঠিক বোঝা গেল না। আমি অবশ্য বারবার বলতে লাগলুম, আমি র‍্যাটল স্নেকটার লেজের দিকের শুক্‌নো হাড়ের খটাখট শব্দ স্পষ্ট শুনতে পেয়েছি।

যাই হোক, সাপের নাম উচ্চারণ করার পর জায়গাটার মাধুর্য অনেকটা নষ্ট হয়ে এলো। অবশ্য বেলাও ঢলে এসেছে, আলো শুষে নিচ্ছে আকাশ। আবার শুরু হলো যাত্রা।

গাড়ি চেপে যাওয়ায় যদিও শারীরিক পরিশ্রম কিছুই নেই, তবু ক্ষিদে পায় ঘন ঘন। মনে হয় খাইয়াটাই এক মাত্র কাজ। অন্ধকার নামবার পরই আমাদের মনের মধ্যে একটা খাই খাই রব ওঠে। আমরা কোন্ শহরে যাবার জন্য থামবো, তা আমরা পছন্দ করতে শুরু করি। ইচ্ছে করলে কোনো বড় শহরের মধ্যেই না ঢুকে হাজার দেড় হাজার মাইল চলে যাওয়া যায়। আবার ইচ্ছে করলেই বাই-পাস্ দিয়ে ঢুকে পড়া যায় যে কোনো শহরে।

দীপকদার গাড়িতে তেল ফুরিয়ে গেছে, তাই ঢুকে পড়লেন একটা শহরে। শহরটির নাম রেডিং। কস্মিনকালেও এ জায়গাটার নাম আগে শুনিনি, কিন্তু এখানেই আমাদের খাদ্য বরাদ্দ ছিল। গাড়ির খিদে ও আমাদের খিদে এক সঙ্গেই মিটিয়ে নেবার জন্য আমরা এখানে নেমে পড়লুম।

কোন্ দোকানে খাবো, এটা ঠিক করাও একটা খেলার মতন। দোকানের সংখ্যা অনেক, সেই জন্যই পছন্দ করা দুষ্কর। এই রেডিং-এর মতন একটা নাম-না-জানা জায়গাতেও পাশাপাশি অন্তত কুড়ি-পঁচিশটা ভোজনালয়। টিপিটিপি বৃষ্টি পড়ছিল বলে আমরা বেশী বাছাই না করে সামনের একটা চীনে দোকান দেখে ঢুকে পড়লুম। এমনিতেই কলকাতার মানুষদের চীনে খাবারের

প্রতি বিশেষ দুর্বলতা আছে, এখানে এসে আমরা অনেকদিন ঐ খাবার খাইনি।

দোকানটিতে ঢুকে প্রায় তাজ্জব হবার মতন অবস্থা। এই ধাধ্‌ধাড়া গোবিন্দপুরে এত বড় চীনে হোটেল? মনে করুন বেলমুড়ি কিংবা মানকুণ্ডুর মতন জায়গায় পাঁচশো লোকের এক সঙ্গে খাবারের মতন চীনে রেস্তোরাঁ। কলকাতাতেও এত বড় দোকান আজও হয়নি। অবশ্য ক্যালিফোর্নিয়ায় চীনে অধিবাসীর সংখ্যা অনেক এবং চীনের সঙ্গে বর্তমান আঁতাত হবার আগে থেকেই আমেরিকানরা চীনে খাবারের খুব ভক্ত। তা হলেও এত বড় দোকান দেখে চমকে যেতেই হয়।

দোকানটি তিনটি অংশে ভাগ করা, এর মধ্যে যে-যে অংশে মদ পাওয়া যায়, সেখানে বাচ্চাদের প্রবেশ নিষেধ বলে আমরা বসলুম সর্বসাধারণের এলাকায়। সেখানেও অন্তত পঞ্চাশটি টেবিল, কিন্তু প্রায় সবগুলোই খালি। প্রায় রাজকীয় খাতির পেলুম আমরা। একাধিক পরিচারিকা বারবার আমাদের তদারকি করে গেল। খাবারগুলোও বেশ ভালো, তবে আমাদের কলকাতার মতন নয়। কলকাতার চীনে খাবার সতিই অপূর্ব।

বিল মেটাবার সময় আমি যথারীতি পুরোনো কায়দায় পকেটে হাত ঢুকিয়ে, 'আমি দিই, আমি দিই' বলতে থাকি, হাতটা আর পকেট থেকে বেরোয় না, তার মধ্যেই জয়তীদি ধমক দিয়ে বলেন, তুমি ছেলে মানুষ, খবরদার দেবে না···। দীপকদাই দিয়ে দেন টাকাটা। আমি কৃত্রিম দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলি, আপনারা কি আমায় একবারও সুযোগ দেবেন না!

খুচরো ফেরৎ আসবার সময় প্লেটে সাজিয়ে নিয়ে এলো সাতখানা বেশ বড় সাইজের করবী ফুলের বিচি। দেখেই চিনতে পারলুম, ওগুলো হল ফরচুন কুকি। এর আগে অন্য কোনো দোকানে ফরচুন কুকি দেয়নি। ওগুলো আসলে বিস্কুটে তৈরি, ভাঙলে ভেতরে টুকরো কাগজ পাওয়া যায়, তাতে সেদিনের ভাগ্য লেখা থাকে।

ছোটদের দাবি আগে, তাই প্রিয়া প্রথমে একটা তুলে নিয়ে ভাঙলো। তাতে লেখা আছে, তুমি যা স্বপ্ন দেখবে, তাই সত্যি হবে। আমরা হাততালি দিলুম। এবার খুললো জিয়া। তার ভাগ্যলিপি: আগামী কালকের দিনটি তোমার জীবনের একটা চমৎকার দিন। শিবাজী রায় পেল; ঘর ছেড়ে বেশীদিন দূরে থেকো না। মেজদিরটা, যা হারিয়ে যায় তার জন্য দুঃখ করে লাভ নেই, নতুন কিছু শিগগির পেয়ে যাবে। জয়তীদির: খুব তাড়াতাড়ি তুমি একটা সুখবর পাবে।

আমারটা অতি সাধারণ এবং খুব সত্যিও বটে: তোমার বন্ধু ভাগ্য খুব

ভালো।
দীপকদা হাসতে হাসতে বললেন, দেখো, আমি কী পেয়েছি! এ যে সত্যিই ভবিষ্যৎবাণী।

আমরা সবাই দীপকদার কাগজটা দেখলুম : যদি আজ কোথাও যাত্রা শুরু করে থাকো, তা হলে মাঝপথে থেমো না, এগিয়ে চলো!

দীপকদা বললেন, তার মানে আমাকে রাত্তিরে থামতে বারণ করছে। তা হলে কি সারা রাত গাড়ি চালাবো?

এই নিয়ে একটুক্ষণ বিতর্ক হলো। দীপকদার ইচ্ছে সারা রাত গাড়ি চালিয়ে যতদূর সম্ভব এগিয়ে যাওয়া। জয়তীদি বললেন তোমার স্ট্রেন হবে। মেজদি বললেন, বাচ্চাদের কষ্ট হবে। বাচ্চারা না না বলে উঠলো।

শেষ পর্যন্ত ফরচুন কুকির নির্দেশই মান্য করা হবে ঠিক হল। গাড়ির পেছনের দিকে জিয়া আর প্রিয়ার শোওয়ার জায়গা করে দেওয়া হলো। আমরা সারা রাত গল্প করতে করতে যাবো। আমাদের ঘুমোলে চলবে না।

শিবাজী গাড়িতে উঠেই ঘোষণা করলো : চলন্ত গাড়িতে আমি কক্ষনো ঘুমোই না।

বলেই ঘুমিয়ে পড়লো সঙ্গে সঙ্গে। তারপর চোখ জুড়িয়ে এলো মেজদির। একটু বাদে জয়তীদিরই মাথাটা ঝুঁকে এলো বুকের ওপরে।

দীপকদা এক মনে, একরকম স্পীডে গাড়ি চালাচ্ছেন, আমি মাঝে মাঝে ওঁকে সিগারেট এগিয়ে দিচ্ছি আর বাইরের অন্ধকার দেখছি। রাস্তায় অনেক গাড়ি। দূর পাল্লার যাত্রায় অনেকেই নাইট ড্রাইভিং পছন্দ করে। দু'দিকের রাস্তায় এক দিকে উজ্জ্বল হেড লাইটের মিছিল, অন্য দিকে লাল ব্যাক লাইট। এ দেশে গুণ্ডামি বদমাইশী খুনোখুনি হচ্ছে-অহরহ, কিন্তু সারা রাত রাস্তায় গাড়ির মধ্যে থাকায় কোনো বিপদ নেই, এটা আশ্চর্য না?

লেখকদের অনেক সুবিধে। আমি অনায়াসে এর পর লিখতে পারতুম যে পেছনের সীটে অন্যরা সবাই ঘুমোলেও আমি সারা রাত বীরের মতন জেগে রইলুম দীপকদার পাশে। কেউ অবিশ্বাস করতো না।

কিন্তু আসল ব্যাপার হচ্ছে, হঠাৎ এক গুচ্ছ হাসির শব্দে, আমি চমকে উঠলুম এক সঙ্গে। অন্যরা সবাই অনেক আগে জেগে উঠেছে, শুধু আমিই কাৎ হয়ে এমন ঘুমোচ্ছিলুম যে অনেক ডাকাডাকিতেও উঠিনি। শেষ পর্যন্ত একজন

রুমাল পাকিয়ে আমার কানে সুড়সুড়ি দিতেই...।

বাইরে তাকিয়ে দেখি প্রায় ভোর হয়ে এসেছে।

॥ ১৮ ॥

লস এঞ্জেলিস শহরটির ডাক নাম এল এ। এরকম একটা জগঝম্প মার্কা শহর সারা দুনিয়ায় আর আছে কিনা সন্দেহ। এটা একটা শহরই না। অনেকগুলো উপনগরী সুতো দিয়ে জুড়ে জুড়ে তৈরি হয়েছে এই এল এ।

নিউ ইয়র্ক শহর যেমন ওপর দিকে বাড়ছে, উঁচু হতে হতে প্রায় আকাশ ছুঁয়ে ফেলেছে, লস এঞ্জেলিস বাড়ছে তেমন লম্বায়। এই শহরের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত ইচ্ছে মতন ঘুরে বেড়াবার কথা কল্পনাও করা যায় না। এই শহরে পনেরো-কুড়ি বছর ধরে আছেন এমন নাগরিকরাও যখন তখন এ শহরে রাস্তা হারিয়ে ফেলেন। কারুর বাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে গেলে, শুধু সে বাড়ির ঠিকানা জানাই যথেষ্ট নয়, নিমন্ত্রণকর্তার কাছ থেকে সে বাড়িতে পৌঁছোবার নির্দেশ দু' তিন বার শুনে মুখস্ত করে নিতে হয়। রাত আটটায় নেমন্তন্ন, রাত সাড়ে দশটায় পঞ্চাশ-ষাট মাইল ঘোরাঘুরি করে বিধ্বস্ত চেহারায় অতিথি এসে ঢুকলেন, এটাও আশ্চর্য কিছু নয়।

নিউ ইয়র্কের সঙ্গে লস এঞ্জেলিসের তুলনা এসেই পড়ে বারবার। এই দুই শহরের মধ্যে বেশ একটা রেষারেষির ব্যাপার আছে, ঠাট্টা-ইয়ার্কির সম্পর্কও আছে, অনেকটা আমাদের ঘটি-বাঙালের ঝগড়ার মতন। আমাদের ঘটি বাঙাল, ওদের ইস্ট কোস্ট-ওয়েস্ট কোস্ট। এর মধ্যে পূর্ব উপকূল হলো ঘটি আর পশ্চিম উপকূল বাঙাল।

কারণ, পূর্ব উপকূল তুলনামূলকভাবে পুরোনো অর্থাৎ বনেদী, আর পশ্চিম উপকূলের শহর টহর তো সেদিনকার ছোকরা। লস এঞ্জেলিস শহরটার নামের উচ্চারণের মধ্যেই যেন আছে টাকার ঝনঝনানি, যদিও নিউ ইয়র্ক শহরেই আছে সেই বিখ্যাত ওয়াল স্ট্রীট, যেখানে চলে ক্যাপিটালিস্ট দুনিয়ার সব বড় বড় ধন-দৈত্যদের ফাটকা।

সবচেয়ে মজার কথা শুনেছিলুম টেলিভিশানে একটি 'সাবান নাটকে'। (সাবান নাটকের ব্যাপারটা পরে বিস্তৃতভাবে বলা যাবে এখন) সেই নাটকের এক নায়ক (এই সব নাটকে অনেক নায়ক-নায়িকা থাকে) বলছিল, কী রকম মেয়ে তার পছন্দ। সে বললো, তার স্বপ্নের নায়িকা হচ্ছে সেই রকম, যার রূপ হবে ওয়েস্ট কোস্টের মতন, আর মন হবে ইস্ট কোস্টের। এক সাহেবকে এই

ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিতে বলেছিলুম। সে বললো, ব্যাপারটা কী জানো, পশ্চিম উপকূলের মেয়েদের মাথার চুল সত্যিকারের সোনালি হয়, মুখ ও শরীরের ডৌল বেশ কোমল আর নিখুঁত। কিন্তু বুদ্ধি? বুদ্ধিতে নিউ ইয়র্কের মেয়েরা অনেক তীক্ষ্ন। সুতরাং এই এই দুটোকে যদি মেলানো যায়...।

শুধু নারী নয়, নগরী হিসেবেও তুলনা করলে নিউ ইয়র্কের তুলনায় এল এ শহরটি দেখতে অনেক বেশী সুন্দর। তবু, আমায় যদি কেউ জিজ্ঞেস করে এই দুটি শহরের মধ্যে কোন্‌টি আমার বেশী পছন্দ, আমি বিনা দ্বিধায় নিউ ইয়র্কের নাম বলবো। নিউ ইয়র্কের অনেক রাস্তা বেশ ভাঙা-চোরা, এখানে সেখানে ময়লা পড়ে থাকে, অনেকটা কলকাতা-কলকাতা ভাব, তবু অসাধারণ প্রাণ চাঞ্চল্য আছে ঐ শহরটির। সেই তুলনায়, এল এ একেবারে ঝকঝকে তকতকে এবং কৃত্রিম।

এল এ শহরটির আর একটি দুর্ভাগ্য এই যে, এই শহরটি আমার, আমি একে ভালোবাসি, এই রকম গর্ব করার কেউ নেই। এই শহরটা বারো ভূতের। সবাই আসে এটাকে লুটেপুটে নেবার জন্য। কিন্তু নিউ ইয়র্কের নাগরিকরা তাদের শহরটির জন্য গর্ব বোধ করে। 'আই লাভ এন ওয়াই' এ রকম লেখা বড় বোতাম কিনতে পাওয়া যায়, অনেকেই সে-রকম বোতাম কিনে বুকে লাগিয়ে ঘোরে। যারা খাঁটি আমেরিকান নয়, যেমন ইহুদী বা কৃষ্ণকায়রা (খাঁটি আমেরিকান হচ্ছে বোলতারা। বোলতা অর্থাৎ ওয়াস্‌প, অর্থাৎ হোয়াইট—আঙ্গলো-স্যাক্সন এবং প্রোটেস্টান্ট) তাদেরও সাহিত্য পড়লে দেখা যায়, তারা নিউ ইয়র্ক শহরটাকে খুব প্রিয় আর নিজস্ব মনে করে। এল এ নিয়ে সেরকম কোনো সাহিত্যও নেই।

লস এঞ্জেলিস বলতেই প্রথমে মনে পড়ে হলিউডের কথা। যদিও এই বিশাল শহরে হলিউড একটা পাড়া মাত্র। দূর থেকে দেখা যায় পাহাড়ের গায়ে হলিউডের নাম খোদাই করা।

হলিউডের প্রতিষ্ঠা নিয়ে একটা বেশ মুখরোচক গল্প আছে। চলচ্চিত্র শিল্পের গোড়ার দিকে আমেরিকান সিনেমার কেন্দ্র ছিল নিউ ইয়র্ক, বড় বড় কোম্পানিগুলোর অফিস ছিল ওখানেই। সেই যুগের একজন পরিচালক, যার নাম সিসিল বি ডিমিল (যিনি মার্কিনী ভাষায় ঢাউস ঢাউস হিন্দী ফিল্‌ম বানাবার জন্য বিখ্যাত) একটা ছবির আউট ডোর শুটিং-এর জন্য দলবল নিয়ে এসেছিলেন আরিজোনা রাজ্যের একটি জায়গায়। ট্রেন থেকে নেমেই সিসিল বি ডিমিল বললেন, ওরে বাস্ রে, একী পাণ্ডববর্জিত জায়গা! উঃ কী গরম! এ যে মরুভূমি। না, না, এখানে শুটিং চলবে না! ট্রেনটা তখনও দাঁড়িয়ে ছিল, সেই

ট্রেনেই আবার সবাই হুড়মুড়িয়ে উঠে পড়লো। ডিমিল সদলবলে নামলেন একেবারে ট্রেন শেষ পর্যন্ত যেখানে গিয়ে থামলো, সেখানে। সেখানকার আবহাওয়া খুব মনোরম, নাতিশীতোষ্ণ। সমুদ্রের ধারে, সন্ধের পর চমৎকার বাতাস দেয়, এখানে লোকজনের ভিড়ও তেমন নেই। শহরের উপকণ্ঠে একটা নিরিবিলি পাহাড়ী গ্রাম মতন জায়গা বেছে নিয়ে ডিমিল কম্পানিকে টেলিগ্রাম পাঠালেন, শুটিং-এর খুব ভালো জায়গা পেয়েছি!

সেই গ্রামটির নামই হলিউড। প্রথমে নাকি একটা মাছের গুদাম ভাড়া করে স্টুডিও বানানো হয়েছিল। এখন সেখানে এলাহি কারবার।

একদিন দেখতে গিয়েছিলুম স্টুডিও পাড়া।

এমনি এমনি তো ঢুকে পড়া যায় না, তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা আছে। একটি কম্পানি তাদের স্টুডিও এলাকায় প্রত্যেকদিন ট্যুরের ব্যবস্থা করে। তা বলে সত্যি সত্যি শুটিংও দেখা যায় না কিংবা শুকনো কয়েকটা সেট বা ক্যামেরা দেখিয়েও ছেড়ে দেয় না। এন্টারটেইনমেন্ট ব্যাপারটা এরা ভালো জানে, আপনার কাছ থেকে পয়সা নিলে তা যাতে পুরোপুরি উসুল হয়, সে দিকে এদের নজর আছে। দশ টাকার টিকিটে সারা দিন ধরে এরা কতরকম জিনিস যে দেখায়, তার ইয়ত্তা নেই।

মূল সফরটি হয় একটি ট্রামে। টিকিট কেটে ভেতরে ঢুকবার পরই একজন জানিয়ে দেবে যে তখন থেকে দেড় কি দু ঘণ্টা বাদে আপনার জন্য সেই ট্রামে জায়গা নির্দিষ্ট থাকবে। এতক্ষণ সময় কিন্তু কোনো বেঞ্চে বসে বাদাম চিবিয়ে কাটাতে হবে না, তারও ব্যবস্থা আছে। আলাদা আলাদা জায়গায় কয়েকটি নাটকীয় প্রদর্শনী আছে, তার যে-কোনো একটায় ঢুকে পড়া যায়। যেমন একটাতে আছে ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের বাড়ি, সেখানে সত্যিকারের জ্যান্ত ভূত ও ভ্যামপায়ার আসে, নানা রকম কাণ্ড কারখানা হয়, তারপর শেষে লাগে ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন ও হাল্‌কের (মানুষ-দৈত্য) মধ্যে মারামারি। অন্য একটি জায়গায় দেখানো হয় যত রাজ্যের পোষা জন্তু জানোয়ারের খেলা। আর একটিতে থাকে কোনো ওয়েস্টার্ন ছবির একটি দৃশ্য, ছবি নয়, বাস্তব। এক বাড়ির ছাদ থেকে অন্য বাড়ির ছাদে লাফিয়ে চলে যাচ্ছে নায়ক, নিচ থেকে ভিলেন তাকে গুলি করলো, রক্তাক্ত দেহে নায়ক সেই তিনতলা থেকে এক তলায় পড়ে গিয়েও বাঁ হাতে হাঁটুর তলা দিয়ে গুলি চালিয়ে দিল। অর্থাৎ এই সব দৃশ্যে যে ট্রিক ফটোগ্রাফি নেই, স্টান্ট ম্যানদের কৃতিত্ব, দেখিয়ে দেওয়া হলো সেটাই।

এই রকম সব নানা ব্যাপার দেখে সময় কাটবে। পুরো এলাকাটা সাজানো কোনো অষ্টাদশ শতাব্দীর শহরের মতন, সেই রকম সব দোকান, সেই রকম

সাইন বোর্ড। এরই মধ্যে এক জায়গায় চোখে পড়ে যাবে জ'স ফিল্মের নকল হাঙরটি

এর পর মূল সফর।

ট্রামে চড়লে একজন গাইড নানা রকম রঙ্গ কৌতুক করে হলিউডের বিভিন্ন সব মজার ঘটনা শোনাবে। মাঝে মাঝে ট্রাম থামিয়ে নিয়ে যাবে এক একটা স্টুডিওতে, দেখাবে স্টার ওয়ার ছবির সেট, বিখ্যাত অভিনেতা অভিনেত্রীদের মেক-আপ রুম, কিংবা সুপারম্যান কীভাবে আকাশ দিয়ে উড়ে যায় সেই কায়দা। দর্শকদের মধ্যে দু' একজনকে বেছে নিয়ে তাদেরও উড়িয়ে দেবে।

ট্রামটার যাত্রা পথেও নানা রকম রোমাঞ্চ আছে। একটি নড়বড়ে কাঠের ব্রিজ পার হওয়া মাত্রই ভেঙে পড়ে যাবে ব্রিজটি। কোথাও সামনে জলাশয়, কিন্তু ট্রামটি জলের উপর দিয়ে চলতে চাইলেই জল দু' পাশে সরে গিয়ে রাস্তা করে দেবে। মোজেস যে-ভাবে দলবল নিয়ে সমুদ্র পার হয়েছিলেন, দেখিয়ে দেবে সেই দৃশ্যটি। কোথাও মুখোমুখি অন্য গাড়ির সঙ্গে কলিশন হতে হতেও বেঁচে যাওয়া যাবে। কিংবা গাইড বলবে, এবার কিন্তু বৃষ্টি নামবে। সঙ্গে সঙ্গে ঝুপ ঝুপ করে প্রবল বর্ষণ। কিংবা বলবে, ডান পাশে দেখুন উত্তর মেরু। অর্থাৎ একটা বিরাট সমতল মাঠে ময়দা ছড়িয়ে উত্তর মেরুর বরফ তৈরি করা হয়েছে। শেষের দিকে ট্রামটা ঢুকে যায় একটা গুহার মধ্যে, মনে হয় যেন পৃথিবীর পেটের মধ্যে চলে যাচ্ছে। জার্নি টু দা সেন্টার অফ দা আর্থ।

পুরো জায়গাটা যে কত বড়, তা ঠিক ধারণা করা যায় না। কী যেন একটা হিসেব দিয়েছিল, বোধহয় আট-দশ বর্গ কিলোমিটার। এই হলো একটা মাত্র স্টুডিও'র নমুনা।

কণ্ডাকটেড ট্যুর আমার কখনো বিশেষ পছন্দ হয় না। কিন্তু এ রকম ট্যুর না নিলে তো হলিউডের স্টুডিও দেখবার অন্য কোনো উপায়ও নেই। আমার সঙ্গে তো ডাস্‌টিন হফ্‌ম্যান কিংবা এলিজাবেথ টেলরের খাতির নেই যে আমাকে ওদের শুটিং দেখাতে নিয়ে যাবে! টিকিট কেটে এ জিনিস দেখাও একটা সত্যিকারের নতুন অভিজ্ঞতা।

এল এ-র অন্য বিশেষ দ্রষ্টব্য স্থান হলো ডিজ্‌নিল্যাণ্ড।

সেখানে গিয়ে আমার মন খারাপ হয়ে যায়। আমার চেনা যত বাচ্চা ছেলেমেয়ে আছে, তাদের জন্য কষ্ট হয়। আমার বদলে ওদেরই তো আসা উচিত ছিল এখানে।

পুরো ডিজনিল্যাণ্ডটিকেই একটি স্বপ্ন রাজ্য করে রাখা হয়েছে। যন্ত্রপাতির সঙ্গে কল্পনা মিশিয়ে এক অপরূপ রূপকথা।

ডিজনিল্যাণ্ডের প্রধান আকর্ষণ এর বিশালত্ব। আমেরিকানদের সব কিছুই খুব বড় বড়। এবং বড় হলেই যে তা আকর্ষণীয় বা সুন্দর হবে, তার কোনো মানে নেই। কিন্তু ডিজনিল্যাণ্ডের ক্ষেত্রে এ প্রশ্ন ওঠে না। সত্যিই এটা অভাবনীয় রকমের বড় এবং সুন্দর।

টিকিট কেটে ঢুকতে হয় এবং সব জায়গাটাই ঘেরা। কিন্তু এরই মধ্যে আছে একাধিক পাহাড়, নিবিড় জঙ্গল, বেশ চওড়া নদীও একাধিক, অনেকগুলি পার্ক, এক একটা শহরের টুকরো এবং বহু মণ্ডপ। এবং এর পরেও অনেক কিছু দ্রষ্টব্যই মাটির নিচে।

ডিজনিল্যাণ্ডে যেতে হয় সকালে, ফিরতে হয় মধ্যরাতে। তাতেও অবশ্য সব কিছু দেখে শেষ করা যায় না।

ডিজনিল্যাণ্ডের বর্ণনা দিয়ে কোনো লাভ নেই, কেন না, এর কোনোটাই চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। এবং নিজের রুচি অনুযায়ী বেছে নেবার অজস্র দ্রষ্টব্য এবং উপভোগ্য ব্যাপার আছে। যার উত্তেজনা কিংবা বিপদের অভিজ্ঞতা ভালো লাগে, তার জন্যও যেমন আছে ব্যবস্থা, আবার যে ভবিষ্যৎ বিজ্ঞান বা মহাশূন্য পছন্দ করে, তাকে পাঠিয়ে দেওয়া যায় সেখানে, কেউ ভূতের বাড়িতে গিয়ে অজস্র ভূত পেত্নী দেখতে পারে, আর যে ভালোবাসে নরম মধুর দৃশ্য বা সঙ্গীত, সে তাও খুঁজে পাবে। অথবা কোনো মণ্ডপে না ঢুকে চুপচাপ মাঠে বসে থাকতেও তো ভালো লাগতে পারে। সে জন্য আছে অনেক খাবারের জায়গা এবং সুরম্য বিশ্রাম স্থান। এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যাবার জন্য আছে ঘোড়ায় টানা ট্রাম কিংবা পুরোনো আমলের ছাদখোলা দোতলা বাস, কিংবা আকাশ ট্রেন, সব বিনামূল্যে।

শুধু একটি প্রদর্শনীর কথা বলি, যেটি আমার সবচেয়ে ভালো লেগেছিল, এটি দেখতে হয় একটি ছোট নৌকোয় চেপে, যেটি আপনা আপনি চলে। পুরো মণ্ডপের মধ্যে খাল কাটা আছে, তার মধ্য দিয়ে এ রকম যাত্রীবাহী বহু নৌকো চলছে। এখানে দেখা যাবে মানুষের চেয়ে একটু ছোট সাইজের সব পুতুল, এবং তাদের বাড়ি ঘর এবং পারিপার্শ্বিক। এই রকম পুতুল নিছক পঞ্চাশ বা একশোটা নয়, হাজার হাজার। এখানে রয়েছে সমস্ত পৃথিবীর মানুষের আদল, সেই রকম বিভিন্ন দেশের সাজ পোশাক, সেই রকম পরিবেশ, এবং অন্তরীক্ষে বাজে প্রত্যেকটি নির্দিষ্ট জায়গার আলাদা সঙ্গীত। সব মিলিয়ে এমন একটা ব্যাপার যা মনকে একেবারে অভিভূত করে দেয়। এই প্রদর্শনীটির নাম 'ইট্‌স আ স্মল স্মল ওয়ার্লড'। ঐ শব্দগুলি দিয়ে একটি গানও বাজে শেষকালে, সেই গানের সুরটি যেন এখনো আমার কানে লেগে আছে।

এখন এ শহরে দর্শনীয় ব্যাপার আরও আছে। কিন্তু আমার বুক কেঁপে উঠেছিল একজনকে দেখে। প্রথম দিন সন্ধেবেলাতেই তাঁকে দেখতে যাই। তাঁর নাম প্রশান্ত মহাসাগর। সব সমুদ্রের চেহারাই মোটামুটি এক রকম। কিন্তু ইনি প্রশান্ত মহাসাগর। সব সমুদ্রের রাজা। জলধিপতি, এই অনুভূতিতেই শ্রদ্ধা জাগে। মাউন্ট এভারেস্টকেও তো দূর থেকে দেখলে আর পাঁচটা বরফওয়ালা পাহাড়ের মতন দেখায়। তবু, মাউন্ট এভারেস্টের নাম শুনলেই বুক কেঁপে ওঠে না?

সমুদ্রের বুকের ওপর দিয়ে একটা সেতু অনেকখানি টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তার মাথায় একটা জেটি। সেখানে অনেকে বেড়াতে যায়। সেখানে যাবার আগে আমি জলের কিনারায় গিয়ে খানিকটা জল আঁজলা করে তুলে প্রশান্ত মহাসাগরকে প্রণাম জানালুম।

॥ ১৯ ॥

আমি কেন ফিরে যাবো, বলতে পারেন?

যুবকটির তীব্র প্রশ্ন শুনে আমি খানিকটা কাঁচুমাচু হয়ে যাই। এই সব কঠিন প্রশ্ন আমাকে জিজ্ঞেস করবার কোনো মানে হয়? কে দেশে ফিরে যাবে, কে অন্য দেশে থেকে জীবনে উন্নতি করবে, তার আমি কি জানি! ও সব তাদের নিজস্ব ব্যাপার। আমি অন্যদের সাতে পাঁচে থাকতে চাই না।

তবু যুবকটি আমার কাছে ঘুরে আসছিল বারবার।

বিশাল পার্টি, অন্তত শ খানেক নারী-পুরুষ তো হবেই। এর মধ্যে কুড়ি পঁচিশ জনের মাত্র বসবার জায়গা আছে, বাকি সবাই দাঁড়িয়ে। আমেরিকান পার্টির মতন ভয়াবহ জিনিস আর নেই। এক সঙ্গে এত মানুষ, সুতরাং সকলের সঙ্গেই সঠিক চেনা হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। তবু এ সব জায়গায় একটা অলিখিত নিয়ম আছে, প্রত্যেকের সঙ্গেই ঘুরে ঘুরে কথা বলতে হবে, এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে না। সে এক হৃদয়হীন ব্যাপার। একজন এসে প্রথমে নিজের পরিচয় দিয়ে খুবই আন্তরিক গলায় জিজ্ঞেস করবে, তুমি কোন দেশ থেকে এসেছো, সেখানকার আবহাওয়া কী রকম, তোমাদের ভাষা সমস্যার কীভাবে সমাধান করো, ইত্যাদি। মনে হবে যেন, এই সব বিষয় জানবার জন্য তার কত না আগ্রহ। কিন্তু ঠিক পাঁচ ছ' মিনিট পরে হঠাৎ 'এক্সকিউজ মী' বলে পট করে মুখ ঘুরিয়ে আর একজনের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করে দেবে। আর আমাকে চিনতেই পারবে না। এই রকম একের পর এক।

সেই জন্যই, বাধ্য হয়ে কখনো এই সব পার্টিতে যেতে হলে আমি প্রথমেই জায়গা বেছে নিয়ে এক কোণে বসে থাকি, কেউ কাছে এসে কথা বললে তো বললো, কেউ কথা না বললেও আমার জীবনের কোনো ক্ষতি হয় না।

এই পার্টিতে অবশ্য জনা আষ্টেক ভারতীয়ও আছে। শুধু ভারতীয় ক'জন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে জটলা করলে ভালো দেখায় না বলে তারাও আছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। আমি যথারীতি জানলার ধারে একটা কাঠের টুল নিয়ে আসন গেড়ে বসে উত্তম উত্তম পানীয়ের সদ্ব্যবহার করছি। কারুকে আমার দিকে আসতে দেখলেই চট করে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছি জানলার বাইরে। একেই তো ইংরেজি বলতে বলতে চোয়াল ব্যথা হয়ে যায়, তাতে প্রত্যেকের সঙ্গে একই ধরনের কথা বলারও কোনো মানে হয় না।

এই বাঙালী যুবকটি কিন্তু বারবার ধেয়ে আসছে আমার দিকে।

বছর তিরিশেক বয়েস, বেশ স্বাস্থ্যবান, সুপুরুষ, চোখ দুটিতে বুদ্ধি ও মেধার চিহ্ন আছে। সঙ্গে তার স্ত্রী, সেও বেশ সুন্দরী, কথাবার্তা খুব নরম ধরনের। মেয়েটি প্রথমে আমাকে চিনতে পারে। আমার ছোট মাসীর মেয়ে টুলটুল ওর বান্ধবী, সেই সূত্রে কয়েকবার আমায় কলকাতায় দেখেছে। এবং, কী আশ্চর্য ব্যাপার, সে নীললোহিতের লেখা টেখাও পড়েছে দু'একটা। সুতরাং, সে একটু উচ্ছ্বাস দেখালো।

তার স্বামী কিন্তু উচ্ছ্বাস-টুচ্ছ্বাসের ধার ধারে না। নীললোহিত ফিললোহিত বলে কারুর নামও সে শোনেনি। আমি টাটকা কলকাতা থেকে এসেছি, এটাই আকৃষ্ট করলো তাকে।

প্রথম আলাপেই ভদ্রলোক বক্র কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, কলকাতাটা সেই একই রকম নরক হয়েই আছে? সেই লোড শেডিং, সেই রাস্তায় ঘাটে নোংরা···

আমি হেসে বললুম, আপনি শেষ কবে কলকাতা দেখেছেন?

—সেই নাইন্টিন সেভেন্টি ওয়ানে।

—তা হলে বিশেষ কিছু বদলেছে বলে মনে হয় না। তবে হাওড়া ব্রীজের কাছে ফ্লাই ওভার হয়ে গেছে, শিয়ালদারটাও শিগগির খুলবে শুনে এসেছি···আর হাওড়ার সাব-ওয়ে কি আপনারা দেখেছিলেন?

—বুল শীট! ওসব কে শুনতে চাইছে? মানুষের অবস্থার কিছু পরিবর্তন হয়েছে? কলকাতার রাস্তায় একটা লোক মরে পড়ে থাকলে তাকে সরাতে ক'ঘণ্টা লাগে? টুয়েন্টি ফোর আওয়ার্স? ফরটি এইট?

সত্যি কথা বলতে কী আমি কলকাতার রাস্তায় কোনোদিন কোনো মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখিনি। এ রকম হয় জানি, কিন্তু আমার চোখ দুটি ভাগ্যবান,

এরকম দৃশ্য কোনোদিন সহ্য করতে হয়নি। একদিন দুপুরে শুধু মেট্রোপলিটান বিল্ডিং-এর সামনে একজন লোককে শুয়ে থাকতে দেখেছিলুম, তার মুখের ওপর মাছি উড়ছিল। কাছে গিয়ে দেখেছিলুম সে আসলে একটি অজ্ঞান মাতাল। সেটা কৌতুক দৃশ্য, করুণ কিছু ব্যাপার নয়।

সুতরাং চুপ করে রইলুম।

—কলকাতার মতন একটা এত বড় মেট্রোপলিস, অথচ এখনো সেখানে রাস্তায় লোক পড়ে থাকে, না খেয়ে মানুষ মরে, তার চেয়েও খারাপ আধ মরা হয়ে লাখ লাখ লোক বেঁচে থাকে…পৃথিবীর আর কোনো দেশ…ইন্দোনেশিয়া, সিঙ্গাপুর…এই সব মাইনর কান্ট্রিজেও এখন এরকম অবস্থা নেই। চীনের কথা তো বাদই দিলুম!

—তা আপনি ঠিকই বলেছেন।

—কেন, কেন এরকম হয়? তার কারণ, পলিটিক্যাল পার্টিগুলো…ওদের কোনো ইডিয়লজিই নেই…দেশের কথা কেউ ভাবে না…শুধু বড় বড় কথা বলে, সব ফালতু বাৎ!

গলার আওয়াজ শুনেই বোঝা যাচ্ছে ভদ্রলোকের পেটে এর মধ্যেই গেলাস চারেক হুইস্কি চলে গেছে। এই রকম সময় অনেকের মনেই আদর্শবাদ জেগে ওঠে। দেশের কথা মনে পড়ে। তা পড়ুক। কিন্তু উনি এমনভাবে আমার দিকে কটমট করে তাকিয়ে কথা বলছেন, যেন এইসব দুরবস্থার জন্য আমিই দায়ী।

ভদ্রলোকের স্ত্রী একটু অপ্রস্তুত হয়ে স্বামীকে ফিসফিস করে কী যেন বললেন।

ভদ্রলোক তবু তেড়িয়া হয়ে বললেন, আর কলকাতার টেলিফোন! সেই বর্বর যুগেই আছে না। উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে…আর দু' মাস টেলিফোন ডেড থাকলেও সাতশো টাকা বিল! আপনারা মশাই মহা ইডিয়েট, যে-যার বাড়ির রিসিভারগুলো বাড়ির সামনের রাস্তায় আছড়ে ভেঙে ফেলতে পারেন না?

ভদ্রমহিলা এবার স্বামীর জামা ধরে বললেন, এই, তোমাকে মিসেস ওয়াল্টার্স ডাকছেন বললুম না! চলো—

প্রায় টানতে টানতে তিনি নিয়ে চলে গেলেন স্বামীকে।

কিন্তু দশ মিনিট বাদেই যুবকটি আবার ফিরে এলেন। হাতে আর একটি ভরা গেলাস। চোখ লালচে, মাথার চুল খাড়া হতে শুরু করেছে।

আমাকে ভালো করে দেখে নিয়ে আবার কড়া গলায় জিজ্ঞেস করলেন, শিবপুর না যাদবপুর?

এই রে, ভদ্রলোক আমাকে প্রথম থেকেই স্বজাতি বলে ভুল করেছেন।

প্রবাসে বাঙালী দেখলে চোখ কান বুজেই বলে দেওয়া যায় ইঞ্জিনিয়ার। একশো জনের মধ্যে অন্তত আশীজন তো বটেই। আর বাকিরা ডাক্তার কিংবা শিক্ষা বিভাগের সঙ্গে যুক্ত।

আমি জানালুম যে, আমি ইঞ্জিনিয়ার কিংবা ডাক্তার নই।

—তবে প্রেসিডেন্সির ছাত্র?

—আজ্ঞে না। আমি ইস্কুল ফাইনালই পাশ করেছি তিনবারের চেষ্টায়, তারপর কোনো ক্রমে একটা মফঃস্বল কলেজে…

—স্টেটসে এসেছেন কেন?

—এই…বলতে পারেন…বেড়াতে।

—টুরিস্ট!

এমন একটা ধিক্কারের সঙ্গে বললেন কথাটা, যেন আমি একটা কেঁচো কিংবা আরশোলা। তারপর আবার যোগ করলেন, বাপের অনেক পয়সা আছে বুঝি?

আমি বললুম, আপনার মতন কোনো বড়লোক বন্ধু এ দেশ থেকে তো টিকিট পাঠিয়ে দিতেও পারে। তারপর স্রোতের ফুলের মতন এখানে ওখানে ভেসে বেড়ানো।

মুখের ভাব না বদলেই তিনি বললেন, হ্যাঁ, অনেকেই এরকম টিকিট চায় বটে। আমি দু'বছর আগে আমার এক মামার জন্য টিকিট পাঠিয়ে ছিলুম। আমার বাবা-মাও এসে ঘুরে গেছেন একবার। আমার স্ত্রী…ওর তো প্রত্যেক দু' বছর অন্তর দেশে যাওয়া চাই-ই। গতবার ওর বোনকে সঙ্গে নিয়ে ফিরেছিল। এই ক্যাপিটালিস্ট দেশে আপনারা কী দেখতে আসেন? কতকগুলো বড় বড় বাড়ি আর রাস্তাঘাট, আর ফর্সা ফর্সা মেয়েছেলে…দেশ থেকে অনেকে এসে যা পায় গপ গপ করে খেয়ে নিয়ে যায়…যত সব হ্যাংলা, বুভুক্ষু পার্টি!

মাতালের উপর রাগ করা নিয়মবিরুদ্ধ তাই আমি চুপ করে মিটিমিটি হাসতে লাগলুম।

প্রবাসে বাঙালীরা প্রায় সবাই খুবই পরিমিত মদ্যপায়ী। সকলের বাড়িতেই ওসব জিনিসপত্তর মজুত থাকে, কিন্তু নিজেরা এক দু'ঢোঁকের বেশী খান না। একেবারে টিটোটালার ও অনেক দেখা যায়। বিশেষত পার্টিতে মাতাল হওয়া একেবারেই নিয়মবিরুদ্ধ, তাই সেরকম অবস্থায় কোনো বাঙালীকে কচিৎ দেখা যায়। এই যুবকটি যে একটু বেশী পান করে ফেলেছেন, তার কারণ বোধ হয় ওঁর মনের মধ্যে বিশেষ কোনো অস্থিরতা আছে।

ভদ্রলোক আবার বললেন, এদিকে দেশটা দিন দিন গোল্লায় যাচ্ছে…এখানে যখন বেটাছেলে সাহেবরা জিজ্ঞেস করে, তোমাদের ইণ্ডিয়া এত বড় দেশ।

সেখানে ওয়ার্ক-ফিলসফি নেই কেন ? কাজ করাটা যে একটা পবিত্র ব্যাপার, সেটা এখনো কেউ বোঝালো না···কী উত্তর দোবো ! বলি, তোমরা, ক্যাপিস্টলিস্টরাই তো আমাদের দেশটাকে চুষে চুষে ছিবড়ে করে দিয়েছো··· । কী, ঠিক কি না ? হাঁ করে বসে আছেন কেন, আমি যা বলছি, তা মাথায় ঢুকছে ?

—আপনি তো ঠিকই বলছেন ?

—আলবাৎ ঠিক বলবো । বিকজ আই নো-ও-ও-ও ! আমি নিজে এক সময় মাঠে ঘাটে ঘুরেছি, ভূমিহীন চাষীদের মধ্যে কাজ করেছি···কিন্তু কী লাভ ! সবাই বড় বড় বাকতাল্লা দেয় । শ্রেণী সংগ্রাম ! হুঃ ! মুখের কথা ! আজ অবধি কেউ ধর্মের বিরুদ্ধে, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে একটাও কথা বলেছে ? এমনি এমনি শ্রেণী সংগ্রাম হয় ? যত সব বামুন কায়েতের লীডারশীপ···

আমি দু'বার উদ্দেশ্যমূলকভাবে কাশলুম । কারণ, ভদ্রলোক খুব জোরে জোরে বাংলায় কথা বলছেন বলে কাছাকাছি অনেকে অবাক হয়ে ফিরে তাকাচ্ছেন ।

এবারও ওঁর স্ত্রী ছুটে এলেন । ভদ্রলোকের জামার হাতা ধরে বললেন, এই, তোমার খাবার প্লেট ফেলে এসেছো···আমাদের বাড়ি যেতে হবে না ? চলো, চলো । আজ কিন্তু আমি গাড়ি চালাবো !

হুংকার দিয়ে তিনি বললেন, হোয়াই ! আমি চালাতে পারবো না ? আমি ঠিক আছি, আমার কিচ্ছু হয়নি !

যেতে যেতে আমার দিকে একটা বিষাক্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তিনি বললেন, ভ্যাড়া ! আপনারা সব ভ্যাড়ার পাল ! সেই জন্যই তো আমাদের নেতাগুলো সব রাখাল টাইপের, তাই একবার বাঁশী বাজাচ্ছে আর একবার ফাঁকা মাঠে লাঠি ঘোরাচ্ছে ।

ওঁর স্ত্রী লজ্জিত মুখ করে তাকালেন আমার দিকে ।

জয়তীদি এসে জিজ্ঞেস করলেন, অমুক কী বলছিল তোমাকে ? খুব রেগে গেছেন মনে হলো !

আমি বললুম, রেগে গেছেন কিনা জানি না, তবে আমায় কিছু বলছিলেন না, স্বগতোক্তি করছিলেন মনে হলো ।

জয়তীদি বললেন, ও খুব ব্রিলিয়ান্ট ছেলে জানো তো···এখানে এসে এত কম বয়েসে যা উন্নতি করেছে···বড় বড় কম্পানি থেকে ওকে ডাকাডাকি করে···তবে ঐ একটা দোষ, একটু হুইস্কি পেটে পড়লেই চ্যাঁচামেচি শুরু করে দেয় ।

—বেশী খাটতে হয় বোধ হয়, তাই রিলাক্সেশানের জন্য ।

—তোমার দীপকদার সঙ্গে তো কতবার ওর তর্ক হয়েছে । তবে ওর মনটা

খুব ভালো···

জয়তীদি আমার সঙ্গে বেশীক্ষণ কথা বলতে পারলেন না । অন্য একজন তাঁকে ডেকে নিয়ে চলে গেল ।

আমি যুবকটির কথা ভাবতে লাগলুম । বয়েস তিরিশের কাছাকাছি । দশ বছর কলকাতাতেই যায়নি । তা হলে বিয়ে হলো কোথায় ? কুড়ি বছর বয়েসেই কি বিয়ে করে এসেছিল ? অথবা মেয়েটি এসেছিল এদেশে, তারপর দুজনের মন-বিনিময় ।

আবার যুবকটি চলে এলো আমার দিকে । এবার স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়েই । ওঁর স্ত্রী ওঁকে অনবরত কিছু বোঝাবার চেষ্টা করছেন, কিন্তু নাটকীয় কিছু ঘটে যাওয়ার আশঙ্কায় বেশী জোর করতে পারছেন না ।

যুবকটির হাতে আর একটা ভর্তি গেলাস । এবার অবস্থা বেশ টলটলায়মান ।

এবারও বেশ জোর গলায় সে বললো, শুনুন মশাই, আমার বউ প্রায়ই দেশে ফিরে যাবার জন্য ন্যাগ করে, কিন্তু আমি কেন ফিরে যাবো বলতে পারেন ? গীভ মি ওয়ান সিংগ্‌ল সলিড রিজন !

এর কোনো উত্তর হয় না । তাই আমি মুখ নিচু করে সিগারেট ধরাবার জন্য অনেক সময় নিলুম ।

উনি আবার বললেন, কেন ফিরে যাবো ! এখানে আই হ্যাভ মাই ওউন হাউজ···সুইমিং পুল আছে, তিনটে গাড়ি···পৃথিবীর যে-কোনো জায়গায় আমি যখন তখন বেড়াতে যেতে পারি··· । দেশে গেলে শালা কেউ আমার কাজের দাম দেবে ? নিজেরাই কেউ কাজ করতে জানে না···গভর্নমেন্টের একটা অর্ডার বেরুতে আঠারো মাস···রেড টেপ আর বিউরোক্রেসি···একটা ফালতু চাকরি দেবে, তারপর ফ্ল্যাট খুঁজে পেতে হয়রান···কেন যাবো ?

হঠাৎ আমার মেজাজ খারাপ হয়ে গেল । আমি অসহিষ্ণুভাবে বললুম, কে আপনাকে ফিরে যাবার জন্য মাথার দিব্যি দিয়েছে ? আপনাদের মতন লোকেরা দেশে ফিরে গিয়ে এটা নেই, সেটা নেই, উঃ কী গরম, উঃ কী নোংরা, এইসব নিয়ে অনবরত ঘ্যান ঘ্যান করেন, তা আমাদের মোটেই শুনতে ভালো লাগে না । আপনারা যেন সবাই এক একটি বাইবেলের প্রডিগ্যাল সন্, দেশে ফিরলেই রাজার মতন আদর করতে হবে ! আপনাদের বাদ দিয়েও তো দেশটা কোনোক্রমে চলে যাচ্ছে, ডুবে তো যায়নি ।

এক তোড়ে বলে যাচ্ছিলুম, হঠাৎ ভদ্রমহিলার দিকে চোখ পড়লো । তাঁর মুখ থেকে সনির্বন্ধ মিনতি ঝরে পড়ছে । যেন তিনি বলতে চাইছেন, দয়া করে, এই সময় আমার স্বামীর কথায় কিছু মনে করবেন না, ওঁর সঙ্গে তর্ক করবেন না ।

তৎক্ষণাৎ আমি লজ্জিত ও অনুতপ্ত বোধ করলুম।

ভদ্রলোক একটু দুলতে দুলতে বললেন, হুঁ, রাগ আছে তা হলে? বিষ নেই তার কুলোপানা চক্র। দেশে বসে এই রাগ দেখাতে পারেন না? সব ব্যবস্থা চুরমার করে দিতে পারেন না। আমেরিকাতে এসেছেন মজা মারতে?...আমার কথা আলাদা, আই অ্যাম আ প্রিজনার অব ইনডিসিশান...ওয়াক্।

ভদ্রলোক ছুটে চলে গেলেন বাথরুমের দিকে। বুঝলাম, এখন বমি করবেন। অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন তাঁর স্ত্রী।

পার্টি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, এরপর খাবার টাবার নেবার জন্য আমায় উঠে যেতে হলো টেবিলের দিকে।

একটু পরে দেখলুম সেই ভদ্রলোক বাথরুম থেকে বেরিয়ে একটা চেয়ারে মাথা হেলান দিয়ে বসে আছেন, চোখ দুটি ওপরের দিকে।

সে রকম দুঃখী, অসহায়, বিভ্রান্ত, করুণ মুখ আমি আর কখনো দেখিনি।

॥ ২০ ॥

প্রশান্ত মহাসাগরের বেলাভূমিতে ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম বালির ওপর দিয়ে। একটু আগে সারা আকাশ রঙে ভাসিয়ে সূর্যদেব ডুব দিয়েছেন সমুদ্রে, তবু এখনো দিনের আলো আছে। লস এঞ্জেলিসের সূর্যাস্ত একটা বিশেষ দ্রষ্টব্য ব্যাপার। এখানে একটা বিখ্যাত রাস্তারও নাম সানসেট বুলেভার।

এখানে খুব একটা ভিড় নেই। ক্যালিফোর্নিয়ায় ভিড় হয় শীতকালে, যখন এ দেশের প্রায় সব জায়গাই বরফে ঢাকা থাকে, শুধু ক্যালিফোর্নিয়ায় পাওয়া যায় বসন্তের হাওয়া।

তবে অনেকগুলো ছেলে-মেয়ে সার্ফিং করছে জলে। এ এক বিচিত্র খেলা, ঢেউ-এর সঙ্গে যুদ্ধ করে ক্রমশই সামনের দিকে এগিয়ে যাবার চেষ্টা। এই রকম খেলা চলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, ঠিক যেন পাগলামির মতন। শুনেছি অনেক ছেলেমেয়ে সারা রাতই জলে থাকে।

একটা ধপধপে সাদা রঙের ক্যাডিলাক গাড়ি থেকে নেমে একজন মহিলা ধীর পায়ে এগিয়ে আসতে লাগলেন জলের দিকে। ভদ্রমহিলা পরেছেনও সাদা লম্বা স্কার্ট, মাথায় সাদা টুপি, দু' হাতে সাদা রঙের গ্লাভ্স। জলের কাছাকাছি এসে শ্বেতবসনা সুন্দরীটি মাথা থেকে টুপি খুললেন, হাতের গ্লাভ্সও খুলতে লাগলেন। মনে হয়, তিনি সমুদ্রের জলে মুখ ধুতে চান।

টুপি খুলতেই দেখা গেল মহিলার মাথাভর্তি সোনালি চুল। বয়েস অন্তত

চল্লিশ তো হবেই, তবু এখনো মুখখানা বেশ সুন্দর, চোখের মণিদুটি নীল।

মহিলাকে দেখে জয়ন্তীদি দারুণ চমকে উঠে তাঁর মেজদিকে বললেন, মেজদি, দ্যাখ, দ্যাখ। কে চিনতে পারছিস?

মেজদি প্রথমে একেবারে উল্টো দিকে একটা লম্বা লোককে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, কই? কই? কে রে?

আমরাও সবাই উৎসুক হয়ে দেখতে লাগলুম মহিলাকে। চেনা চেনা লাগছে, কিন্তু ঠিক যে কে তা বুঝতে পারছি না।

জয়ন্তীদি ফিসফিস করে বললেন, শার্লি ম্যাকলেইন!

আমরা সবাই তৎক্ষণাৎ চিনতে পারলুম। মাত্র দু'দিন আগেই আমরা টি ভি-তে জ্যাক লেমন-এর সঙ্গে শার্লি ম্যাকলেইনের একটা চমৎকার ফিল্ম দেখেছি। সেই ফিল্মের তুলনায় এখন বয়েসটা বেশী দেখালেও সেই একই মুখ।

হলিউডের শহরে এসে এক জলজ্যান্ত হিরোইনকে দেখতে পাবার রোমাঞ্চই আলাদা। বোম্বাই-এর কোনো হিরোইন একলা সমুদ্রের ধারে বেড়াতে গেলে নিশ্চয়ই ভিড় সামলাবার জন্য পুলিস ডাকতে হয়, কিন্তু এখানে সেরকম কোনো ব্যাপার নেই। এখানে ফিল্ম স্টারদের কিছুটা স্বাধীনতা আছে মনে হচ্ছে।

শার্লি ম্যাকলেইন পা থেকে জুতো খুলে ফেলে খানিকটা জলে নেমে গেলেন, তারপর দিগন্তের দিকে তাকিয়ে রইলেন উদাসভাবে।

কয়েকদিন আগেই ন্যাটালি উড নামের আর একজন নায়িকার মর্মান্তিক মৃত্যু সংবাদ আমরা কাগজে পড়েছি। 'ওয়েস্ট সাইড স্টোরি'-তে দারুণ অভিনয় করেছিলেন ন্যাটালি উড। তিনি এখানে একটা ছবির শুটিং-এর অবসরে একলা কিছুক্ষণ সময় কাটাবার জন্য একটা ছোট্ট নৌকো নিয়ে ভেসে পড়েছিলেন সমুদ্রে। কিছুক্ষণ বাদে দেখা গেল নৌকোটি ফাঁকা। সমুদ্রে ফাঁকা নৌকো দেখলেই অন্য নৌকো চালকরা বিচলিত হয়ে ওঠে। পরে ন্যাটালি উড্-এর জলে ডোবা শরীর উদ্ধার করা হয়েছিল। দুর্ঘটনা না তিনি আত্মহত্যা করেছেন, তা বোঝা গেল না। উনি সাঁতার জানতেন। সার্থকতা অনেক সময় মানুষকে চরম অসুখী করে দেয় বোধহয়। ন্যাটালি উডের পেটে অনেকখানি অ্যালকোহল পাওয়া গিয়েছিল।

আমরা ভাবলুম, ন্যাটালি উড নিশ্চয়ই শার্লি ম্যাকলেইন-এর খুব বান্ধবী ছিলেন, সেই জন্য উনি এখনো সেই দুঃখ ভুলতে পারছেন না।

দীপকদা বললেন, এই রে, এই নায়িকাটিও আবার আত্মহত্যা করবে না তো? অনেকখানি জলে নেমে যাচ্ছে যে।

আমি বললুম, না, না, শার্লি ম্যাকলেইন খুব ভালো মেয়ে। মদটদ খায় না।

মেজদি বললেন, তুমি এমনভাবে বলছো, যেন ও তোমার বান্ধবী?

আমি বললুম, বান্ধবী না হলেও ওঁর সঙ্গে আমার আলাপ আছে। একদিন অনেকক্ষণ একসঙ্গে থেকেছি।

সকলে আমার দিকে এমনভাবে তাকালো, যেন আমি একটা ডাহা মিথ্যুক। সত্যি কথা সরলভাবে বললে কেউ বিশ্বাস করে না। এরা ভাবছে শার্লি ম্যাকলেইন হলিউডের টপ্ হিরোইনদের একজন, বিরাট বড়লোক, আর আমি কলকাতার একটা ফ্যা-ফ্যা করে ঘুরে বেড়ানো ছোকরা, আমাদের মধ্যে পরিচয় হওয়া অসম্ভব। কিন্তু এরকম অসম্ভবও সম্ভব হয় মাঝে মাঝে।

আমি বললুম, শার্লি ম্যাকলেইন প্রায়ই কলকাতায় যান। অন্তত দু'বার যে গেছেন, তা আমি নিজেই জানি। ডায়মণ্ডহারবারের কাছে একটা অনাথ আশ্রম আছে। একজন বিদেশী পাদ্রী সেই আশ্রমটি চালান। শার্লি ম্যাকলেইন সেই আশ্রমকে অনেক সাহায্য করেন, টাকা তুলে দেন।

এবারে মেজদি এবং শিবাজী দু'জনেই স্বীকার করলো যে এরকম একটা খবর দেশে থাকতে তারা কাগজে পড়েছে বটে একবার। গ্র্যাণ্ড হোটেলে শার্লি ম্যাকলেইন কী যেন একটা ফাংশান করেছিল।

আমি বললুম, একজ্যাক্টলি। সেই ফাংশান উনি করেছিলেন অনাথ আশ্রমের টাকা তোলার জন্য। তারপর নিজে ডায়মণ্ডহারবারের সেই আশ্রমেও গেছেন।

দীপকদা বললেন, তোমার সঙ্গে কোথায় দেখা হলো? তুমি কি সেই অনাথ আশ্রমে অনাথ বালক হয়ে ছিলে নাকি?

—প্রায় তাই বলতে পারেন। আমার এক মাসতুতো দাদা ঐ অনাথ আশ্রমের সঙ্গে খানিকটা যুক্ত। সেই জন্য আমি ওখানে কয়েকবার গেছি। সবচেয়ে বড় কথা এই, কলকাতা থেকে শার্লি ম্যাকলেইন যখন ডায়মণ্ডহারবারে যাচ্ছিলেন, তখন সেই গাড়িতে আমি জায়গা পেয়েছিলুম। গাড়িটা প্রায় খালিই যাচ্ছিল, উনিই বললেন, দু'একজন এই গাড়িতে আসুক না। তারপর আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, এই, তুমি এসো। তারপর যেতে যেতে অনেক গল্প হলো।

দীপকদা বলেন, শার্লি ম্যাকলেইন নাচ-গানের ছবিতে অভিনয় করে বটে, কিন্তু এমনিতে খুব তেজী মহিলা। আমি একটা ঘটনা জানি, ওঁর একটা ছবি ইণ্ডিয়াতে রিলিজ আটকে দেওয়া হয়েছিল। তারপর কী একটা উপলক্ষে লণ্ডনে ওঁর সঙ্গে ইন্দিরা গান্ধীর দেখা। একগাদা লোকজনের মাঝখানে শার্লি ইন্দিরা গান্ধীকে জিজ্ঞেস করলো, আপনাদের দেশে নাকি ডিমক্রেসি আছে? তা হলে

আমার ছবিটা দেখাতে দিচ্ছেন না কেন? ইন্দিরা গান্ধী অপ্রস্তুতের একশেষ। দেশে ফিরেই ছবিটি রিলিজের ব্যবস্থা করে দেন।

জয়তীদি মুচকি হেসে আমার পিঠে একটা ছোট্ট ধাক্কা দিয়ে বললে, তবে তো দেখছি তোমার গার্ল ফ্রেণ্ড! যাও, গিয়ে কথা বলো!

আমি বললুম, ধ্যাৎ! আমায় উনি চিনতে পারবেন কেন?

মেজদি বোধহয় তখনও পুরোপুরি আমার কথা বিশ্বাস করেননি, তাই বললেন, না, না, ওর কথা বলার দরকার নেই।

শার্লি ম্যাকলেইন স্কার্ট ভিজিয়ে প্রায় হাঁটু পর্যন্ত জলে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। এবার আস্তে আস্তে উঠে এলেন।

তারপরেই সেই চমকপ্রদ ঘটনাটি ঘটলো।

শার্লি ম্যাকলেইন কৌতূহলী চোখে আমাদের দলটির দিকে তাকালেন। শাড়িপরা মহিলা দেখলে এ দেশের মহিলারা বেশ আকৃষ্ট হয়।

শার্লি আমাদের উদ্দেশে বললেন, হাই!

আমাদের মধ্যে জয়তীদিই সবচেয়ে সপ্রতিভ। উনি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, হাই!

শার্লি কয়েক পা এগিয়ে এলেন আমাদের দিকে। তারপর আমাদের আর একটু ভালো করে দেখে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, বাই এনি চ্যান্স, আর ইউ অল ফ্রম ক্যালকাটা?

জয়তীদি বললেন, ইয়া।

এরপর সেই ভুবনমোহিনী সরাসরি আমার মুখের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে জিজ্ঞেস করলেন, ডিড্‌নচাই মিট য়ু সামহোয়্যার বাফোর?

চিত্রতারকার এরকম অত্যাশ্চর্য স্মৃতিশক্তি? এ যে অবিশ্বাস্য! হাজার হাজার মানুষের সঙ্গে এঁদের দেখা হয়। তবে কি আমার বোঁচা নাক এবং ছোট ছোট কুতকুতে চোখের জন্য বিশ্বের শ্রেষ্ঠ অসুন্দর পুরুষ হিসেবে আমায় উনি মনে রেখেছেন?

আমি থতমতো খেয়ে বললুম, হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনার কি ডায়মণ্ডহারবার বলে একটা জায়গার কথা মনে আছে? সেখানকার অনাথ আশ্রম…আমি সেবারে আপনার সঙ্গে অনেক কথা বলেছিলাম…

শার্লি বললেন, ডায়মণ্ডহারবার! অফ খোর্স! চী চমৎকার নাম। সেই বয়েজ হোম…তার অবস্থা এখন…

কথা বলতে বলতে থেমে গিয়ে তিনি সকলের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের এখন কি খুব জরুরি কাজ আছে? এসো না আমার

বাড়িতে...কিছুক্ষণ গল্প করা যাবে। আমি ডায়মণ্ডহারবারের সেই বয়েজ হোম সম্পর্কে খবর টবর জানতে চাই!

আমি সগর্বে আমার সঙ্গিনী ও সঙ্গীদের দিকে তাকালুম। সব সময় আমায় হেলা তুচ্ছ করো, কিন্তু বেভার্লি হিলস, যেখানে রাজা-রাজড়ারাও সহজে প্রবেশ অধিকার পায় না, সেখানে নেমন্তন্ন জোগাড় করার হিম্মৎ তোমাদের কারুর আছে?

এক কথায় এ রকম নেমন্তন্ন গ্রহণ করা উচিত কি না এই ভেবে দীপকদারা ইতস্তত করছিলেন, কিন্তু শার্লি আমাদের দ্বিধার বিশেষ সুযোগ দিলেন না। মেজদি আর জয়ন্তীদির দিকে এগিয়ে এসে খুব আন্তরিকভাবে বললেন, এসো, এসো। বেশীক্ষণ আটকে রাখবো না।

জয়ন্তীদির দুই মেয়েকে রেখে আসা হয়েছে দীপকদার এক বোনের বাড়িতে। ওরা খুব মিস্ করলো। আমরা ভাগাভাগি করে দুটি গাড়িতে উঠলুম। এবারও আমার স্থান হলো শার্লি ম্যাকলেইনের গাড়িতে। শার্লি নিজেই গাড়ি চালান।

বেভার্লি হিল্‌স-এ আমরা আগেও একবার ঘুরে গেছি। পাহাড়ের গায়ে গায়ে এক একটা বাড়ি আর নিরিবিলি ঝকঝকে রাস্তা। এর মধ্যে এক একটা বাড়ি এক একজন বিখ্যাত স্টারের, কোন্‌টা কার বাড়ি তা অবশ্য বোঝবার উপায় নেই। আগেরবার আমরা কল্পনাই করতে পারিনি যে এই রকম কোনো বাড়িতে ঢুকবো।

শার্লি ম্যাকলেইন কতবার বিয়ে করেছেন কিংবা বর্তমানে তাঁর কোনো স্বামী আছে কি না তা আমি জানি না। জিজ্ঞেসও করা যায় না। জয়ন্তীদির বড় মেয়ে জিয়া সব খবর রাখে, সে থাকলে নিশ্চয়ই বলতে পারতো। ওঁর বাড়িতে ঢুকে প্রথমেই যেটা নজরে পড়ে, তা হলো নির্জনতা। বেশ বড় বাড়ি, সামনে বাগান, কিন্তু কোনো লোকজন চোখে পড়ে না। একটি মাত্র ঘরে আলো জ্বলছে। গেটে কোনো দরোয়ান নেই, সেক্রেটারি বা বডিগার্ড জাতীয় কেউ অভ্যর্থনা করতে ছুটে এলো না। এত বড় বাড়িতে এই ধনী মহিলা একা থাকেন নাকি? প্রথমেই মনে হয়, এ সব বাড়িতে ডাকাতি করা তো খুব সোজা!

বাড়ির মধ্যে আমাদের দ্বিতীয় চমকটি অপেক্ষা করছিল।

বসবার ঘরটি অতি প্রশস্ত। এক সঙ্গে অন্তত পঞ্চাশজন লোক এঁটে যায়। ফিল্‌ম স্টারদের বাড়িতে প্রায়ই বড় বড় পার্টি হয়, সেই জন্যই এ রকম ঘর দরকার। সেই ঘরের এক কোণে দু'জন বেশ বুড়ো লোক গেলাস হাতে নিয়ে প্রায় ফিসফিস করে কথা বলছে। শার্লি ঘরে ঢুকে ওঁদের দেখতে পেয়ে বললেন, হাই গ্রেগ্! হাই অ্যাল!

আমার প্রায় দম বন্ধ হয়ে যাবার জোগাড়। গ্রেগরি পেক আর অ্যালেক গিনেস। এই দু'জনই যে আমার প্রথম যৌবনের হীরো। গ্রেগরি পেকের ছবি এলে পাগলের মতন দেখতে ছুটতাম! আর অ্যালেক গিনেশ, সেই ব্রিজ অন দা রিভার কোয়াই-এর নায়ক! পর্দার দুই দেবতা জলজ্যান্ত অবস্থায় বসে আছে আমাদের সামনে!

দু'জনেই বেশ বুড়ো হয়ে গেছেন। কিছুদিন আগেই 'বয়েজ ফ্রম ব্রাজিল' নামে একটা ফিল্‌মে গ্রেগরি পেককে বুড়ো অবস্থাতেই দেখেছি, সেই জন্য চিনতে অসুবিধা হলো না। তবে রোমান হলিডের নায়কের সেই হাসিটি এখনো একই রকম আছে মনে হলো।

আমাদের সঙ্গে শার্লি ওঁদের পরিচয় করিয়ে দিতে ওঁরা দু'জনেই সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ালেন। কিন্তু আমাদের দেখে ওরা খুব খুশী হয়েছেন বলে মনে হলো না। ওঁরা বোধহয় শান্ত নিরিবিলি সন্ধ্যা কাটাতে চেয়েছিলেন, তার মধ্যে এই ভারতীয় উৎপাত পছন্দ হবে কেন?

গ্রেগরি পেক তাঁর সেই বিখ্যাত গলায় শার্লিকে বললেন, অ্যাল প্যাচিনো আর মেরিল স্ট্রিপ একটুবাদেই আসবে। ওরা কি একটা জরুরি ব্যাপারে মিটিং করতে চায়। তোমাকে ফোন করেছিল, মনে নেই!

শার্লি বললেন, হ্যাঁ, মনে আছে। অ্যাল প্যাচিনো পরে আবার ফোন করে জানিয়েছে যে সে আটটার আগে আসতে পারবে না। তার আগে আমার কলকাতার বন্ধুদের সঙ্গে একটু গল্প করে নিই।

শার্লি সুমধুর টুং টাং রবে একটা ঘণ্টা বাজাতেই সঙ্গে সঙ্গে একজন জাপানী পরিচারক এসে হাজির হলো, তা হলে বাড়িটা একেবারে জনহীন নয়। কিন্তু এরা এরকম নিঃশব্দে থাকে যে বোঝাই যায় না।

শার্লি জিজ্ঞেস করলেন, আমরা কে কী পানীয় নেবো। উনি নিজের জন্য চাইলেন শুধু এপ্রিকটের রস।

তারপর আমরা গল্প করতে বসলুম।

কিন্তু গল্প ঠিক জমলো না। শার্লির অনবরত ফোন আসতে লাগলো। উনি উঠে উঠে ফোন ধরছেন আর কথা থেমে যাচ্ছে। টুকরো টুকরো ফোনের সংলাপ শুনে বুঝতে পারলুম, আরও অনেকে এ বাড়িতে আজ আসবে। কী একটা ব্যাপারে চিত্র তারকারা বেশ উত্তেজিত।

জয়ন্তীদি আমায় বললেন, এই শোন, উনি আমাদের ডেকে এনে খুবই ভদ্রতা করেছেন। এখন আমাদের পক্ষে ভদ্রতা হলো খুব তাড়াতাড়ি চলে যাওয়া। এঁরা আজ ব্যস্ত আছেন।

সুতরাং আমরা সবাই এক সঙ্গে উঠে দাঁড়ালুম। শিবাজী সকলের অটোগ্রাফ নিল। শার্লি ম্যাকলেইন বললেন, শিগগিরই ওঁর একটা শুটিং আছে জাপানে, তখন একবার কলকাতায় যাবেন। তখন আবার নিশ্চয়ই দেখা হবে ?

আমরা বললুম, নিশ্চয়ই! নিশ্চয়ই!

বাইরে বেরিয়ে এসে শিবাজী বললো, গ্রেগরি পেক আমার সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করেছে, কলকাতায় কেউ শুনলে বিশ্বাস করবে ?

এবার আমার প্রশ্ন : সরল মতি পাঠকপাঠিকারা আমার এই কাহিনীটি বিশ্বাস করেছেন তো ? এরকমভাবেও যে ভ্রমণ কাহিনী লেখা যায়, তার একটি নমুনা দেখাবার জন্যই এবারের এই রচনা। পুরো ব্যাপারটাই বানানো। এমনকি শার্লি ম্যাকলেইনের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়েরও ব্যাপারটাও গুল! লস এঞ্জেলিসে বেভার্লি হিলে ঘুরে ঘুরে কোনো নায়ক-নায়িকার দর্শন পাওয়া তো দূরে থাকুক, চিনতে পারা যায় এমন কোনো একস্ট্রাকেও আমরা দেখতে পাইনি।

॥ ২১ ॥

লস এঞ্জেলিসে আমরা যাঁর বাড়িতে উঠেছি, ধরা যাক, তাঁর নাম তাপসবাবু। তিনি ছেলেবেলায় কোনো বইতে ক্যালিফোর্নিয়ার একটি সুন্দর বর্ণনা পড়ে ঠিক করেছিলেন, জীবনে কোনো না কোনোদিন ক্যালিফোর্নিয়া দেখতে যাবেনই। তারপর চাকরি জীবনে নানা জায়গা ঘুরতে ঘুরতে, ইওরোপ হয়ে, শেষ পর্যন্ত সেই ক্যালিফোর্নিয়াতেই থিতু হয়ে বসেছেন। এবং তাঁর স্বপ্ন ভঙ্গ হয়নি, তাঁর কল্পনার ক্যালিফোর্নিয়ার সঙ্গে বাস্তবের জায়গাটিও মিলে গেছে।

ইওরোপেও এরকম একজনের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, যিনি স্কুল জীবনে মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা 'লাফা যাত্রা' পড়ে মনে মনে সংকল্প নিয়েছিলেন যে কোনো উপায়ে একদিন না একদিন তিনিও হিচ হাইকিং করে সারা ইওরোপ ঘুরবেন। আজ তিনি কুড়ি-পঁচিশ বছর ধরে ইওরোপ প্রবাসী। এখন আর হিচ হাইকিং করেন না অবশ্য। নিজের গাড়ি চালিয়েই যখন তখন ফ্রান্স থেকে জার্মানি কিংবা সুইটসারল্যাণ্ড কিংবা ইতালি চলে যান।

ক্যালিফোর্নিয়ার তাপসবাবুর চেহারা আর পাঁচজন বাঙালীবাবুর মতন হলেও তিনি কিন্তু আর বাঙালী নন। তিনি এখন আমেরিকান। বেশ কয়েক বছর আগেই তিনি পুরোদস্তুর মার্কিন নাগরিকত্ব পেয়েছেন, এখানকার নির্বাচনে ভোট দেন, এখানকার ফুটবল খেলায় তাঁর নিজস্ব প্রিয় দল আছে, সেই দলের জয়ে তিনি উল্লসিত হন, পরাজয়ে মূহ্যমান। ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের ব্যাপারে তাঁর

কোনো আগ্রহ নেই। ভারতবর্ষ এখন তাঁর পূর্বপুরুষদের দেশ। যেমন অনেক শ্বেতাঙ্গ আমেরিকান মাঝে মাঝে পূর্বপুরুষদের দেশ দেখবার জন্য আয়ার্ল্যাণ্ডে কিংবা জার্মানিতে কিংবা রাশিয়ায় যায়, সেই রকম তাপসবাবুও কচিৎ কখনো কলকাতায় যাওয়ার কথা ভাবেন। ওঁর স্ত্রীও অবশ্য বাংলার মেয়ে। ঝুমুর দেবী পড়াশুনো করতে বিদেশে এসেছিলেন, তারপর চাকরি, তারপর এঁর সঙ্গে পরিচয় এবং বিবাহ। ঝুমুর দেবীর বরং প্রাক্তন স্বদেশ সম্পর্কে টান একটু বেশী মনে হয়। নানা প্রসঙ্গে সেই কথা এসে পড়ে। এই ঝুমুর দেবী আমাদের দীপকদার মাসতুতো কিংবা পিসতুতো বোন।

আবার এর উল্টোটাও দেখা যায়। পনেরো-কুড়ি বছর ধরে প্রবাসী বাঙালী দম্পতির হঠাৎ একদিন মনে হয়, আর নয়, যথেষ্ট হয়েছে, এবার তল্পিতল্পা গুটিয়ে দেশে ফেরা যাক। বিশেষত ছেলেমেয়েরা বড় হতে শুরু করলেই মন এরকম উন্মনা হয়। এ দেশের নিয়ম অনুযায়ী ছেলে-মেয়ে আঠারো বছর বয়সে পা দিলে ঘর-ছাড়া হয়ে যাবেই। সারা জীবনে আর ক'বার তাদের মুখ দেখতে পাওয়া যাবে সেটাই সন্দেহ। স্বাবলম্বিনী হবার আগেই মেয়ে তার বয় ফ্রেণ্ডের সঙ্গে ডেটিং করতে চলে যাবে, সারা রাত হয়তো বাড়িই ফিরলো না। বাঙালী বাবা-মায়েদের হৃদয় এখনো এটা ঠিক মেনে নিতে পারে না। সুতরাং তার আগে আগেই যদি দেশে ফেরা যায়···। সমস্যা অনেক, এখানকার জীবনযাত্রার মান দেশে ফিরে গিয়ে পাওয়া অসম্ভব। একটা ভদ্রমতন, সম্মানজনক চাকরি পাওয়াও খুব শক্ত, উপযুক্ত বাসস্থান জোগাড় করারও সমস্যা আছে। গুণী সন্তানদের দেশে ফিরিয়ে আনবার জন্য ভারত সরকার অনেক রকম ব্যবস্থা নিয়েছেন বলে শোনা যায়। তবে অবস্থাটা অনেকটা সেই রকম, "খোকন, সত্বর ফিরিয়া আইস। মা শয্যাশায়ী। তুমি যাহা চাহিয়াছিলে তাহাই পাইবে—" এই বিজ্ঞাপন বেরুবার পর খোকন যেদিন সত্যিই বাড়ি ফিরে এলো, সেদিন তার পিঠে বাবা-জ্যাঠার লাঠির ঘা পড়তে লাগলো দমাদ্দম্ করে। তবু, এরকম ঝুঁকি নিয়ে স্বামী ফিরে আসতে চাইলেও স্ত্রীর দ্বিধা কাটতে চায় না। অনিশ্চয়তার মধ্যে ঝাঁপ দিতে পুরুষরা যতটা উৎসুক, মেয়েরা ততটা নয়।

অবশ্য, পুরুষদের তুলনায় মেয়েদের ছোট করবার জন্য এ কথা বলছি না। হিসেবী, কৃপণ, ভীতুর ডিম পুরুষ মানুষ কি নেই ? পুরুষের তুলনায় অনেক বেশী বেপরোয়া, দুঃসাহসিনী নারীও আমি দেখেছি। আসল কথাটা হলো, বিদেশে মেয়েরা অনেকখানি স্বাধীনতা পায়, যতটা সমান অধিকার সেখানে ভোগ করে, যেমন আত্মসম্মান বজায় রেখে চলতে পারে, তেমন তো দেশে ফিরে এসে পারে না। তাই তারা ইতস্তত করে বেশী। অনেক সময় স্বামী স্ত্রী এ ব্যাপারে

একমত, তবু সিদ্ধান্ত নিতে বিলম্ব হয়। ছেলেমেয়েদের মতামতেরও তো প্রশ্ন আছে। যে-সব শিশুরা এই সব দেশে ভূমিষ্ঠ হয়েছে, এখানেই বেড়ে উঠেছে, এখানকার তুষারের মধ্যে খেলা করেছে, এখানকার স্কুলে বন্ধু-বান্ধব পেয়েছে, এখানকার জল হাওয়া রোদে যাদের শরীর গড়ে উঠেছে, তাদের তো এই সব জায়গাই প্রিয় হবে। বাংলার মাটি কিংবা কলকাতার ধুলো সম্পর্কে তো তাদের কোনো নস্‌টালজিয়া থাকার কথা নয়।

অনেক রকম বাঙালীর সঙ্গে দেখা হয় এখানে ঘুরতে ঘুরতে। একদিন একটা বাড়িতে গেছি। পাশের ঘরে একজনের কণ্ঠস্বর শুনে চমকে উঠেছিলুম। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় এ দেশে এসেছেন নাকি? ঠিক যেন তিন পয়সার পালার সংলাপ শুনছি! পরে আলাপ হলো, অজিতেশ নন, তাঁর ভাই মোহিতেশ। একই রকম গলার আওয়াজ, একই রকম সদালাপী ও সুরসিক। তবে দৈর্ঘ্যে অজিতেশের চেয়ে একটু কম। মোহিতেশ একজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী, পেট্রোল অনুসন্ধানের ব্যাপারে একজন বিশেষজ্ঞ, একটি আন্তর্জাতিক কম্পানীর উচ্চপদে কাজ করতেন, আমরা থাকতে থাকতেই ওঁর আরও উঁচু পদে প্রমোশন হলো। দেশের প্রতি ওঁর আন্তরিক টান আছে, দেশের অবস্থার জন্য উনি গাঢ় দুঃখ বোধ করেন। দেখা হলেই এ বিষয়ে আলোচনা হতো। ভারতবর্ষের তো এখন দরিদ্র থাকার কোনো কারণ নেই, খাদ্যে ভারত স্বয়ম্ভর, যন্ত্রপাতি উৎপাদনেও কারুর থেকে পিছিয়ে নেই। অভাব শুধু পেট্রোলের, যা ছাড়া আধুনিক সভ্যতা অচল। যত বৈদেশিক মুদ্রা ভারত রোজগার করে, তা সবই খরচ হয়ে যায় শুধু পেট্রোল কেনবার জন্য। মোহিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে ভারতেও যথেষ্ট পেট্রোল আছে, কিন্তু তা উদ্ধার করার জন্য যুক্তিযুক্ত ব্যবস্থা যে কেন গ্রহণ করা হচ্ছে না তা কে জানে! একজন আন্তর্জাতিক পেট্রোল বিশারদের মতে, বড় বড় নদীগুলোর মোহনায় পেট্রোল পাওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশী। সেই অনুযায়ী গঙ্গার মোহনায় নিবিড় অনুসন্ধান হলো না কেন? মোহিতেশ আরও বললেন, জানেন ভারত সরকার অনেক সময় আমেরিকা বা ক্যানাডা থেকে বিশেষজ্ঞ নিয়ে যান, তাদের মাইনে হয় ভারতীয় বিজ্ঞানীদের চেয়ে পঁচিশ-তিরিশ গুণ বেশী। এরকম পরিবেশে কাজ হয়? অথচ, অনেক ভারতীয় বিশেষজ্ঞ (যেমন মোহিতেশ নিজেই একজন, এটা আমার সংযোজন) এ দেশে অনেক আমেরিকান-কেনেডিয়ানের চেয়ে উঁচু পোস্টে, বেশী মাইনের কাজ করেন।

বিজ্ঞানী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ভালো ছাত্র ছাড়াও আরও অনেক রকম বাঙালীর সন্ধান পাওয়া যায় এ দেশে। ট্যাক্সি চালক কিংবা হোটেলের পরিচারক

হিসেবে কোনো বাঙালীকে দেখলে চমকে উঠি। অনেক ভাগ্যান্বেষী বাঙালী এ দেশে এসে ভাগ্য ফিরিয়ে ফেলেছে। বাঙালী ব্যবসা করছে শুনলে আমরা এখনো আশ্চর্য হই। কিন্তু আলামোহন দাস ধরনের দু'একজন বাঙালীকেও এ দেশে দেখা যায়। অবশ্য পাঞ্জাবী এবং গুজরাতীরাই এ ব্যাপারে অনেক বেশী অগ্রণী।

একজন বাঙালী যুবকের সঙ্গে আলাপ হলো এখানে। প্রথম কিছুদিন টুকটাক চাকরি ও নানা রকম কষ্ট সহ্য করবার পর এখন তিনি জীবনে প্রতিষ্ঠিত। তাঁর ব্যবসা রিয়েল এস্টেটের, অর্থাৎ জমি ও বাড়ি বিক্রি করা। ক্যালিফোর্নিয়ায় জনসংখ্যা হু হু করে বাড়ছে, সেই জন্য বাড়ির খুব চাহিদা। ইনি পতিত জমি উদ্ধার করে সেখানে বাড়ি তৈরি করে বিক্রি করেন। এই ব্যাপারে তাঁর বেশ সুনাম হয়ে গেছে। ভারতীয় ব্যবসায়ীরা দেশ থেকে যে-সব অভিজ্ঞতা নিয়ে যান, তার মধ্যে প্রধান হলো ঘুষ দেওয়া। ঘুষের ব্যাপারে বেশ একটা আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা আছে। সেখানে ভারতীয়রাও পিছু পা হয় না। ঐ যুবকটির কাছ থেকে একটা গল্প শুনেছিলুম। উনি এক জায়গায় জমি কিনে অনেকগুলি বাড়ি তৈরির পরিকল্পনা করেছিলেন, কিন্তু সেই জায়গাটি বসত বাড়ির উপযুক্ত নয়, এই কারণ দেখিয়ে নগর স্থপতি প্ল্যানটি বানচাল করে দিলেন। তখন উনি নগরীর মেয়রকে প্রস্তাব দিলেন যে আস্ত একটি বাড়ি তাঁকে উপঢৌকন দেবেন। সঙ্গে সঙ্গে সব প্ল্যান পাস হয়ে গেল। আমেরিকায় সব কিছুই তো বড় বড়, তাই ঘুষের ব্যাপারটাও ছোটখাটো হলে চলে না। পঞ্চাশ একশো টাকা ঘুষ দিতে গেলে এরা খুব নীতিবাগিশ হয়ে যাবে, কিন্তু এক লাখ টাকা দিলে আনন্দের সঙ্গে লুফে নেবে। ঘুষ নিয়ে ধরা পড়াটা দারুণ অপরাধ। প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট কার্টারের ভাই তার দাদার নাম ভাঙিয়ে এক জাপানী কম্পানির কাছ থেকে ঘুষ নিয়েছিল, কাগজওয়ালারা সেটা ফাঁস করে দিয়ে বেচারিকে একেবারে নাজেহালের এক শেষ করে দিয়েছে।

লস এঞ্জেলিসের অনেক দোকানের বাইরে দুটি বিজ্ঞাপন দেখে আমি বড্ড মজা পেয়েছি। একটি হলো, "এখানে খাঁটি ইম্পোর্টেড জিনিসপত্র পাবেন।" আর অন্যটি "আমরা আসল বিদেশী জিনিস রাখি।" ফরেন জিনিসের প্রতি ভারতীয়দের আসক্তি নিয়ে আমরা অনেক ঠাট্টা ইয়ার্কি করি। কার বাড়িতে কটা ইম্পোর্টেড গুডস আছে, তাই দিয়ে ঠিক হয় সামাজিক পদমর্যাদা। এই সব ফরেন বা ইম্পোর্টেড গুডস বলতে অধিকাংশ সময়েই বোঝায় আমেরিকান। অথচ খোদ আমেরিকাতেও বিদেশী ও ইম্পোর্টেড জিনিসের প্রলোভন দেখিয়ে বিজ্ঞাপন থাকে। আবার মনে হলো, মানুষের চরিত্র সব জায়গাতেই এক।

আমেরিকানদের কাছে এই লোভনীয় বিদেশী দ্রব্য অবশ্য সবই প্রায় জাপানী। বিশেষত জাপানী গাড়ি ও গাড়ির পার্টস!

লস এঞ্জেলিস ছাড়বার আগের দিন আমরা গেলুম সান ডিয়েগোর 'সমুদ্র জগৎ' দেখতে। অনেক দেশ ঘুরে অনেক কিছু দেখতে দেখতেও এরকম অনুভূতি খুব কমই হয় যে, আঃ, আজ এটা যা দেখলুম, এটা একেবারে অকল্পনীয় ছিল! সান ডিয়েগোতে এসে আমার সেই রকম অনুভূতি হয়েছিল। এ একেবারেই অভাবনীয় এবং সত্যিকারের নতুন।

সান ডিয়েগোতে প্রধান দ্রষ্টব্য দুটি, চিড়িয়াখানা এবং সমুদ্র জগৎ। পুরো একদিনে একটার বেশী দেখা যায় না। সময়াভাবে আমাদের যে-কোনো একটা বেছে নিতে হবে, তাই আমরা 'সমুদ্র জগৎ' যাবো ঠিক করলুম। অন্যটি দেখিনি বলে জানি না আমাদের নির্বাচন ঠিক হয়েছিল কিনা, কিন্তু যা দেখেছি, তার তুলনা নেই।

লস এঞ্জেলিস থেকে সান ডিয়েগো ঘন্টা তিনেকের পথ। একদিন সকালে আমরা সবাই মিলে সেজেগুজে বেরিয়ে পড়লুম। জিয়া আর প্রিয়া নামের বালিকা দুটির উৎসাহই বেশী, কারণ, এর মধ্যে দু'একদিন ওদের বাড়িতে রেখে আমরা বড়রা একটু আলাদা ঘোরাঘুরি করেছিলুম। আবার আমরা সকলে এক সঙ্গে। জয়তীদি যেদিন শাড়ী পরেন সেদিন তাঁর চেহারা এক রকম, আবার যেদিন জিন্‌স পরেন সেদিন একেবারে সম্পূর্ণ অন্যরকম। তাছাড়া শাড়ী পরলে উনি বেশ নরম মেজাজে থাকেন আর দুঃখী দুঃখী বাংলা গান করেন। আর যেদিন জিন্‌স পরেন সেদিন একেবারে টম্‌ বয়। কোন্‌দিন কোন্‌টা পরবেন, সেটা অবশ্য ওঁর খেয়ালের ওপর নির্ভর করে। আজ জয়তীদি নিজে জিন্‌স পরেছেন তো বটেই, ওঁর লাজুক মেজদিকেও ঐ পোশাক পরিয়েছেন। মেজদির ধারণা, উনি শাড়ীর বদলে জিন্‌স পরেছেন বলে সারা পৃথিবীর লোক ওঁর দিকে তাকিয়ে আছে। যদিও এখানকার লোকেরা কে কী পোশাক পরলো তা নিয়ে ভ্রূক্ষেপও করে না। বাচ্চা মেয়ে দুটি সব সময়ই জিন্‌স পরে। আর দীপকদার পোশাক তো একটাই। একটা রঙচটা জিন্‌স আর একটা মেটে সিঁদুর রঙের ইষৎ ছেঁড়া গেঞ্জি। ছ'দিন সাত দিন ধরে দীপকদাকে ঐ একই বস্ত্রে দেখা যায়। জয়তীদির ঝাঁঝালো অনুরোধে উনি যদি বা কোনো এক সকালে পাট ভাঙা জামা-প্যাণ্ট পরলেন, কিন্তু বিকেলেই তা ছেড়ে আবার জিন্‌স ও গেঞ্জিতে প্রত্যাবর্তন। আজ আমি ও শিবাজীও জিন্‌স পরে ফেলায় আমাদের পুরো দলটাকেই জিন্‌স পার্টি বলা যায়।

জিন্‌স নামের এই প্রায় চটের কাপড়ের প্যান্টালুন এক সময় ছিল

আমেরিকার শ্রমিক শ্রেণীর পোশাক, এখন বাকি সবাই জিন্‌স পরে, শুধু শ্রমিক শ্রেণী অন্য পোশাকে বাবুয়ানি করে।

প্রশান্ত মহাসাগরের পাশ দিয়ে দিয়ে চমৎকার পথ। দীপকদার গাড়িটি বাতানুকূল, তা সত্ত্বেও আমরা কাচ নামিয়ে দিলুম সমুদ্রের হাওয়া খাওয়ার জন্য। দূর থেকে সান ডিয়েগোকে অলকাপুরীর মতন সুন্দর দেখায়। এক সময় আমাদের গাড়ি এসে থামলো সি ওয়ার্ল্ড-এর গেটের সামনে। ডিজনিল্যাণ্ডের মতন এখানেও দশ টাকার টিকিট কিনে ঢুকলে সারাদিন ধরে সব কিছু যতবার খুশী দেখা যায়।

দেখবার যে কত রকম জিনিস, তার ইয়ত্তা নেই। এখানেও সেই আমেরিকান বিশালতা। অল্পে সন্তুষ্ট হবার জাত এরা নয়। ডিজনিল্যাণ্ডে যেমন অনেক উদ্দাম কল্পনাকে চাক্ষুষ করা হয়েছে নানা রকম যন্ত্রপাতি দিয়ে, এখানে তেমন শুধু জল ও জলজ প্রাণীর খেলা। না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।

সমুদ্রের জলকে টেনে আনা হয়েছে অনেকখানি ভেতরে। এক এক জায়গায় বাঁধন দিয়ে সেখানে স্টেডিয়াম বা গ্যালারি বা সিনেমা হলের মতন, সেখানে বসে বসে প্রতিবার এক একটি অদ্ভুত জিনিস প্রত্যক্ষ করছি।

ডলফিন বা শুশুক মানুষের পোষ মানে জানতুম, কিন্তু হাঙর? সিন্ধুঘোটক, এমনকি তিমি? মানুষের এই বিস্ময়কর ক্ষমতায় স্তম্ভিত হয়ে যেতে হয়। ওয়ালরাস ও ডলফিন নিয়ে নাটক, কালো তিমি মাছের নাচ? এর মধ্যে কোনোটাই কৃত্রিম বা সাজানো নয়। বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে এসব দেখতে দেখতে আমাদের কৌতূহল ও বিস্ময় ক্রমশই বেড়ে যায়। এসব দৃশ্য দেখবার, বর্ণনা করবার নয়। তবে শামুর কথা বলতেই হয়। শামু একটি খুনী তিমির আদরের ডাক নাম। তার ওজন সাত টন না চোদ্দ টন কত যেন। পৃথিবীর বৃহত্তম এবং ভয়ংকরতম প্রাণী। গ্রীক দেবতার মতন রূপবান একজন যুবকের নির্দেশে সে নানান খেলা দেখায় আমাদের, এমনকি একবার হুকুম শুনে জল থেকে তিরিশ-চল্লিশ ফিট উঁচুতে লাফিয়ে উঠে আমাদের অভিবাদন জানায়। যুবকটি তাকে এক বালতি মাছ খেতে দিয়ে আদর করে এবং শামুর পিঠে চড়ে বসে। তারপর সেই অতিকায় তিমি ও গ্রীক দেবতা জলের ওপর দিয়ে চলে যায় রূপকথার জগতে।

এই সব দেখতে দেখতে আমি জিয়া ও প্রিয়ার দিকে তাকাই। বালিকা দুটির চোখের মুগ্ধতা দেখে বোঝা যায়, ওরা এখানে নেই, ওরা রয়েছে এখন ওদের কল্পলোকে।

পৃথিবীটা যে আসলে কত ছোট তার প্রমাণ পেলুম এক রাতে।

জয়তীদিদের এক আত্মীয়ের আত্মীয়-বাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে গেছি, প্রচুর লোকজন সেখানে, একতলা-দোতলা জুড়ে নিমন্ত্রিতরা ঘোরাঘুরি করছে। আমি যথারীতি বসে আছি এক কোণে একটা চেয়ারে, হঠাৎ এক সময় একজন কেউ ঘুরে ঘুরে বলতে লাগলো, এখানে নীললোহিত নামে কে আছে? তার ফোন এসেছে।

বিশ্বাস করাই শক্ত আমার পক্ষে। এই অচেনা বাড়িতে আমায় কে ফোন করবে? আমি যে এখানে থাকবো, তা তো কারুর জানার কথা নয়। এমনকি এই সন্ধ্যেবেলাতেও আমি দোনামোনা করছিলুম আসবো কি না! তা ছাড়া এই মাঝ রাতে কে আমার খোঁজ করবে?

উঠে গিয়ে ফোন ধরে বললুম, হ্যালো?

প্রথমে একটা হাসির শব্দ। তারপর একটি নারী কণ্ঠ প্রশ্ন করলো, কোনো সুন্দরী মেয়ের পাশ থেকে তোমায় উঠে আসতে হলো বুঝি? ডিসটার্ব করলুম তো?

শুনেই চিনেছি, আমার বন্ধু বরুণ চৌধুরীর স্ত্রী মীনার গলা।

কলকাতা ছাড়ার কয়েকদিন আগেই ওদের সঙ্গে দেখা হয়েছে। এর মধ্যে ওদের মার্কিন দেশে বেড়াতে আসা আশ্চর্য কিছু নয়, কিন্তু আমায় এখানে টেলিফোন করা পরমাশ্চর্য ব্যাপার। কারণ, এ বাড়ির টেলিফোন নাম্বার আমি নিজেও জানি না।

তারপর বরুণ চৌধুরী বললো, খুব টো-টো করে ঘুরে বেড়াচ্ছো তো, কিন্তু আমরা ঠিক ধরে ফেলেছি।

কথায় কথায় জানলুম, ওরা রয়েছে শ' তিনেক মাইল দূরে মার্সেড শহরে। দিন দু' এক আগে লাস ভেগাস যাবার পথে এসেছে ওখানে, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের ভাই ডাক্তার চিত্ত চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে। সেখানে আজ সন্ধেবেলা আড্ডা দিতে দিতে আমার প্রসঙ্গ উঠেছিল। কোথায় আমাকে পাওয়া যেতে পারে? আমি ভ্রাম্যমান, আমার কোনো ঠিকানা নেই। কিন্তু আমার সম্পর্কে একটা ব্যাপার অনায়াসে আন্দাজ করা যায়, আমি নিশ্চয়ই পয়সা বাঁচাবার জন্য কোনো হোটেলে উঠবো না, কোনো বাঙালীর বাড়িতেই আশ্রয় নেবো। লস এঞ্জেলিস-এ বাঙালীর সংখ্যা কম নয়, ঠিক কোন্ বাড়িতে আমি উঠবো তা বোঝা প্রায় অসম্ভব। তবু ওরা অসম্ভবকেও সম্ভব করেছে। কয়েক জায়গায় ফোন করে নাম জেনেছে আমার আশ্রয়দাতার। সেখানে ফোন করে

জেনেছে আমি নেমন্তন্ন খেতে এসেছি এখানে।

টেলিফোনে এমনভাবে ওদের সঙ্গে গল্প হলো, যেন এলগিন রোডের সঙ্গে গড়িয়াহাটের আড্ডা।

মিনা ও বরুণ চৌধুরী দু'দিন পরে এসে পৌঁছোবে লস এঞ্জেলসে, আর আমাদের কাল সকালেই এ জায়গা ছেড়ে যাবার কথা। জিয়া আর প্রিয়া উতলা হয়ে উঠেছে বাড়ি ফিরে যাবার জন্য, তা ছাড়া দীপকদার বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস শুরু হয়ে যাবে।

কিন্তু ক্যালিফোর্নিয়ায় এসে সানফ্রান্সিসকো যাওয়া হবে না, এ কি চিন্তা করা যায়? বিশ্বের বিখ্যাত নগরীগুলিকে যদি সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় লাইন দিয়ে দাঁড় করানো যায়, তাহলে অনেক বিচারকই সান ফ্রান্সিসকোকে প্রথম স্থান দেবেন। আমি অবশ্য দেবো না, কারণ বিচারক হিসেবে আমি বড্ড খুঁতখুঁতে। এখনো পৃথিবীর যে-সব স্থান আমি দেখিনি, আমার মনে হয়, তারা আরও বেশী সুন্দর। সানফ্রান্সিসকো আমার আগে একবার দেখা।

লস এঞ্জেলিস থেকে সানফ্রান্সিসকো যাবার পথে মাঝামাঝি জায়গায় বেকার্সফিল্ড নামে একটা মাঝারি শহর আছে। এখানে থাকেন ডাক্তার মদনগোপাল মুখোপাধ্যায়, তিনি আগে থেকেই কড়ার করে রেখেছেন, তাঁর ওখানে একবার যেতেই হবে।

পরদিন সকালে জয়তীদি ও মেজদিরা গেলেন লস এঞ্জেলিস-এর বাজার উজাড় করে আনতে, আমি আর দীপকদা আড্ডা দিতে বসলুম। শিবাজী তার অতি প্রিয় একটা ব্যাপারে ব্যস্ত হয়ে পড়লো, বিছানায় শুতে না শুতেই ঘুম।

দীপকদা পদার্থ বিজ্ঞানী, কিন্তু আধুনিক সাহিত্য থেকে শুরু করে সমাজতত্ত্ব এমনকি মহাকাশ অভিযান পর্যন্ত নানান বিষয়ে তাঁর উৎসাহ ও পড়াশুনো, সুতরাং তাঁর সঙ্গে আড্ডা দিতে বসলে কখন যে সময় কেটে যায়, বোঝাই যায় না।

বেরুতে বেরুতে আমাদের অনেক দেরি হয়ে গেল। এক হিসেবে এটা আমাদের উল্টো যাত্রা। ক্যানাডা থেকে ক্যালিফোর্নিয়ায় আসবার সময় আমরা সানফ্রান্সিসকোকে পাশ কাটিয়ে লস এঞ্জেলিসে এসেছিলুম। যে পথ দিয়ে আমরা এসেছিলুম, অনেকটা সেই পথ ধরেই ফিরে যাচ্ছি।

বেকার্সফিল্ডে পৌঁছোতে কেন যে আমাদের রাত দু'টো বেজে গেল তা জানি না। মাত্র আড়াইশো মাইলের ব্যাপার, তাই তাড়া ছিল না। দীপকদা দু'তিনবার কফি খাওয়াবার জন্য গাড়ি থামিয়েছেন। অবশ্য বেকার্সফিল্ডে এসে ঠিকানা খুঁজতেও অনেকটা সময় গেছে। এত রাতে কি কারুর বাড়িতে যাওয়া যায়?

পাড়া একেবারে শুনশান। বাড়িগুলো দেখলেই বোঝা যায় বেশ আভিজাত পাড়া। কোনো বাড়িতে আলো জ্বলছে না। এ দেশে রাস্তায় কুকুর থাকে না, নইলে এই নিঝুম রাতে আমাদের গাড়ি থেকে নামতে দেখলে নিশ্চয়ই কুকুর তেড়ে আসতো।

কিন্তু সন্তর্পণে গিয়ে বেল টেপা মাত্র দরজা খুলে গেল। ডাঃ মুখার্জি আমাদের প্রতীক্ষায় জেগেই ছিলেন। সহাস্য মুখে বললেন, আসুন, আসুন।

ডঃ মদনগোপাল মুখোপাধ্যায় অতি সদালাপী ও অমায়িক মানুষ। কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি আমার মদনদা হয়ে গেলেন। অবশ্য নামটা যত ভারিক্কী, সেই তুলনায় বয়েস বেশী নয়। নিম্ন-চল্লিশেই তিনি ক্যানসার বিশেষজ্ঞ হিসেবে এদেশে যথেষ্ট খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন।

আমরা অনেকগুলো মানুষ, সকলের জন্যই আলাদা আলাদা ঘরে শোবার ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছে। এত রাত্রে আর আড্ডা জমবে না, আমরা শুয়ে পড়ার উদ্যোগ করলুম। আমাদের মধ্যে শিবাজীকেই বেছে নিয়ে মদনদা বললেন, দেখবেন, মনের ভুলে যেন জানালা খুলে ফেলবেন না। তা হলেই পুলিশ ছুটে আসবে।

কাছাকাছি কয়লাখনি আছে বলেই বোধহয় লস এঞ্জেলিস-এর তুলনায় বেকার্সফিল্ড একটু গরম। সুতরাং রাত্রে জানলা খুলতে আপত্তি কেন?

মদনদা বুঝিয়ে দিলেন যে, প্রত্যেক দরজা-জানালায় বার্গলার্স অ্যালার্ম লাগানো আছে। চোর-ডাকাত কিছু ভাঙবার চেষ্টা করলেই শুধু যে এখানেই সতর্ক ঘণ্টা বেজে উঠবে তা নয়, থানায় একটা বোর্ডে আলো জ্বলে উঠবে, তা দেখে বোঝা যাবে, কোন্‌বাড়িতে হানাদার এসেছে, সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ এসে যাবে।

এ দেশের পুলিশ খুব ভালো দারোয়ানগিরি করতে পারে।

পরদিন বেশ বেলা করে উঠে ঘুরে ঘুরে দেখলুম মদনদার বাড়ি। এর আগে যত বাঙালীর বাড়িতে গেছি, এত বড় ও ঝকঝকে তকতকে বাড়ি আর দেখিনি। বাড়ির সঙ্গে আছে বাগান, সুইমিং পুল, টেনিস কোর্ট ইত্যাদি। দুটি বসবার ঘর, যার মধ্যে একটির নাম ফ্যামিলি রুম। অর্থাৎ একটিতে বাইরের লোক এলে বসানো হবে, অন্যটিতে বাড়ির বাচ্চারা খেলবে কিংবা বড়রা টি ভি দেখবে। সেই রকম খাবারের ঘরও দুটি। একটি বাইরের লোকদের জন্য বেশী সাজানো, অন্যটি প্রতিদিনের ব্যবহারের জন্য। এ ছাড়া আছে বার কাউন্টার। ঠিক যেন সিনেমার বাড়ি। বসবার ঘরের কার্পেট এত গভীর যে পা ডুবে যায়।

এই সব বাড়িতে ঘোরাফেরা করতে অস্বস্তি লাগে। কখন যে কোথায় দাগ

লেগে যাবে, কিংবা মেঝেতে সিগারেটের ছাই ফেললে কী কেলেংকারি হবে, এই চিন্তাতেই সর্বক্ষণ কাঁটা হয়ে থাকতে হয়। কিন্তু গৃহস্বামী ও গৃহস্বামিনীর ব্যবহারের আন্তরিকতায় এই অস্বস্তি দূর হয়ে যায়। যারা বস্তুর চেয়ে মানুষকে বেশি মূল্য দেয়, তাদের কাছে কোনো অসুবিধে নেই। ডলিবৌদি চমৎকার হাসি খুশী মানুষ, ওঁদের এক ছেলে ও এক মেয়ে, তাদের নাম মিষ্টি আর মিঠাই। বোঝাই যাচ্ছে, ডলি বৌদি সন্দেশ-রসগোল্লা খুব ভালো বানাতে পারেন।

মদনদা খুব ব্যস্ত ডাক্তার হলেও তাঁর নানা রকমের শখ আছে। উনি বিভিন্ন দেশের মুদ্রা ও তলোয়ার সংগ্রহ করেন, বই ও ছবি কেনেন। এ ছাড়া আছে ওঁর গাড়ির শখ। আপাতত ওঁর চারখানা গাড়ি। মার্সিডিজ, ক্যাডিল্যাক, বি এম ডব্লু ও আর একটা কী যেন! নীহাররঞ্জন গুপ্তর রহস্য-উপন্যাসে রাজা মহারাজারা সব সময় ক্যাডিলাক গাড়ি চেপে আসতো, সেই ক্যাডিলাকে আমিও চাপবো ভেবে বললুম, ক্যাডিলাক! ওরেঃ বাবা!

আমার দিকে অন্যরা এমনভাবে তাকালো, যেন আমি একটা ঘোর বাঙাল!

ক্যাডিলাকের তুলনায় মার্সিডিজ বেঞ্জ, বি এম ডব্লু নাকি আরও উঁচু জাতের গাড়ি। বিশেষত যে গাড়িটার নাম আগে শুনিনি শুনলেও মনে রাখতে পারি না, দু'শো চল্লিশ না চারশো আশি কী যেন, সেটা নাকি পৃথিবীর সেরা।

দীপকদা সেই গাড়িটার পিঠে সস্নেহে হাত বুলিয়ে বললেন, বুঝলেন মদনবাবু আমারও খুব গাড়ির শখ। কিন্তু আমি মাস্টার মানুষ, এ সব গাড়ি কেনবার কথা ভাবতেই পারি না।

মদনদা ভদ্রতা করে বললেন, বাঃ, আপনিও যে এত বড় পনটিয়াক গাড়িটা এনেছেন, এটা কম কিসে?

আমি গাড়ি বিষয়ে কিছুই বুঝি না। আমার ধারণা, যে গাড়ি থেমে থাকে না, চলে, সেটাই ভালো। শুধু শুধু বেশী দামের গাড়ি কেনার কী মানে হয় কে জানে! যাই হোক, পর্যায়ক্রমে মদনদার সব গাড়িতেই একবার করে চেপে জীবন ধন্য করে নিয়েছি, বিশেষ তফাত অবশ্য বুঝতে পারিনি।

উন্মুক্ত জায়গায় লোহার ঘোরানো উনুন এনে সন্ধেবেলা বারবিকিউ ডিনার হলো। এই ব্যাপারটা দীপকদাও বেশ ভালো পারেন, এডমান্টনে আমাদের একাধিক দিন খাইয়েছেন। পুরুষ রাঁধুনীদের একটা স্বভাব হলো, তাঁর কে কার চেয়ে ভালো রান্না করেন, তার প্রমাণ দেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। দীপকদা বারবার বলতে লাগলেন, মদনবাবু, আপনি আঁচটা একটু বেশী করে ফেলেছেন। আর মদনদা বলতে লাগলেন, আরে মশাই, আমি বারবিকিউ করতে করতে ঝুনো হয়ে গেলুম, যে-কোনো রেস্তোরাঁয় চাকরি পেতে পারি…। শেষ পর্যন্ত ডলিদি

বললেন, তোমরা দু'জনেই সরো তো, আমি দেখছি।

মদনদা খুব দুর্লভ জাতের ওয়াইন সংগ্রহ করে রেখেছিলেন, ঝলসানো মাংসের সঙ্গে সেই আঙুরের রস যা জমলো, তা আর বলার নয়। মেয়েদেরও জোর করে খাওয়ানো হলো খানিকটা করে ওয়াইন, কিংবা খুব একটা জোর করতে হয়নি বোধ হয়, প্রথম গেলাসের পর নিজেরাই বাড়িয়ে দিয়েছেন দ্বিতীয় গেলাস। অল্পতেই ওঁদের ফুরফুরে নেশা হয়, একটু পরেই শুরু হলো জয়তীদি ও মেজদির গান। প্রথমে 'জ্যোস্না রাতে সবাই গেছে বনে', তারপর যার যেটা মনে পড়ে। একটু পরে আমরা ছেলেরাও হেঁড়ে গলায় যোগ দিলুম। সত্যিই যেন চাঁদের আলোয় পিকনিক হচ্ছে। অফুরন্ত আনন্দ।

তখনও আমরা বুঝতে পারিনি, মিলিতভাবে এটাই আমাদের শেষ রাত।

মদনদা এক সময় একটা প্রস্তাব দিলেন, কাল থেকে তিনি কয়েকদিনের ছুটি নিচ্ছেন, সবাই মিলে একসঙ্গে কোথাও বেড়াতে গেলে হয় না?

মদনদা ছুটি নিচ্ছেন শুনে আমরা অবাক হলুম। ডাক্তাররা কখনো ছুটি পায় নাকি? মদনদা এখানকার একটি হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত, তা ছাড়া তাঁর প্রাইভেট প্র্যাকটিসের এলাকা বহুদূর বিস্তৃত। চারখানা গাড়ি থাকা সত্ত্বেও তিনি একটি ছোট প্লেন কেনার কথা ভাবছেন। নিজেই চালাবেন। প্লেনে রুগী দেখার অনেক সুবিধে, অনেক সময় বাঁচে।

—সত্যি ছুটি নিচ্ছেন?

মদনদা বললেন যে, অনেকদিন ছুটি নেওয়া হয়নি, কোথাও বেড়াতে যাওয়া হয়নি, সুতরাং তাঁর মন উচাটন হয়ে উঠেছে।

কাছাকাছির মধ্যে দুটির যে-কোনো একটি জায়গায় যাওয়া যায়। লাস ভেগাস কিংবা সানফ্রান্সিসকো। দু'জায়গাই দু'রকম আকর্ষণ। মদনদার ঝোঁক লাস ভেগাসের দিকেই বেশী। শিবাজী প্রচুর সিনেমায় লাস ভেগাস দেখেছে, সেও লাফিয়ে উঠল। দীপকদারও অনিচ্ছে নেই। মেজদি দুটো জায়গাতেই যেতে চান।

কিন্তু এই পৃথিবী বিখ্যাত জুয়ার শহরে যেতে আমিই প্রথম আপত্তি তুললুম। আমার মনের মধ্যে একটা বিষম জুয়াড়ী আছে। কিন্তু লাস ভেগাসে জুয়া খেলতে যাবো; সে মুরোদ আমার কোথায়? 'যত সাধ ছিল সাধ্য ছিল না'। পকেট গড়ের মাঠ নিয়ে কেউ জুয়ার আসরে যায়? সেইজন্যই আমি এখন মনে মনে একা একা জুয়া খেলা পছন্দ করি।

মদনদা বোঝালেন যে, লাস ভেগাসে শুধু জুয়া নয়, নাচগানের অনেকগুলো শো হয়, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্পীরা সেখানে আসে। এই তো ফ্রাঙ্ক সিনাত্রা দলবল

নিয়ে সেখানে একটা শো করছেন। কিন্তু তাতেও আমি গললুম না, কারণ একেবারে গরীব হয়ে লাস ভেগাসে যাওয়া যায় না। আর জুয়ার শহরে গিয়ে জুয়া খেলবো না, শুধু নাচ-গানের আসরে যাবো, তারই বা কোন্ মানে হয়?

লাস ভেগাস যাবার বিরুদ্ধে আর একটা বড় যুক্তি, আমাদের সঙ্গে বাচ্চারা রয়েছে, তারা ওখানে কী করবে? ঐ শহর বাচ্চাদের জন্য নয়।

পরদিন বেরিয়ে পড়লো দুটো গাড়ি।

সানফ্রান্সিসকো যাবার আগে, আমরা ঠিক করলুম, একটু মার্সেড ঘুরে যাওয়া হবে। যদি সেখানে মীনা ও বরুণ চৌধুরীকে এখনো পাওয়া যায়। কিন্তু পৌঁছে দেখলুম পাখি উড়ে গেছে। বরুণ ও মীনার উপস্থিতির উত্তাপ এখনো রয়েছে সেখানে, কিন্তু ওরা চলে গেছে লস এঞ্জেলিসে। সেখান থেকে ওদের ধরে আনা যায় না? মাত্র দুশো মাইল, যাওয়া-আসায় বড় জোর ছ' ঘণ্টা লাগবে। ফোন করা হলো ওদের, কিন্তু উপায় নেই, ওরা জানালো যে, পরদিনই ওদের এদেশ ছেড়ে যাবার জন্য প্লেনে রিজার্ভেশান হয়ে আছে।

চিত্ত চট্টোপাধ্যায় এবং তাঁর স্ত্রী আলো, দু'জনেই ডাক্তার। আমাদের পেয়ে হৈ হৈ করে উঠলেন। আমাদের কিছুতেই ছাড়বেন না। চিত্তর বাড়ির সুইমিং পুলের ধারে বসে আড্ডা হলো অনেকক্ষণ। এর আগেই আমরা চুপি চুপি ঠিক করে রেখেছি যে, এখানে রাত কাটানো হবে না, আজ রাত্তিরের মধ্যেই সানফ্রান্সিসকো পৌঁছোতে হবে।

চিত্ত আর তার স্ত্রীকে অনেক বুঝিয়ে, খাওয়াদাওয়া সেরে আমরা যখন বিদায় নিয়ে বাইরে এসে গাড়িতে উঠতে যাচ্ছি, তখন জয়তীদি বললেন, ওঁরা আর সানফ্রান্সিসকো যাবেন না। ওঁরা এবার বাড়ির দিকে রওনা হবেন।

প্রথমে বিশ্বাস করতে পারিনি। এতদূর পরিকল্পনা করে এসে হঠাৎ এরকম সিদ্ধান্ত? কিন্তু, জয়তীদি বললেন, এতদিন ধরে গাড়িতে ঘুরে ঘুরে ওঁর মেয়েরা ক্লান্ত। ক্যানাডায় ফিরে স্কুলে যাবার আগে দু'একদিন বিশ্রাম নেওয়া দরকার। সানফ্রান্সিসকো ওঁরা আগে দেখেছেন, সুতরাং···বিশেষত আমাদের নিয়ে ঘোরাবার জন্য মদন মুখার্জিকে যখন পাওয়া গেছেই···।

জয়তীদির সঙ্গে আমরা যুক্তিতে হেরে গেলুম। কোনো যুক্তি না থাকলেও অবশ্য উনিই জিততেন। এক একজনের ইচ্ছেটাই যুক্তি। ঠিক হলো, ওঁর মেজদি আমাদের সঙ্গেই যাবেন, পরে তাঁকে ক্যানাডায় পাঠিয়ে দিলেই হবে।

একটা ব্যাপারে আমি সাহেব। বিদায় নেবার সময় বেশী বেশী আবেগের বিমোচন আমার পছন্দ হয় না। বাঙালীদের তো আশীবার আসি না বললে বিদায় নেওয়াই হয় না ঠিক মতন। আমি দীপকদার গাড়ির কাছে গিয়ে সবার

দিকে তাকিয়ে শুধু বললুম, আচ্ছা, আবার দেখা হবে। তারপর উঠে পড়লুম মদনদার গাড়িতে।

দুটো গাড়ি দু'দিকে চলে গেল।

॥ ২৩ ॥

বেশ কয়েক বছর আগে এক মুখচোরা বাঙালী ছোকরা এসেছিল সানফ্রান্সিসকো শহরে। গ্রেহাউণ্ড বাস ডিপোতে এসে নেমেছিল সন্ধেবেলা, সঙ্গে একটা মাঝারি ব্যাগ, বলতে গেলে প্রায় সহায় সম্বলহীন, নিছক ভ্রমণের জেদেই সে ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

কোনো নির্দিষ্ট থাকার জায়গা না থাকলে সানফ্রান্সিসকো শহরটি সন্ধেবেলা একা পৌঁছোবার পক্ষে মোটেই উপযুক্ত নয়। এই নগরীটি যেমন সুন্দরী তেমনই ভয়ঙ্করী। গোটা মার্কিন দেশেই অপরূপ সৌন্দর্যের সঙ্গে মিশে আছে নিদারুণ হিংস্রতা। সেই ছেলেটির কোনো থাকার জায়গার ঠিক নেই, পকেটে টাকা-পয়সা যৎসামান্য, নতুন শহরে এসে সে ওয়াই এম সি এ-তে ওঠবার চেষ্টা করে। এর থেকে সস্তায় আর কোথাও থাকা যায় না।

ছেলেটি বাস স্টেশানেই টেলিফোন ডিরেক্টরি দেখে ফোন করলো ওয়াই এম সি এ-তে। নিদারুণ দুঃসংবাদ, সেখানে একটাও জায়গা খালি নেই, আগামী দু'দিনের মধ্যে কোনো জায়গা পাওয়া যাবে না। নাম লিখিয়ে রাখলে তারপর ঘর পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু আজকের রাত্রিবাস কোথায় হবে?

ব্যাগটি পিঠে ঝুলিয়ে সে বেরিয়ে পড়লো। টিপি টিপি বৃষ্টি পড়ছে। সেই সঙ্গে ছেলেটির গা ছমছম করছে। বন্দর-শহরে এমনিতেই লুঠেরা-বখেরাবাজ আর খুনে গুণ্ডাদের আড্ডা থাকে, তার ওপরে সানফ্রান্সিসকো শহরে আছে একটি বিশাল চীনা উপনিবেশ। দীনেন্দ্রকুমার রায়ের রহস্য লহরী সিরিজে ভয়াবহ সব চীনে গুণ্ডাদের কাহিনী সে পড়েছে, চীনে-খুনীদের ছুরিগুলো হয় সরু লিকলিকে, পিঠে গাঁথলে বুক ফুঁড়ে বেরিয়ে যায়, যাকে গাঁথা হলো, সে কিছু না বুঝেই অক্কা পায়। রাস্তা দিয়ে এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে ছেলেটি হাঁটছে আর তার পিঠ শিরশির করছে।

ছেলেটির কাছে একটি মাত্র ঠিকানা আছে। সিটি লাইটস বুক স্টোরের আংশিক মালিক, তার নাম লরেন্স ফেলিং গেটি। কবি অ্যালেন গীন্সবার্গ এই ঠিকানাটা তাকে দিয়ে বলেছিল, যদি কখনো সানফ্রান্সিসকো যাও, এর সঙ্গে দেখা করো। ছেলেটি ভাবলো, এখুনি কি একবার ফের্লিংগেটিকে ফোন করা উচিত?

কিন্তু ওর কাছে কি আশ্রয় চাওয়া যায়? সাহেবদের বাড়িতে তো হঠাৎ কোনো অতিথি আসে না, এ দেশে সবই অ্যাপয়েন্টমেণ্টে চলে। ছেলেটি লাজুক, তাই সে ফোন করলো না, সস্তার হোটেল খুঁজতে লাগলো।

একটার পর একটা হোটেলের দরজা থেকে ফিরে যাচ্ছে সে। কোথাও ঘর খালি নেই, কোথাও দাম অতিরিক্ত চড়া। এর মধ্যেই বৃষ্টিতে ভিজে জবজবে হয়ে গেছে সে, ভাগ্যিস সানফ্রান্সিসকোতে তেমন শীত পড়ে না। সারা আকাশ চিরে বিরাট বিরাট বিদ্যুৎ আর প্রচণ্ড বজ্রের গর্জন হচ্ছে মাঝে মাঝে, যেন আকাশে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলছে।

ডাউন টাউন ছাড়িয়ে আসতেই রাস্তা একেবারে ফাঁকা, শুধু গাড়ি, কোনো পথচারী নেই। অচেনা শহরে এক কচি বয়েসের বঙ্গ সন্তান হেঁটে চলছে অসহায়ভাবে। এই রকম অবস্থায় একটা নেশার ভাব হয়, এক সময় সব ভয় কেটে যায়, মনে হয়, যা হয় হোক, চারটে ডাকাত ঝাঁপিয়ে পড়ুক, পেটে ছুরি চালিয়ে দিক, টাকা-পয়সা ব্যাগ-ট্যাগ কেড়ে নিয়ে চলে যাক, কিছু যায় আসে না। দেখা যাক না কে কত মারতে পারে।

দূরে একটা হোটেলের আলো দেখা যাচ্ছে, ছেলেটি এগোচ্ছে সেই দিকে, হঠাৎ যেন মাটি ফুঁড়ে দাঁড়ালো তার সামনে একটা কালো দৈত্য। সাদা ধপধপে দাঁতে হেসে সে বললো, গট্ আ লাইট?

ছেলেটি প্রথমে দারুণ চমকে কেঁপে উঠলেও সঙ্গে সঙ্গে স্থির হয়ে গেল। সে বুঝেছে যে চরম মুহূর্ত এসে গেছে। সে দেশলাই খোঁজার জন্য পকেটে হাত দেওয়া মাত্র এই কালো দৈত্যটি তার পেটে ছুরি মারবে। এই রকমই নিয়ম। বাধা দিয়ে কোনো লাভ নেই, কারণ এই কালো দৈত্যটি ইঁদুরছানার মতন তার টুঁটি চেপে ধরে শূন্যে তুলে লোপালোপি করতে পারে।

ছেলেটি অভিমানভরা কণ্ঠে বললো, আমার কাছে তো দেশলাই নেই?

এই কথাগুলি বলায় এবং তার পরবর্তী উত্তর শোনার মাঝখানে যেন কেটে গেল একযুগ। এখনো সে মরেনি? নাকি ছুরি চালিয়ে দিয়েছে, সে টের পাচ্ছে না?

কালো দৈত্যটির হাতে সিগারেটের প্যাকেট, তখনও ছুরি কিংবা রিভলবার দেখা যাচ্ছে না। সে বললো, হোয়াইয়ু গোয়িং, ম্যান!

অল্প দূরে 'হোটেল সিসিল' লেখা বাতি স্তম্ভটি দেখালো ছেলেটি আঙুল তুলে।

কালো দৈত্যটি কী যেন একটু চিন্তা করে বললো, কম্ কম্!

তারপর সে ছেলেটির সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগলো। এতক্ষণেও মরে না

যাওয়ায় ছেলেটি বেশ অবাকই হয়েছে। কালো মানুষটি তাকে এত দয়া করছে কেন ? এত জনশূন্য রাস্তায় তাকে ঝট করে খুন করে ফেললে কেউ তো দেখবার নেই। অন্তত ব্যাগটা তো কেড়ে নিয়ে অনায়াসেই পালাতে পারে।

হোটেলের কাউণ্টারে যে ফর্সা মেয়েটি বসেছিল তার সঙ্গে কালো লোকটিই প্রথমে কিছুক্ষণ কথা বললো। সে কথার মর্মোদ্ধার করা শক্ত। তবে মনে হচ্ছে, কালো লোকটি ফর্সা মেয়েটিকে বেশ অনুরোধ করছে।

একটু বাদে ফর্সা মেয়েটি ছেলেটিকে বললো, শোনো, আমাদের হোটেলেও জায়গা নেই। এইরকম সময়ে তুমি হোটেল রিজারভেশন ছাড়াই সানফ্রান্সিসকো শহরে এসেছো ? যাই হোক, তোমার বন্ধুর অনুরোধে একটা ব্যবস্থা করতে পারি, যদি তুমি রাজি থাকো।

ছেলেটি আকাশ থেকে পড়লো। বন্ধু ? মাত্র দেড় মিনিট আগে দেখা, পরস্পরের নামও জানে না, এর মধ্যে ওরা বন্ধু হয়ে গেল ? এ আবার কী ধরনের চক্রান্ত ?

মেয়েটি বললো, একটা ডব্‌ল বেড রুমে একটা বেড খালি আছে। যে লোকের ঘর, সে এখন নেই, যে-কোনো সময় এসে পড়তে পারে, তবে তাকে বলা আছে যে তার ঘরের অন্য বিছানাটি আর একজনকে দেওয়া হতে পারে। তুমি সেটা নিতে রাজি আছো ?

অচেনা লোকের সঙ্গে রাত্রি বাস ? সে কী রকম কে জানে ? এই কালো লোকটি কোনো মতলবে নিয়ে তাকে ঐ ঘরে ঢোকাচ্ছে ? কিন্তু ভাড়া এত অবিশ্বাস্যরকমের সস্তা যে ছেলেটি এক কথায় না বলতে পারলো না।

কালো লোকটি কাউণ্টারে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল, সে হঠাৎ বললো, হে ! ইয়ু, লুক সো স্কোয়ার্ড···হ্যা হ্যা হ্যা হ্যা।

ফর্সা মেয়েটি কিন্তু হাসে না ! সে বললো, যদি রাজি থাকো, তবে তোমার গাড়িটা পেছন দিকে রেখে এসে রেজিস্টারে নাম লেখো—

গাড়ি ছাড়া, এমনকি ট্যাক্সিও না নিয়ে, পায়ে হেঁটে কেউ সানফ্রান্সিসকো শহরে রাত্তিরবেলা হোটেল খুঁজতে বেরুতে পারে, একথা এরা বিশ্বাসই করতে পারবে না। খুনে-ছিনতাইবাজরা সবাই কি আজ ক্যাজুয়াল লীভ নিয়েছে ?

ছেলেটি বললো, আমার গাড়ি নেই, কোথায় নাম লিখতে হবে বলো।

কালো লোকটি ঝুঁকে কাউণ্টারের ওপাশ থেকে একটা দেশলাই তুলে নিয়ে কী একটা দুর্বোধ্য বিদায় বাক্য বলে হঠাৎ নেমে গেল রাস্তায়। মেয়েটি নিজেই ছেলেটিকে সঙ্গে নিয়ে লিফ্‌টে উঠলো, সাততলায় একটা ঘরের দরজা খুলে দিয়ে, এতক্ষণ বাদে একটু মুচকি হেসে বললো, হ্যাভ আ নাইস টাইম।

তারপরেই সে প্রায় একটা পাখির মতন উড়ে গেল ফুরুৎ করে।

এরকম অবস্থায় শুধু একটা কথাই মনে হয়, এ কোথায় এসে পড়লুম রে, বাবা !

ঘরটি মাঝারি, মধ্যে টেবিল ল্যাম্প সমেত ছোট টেবিল, দু'পাশে দুটো খাট। একটি বিছানা নিভাঁজ পরিচ্ছন্ন, অন্য বিছানাটি এলোমেলো। ওয়ার্ডরোবের দরজাটা হাট করে খোলা, তার মধ্যে কয়েকটা জামা-প্যাণ্ট আর একটা ওভারকোট ঝুলছে। নিচে একটা সুটকেসও রয়েছে, সেটাও তালাবন্ধ নয়, উঁচু হয়ে আছে ডালাটা। এ ঘরের আসল মালিক কী রকম মানুষ কে জানে। ওভারকোটের সাইজ দেখে মনে হচ্ছে বেশ লম্বা-চওড়া। সে যদি এসে বলে তার কোনো জিনিস চুরি গেছে ? কিংবা মাঝ রাত্তিরে সে যদি কোনো বান্ধবীকে সঙ্গে নিয়ে এসে তাকে বলে, গেট আউট ! না, না, গেট আউট তো ভদ্র ভাষা, সে নিশ্চয়ই বলবে, গেট দা হেল আউট অব হিয়ার !

ছেলেটি বিমর্ষভাবে নিজের খাটে বসে জুতো-মোজা খুলে ফেললো। তার মাথায় এখন আকাশ-পাতাল চিন্তা। রাস্তার কালো লোকটি কেন তাকে এই হোটেলে পৌঁছে দিয়ে থাকবার ব্যবস্থা করে দিল ? বিনিময়ে পয়সা কড়ি কিছু চাইলো না, একটা ধন্যবাদ পর্যন্ত নেবার জন্য দাঁড়ালো না ! ও কি দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ ? কাউণ্টারের মেয়েটি যাবার সময় মুচকি হেসে গেল কেন ? তাকে নিয়ে কোনো মজার খেলা হবে ? এ ঘরের মালিক রাত্তিরবেলা এসে তাকে তুলোধোনা করবে ?

বাঙালী ছেলেদের স্বভাব হচ্ছে এই যে, তারা এক কথায় মরে যেতে একটুও ভয় পায় না, কিন্তু মার খাওয়া বড্ড অপছন্দ করে।

ভয়ের সঙ্গে একটা খিদের সম্পর্ক আছে। ছেলেটি যদিও বিকেলবেলা একটা বেশ বড় হ্যামবার্গার আর কফি খেয়েছে, তবু এর মধ্যে তার খিদে পেয়ে গেল। কিন্তু খাবার জন্য তাকে আবার বাইরে যেতে হবে ? কোনো দরকার নেই ! তার ব্যাগে বিস্কুট, চীজ আর আপেল আছে।

কিন্তু খাওয়ার আগে অন্য একটা কাজের কথা তার মনে পড়ে গেল। সে যে এই শহরে এসেছে তা কেউ জানে না। এখন তো থাকবার জায়গা জুটেছে, এখন শ্রীযুক্ত লরেন্স ফের্লিংগেটির সঙ্গে একটা অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট করা যেতে পারে। রাত আটটাও বাজেনি, বইয়ের দোকান খোলা থাকাই সম্ভব। ঘরেই ফোন আছে, সহজেই সিটি লাইট বুক স্টোরস পেয়ে গেল সে। কিন্তু তারপরই দুঃসংবাদ। মিঃ ফের্লিংগেটি ইজ নট ইন টাউন ! কাল-পরশু ফিরে আসতে পারেন। যাঃ, এ শহরের সঙ্গে ছেলেটির একমাত্র যোগসূত্রও নষ্ট। এখন যদি সে এখান থেকে

নিঃশব্দে হারিয়ে যায়, কেউ টেরও পাবে না।

ঘরের সংলগ্ন একটি বারান্দাও আছে। আপেল কামড়াতে কামড়াতে ছেলেটি খালি পায়ে এসে বারান্দায় দাঁড়ালো। এতক্ষণ বাদে তার খেয়াল হলো যে প্রায় দু' ঘণ্টা আগে সে সানফ্রান্সিসকোয় পৌঁছলেও নানারকম দুর্ভাবনা নিয়ে এমন ব্যস্ত ছিল যে এ শহরের কিছুই তার চোখে পড়েনি। এ শহরের এত নাম সে শুনেছে, কিন্তু এ পর্যন্ত সে দেখেছে শুধু কয়েকটি রাস্তা আর বড় বড় বাড়ি, যা সব শহরেই আছে। এই বারান্দা থেকেও বিশেষ কিছু দেখা যায় না, তবে দূরে দেখা যাচ্ছে একটা উজ্জ্বল আলোর আভা, ওখানে কিছু আছে নিশ্চয়ই। এমন কিছু রাত হয়নি, এখনো সে বেরিয়ে শহরটা ঘুরে দেখে আসতে পারে, এই সব শহর রাত্রিরই শহর, এরা রাত-মোহিনী। কিন্তু ছেলেটির আর উৎসাহ নেই, তার বিমর্ষ ভাব কিছুতেই কাটছে না।

যে-কোনো বড় শহরেই একাকীত্ব অতি সাঙ্ঘাতিক। যেন দম আটকে ধরে। তা ছাড়াও এই ধরনের অদ্ভুত রাত্রির আশ্রয়ে সে কিছুতেই সুস্থির হতে পারছে না। কল্পনায় ইতিমধ্যে সে তার রুমমেটের প্রায় পঁচিশ রকম চেহারা ভেবে ফেলেছে।

অনেকক্ষণ বাস জার্নি করে এসেছে বলে আজকের রাতটা সে বিশ্রামই নেবে ঠিক করলো। সাহেবরা স্লিপিং সুট পরে ঘুমোয়, ছেলেটির তা নেই, তার আছে পাজামা আর পাঞ্জাবি। যদি এই পোশাক দেখেই তার রুমমেট রেগে যায়? কিন্তু কী আর করা যাবে, উপায় তো নেই, সেই পোশাকেই শুয়ে পড়লো সে।

অবশ্য ঘুম আসবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। প্রতি মুহূর্তে সে তার রুমমেটের প্রতীক্ষা করছে। এই বুঝি দরজায় খুট করে একটা শব্দ হয়। যত রাত বাড়ছে, তত আশঙ্কা বাড়ছে। কারণ বেশি রাতে যে ফিরবে, সে নিশ্চয়ই বদ্ধ মাতাল হয়েই ফিরবে! ওরে বাপ রে, সাহেব-মাতাল, তার একটা কথাও বুঝতে পারা যাবে না...।

ছেলেটি নিজের ওপরেই ক্ষুব্ধ হয়ে ভাবলো, দূর ছাই, কেন যে নাস্তিক হতে গিয়েছিলাম! নইলে এই সময়টায় তো ভগবানকেও ডাকা যেত উদ্ধার করে দেবার জন্য!

একটু বাদে বাদেই সে উঠে টেব্‌ল ল্যাম্প জ্বেলে ঘড়ি দেখছে। রাত সাড়ে দশটা...বারোটা...পৌনে একটা...দুটো...আড়াইটে...এখনো সে মক্কেলের ফেরার নাম নেই!

ফাঁসীর আসামীও তো আগের রাত্রে ঘুমোয়, সেইরকম সেও ঘুমিয়ে পড়েছিল একসময়। কী একটা শব্দে ঘুম ভেঙে যেতেই সে চোখ মেলে দেখলো সকালের

আলোয় ঘর ভরে গেছে। আর তার ঠিক মাথার কাছে দাঁড়িয়ে আছে একজন লোক। লোকটি অস্বাভাবিক লম্বা কিন্তু রোগা, চোখ দুটো একেবারে নীল, মাথায় ঝাঁকড়া চুল, তার হতে কী একটা অদ্ভুত জিনিস, মেশিন গান-টান কিছু হবে নিশ্চয়।

বোবায় ধরা মানুষের মতন সদ্য ঘুম ভাঙা ছেলেটি ভয়ার্ত আঁ আঁ শব্দ করে উঠে বসলো। হাত জোড় করে বাংলায় ক্ষমা চাইতে গেল—।

সেই রোগা লম্বা লোকটি কিন্তু খুবই বিনীতভাবে এবং নরম, পরিচ্ছন্ন ইংরেজিতে বললো, আমি খুব দুঃখিত, তোমার ঘুম ভাঙালুম! আমি জানতুম না আমার ঘরে কেউ আছে, অবশ্য আগে আমায় জানানো হয়েছিল কেউ এসে থাকতে পারে, আমি খুবই দুঃখিত, তুমি আবার ঘুমোও, আমি কোনো শব্দ করবো না...।

লোকটির হাতে মেশিন গান নয়, একটা বেহালার বাক্স!

ছেলেটি উঠে দাঁড়িয়ে বললো, না, না, আমি আর ঘুমোবো না। আপনার যদি কোনো অসুবিধে হয়, আমি তা হলে বাইরে যেতে পারি।

নীল-চক্ষু লোকটি বললো, সে কি, বাইরে যাবে কেন? প্লীজ, তুমি আর একটু ঘুমোও, কিংবা যা খুশী করো, আমার কোনো অসুবিধে নেই। তুমি কি ইজিপ্টের লোক?

ছেলেটি বললো, না আমি ভারতীয়।

লোকটি বললো, দেখেই আমি বুঝতে পেরেছিলুম, তুমি খুব প্রাচীন কোনো দেশের মানুষ, তোমার ঘুমন্ত মুখে এমন একটা শান্তির ভাব ছিল যা আমাদের নেই।

একটু বাদেই খুব আলাপ হয়ে গেল দু'জনের। নীল চক্ষু লোকটি একটি নাইট ক্লাবে বেহালা বাজায়। খুবই নম্র স্বভাবের মানুষ। দিনের বেলা সে ঘুমোয়। সন্ধে থেকে সারারাত সে ঘরে থাকে না। সুতরাং বাঙালী ছেলেটি সারাদিন ঘুরে বেড়াতে পারবে, সন্ধের পর এই ঘরটি তার নিজস্ব হয়ে যাবে।

এরপর দিন চারেক ছিল ছেলেটি ঐ শহরে। তার একটুও অসুবিধে হয়নি, কোনো জোচ্চোর-খুনে-বদমাইসের পাল্লায় পড়েনি। লরেন্স ফের্লিংগেটির সঙ্গে দেখাও হয়েছিল, খুব খাতির করেছিল। আর তার রুমমেটের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়ে গেল যে একদিন বিনা পয়সায় নিয়ে গেল নাইট ক্লাবে। সেই কালো দৈত্যটির সঙ্গেও পরে দেখা হয়েছিল, অতিশয় সহৃদয় মানুষ...।

এবার সানফ্রান্সিসকো ঢোকার মুখে আমার মনে পড়ছিল সেই আগের বারের অভিজ্ঞতার কথা। প্রথম রাত্রির ভয়াবহ স্মৃতি। এখন ভাবতে অবশ্য মজা

লাগছে, কিন্তু সেদিন যে বেদম ভয় পেয়েছিলুম, তাও তো ঠিক।

এবার সানফ্রান্সিসকোতে প্রবেশ করছি সম্পূর্ণ অন্যভাবে। মদনদার ঝকঝকে নতুন মার্সিডিজ বেঞ্জ গাড়িতে আমরা সবাই মিলে বাংলায় গান গাইতে গাইতে। যেন আমরা এই শহরটা জয় করতে চলেছি।

২৪ ॥

এবার তা হলে সেই ঘটনাটা লিখি? যে-ঘটনাটার এক চুল এদিক ওদিক হলেই আমি এতদিনে স্বর্গে গিয়ে বিদ্যাসাগর মশাইয়ের সঙ্গে বেলের পানা খেতুম কিংবা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নিমপাতার রস খেতে খেতে আধুনিক কবিতা বিষয়ে তর্ক করতুম কিংবা কার্ল মার্কসের সঙ্গে চা খেতে খেতে চীন ও রাশিয়ার ঝগড়া বিষয়ে তাঁর মতামত জেনে নিতুম। কিংবা ওসব কিছুই না করে একালের উর্বশী মেরিলিন মনরোর সাহচর্য লাভে ধন্য হতুম।

কিন্তু একটুর জন্য আমি আমার নামের আগে চন্দ্রবিন্দু বসাবার সেই সুবর্ণ সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছি।

মদনদাদের সঙ্গে দিন দু'-এক তো দারুণ হৈ চৈ করে কাটলো সানফ্রান্সিসকো শহরে। যেমন সুন্দর শহর, তেমনই ঝকঝকে দিন আর নরম রাত্রি। এই শহরটির বৈশিষ্ট্য হলো, যে-কোনো দিকে মিনিট পাঁচ দশ গেলেই সমুদ্র চোখে পড়ে। এই শহরেএখনো আছে পুরোনো আমলের ট্রাম, আবার এমন অত্যাধুনিক বহুতল বাড়ি আছে যে দেখলে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। শহরের মাঝামাঝি রয়েছে বিরাট চীনে পাড়া, যেখানে গেলে মনে হয় মূল চীন ভূখণ্ডে পৌঁছে গেছি। রাস্তায় টাট্‌কা চীনে শাক সব্জী বিক্রি হচ্ছে, সিনেমা হলে চীনে ছবি, ব্যাঙ্কের নাম চীনে ভাষায় লেখা। এখানকার কোনো কোনো চীনে খুবই বড়লোক। একবার শুনেছিলুম, কোনো একজন চীনে ব্যাঙ্কার গোটা সানফ্রান্সিসকো শহরটাই কিনতে চেয়েছিল।

নানান দ্বীপের সঙ্গে সানফ্রান্সিসকো শহরটি জোড়া। এখানকার গোল্ডেন গেট ব্রীজ জগদ্বিখ্যাত। এমন নিখুঁত স্মার্ট চেহারার ব্রীজ দেখলে সত্যিই আনন্দ হয়। কোনো প্রয়োজন নেই, তবু এমনি এই ব্রীজে বার বার এপার ওপার হতে ইচ্ছে করে। যে-দ্বীপটিতে বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয় অধিষ্ঠিত, মূল শহরের সঙ্গে সেই দ্বীপটি একটি সাড়ে আট মাইল লম্বা ব্রীজ দিয়ে জোড়া। অবশ্য এক লাফে সমুদ্র লঙ্ঘনের সময় হনুমান যেমন মাঝখানে একবার এক ডুবো পাহাড়ে একটু পা ছুঁয়েছিল, সেই রকম এই সাড়ে আট মাইল লম্বা ব্রীজটিও একবার এক জায়গায়

কিছু পাথরের স্তূপে পশ্চাৎদেশ ঠেকিয়েছে।

একদিন সকালবেলা গিয়েছিলুম বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয় দেখতে। হার্ভার্ড বা ইয়েলের মতন তেমন কুলীন নয় বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয়, তবু এর খ্যাতি অন্য কারণে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসেই নানান আন্দোলনের জন্ম হয়েছে, সিভিল রাইট্‌স, উইমেন্‌স লীব, ভিয়েৎনাম যুদ্ধের প্রতিবাদ, আণবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতা বিরোধী মিছিল ইত্যাদি। অনেক হাঙ্গামা হয়েছে এখানে, পুলিশী আক্রমণে অনেক রক্ত ঝরেছে, তবু এখানকার ছাত্রছাত্রীরা অসম সাহস দেখিয়েছে।

আমরা যেদিন গেলুম, তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছুটি। সব দিক অসম্ভব শান্ত। এখানে সেখানে ঘাসের ওপর অলস ভাবে শুয়ে আছে এক জোড়া করে ছেলেমেয়ে, অতিরিক্ত পড়ুয়া কেউ কেউ সাইকেলের পেছনে এক গাদা বইপত্র চাপিয়ে চলেছে লাইব্রেরিতে। আমেরিকার অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসই এত বড় যে ভেতরে বাস চলে, এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যাবার জন্য। বার্কলের ক্যাম্পাস যেন আরও বড়। কতটা যে বড় তা এক সঙ্গে দেখবার জন্য একটা ব্যবস্থা আছে। মাঝামাঝি একটা জায়গায় আমাদের মনুমেন্টের মতন একটা স্তম্ভ আছে, তার ভেতরে লিফ্‌ট চলে, আট আনার টিকিট কাটলেই ওপরে ওঠা যায়।

ওপরে উঠে শুধু যে চোখ জুড়িয়ে গেল তাই নয়, একটা দীর্ঘশ্বাসও পড়লো। আমাদের দেশে এমন সুন্দর ক্যাম্পাস কোনোদিন হবে না? শান্তিনিকেতনে অনেক গাছপালা আছে, কিন্তু বার্কলে ক্যাম্পাসের বড় বড় বৃক্ষরাজি ও ফুলের সৌন্দর্য আরও অনেক বেশী। তা ছাড়া, পেছনে রয়েছে পাহাড়ের পটভূমি আর তিন দিকে সমুদ্র।

এই প্রসঙ্গে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা একটু বলি। বার্কলে শুধু চোখে দেখেছি কিন্তু সেখানকার কারুর সঙ্গে আলাপের সুযোগ সেদিন হয়নি। কিন্তু শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে একটা চমকপ্রদ তথ্য জানি। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় হার্ভার্ড-ইয়েলের মতন অভিজাত তো নয়ই, পড়াশুনোর কৃতিত্বেও বার্কলের চেয়েও কিছু নিচে। তবু সেই শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসেই বেয়াল্লিশজন নোবেল লরিয়েট অধ্যাপক থাকেন। তাহলে হার্ভার্ড-ইয়েল-বার্কেলেতে ওনারা কতজন আছেন কে জানে!

যাই হোক, আমাদের সানফ্রান্সিসকো সফরের পালা এবার ফুরিয়ে এলো। সব সুখের দিনই তো একদিন না একদিন শেষ হয়। এবার মদনদারা ফিরে যাবেন, আমাকে একলা যেতে হবে অন্যদিকে।

ওঁরা সবাই মিলে আমায় তুলে দিতে এলেন গ্রে হাউণ্ড বাস স্টেশনে। এরা বাস ডিপো বলে না, স্টেশন বলে, ঠিকই বলে। বড় বড় শহরের বাস স্টেশন অনেক রেল স্টেশনের চেয়ে বড়। যাত্রীদের জন্য ওয়টিং প্লাটফর্মে এক একটি চেয়ারের হাতলের সঙ্গে ছোট ছোট টিভি সেট লাগানো আছে, যাতে তাদের সময় কাটাতে অসুবিধে না হয়।

আমার বাসটি এক্ষুনি ছাড়বে। আমি "একেলা এসেছি এই ভবে, একেলাই চলে যেতে হবে" এই গান গাইতে গাইতে উঠে পড়লুম। জানলার কাছে গিয়ে ওঁদের দিকে একটু হাত দেখাতেই বাস চলতে শুরু করলো। তারপরই ঢুকে পড়লো অন্ধকার সুড়ঙ্গে। ব্যাস, আবার শুরু হলো আমার একাকী ভ্রাম্যমান জীবন।

গ্রে হাউণ্ড বাসের চেহারা বাইরে থেকে এমন শক্ত পোক্ত যে কুকুরের বদলে গণ্ডারের সঙ্গেই এর তুলনা দেওয়া উচিত। ভেতরটা অবশ্য শীত-তাপ এবং শব্দ নিয়ন্ত্রিত, একশো কুড়ি মিটার বেগে বাস চললেও ভেতরে বসে বিশেষ কিছু টের পাবার উপায় নেই। পেছনে বাথরুম আছে। আপাততঃ প্রায় বেয়াল্লিশ ঘণ্টা আমাকে এই বাসে থাকতে হবে, সুতরাং আমি ঘাড় ঘুরিয়ে আমার সহযাত্রীদের দেখে নিলুম। জনা আষ্টেক চীনে, জনা পনেরো কালো মানুষ, জনা কুড়িক ফর্সা। খয়েরি বলতে আমি একাই। আমার পাশে বসেছে···এখানে আমার খুব লিখতে ইচ্ছে করছিল যে আমার পাশে বসেছে একটি ফুটফুটে সুন্দরী তরুণী মেয়ে, অধিকাংশ ভ্রমণ কাহিনীতেই যেমন হয়ে থাকে। কিন্তু আমার যা ভাগ্য! আসলে আমার পাশে বসেছে এক বুড়ি মেম সাহেব, যার মাথার উল্‌কো-ঝুল্‌কো চুল দেখলে মনে হয় নির্ঘাৎ উকুন আছে।

বুড়ি মেমদের সঙ্গে আলাপ করার জন্য কোনো চেষ্টা করতে হয় না, এরা নিজেরাই আলাপের জন্য মুখিয়ে থাকে। বুড়ো-বুড়িরা এদেশে অতি নিঃসঙ্গ, তাদের কথা শোনবার সময় কারুর নেই, তরুণ সমাজ তাদের পাত্তাই দেয় না। সেইজন্য এরাও নতুন লোক দেখলেই কথার ফোয়ারা ছুটিয়ে দেয়।

মুশকিল হচ্ছে এই যে, এরাও অনেকেই বার্ধক্যটাকে প্রসন্নভাবে মেনে নিতে পারে না। প্রাণপণে বয়েসটা চাপা দেবার চেষ্টা করে যায় শেষ দিন পর্যন্ত। আমার পাশে যে বুড়ি মেম সাহেব বসে আছেন, তিনি নিশ্চয়ই আমার দিদিমার বয়েসী, কিন্তু ঠোঁটে ও গালে উগ্র রঙ মাখা, পোশাকের রঙ খুন খারাবি, একটা বিরাট চকোলেট-বার নিয়ে কচর মচর করে খাচ্ছেন। বেশ একটা লাল পেড়ে সাদা খোলের শাড়ি পরিয়ে, চুল টানটান করে আঁচড়ে দিলে এবং মুখে এক খিলি পান গুঁজে দিলে বরং বেশ মানিয়ে যেত।

বুড়ি মেমটির সঙ্গে যেন আমার কতকালের চেনা এই ভঙ্গিতে সে প্রথমেই আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি রিনোতে নামবে?

দু' দিকে ঘাড় নেড়ে আমি বললুম, না।

তিনি বেশ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, নামবে না? পঁয়তাল্লিশ মিনিট থামবে?

এবার মুখে কোনো উত্তর না দিয়ে আমি 'সে দেখা যাবে এখন' এই রকম একটা ভাব করে কাঁধ ঝাঁকালুম। তারপরই কথাবার্তা থামাবার জন্য খুলে ফেললুম একটা বই।

রিনো শহরটির বিষয়ে আমি জানি। লাস ভেগাস যেমন বিশ্ববিখ্যাত জুয়া খেলার জায়গা, তার কাছাকাছি এই রিনো শহরটিও জুয়ার জন্য প্রসিদ্ধ। লাস ভেগাসে আমাদের বাস থামবে না, কিন্তু রিনোতে চা খাবার স্টপ আছে। সব রেস্তোরাঁর মধ্যেই জুয়া খেলার যন্ত্র বসানো থাকে, অনেক যাত্রী ঐটুকু সময়ের মধ্যেই ভাগ্য ফেরাবার চেষ্টায় লেগে যায়।

এ কথা ঠিক, আমেরিকার সমস্ত জুয়ার আসরে বুড়িদের সংখ্যারই প্রাধান্য। এটাও তাদের নিঃসঙ্গতা কাটাবার একটা উপায়।

গ্রে-হাউণ্ড বাসের ড্রাইভারদের ভাব-ভঙ্গি উচ্চ পদস্থ অফিসারের মতন। খুব সম্ভবত সেই রকমই মাইনে পায়। এরা স্বভাব-গম্ভীর ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, যাত্রীদের সঙ্গে কথা বলে না, কিন্তু মাঝে মাঝে বক্তৃতা দেয়। সেজন্য এদের কাছে মাইক্রোফোন থাকে। বক্তৃতায় এরা বাস যাত্রার নিয়ম কানুন স্মরণ করিয়ে দেয় এবং মেজাজ প্রসন্ন থাকলে কখনো কখনো পথের দু' পাশের বিশেষ দ্রষ্টব্য জিনিসগুলো সম্পর্কেও দু'চার কথা বলে।

অনেকের ধারণা, বাস থাকলেই একজন কণ্ডাকটর থাকবে, সেইজন্যই জানিয়ে দিতে চাই যে গ্রে-হাউণ্ড বাসে ড্রাইভারই একমাত্র কর্মচারী।

আমাদের বাসটা ছাড়বার একটু বাদে ড্রাইভার মহোদয় যে বক্তৃতাটি দিলেন, তা শুনে তো আমার মাথায় হাত। নতুন নিয়মে বাসে ধূমপায়ী এবং অধূমপায়ী এলাকা ভাগ করা হয়েছে। একদম পেছন দিকের তিনটি রো-তে যারা বসেছে, শুধু তারাই সিগারেট টানার অধিকারী, বাকি সিটের যাত্রীদের ধূমপান নিষিদ্ধ।

আমি তো আগে এই কথাটা চিন্তাই করিনি। তাড়াতাড়ি উঠে সামনে যে-জায়গা পেয়েছি, তাতেই বসে পড়েছি। জায়গাটা অবশ্য ভালোই, সামনের দিকে, ড্রাইভারের কাছাকাছি এবং জানলার পাশে। কিন্তু বিয়াল্লিশ ঘণ্টা সিগারেট না খেয়ে থাকতে হবে? অবশ্য তিন-চার ঘণ্টা অন্তর অন্তর বাস এক একটি স্টেশনে থামবে, সেখানে নেমে ফুক্ ফুক্ করে দু'একটা সিগারেট টেনে নেওয়া

যায়, কিন্তু তাতে কি আরাম হয়! সিগারেট তো আর শারীরিক ক্ষুধাতৃষ্ণা মেটাবার কোনো খাদ্য-পানীয় নয়, সিগারেট হলো মনকে আকাশে ভাসাবার জন্য একটা বায়ু যান। মন যখন চাইবে তখন না পেলে আর পকেটে সিগারেট রাখার কী মানে হয়!

বেশ মন-মরা হয়ে গেলুম!

আমার চোখ বইয়ের প্রতি নিবদ্ধ দেখেও বুড়ি মেম একটুবাদে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি মেক্সিকো থেকে এসেছো?

—না।

—সাউথ আমেরিকা?

—না।

—আরব দেশ? ইরান?

—না।

—তুমি কোথা থেকে এসেছো?

—সান ফ্রান্সিসকো থেকে।

—ও!

আমি ইচ্ছে করেই ভারতবর্ষের নাম করলুম না, তা হলেই অনেক কথা বলতে হবে। যাকে-তাকে ভারতবর্ষ বিষয়ে জ্ঞান দেবার ইচ্ছে আমার নেই। বুড়ি মেম সাহেবের মুখ থেকে আমি পরিষ্কার জিনের গন্ধ পাচ্ছি। বাস ছাড়বার দেড় ঘণ্টার মধ্যেই উনি দু'বার বাথরুম ঘুরে এসেছেন। খুব সম্ভবত বাথরুমে গিয়ে উনি জিনের বোতলে একটা করে চুমুক দিয়ে আসছেন। আমি যে বাথরুমে গিয়ে সিগারেট টেনে আসবো তার উপায় নেই, কারণ ড্রাইভার সাহেব আগেই নিষেধ করে দিয়েছেন, ওটা নাকি বিপজ্জনক।

রিনো শহরের কাছাকাছি আসতেই বুড়ি মেমের কী উৎসাহ। ঝলমলে মুখে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, এসে গেছে! এসে গেছে! তুমি আমি এক সঙ্গে খেলবো! শোনো, এক মেশিনে বেশীক্ষণ খেলতে নেই, কমপিউটার প্রোগ্রামিং করা থাকে, সেই জন্য নানান মেশিনে চান্স নিতে হয়!

রিনোয় আমি নামলাম ঠিকই, কিন্তু চট করে চলে গেলুম উল্টোদিকের অন্ধকারে। তারপর একটুবাদে চুপি চুপি একটা কফি কাউণ্টারে বসলুম। বুড়ি মেম সাহেবের পাল্লায় পড়ে জুয়া খেলতে হলেই গেছি আর কি! পকেট যে গড়ের মাঠ তা তো ও জানে না!

ঠিক পঁয়তাল্লিশ মিনিট বাদে ফিরে এলুম বাসে। বুড়ি মেম সাহেব এখনো ফেরেননি। ড্রাইভার যাত্রী সংখ্যা গুণে দেখলেন একজন কম। এইরকম অবস্থায়

রেস্তোরাঁয় মাইক্রোফোনে ঘোষণা করে দেওয়া হয় যে অমুক নম্বর বাস এক্ষুণি ছাড়বে, যাত্রীদের শেষ আহ্বান জানানো হচ্ছে।

এর পরেও বুড়ি মেম সাহেব এলেন না। বাস ছেড়ে দিল। তাহলে কি ওঁর এখানেই নেমে যাওয়ার কথা ছিল? সেটা তো বুঝিনি, একটু পরেই আমার নজরে পড়লো, ওপরের র‍্যাকে একটা নীল ব্যাগ রয়েছে, ওটা তো বুড়ি মেমের। তা হলে? আমি উত্তেজিত ভাবে উঠে গিয়ে ড্রাইভারকে কথাটা বললুম। তাঁকে বোঝাবার জন্য আমাকে ব্যাপারটা দু' তিনবার বলতে হলো। ড্রাইভার ঘাড় ঘুরিয়ে ব্যাগটা একবার দেখে নিয়ে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে আমায় বললো, ফরগেট ইট!

আমার কেমন যেন একটা অপরাধ বোধ হলো। বুড়ি মেম কি নীল ব্যাগটা ভুল করে ফেলে গেছে? অথবা, এখানে তার নামবার কথা ছিল না, জুয়ায় মেতে গিয়ে ও ওখানেই থেকে গেল। আমি সঙ্গে থাকলে হয়তো ওকে ফিরিয়ে আনতে পারতুম।

এরপর ঘুমিয়ে পড়লুম। মাঝরাত্রে একবার চোখ মেলে দেখলুম এর মধ্যে কোনো এক স্টেশান থেকে একজন মাঝ বয়েসী সাহেব উঠে আমার পাশের সীটে বসেছে। কিছুই শেষ পর্যন্ত খালি থাকে না, প্রকৃতি শূন্যতা পছন্দ করে না।

তারপর খানিকটা ঘুম আর খানিকটা জাগরণে কাটতে লাগলো সময়। এর মধ্যে পাহাড়, গভীর অরণ্য, মরুভূমি পেরিয়ে ছুটতে লাগলো বাস। মাঝে একবার ড্রাইভার বদল হয়ে গেল।

সকাল সওয়া ন'টায় বাস থামলো সল্ট লেক সিটিতে। সেখানে পেছনের সীট থেকে নেমে গেল একজন, অমনি আমি পড়ি মরি করে ছুটে গিয়ে বসে পড়লুম সেই সীটে। যাক্ নিশ্চিন্ত আশ্রয় পাওয়া গেছে। নিজের জিনিসপত্র সেখানে রেখে নামলুম ব্রেকফাস্ট খেতে।

বাস ছাড়লো দশটায়। পাঠক বিশ্বাস করুন, এবার কিন্তু সত্যিই আমার পাশের সীটে এক তরুণী নারী বসেছিল। সে অবশ্য আমার সঙ্গে কথা বলার কোনো চেষ্টাই না করে তাকিয়ে রইলো বাইরের দিকে। আমি আরাম করে একটা সিগারেট ধরালুম। পেছনের দিকের সীটে একটু ঝাঁকুনি লাগে, তা হোক, চলন্ত বাসে যেতে যেতে সিগারেট খাওয়ার আনন্দই আলাদা।

এর পর দশ মিনিটও কাটেনি, আমার সিগারেটটা সবে মাত্র শেষ হয়েছে, এমন সময় কী যেন হলো। আমি সিট থেকে লাফিয়ে উঠে বাসের ছাদে ধাক্কা খেয়ে তারপর লুটিয়ে পড়লুম মাটিতে। প্রথমে মনে হলো মরে গেছি। কিন্তু শরীরে কোনো ব্যথা নেই। তারপরই শুনতে পেলুম, তিন চারজন একসঙ্গে

চিৎকার করছে। হি ইজ ডেড্! হি ইজ ডেড্।

কে মারা গেছে ? আমি ? কোনো রকমে উঠে দাঁড়ালুম। বাসের সমস্ত লোক চিৎকার করছে, কয়েকজন কাঁদছে। অন্যদের কথায় বুঝতে পারলুম, মারা গেছে ড্রাইভার। উঁকি দিয়ে দেখলুম, ড্রাইভারের শরীর একেবারে ছিন্নভিন্ন, বাসের সামনের দিকটা তুবড়ে ঢুকে এসেছে ভেতরে।

কিন্তু ড্রাইভারহীন বাস তখনো চলছে।

হয়তো কয়েক মুহূর্তের ব্যাপার, কিন্তু মনে হচ্ছিল অনন্তকাল। সারা বাস জুড়ে ভয়ার্ত চিৎকার আরও বেড়ে গেল, কারণ, পরিষ্কার বোঝা গেল, বাসটা রাস্তা ছেড়ে পাশের খাদের দিকে নামছে। কত নিচে আছড়ে পড়বে কিংবা কোথায় ধাক্কা খাবে জানি না। সিনেমায় এই রকম সময় দেখা যায় দপ্ করে একটা শব্দ হয়ে পেট্রোল ট্যাঙ্ক ফেটে যায়, তারপরে সমস্ত বাসটায় আগুন জ্বলে। আমার ঠিক ঐ সিনেমার দৃশ্যের কথাই মনে হচ্ছিল, প্রতীক্ষা করছিলুম কখন আগুন জ্বলবে।

কিছুতে ধাক্কা লেগে বাসটা উল্টে গেল একদিকে, কিন্তু আগুন জ্বললো না। সেই ধাক্কার সময় আমি আবার মাটিতে গড়াগড়ি খেলুম। তখনও মনে হলো, মরিনি ? বেঁচে আছি ? হ্যাঁ, বেঁচেই তো আছি। বাসটা যেদিকে উল্টে গেল, আমি ছিলাম তার ওপরের দিকে। কয়েকজনের গায়ের ওপর পড়েছিলুম, আমার ওপর সেই মেয়েটি। অত্যন্ত সাহসিনীর মতন সে আগাগোড়া চুপ করে ছিল। কোনো রকমে এটা সেটা ধরে উঠে দাঁড়ালুম দু' জনে। এতক্ষণে অনেকে দমাদ্দম লাথি মারছে বাসের জানলায়। যে-কোনো মুহূর্তে আগুন জ্বলবে। একটা জানলা ভেঙে যেতেই আমরা কয়েকজন লাফিয়ে পড়লুম সেখান থেকে। অত উঁচু থেকে লাফিয়ে পড়ায় আমার একটা গোড়ালি মচকে গেল, সেই আমার প্রথম ব্যথা। তরুণী মেয়েটিকে আমরা কয়েকজন সাহায্য করলুম নামবার জন্য, তারপর সবাই আগুনের ভয়ে দৌড়ে গিয়ে উঠলুম উল্টো দিকের রাস্তায়।

আগুন অবশ্য শেষ পর্যন্ত জ্বলেনি। আমাদের বাসটার সঙ্গে একটা ট্রাকের ধাক্কা লেগেছিল, দুটোই ছিল দুর্দান্ত স্পীডে, সামান্য ধাক্কাই যথেষ্ট। দুই গাড়ির ড্রাইভারই মারা গেছে সঙ্গে সঙ্গে। ট্রাকটাও উল্টে পড়ে আছে একটু দূরে।

দু' তিন মিনিটের মধ্যে যেন মন্ত্রবলে গোটা দশেক পুলিশের গাড়ি-দমকল-অ্যাম্বুলেন্স এসে গেল। আমাদের বাস থেকে যাত্রীদের উদ্ধার কার্য চলছে, আমি দূরে বসে অলস চোখে দেখছি। থ্যাঁতলানো-চ্যাপটানো, হাত পা ভাঙা এক একটা শরীর বেরুচ্ছে, বাসের বড়ি কেটে কেটে বার করা হচ্ছে। সামনের দিকটায় যাত্রীরাই নিহত ও আহত হয়েছে বেশী।

হঠাৎ আমার একটা সাঙ্ঘাতিক উপলব্ধি হলো। খানিকটা আগেই আমিও তো সামনের দিকে বসে ছিলাম। সিগারেট খাওয়ার টানে পেছনে চলে গিয়েছি। যদি না যেতাম ! তাহলে এতক্ষণে আমিও ঐ রকম থ্যাঁতলানো একটা শরীর, হাত কিংবা পা নেই...। ভেবেই আমার শিহরন হলো।

কে বলে সিগারেটের উপকারিতা নেই ? জয় সিগারেট !

তক্ষুণি সিগারেট ধরালুম একটা। কিন্তু আমার হাত কাঁপছে। সিগারেটে কোনো স্বাদ পাচ্ছি না। কপাল থেকে টপ টপ করে রক্ত পড়ছে, কপালে যে কেটে গেছে তা খেয়ালই করিনি এতক্ষণ।

আমি মরে যেতে পারতুম, আমি মরে যেতে পারতুম। দশ-বারো মিনিট আগে সামান্য একটা সিদ্ধান্তের জন্য... । যদি পেছনের সিটটা খালি না হতো, তা হলে এতক্ষণে এই বিদেশ-বিভুঁইয়ে আমি একটা লাশ হয়ে যেতাম ?

কে যেন বলেছিল মৃত্যুর উপলব্ধি খুব মহান ? আমার তো সেরকম হলো না ? মৃত্যুর অত কাছাকাছি যাবার পর আমি বেশ কিছুক্ষণ যেন বোধহীন, জড়ের মতন হয়ে রইলাম।

॥ ২৫ ॥

দুর্ঘটনা তো সব দেশেই হয়। তাদের চরিত্রও মোটামুটি একই রকম। দুর্ঘটনার পরবর্তী অংশটির অভিজ্ঞতাই আলাদা।

আমাদের বাসটি দুর্ঘটনা ঘটালো সকাল দশটার সময়, প্রকাশ্য দিবালোকে এবং অপেক্ষাকৃত নির্জন রাস্তায়। সারারাত আমরা পাহাড়ী রাস্তা দিয়ে এসেছি, তখন কিছুই হয়নি, অথচ বিপদ ঘটলো কিনা নিরাপদ সমতলে। গ্রে হাউণ্ড বাস এমনিতেই খুব নির্ভরযোগ্য, ড্রাইভাররা খুবই অভিজ্ঞ এবং পরে শুনেছিলাম, আমাদের বাসের ড্রাইভারটি টানা পঁচিশ বছর নির্ভুল বাস চালাবার জন্য অতি সম্প্রতি কোম্পানির কাছ থেকে মেডেল পেয়েছিল। কিন্তু সকাল দশটায় গ্রে-হাউণ্ড বাসটি এক শো কুড়ি কিলোমিটার বেগে যাবার সময় অন্য একটি ট্রাক তার নাকের কাছে ছোট্ট একটি ধাক্কা দিল, সঙ্গে সঙ্গে দুই ড্রাইভারের শরীরই চিঁড়ে চ্যাপ্টা। একে নিয়তি ছাড়া আর কীই-বা বলা যায়।

আমি প্রাণে বেঁচে যাবার পর উল্টো দিকের রাস্তায় ঘাসের ওপর বসে রইলুম। বারবার শরীরের নানা জায়গায় হাত বুলিয়ে দেখছি। চোখ দুটো ঠিক আছে, নাক ঠিক আছে, দুটো হাত, দুটো পা অক্ষতই আছে, মাথার খুলিও উড়ে যায় নি। বাঁ ভুরুর ওপরে খানিকটা গর্ত হয়েছে। ডান পায়ের গোড়ালি মচকে গেছে, শুধু এইটুকুই যা বোঝা যাচ্ছে।

আমাদের বাসটির বডি কেটে কেটে নামানো হচ্ছে অন্য যাত্রীদের। ক'জন নিহত, ক'জন আহত এখনই বোঝা যাচ্ছে না। অনেকেরই হাত পা ভাঙা। পুলিস ও অ্যাম্বুলেন্স এত তাড়াতাড়ি চলে এলো কী করে, সেটাই বিস্ময়ের। রাস্তা দিয়ে পুলিস প্যাট্রোল অনবরত ঘোরে, তাছাড়া রাস্তার অন্য যে-সব গাড়ি এই দুর্ঘটনা দেখেছে, তারা ওয়্যারলেসে খবর দিয়ে দিয়েছে নিশ্চয়ই, এক মিনিটও সময় নষ্ট হয়নি।

আমাদের দেশে এরকম একটা বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটলেই তারপর যেন মাটি ফুঁড়ে উঠে আসে হাজার হাজার মানুষ, তারা ভিড় করে দাঁড়ায় এবং প্রবল চ্যাঁচামেচির মধ্যে তৎক্ষণাৎ দুর্ঘটনা বিষয়ে পাঁচ রকম গল্প তৈরি হয়ে যায়। এখানে দৃশ্যটি একেবারে অন্যরকম। এ দেশের রাস্তায় মানুষ থাকে না, কয়েকটি যাত্রী গাড়ি থেমেছে বটে, কিন্তু তাদের কোনো সাহায্যের দরকার আছে কি না, এইটুকু জেনে নিয়েই চলে যাচ্ছে। এদেশের লোকেরা অকারণে কণ্ঠনালির ব্যবহার করে না। একটুও গোলমাল নেই। আমাদের মতন যে-সব যাত্রীরা অনাহত হয়ে বসে আছি এক জায়গায়, সেখানেও সম্পূর্ণ নিস্তব্ধতা, শুধু একটি বাচ্চা ছেলে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে যাচ্ছে। শিশুটির বয়েস পাঁচ ছ' বছর, ফুটফুটে চেহারা, ওর সোনালি চুলে রক্ত মাখা। ওর মা একবার আমাদের জানিয়ে দিয়েছে যে ঐ রক্ত ঐ শিশুটির নয়, অন্য একজন আহত লোকের রক্ত ওর চুলে লেগে গেছে।

অজস্র মেরিপোসা আর বুনো লিলি ফুটে আছে রাস্তার ধারে। সেখানে পা ছড়িয়ে বসে আমি উদ্ধার কার্য দেখছি। শরীর ও মন অবশ হয়ে আছে, দৈবাৎ প্রাণ ফিরে পাওয়ার তীব্র আনন্দও বোধ করছি না।

আমরা যেখানে বসে আছি, সেই রাজ্যটির নাম ওয়াইওমিং। এখানে জন বসতি খুব বেশী নেই। মাইল পনেরো দূরে একটা ছোট শহর আছে, একটু পরেই সেখানকার নাগরিকরা এলেন আমাদের আতিথ্য দিতে। সঙ্গে দু'তিনজন ডাক্তারও এসেছেন। তাঁরা পরীক্ষা করতে লাগলেন আমাদের। গুরুতর আহতদের তো বার করার সঙ্গে সঙ্গেই অ্যাম্বুলেন্সে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে হাসপাতালে। কিন্তু আমাদের শরীরে সে-রকম কিছু আঘাত না লাগলেও মানসিক আঘাত লেগেছে কি না সেটা পরীক্ষা করে দেখতে চান।

একজন বৃদ্ধ ডাক্তার আমার সামনে এসে বললেন, জীবনে তো এরকম অনেক কিছু হয়ই। সুতরাং এখন আর দুশ্চিন্তা করে লাভ নেই।

আমি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালুম।

ডাক্তারটি আবার বললেন, মানুষের জীবন অনেক কিছুই সহ্য করতে পারে,

তাই না?

আমি আবার ঘাড় নাড়লুম।

ডাক্তারটি এবার বেশ ধমক দিয়ে বললো, সে সামথিং!

ওঃ হো, ইনি বুঝি ভাবছেন আমি আকস্মিক শক্-এ বোবা হয়ে গেছি? সুতরাং জোর করে ঠোঁটে খানিকটা হাসি টেনে এনে বললুম, আই অ্যাম অল রাইট!

আমার পাশের যে তরুণী মেয়েটি আগাগোড়া চুপ করে ছিল, ডাক্তারবাবুটি তাকেও জেরা করলেন ঐভাবে। সে মেয়েটিও শুধু ঘাড় নাড়ছিল। ডাক্তারটি একবার তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কথা বলতো পারো না? মেয়েটি জানালো, অকারণে কথা বলি না।

বিভিন্ন গাড়িতে তোলা হলো আমাদের। মাইল পনেরো দূরের শহরটিতে এসে একটা বড় বাড়ির সামনে থামলো গাড়িগুলো। সে বাড়ির একতলায় একটা হলঘর, মনে হলো থিয়েটার হল, এর মধ্যেই অনেকগুলো ক্যাম্প খাট পেতে ফেলা হয়েছে। আমাদের বলা হলো সেখানে শুয়ে পড়তে। শুয়ে পড়লুম। সঙ্গে সঙ্গে এলো চা আর ডো-নাট। শুধু চা খেয়ে ডো-নাটগুলো রেখে দিলুম। তারপরেই এলো কোল্ড ড্রিংক্স, পেপ্সি আর কোকা কোলার টিন। চায়ের পরেই এটা খেতে হবে? কিন্তু ওরা বলছে বলে খেয়ে নিচ্ছি। মনটা এমনই অবসন্ন যে যে-যা বলছে শুনছি।

তবু খানিকটা বাদে মনে হলো, শুধু শুধু এই দিনের বেলা রুগীর মতন খাটে শুয়ে থাকবো কেন? অনেক মহিলা আমাদের সেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে ঘোরাঘুরি করছেন, আমাদের কার কী দরকার জিজ্ঞেস করছেন। এর মধ্যে একজন আমার কপালের ক্ষতটা সীল্ করে দিয়েছেন। আমি খাট থেকে উঠে বাইরে চলে এলুম। এখন আমাদের আবার পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করলেই তো হয়!

শুনলুম, তার উপায় নেই। টেলিভিশানের লোক, রেডিওর লোক, বীমা কোম্পানির লোক, গ্রে হাউণ্ড কোম্পানির লোক এবং পুলিসের কাছে আলাদা আলাদা বিবৃতি দিতে হবে। একসঙ্গে সবার কাছে একেবারে বলে দিলে চলবে না, কেউ কোনো কিছু গোপন করছে কি না, কিংবা কেউ দুর্ঘটনার সঠিক কারণ সম্পর্কে কোনো আলোকপাত করতে পারে কি না তা জানবার জন্য ওরা নিজেরা গোপনে জেরা করবে। সব মিলিয়ে অনেক সময়ের ব্যাপার।

এরকম দুর্ঘটনা থেকে এদেশে অনেকে প্রচুর টাকা রোজগার করতে পারে। যারা আহত ও ক্ষতিগ্রস্ত, তারা তো ক্ষতিপূরণ পাবেই। নিহতদের নিকট আত্মীয়রা যেমন খুশী টাকা দাবি করবে। যাদের কোনো বাইরের আঘাত লাগে

নি, তারাও মানসিক আঘাত লেগেছে কিংবা গুরুতর কোনো কাজ নষ্ট হয়ে গেছে, এই দাবিতে এক লাখ-দু' লাখ টাকা পেতে পারে। সেজন্য অবশ্য মামলা করতে হবে। পশ্চিম বাংলায় দ'খনোদের খুব মামলা করার ব্যাপারে সুনাম আছে, সে হিসেবে আমেরিকানরা প্রায় সবাই খুব দ'খনো। কথায় কথায় মামলা করে। 'আই উইল স্যু ইউ' এটা একটা কথার লব্‌জ। এমনকি বাবাও যদি ছেলেকে বা মেয়েকে খুব বকাবকি করে, তখন ছেলে-মেয়ে বলতে পারে, ড্যাডি, ইউ আর হার্টিং মাই ফীলিং! সেই অভিযোগেও মামলা হয় এবং প্রমাণিত হলে বাবাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হয়।

কিন্তু মামলা-মোকদ্দমা করে বড়লোক হবার সাধ আমার একটুও নেই, আমি এখন পালাতে পারলে বাঁচি।

আর একটি হল ঘরে জেরা চলছে। খুব সাজগোজ করা মহিলাদের ভিড়ও বাড়ছে। এক সময় কয়েকজন মহিলা একদিকের একটা টেব্‌লে বিরাট এক ঝুড়ি আপেল এনে রাখলেন। আর কয়েকজন মহিলা আর একটা টেব্‌লে রাখলেন এক ঝুড়ি আইসক্রিমের কাপ। তারপর দু'দলই ডাকাডাকি করতে লাগলেন আমাদের।

এক সঙ্গে আপেল আর আইসক্রিম খাবো? দু' দলের পেড়াপিড়িতে নিতেই হলো।

আর একটু পরে এসে গেল মিষ্টি বিস্কুট (এ দেশের ভাষার যার নাম কুকি) এবং ততোধিক মিষ্টি, তলতলে পিঠে (এ দেশে যার নাম পাই)। এ কী রে বাবা, এত সব খেতে হবে নাকি? একটু পরেই জানতে পারলুম যে এই ছোট শহরটির বিভিন্ন মহিলাদের ক্লাবের মধ্যে অতিথি পরায়ণতার একটা প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেছে। দলে দলে মহিলারা রুজ-লিপস্টিক মেখে, তাঁদের শ্রেষ্ঠ পোশাকটি পরে সাজ সাজ রবে ছুটে আসছেন দুর্গতদের সেবা করবার জন্য। রোটারি ক্লাব, লায়ন্‌স ক্লাব, অল মাদারস ক্লাব, সিস্‌টারস অব চ্যারিটি—এঁরাও নাকি এসে পড়বেন খানিকটা পরেই। অনেকদিন এখানে নাকি এরকম বড় গোছের দুর্ঘটনা ঘটেনি, অনেকদিন এঁরা পরোপকার করবার কোন সুযোগ না পেয়ে উপোসী ছারপোকা হয়ে আছেন, আজ এমন সুবর্ণ সুযোগ কেউ ছাড়তে চান না।

একদিকে পুলিস-ইন্‌সিওয়েন্সের কাছে জেরা চলছে, অন্য দিকে আমরা অনবরত খেয়ে চলেছি। অত খাবার অবশ্য আমার পক্ষে খাওয়া সম্ভব নয়। মহিলারা হাতে একটা কিছু গুঁজে দিচ্ছেন আর আমি বাইরে গিয়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে টপাস করে ফেলে দিচ্ছি। এই ভাবেই, দুর্ঘটনার বিভীষিকা মন থেকে মুছে গিয়ে সব কিছুই বেশ হাসির ব্যাপার হয়ে দাঁড়ালো। আমাদের উপকার

করার জন্য সুন্দরী-সুন্দরী মহিলাদের চোখে মুখে কী দারুণ উৎকণ্ঠা। পাঁচ মিনিট অন্তর অন্তর একজন করে এসে জিজ্ঞেস করে যাচ্ছেন, তোমার কিছু লাগবে? তুমি কিছু অসুবিধে বোধ করছো? আমার কিছুই চাই না শুনে তাঁরা দারুণ নিরাশ হয়ে চলে যাচ্ছেন।

আমার সহযাত্রীদের মধ্যে দু'জন ডাকাতের মতন চেহারার যুবক এক সময় আমার পাশে এসে বসলো। এরা খুব সিগারেট খোর, সেইজন্যই এরাও আহত হয়নি। মাথার চুল উস্কোখুস্কো, লাল্‌চে চোখ, লম্বা গোঁফ দু'জনেরই। খুব গম্ভীরভাবে এরা আমার সঙ্গে স্প্যানিশ ভাষায় কথা বলতে শুরু করলো।

এরকম অভিজ্ঞতা আমার আগেও হয়েছে। এই যুবক দু'টি নিশ্চয়ই মেক্সিক্যান। এরা ভারতীয়দের দেখলেই নিজেদের স্বজাতি বলে ভুল করে। আমি দু'হাত নেড়ে বোঝাবার চেষ্টা করলুম যে আমি স্প্যানিশ ভাষা জানি না। ওরা মানতে চায় না। ওদের মুখে ভয়ের ছাপ। এমনও হতে পারে, ওরা বে-আইনীভাবে মেক্সিকো থেকে স্টেট্‌সে ঢুকে পড়েছে। আর ধরা পড়ার সম্ভাবনাও ছিল না, কিন্তু এই দুর্ঘটনার পর পুলিস জেরা করার সময় ওদের কাছে কাগজপত্র দেখতে চাইবে। আমাকেও এর মধ্যে একবার পাসপোর্ট দেখাতে হয়েছে।

ওরা দু'জনে একসঙ্গে অনেক কথা বলে যেতে লাগলো আমাকে। আমি এক বর্ণ বুঝলুম না, তবু ওরা বলবেই। মহা মুশকিলে পড়া গেল! ওদের দু'টি সিগারেট দিয়ে একটুক্ষণের জন্য নিরস্ত করে আমি উঠে গিয়ে পরোপকারী মহিলাদের কয়েকজনকে ইংরিজিতে বললুম, আপনারা কেউ স্প্যানিশ ভাষা জানেন? তা হলে ঐ লোক দুটির খুব উপকার হয়। ওদের কথা কেউ বুঝতে পারছে না!

ঐ মহিলারা কেউ স্প্যানিশ জানেন না বটে, তবে ওঁদের একজনের স্বামীর বন্ধু কিছুদিন মেক্সিকোতে ছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ স্বামীর বন্ধুকে ফোন করলেন। এবং সে ভদ্রলোক আসতে রাজি হওয়ায় ভদ্রমহিলা গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেলেন তাকে আনতে। পরোপকারের একটা সুযোগ পেয়ে সে মহিলার চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, অন্যদের দিকে তিনি একটা গর্বিত দৃষ্টি দিয়ে চলে গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে প্রাশান্ জেনারেলের মতন চেহারার একজন মহিলা এসে ঘোষণা করলেন যে অতিথিদের দুপুরের আহারের ভার তিনি নিয়েছেন। অতিথিরা যেন দয়া করে তাঁর পিছু পিছু আসেন।

এতক্ষণ ধরে এত রকমের খাওয়ার পর এর মধ্যেই আবার দুপুরের খাওয়া?

মাত্র একটা বাজে। আমরা কেউ উঠছি না, মহিলা আবার বললেন, দয়া করে আসুন, দেরি করবেন না, খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

অগত্যা আমাদের যেতেই হলো। খানিকটা হাঁটা পথে আমরা গেলুম আর একটি বাড়িতে। এটাও কারুর ব্যক্তিগত বাড়ি নয়, একটা কোনো প্রতিষ্ঠান। আমরা ঢুকলুম পেছনের দরজা দিয়ে। বিশাল ডাইনিং হলে অনেক টেব্‌ল পাতা। আমরা অনাহূত বাসযাত্রী বাইশ তেইশ জন ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসলুম। আমাদের দেওয়া হলো, এক প্লেট ভুট্টা সেদ্ধ, রুটি-মাখন, একটা বোল্‌ ভর্তি সুপ্‌, তাতে বেশ বড় বড় মাংসের টুকরো আর একটা আপেল। বেশ পুষ্টিকর খাদ্যই বলতে হবে, কিন্তু কেন জানি না, সে খাবারের মধ্যে আমি জেলখানার গন্ধ পেলুম। অবশ্য এ কথাটা কারুকে বলা যায় না।

ফিরে গিয়ে আবার বসলুম জবানবন্দী দিতে। গ্রে হাউণ্ড কম্পানি আমাদের জন্য আলাদা একটা বাস আনিয়ে রেখেছে এর মধ্যে, এখানে আমাদের কাজ মিটে গেলেই রওনা করিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু কতক্ষণে মিটবে ঠিক নেই। আমার সহযাত্রীদের মধ্যে বেশ কয়েকজন অনেক কিছু দাবি করেছে। পুলিসের লোক বারবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জানতে চায়, দুর্ঘটনার জন্য আসল দোষটা কার। আর ইনসিওরেন্সের লোক এই সময় চোখ পাকিয়ে থাকে। অর্থাৎ এর উপরেই অনেক কিছু নির্ভর করছে। আমি কারুর সাতে-পাঁচে নেই, আমি যা সত্যি কথা তাই বলছি, অর্থাৎ আমি পেছন দিকে বসেছিলুম, আমি কিছু দেখিনি।

সাড়ে তিনটে বাজতে না বাজতেই গট্‌ গট্‌ করে ঢুকলেন আর কয়েকজন মহিলা। আবার আমাদের খাবার খেতে যেতে হবে? আমরা আকাশ থেকে পড়লুম! এর মধ্যে আবার খাবার? এ কি পাগলের কাণ্ড নাকি?

এবার সবাই আমরা একযোগে প্রতিবাদ করলুম। ভদ্রমহিলারাও নাছোড়বান্দা, প্রত্যেকের কাছে গিয়ে বলতে লাগলেন, প্লীজ- এসো, তোমাদের খাবার টেব্‌লে দেওয়া হয়ে গেছে, নষ্ট হবে, প্লীজ এসো!

পরস্পরের দিকে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে বাধ্য হয়েই যেতে হলো আমাদের। এবারেও সেই দুপুরের জায়গাটাতেই। তবে এবারের সেখানকার ডাইনিং হলে আরও পঞ্চাশজন নারী পুরুষ বসে আছে। এবারেও আমাদের দেওয়া হলো সেই ভুট্টা সেদ্ধ, সেই রুটি-মাখন, সুপ্‌ আর আপেল। এ কি, এরা কি ভুলে গেছে নাকি যে আমরা দুপুরে একবার খেয়েছি? অন্য যারা বসে আছে তারা সবাই কী রকম যেন চোখ করে চেয়ে আছে। আমার ঠিক পাশের টেবিলেই বসে আছে খুব লম্বা মতন একটি যুবতী, তার চোখ দুটি ছলো-ছলো, সে অযাচিতা হয়েই আমাকে বললো, জানো, আমি কবিতা লিখি, কিন্তু আমার কবিতা কেউ পড়ে

না। আমার সব কবিতা নদী নিয়ে, ছোট নদী, বড় নদী, লাল নদী, নীল নদী, কিন্তু কেউ পড়ে না!

কথাগুলো শুনে আমার বুক দুরদুর করতে লাগলো। আর একজন বললো, একটা বাস উল্টে গেছে, তাতে এক হাজার জন লোক মরে গেছে, তাই না? কিংবা দু' হাজার? তিন হাজার? চার হাজার? কিছু দূর থেকে কে যেন একটা আপেল ছুঁড়ে মারলো, সেটা দুম করে লাগলো দেয়ালে। তারপর আরও পাঁচ ছ'টা আপেল এসে পড়লো দেয়ালের দিকে। অনেকে একসঙ্গে 'হা-হা' করে হেসে উঠলো।

আমার এক সহ-যাত্রী উঠে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে বললো, ও বয়! দিজ্‌ আর অল লুনিজ্‌! বলেই সে দৌড় লাগলো।

তা হলে তো দুপুরে আমার ঠিকই মনে হয়েছিল। এখানকার খাবারে জেলখানার গন্ধ! এটা একটা মানসিক রোগগ্রস্তদের প্রতিষ্ঠান। আমার সহযাত্রীরা সবাই সরে পড়তে লাগলো। আমার পাশের লম্বা মেয়েটি তখনও ঝুঁকে পড়ে আমায় কী সব বলছে, আমি যেতে পারছি না। ভয়ে আমার বুক কাঁপছে। একবার যদি এদের মধ্যে আটকে পড়ি, জীবনে বোধহয় আর কখনো বেরুতে পারবো না। আমি উঠে দাঁড়াতেই লম্বা মেয়েটি দু'তিনটে আপেল আমার হাতে ঠেসে দিয়ে বললো, এগুলো নাও! আমি বললুম, না, না, আমার চাই না। অন্য টেবল্‌ থেকে কয়েকজন আপেল নিয়ে এগিয়ে আসতে লাগলো আমার দিকে।

অন্য দিকে তাকিয়ে দেখি, আমার যে-সব সহযাত্রী চলে যাবার চেষ্টা করছিল, মেট্রন-ধরনের মহিলারা তাদের তাড়া করতে করতে বলছে, এই, যাচ্ছো কোথায়! খেয়ে যাও! না খেয়ে যেতে পারবে না! তাহলে কি ওরাও পাগল! পাগলেরাই আমাদের ডেকে এনেছে!

দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে আমি দৌড় মারলুম। সোজা গিয়ে উঠে বসে রইলুম আমাদের জন্য নির্দিষ্ট বাসটায়। বাপরে বাপ, ওয়াইওমিং-এর পাগলদেরও এত পরোপকারের নেশা? নমস্কার ওয়াইওমিং, তোমাকে সারা জীবন মনে থাকবে!

॥ ২৬ ॥

নিউ ইয়র্ক শহরে হারিয়ে গেলে কোনো ক্ষতি নেই। যে-কোনো সময়ে মাটির নিচে নেমে গেলেই হলো, তারপর পাতাল রেলে চেপে যে-কোনো জায়গায়

আবার থেমে মাটির ওপর উঠে পড়লেই চোখ জুড়িয়ে যাবে। এই শহরের যে-কোনো জায়গাই দর্শনীয়।

গোটা আমেরিকার মধ্যে একমাত্র নিউ ইয়র্ক শহরে এসেই কলকাতার মানুষরা খুব স্বস্তি বোধ করবে। বেশ চেনা চেনা লাগবে। রাস্তা-ঘাট মাঝে মাঝেই ভাঙা দু'এক জায়গায় খোদলে জল জমে আছে, পথ-চলতি লোকেরা খালি সিগারেটের প্যাকেট, কোকাকোলার টিন কিংবা চকলেটের রাংতা যেখানে সেখানে ছুঁড়ে ফেলে দেয় অবলীলাক্রমে। অনেক রাস্তাতে কলকাতার মতন ভিড়, নারী-পুরুষরা ব্যস্ত সমস্ত ভাবে হন হন করে হেঁটে যাচ্ছে, কেউ কারুর দিকে না তাকিয়ে। রাস্তায় এত গাড়ি যে মাঝে মাঝেই ট্রাফিক জ্যাম হয়।

ম্যানহাটন দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমার মনে এমনই কলকাতা-কলকাতা ভাব হয় তা আমি রাস্তার দু'পাশের আশী-নব্বইতলা বাড়িগুলোর কথা ভুলে যাই, দু'ধারের দোকানগুলোতে যে সব ফরেন জিনিস তাও খেয়াল থাকে না, আমি বরং এদিক ওদিক তাকিয়ে কোনো ষাঁড়, কুষ্ঠরোগী ভিখারী কিংবা উলঙ্গ পাগল খুঁজি।

আমেরিকার আর কোনো শহরেই রাস্তা দিয়ে এত লোক হাঁটে না। ম্যানহাটনের প্রায় সব রাস্তাই যেন মানুষের ভিড়ে গিস্ গিস্ করছে। তার একটা কারণ, এখানে গাড়ি পার্ক করা প্রায় একটা অসম্ভব ব্যাপার, অফিসবাবুরা গাড়ি চড়ে এলে, দু'তিন মাইল দূরে গাড়ি রেখে বাকিটা পায়ে হেঁটে আসতে হবে বলে অনেকেই গাড়ি আনে না, ট্রেনে যাতায়াত করে। দ্বিতীয় কারণ, এ শহরে অনেকেরই গাড়ি নেই। এ শহরে অনেক গরীব লোক থাকে। আমাদের কলকাতায় যেমন কোটি কোটিপতি মাড়োয়ারীরাও আছে আবার ফুটপাথে শুয়ে থাকা গরীবও অসংখ্য, সেই রকমই, নিউ ইয়র্কেও সাহেব-মাড়োয়ারী ও গরীবদের সহাবস্থান চলছে। তবে তফাতের মধ্যে এই যে, এখানকার সাহেব-মাড়োয়ারীরা আমাদের মাড়োয়ারীদের চেয়ে অনেক বেশী গুণ বড়লোক আর গরীবরাও রাস্তায় শোয় না, তারা লম্বা লম্বা ফ্ল্যাট বাড়িতে থাকে আর শীতকালে প্রত্যেকের গায়েই একটা ওভারকোট চাপে। এখানকার রাস্তায় ষাঁড় বা উলঙ্গ পাগল নেই বটে কিন্তু গুপ্ত-ভিখিরি আছে। প্রকাশ্যে ভিক্ষে চাইলে পুলিসে ধরে নিয়ে যায়।

এই শহরে এত গরীব তার কারণ প্রচুর বেকার ভাগ্যান্বেষী সারা পৃথিবী থেকেই নিউ ইয়র্কে এসে জোটে। তা ছাড়া, ইহুদী, পোর্টুরিকান, গ্রীক, ইটালিয়ান যারা আগে থেকেই এখানে এসে বসতি নিয়েছিল তাদের দেশোয়ালী ভাইরা এখনো অনবরত আসছে জীবিকার সন্ধানে, কোনো রকমে মাথা গুঁজে থাকছে।

এত মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত আছে বলেই এ শহর শিল্প-সংস্কৃতিতে সকলের সেরা। গোটা আমেরিকার সাংস্কৃতিক কেন্দ্র এই নিউ ইয়র্ক। দেখা যাচ্ছে, শিল্প-সংস্কৃতির ব্যাপারটা খুব বড়লোক কিংবা খুব গরীবরা সৃষ্টি করতে পারে না। ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে।

কোনো গীর্জার সিঁড়িতে কিংবা কোনো ফুটপাথের দোকানে বসে থেকে রাস্তায় লোক চলাচল দেখতেও বেশ লাগে। এত বিচিত্র রকমের মানুষ এক সঙ্গে আর কোথায় দেখতে পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ। নিউ ইয়র্কের মতন স্বাধীন শহরও আর বুঝি নেই। যার যা খুশী করতে পারে। ধুতি, লুঙ্গি, আফরিকান জোব্বা কিংবা শুধু জাঙ্গিয়া পরে রাস্তা দিয়ে হাঁটলেও কেউ ভ্রূক্ষেপ করবে না।

শুধু দুটি ব্যাপারে শহরের মেয়র সম্প্রতি নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন। হরে-কৃষ্ণ বৈষ্ণবের দল রাস্তায় যখন খুশী নাচানাচি শুরু করে দিত তাতে ট্রাফিক জ্যাম হয়ে যেত বলে এখন প্রকাশ্য রাস্তায় নৃত্য-গীত নিষিদ্ধ হয়েছে। আর, এখানকার কম-বয়েসী ছেলে মেয়েদের বাতিক ছিল পথে হাঁটবার সময়ও রেডিও বা টেপ-রেকর্ডার বাজানো। এতই তাদের সঙ্গীত প্রীতি যে রাস্তায় যেতে যেতেও গান না শুনলে চলে না। কিন্তু অনেকে মিলে ওসব বাজালে তো বিচিত্র এক ক্যাকোফোনির সৃষ্টি হয়, সেই জন্য প্রকাশ্যে রেডিও, টেপ রেকর্ডার বাজানোও নিষেধ। এটা সাউণ্ড পলিউশন রোধ করবার কারণে।

অবশ্য কম-বয়েসী ছেলেমেয়েরা এতেও দমে নি। তাদের পকেটে বা কাঁধের ঝোলায় এখনো রেডিও রেকর্ডার থাকে, আর দু'কানে লাগানো হেড ফোন, অন্যদের বিরক্ত না করে তারা নিজেরা ঠিকই গান শুনতে শুনতে যায়। এরকম হেড ফোন আঁটা ছেলে মেয়ে দেখতে পাওয়া যায় প্রায়ই।

রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে খিদে পেলেও কোনো অসুবিধে নেই নিউ ইয়র্কে। অজস্র সস্তায় খাবারের দোকান আছে এই শহরে। ড্রাগ স্টোর, হ্যামবার্গারি, জয়েন্ট, পিৎসা হাট্, হট্ ডগ্ কর্ণার ইত্যাদি। ইচ্ছে মতন পৃথিবীর যে-কোনো দেশের খাবারও বেছে নেবার সুবিধে আছে। চীনে-জাপানী-ইটালিয়ান-গ্রীক-ভারতীয়-পাকিস্তানী-তিব্বতী ইত্যাদি। আমার মতন আরো অনেক বাঙালও তো নিউ ইয়র্কে যায়, তাদের দু একটা কথা জানিয়ে দিচ্ছ। হ্যামবার্গারে কক্ষনো হ্যাম থাকে না, থাকে গো-মাংসের কিমা আর হট ডগের সঙ্গে কুকুরের কোনো সম্পর্ক নেই, ওটা শুয়োরের মাংস আর বিশুদ্ধ সর্ষে বাটার সঙ্গে রুটি। চীনে আর জাপানী খাবার প্রায় একই ভেবে যারা জাপানী দোকানে ঢুকবেন, তারাও ঠকবেন। জাপানী খাবারের দাম বেশী,

পরিমাণে কম, স্বাদও ভালো না। মূল জাপানের কথা জানি না, নিউ ইয়র্কের জাপানী দোকানের এই অবস্থা। ভারতীয় দোকানে ঢুকলে আপনি ভারতীয় বলেই ভালো ব্যবহার পাবেন না, একথা আগেই বলে রাখছি। সস্তায় ভালো মাংস-রুটি খেতে হলে যাওয়া উচিত গ্রীক দোকানে।

নিউ ইয়র্কের মেয়র আর একটা খুব ভালো আইন জারি করেছেন। ম্যানহাটানে এখন আর ফাঁকা জমি একটুও নেই, থাকলেও আগুন দাম, অথচ জন সংখ্যা প্রত্যেক বছর বাড়ছে, শহরটা ঘিঞ্জি হয়ে যাচ্ছে, সেই তুলনায় পার্ক বা জন সাধারণের বিশ্রামের জায়গা বাড়ছে না। বড় বড় কোম্পানিগুলো ছোট বাড়ি কিনে নিয়ে সেখানে একশো তলা বাড়ি তুলে ফেলছে। সেই জন্যই এখন নিয়ম হয়েছে, ঐ রকম বহুতল বাড়ি তৈরি করতে গেলেই গাড়ি রাখবার জায়গা করতে হবে মাটির নিচে আর এক তলাটা ফাঁকা রাখতে হবে। সেই এক তলার অর্ধেকটায় থাকবে বাগান আর বাকি অর্ধেকটায় খাবারের দোকান। সেখানে যে-কেউ এসে বসতে পারবে। মনে করুন, চৌরঙ্গিতে টাটা ম্যানসন কিংবা চ্যাটার্জি ইন্টারন্যাশনাল সেন্টারের মতন লম্বা বাড়িগুলোর একতলা থাকবে জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত। আমাদের মেয়রহীন কলকাতায় এ রকম আইন কে জারি করতে পারেন জানি না।

সেইরকমই একটা নতুন বাড়ির নিচের খাবারের দোকানে বসেছিলুম একটা সুপ নিয়ে। পাশেই ফোয়ারা, তলার জলের রঙীন মাছ খেলা করছে, তাই দেখছি। হঠাৎ আমার টেবিলের পাশে একজন কেউ এসে দাঁড়ালো, দু'দিকের কোমরে দুটি আঙুল দিয়ে। আস্তে আস্তে চোখ তুলে তাকিয়ে একটা হাসি মুখ দেখতে পেলুম।

—যামিনীদা!

তিনি বললেন, ঐ দিকের টেবিলে বসে অনেকক্ষণ ধরে দেখছি, চেনা চেনা মনে হচ্ছিল। তুই সত্যিই তা হলে নীলু?

আমি খুব একটা অবাক হইনি কিন্তু। নিউ ইয়র্কের রাস্তায় কিছুক্ষণ ঘুরলে দু'চারজন বাঙালীর সঙ্গে তো দেখা হবেই, চেনা কারুর সঙ্গে দেখা হওয়াও আশ্চর্য কিছু না। লণ্ডনের মতন অত না হলেও নিউ ইয়র্কের বাঙালীর সংখ্যা নেহাৎ কম নয়।

আমার পাশের চেয়ার টেনে নিয়ে বসে যামিনীদা বললেন, তুই জ্যান্ত এসেছিস না মরে ভূত হয়ে এসেছিস?

রাস্তায় বাস দুর্ঘটনায় যে সত্যিই মরে যেতে পারতুম, সে-কথা চেপে গিয়ে বললুম, বালাই ষাট, মরবো কেন? হঠাৎ ও কথা বলছো যে?

—ভাবছিলুম যে আমাদের দেশের বেকাররা আর কতদিন বেঁচে থাকতে পারে?

যামিনীদা ছিলেন কলকাতার কফি হাউসের ইনটেলেক্চুয়াল। অনেক বিষয়ে পড়াশুনো। এখনো চেহারাটা বিশেষ বদল হয়নি, দেখছি। মেদহীন ঝকঝকে শরীর। ঠোঁটের কোণে এমন একটা হাসি, যাতে মনে হয় সব সময় কিছু একটা উপভোগ করে চলেছেন।

—কবে এসেছিস?

—কাল!

—বাঙালের মতন এর মধ্যেই এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং, ওয়ার্লড ট্রেড সেন্টার, স্ট্যাচু অব লিবার্টি ফিবার্টি সব দেখে নিয়েছিস তো?

উত্তর না দিয়ে আমিও মুচকি হাসলুম। আমিও নানা রকম হাসি দিতে জানি।

—শোন নিউ ইয়র্কে শুধু একরকমই দেখার জিনিস আছে, তা হলো থিয়েটার। এত রকম থিয়েটারের একস্‌পেরিমেন্ট আর কোথাও হয় না। এসেছিস যখন, ভালো করে দেখে যা। 'সত্যাগ্রহ' নামে একটা থিয়েটার হচ্ছে, জানিস? দেখলে তোর মাথা ঘুরে যাবে।

আমি একটা ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হলুম। যামিনীদা এখনো ইনটেলেকচুয়াল আছেন, নিছক ডলার জমাবার ধান্দায় মজে যান নি।

যামিনীদা বললেন, আর যদি দৃশ্য দেখতে চাস, তা হলে ঠিক সন্ধের একটু আগে ব্রুকলীন ব্রীজের ওপর দাঁড়াবি। শেষ সূর্যের আলোয় দেখতে পাবি ঠিক যেন সোনা দিয়ে তৈরি ম্যানহাটান, ঠিক যেন অমরাবতী। বরুকলীন ব্রীজের ওপর সেই বিখ্যাত কবিতাটা পড়েছিস? ঐ যে ইয়ের লেখা, কী যেন নাম, ঐ যে লোকটা আত্মহত্যা করেছিল...

—হার্ট ক্রেন!

যামিনীদা ভুরু কুঁচকে তাকালেন আমার দিকে। আমি একখানা সাহেব-কবির নাম বলে ফেলেছি, আন্দাজে কি না বোঝার চেষ্টা করলেন। তারপর হো-হো করে হেসে উঠে বললেন, ও, মনে পড়েছে, তুই তো আগেও একবার নিউ ইয়র্কে এসেছিলি, এসব তোর জানা। তাই না? কোথায় উঠেছিস?

আমি গ্রীনিচ ভিলেজের একটা সস্তা হোটেলের নাম বললুম।

—চল্, তোর মালপত্তর নিয়ে আসি। তুই আমার ওখানে থাকবি। কিন্তু তোকে রান্না করতে হবে। তোর বৌদি গত কাল বোস্টন চলে গেছেন, আমাকেও যেতে হবে দু'একদিনের মধ্যে। তুই একা থাকতে পারবি তো?

—অন্যের বাড়িতে একা থাকার মতন আনন্দের আর কিছু আছে কি ?

—আমি গত বছরই একবার কলকাতায় গিয়েছিলুম, সুতরাং কলকাতার খবর মোটামুটি জানি। তোর খোঁজ করেছিলুম, তুই ছিলি না শহরে।

—হয়তো আসামে বা মধ্যপ্রদেশে গিয়েছিলুম।

—সব সময় টো-টো করে ঘুরে বেড়াস বুঝি ? চল, উঠে পড়া যাক।

বাইরে বেরিয়ে যামিনীদা একটু থমকে দাঁড়িয়ে কিছু চিন্তা করে বললেন, তুই এক কাজ কর, নীলু, তুই হোটেলে চলে যা। আমাকে দু'একটা কাজ সারতে হবে। তোকে রাত্তিরের দিকে আমি হোটেলে ফোন করবো। কিংবা, আমার বাড়ির ঠিকানা দিলে তুই রাস্তা চিনে চলে আসতে পারবি?

আমি বললুম, কেন পারবো না ? তুমি কোন্ পাড়ায় থাকো ?

—ব্রুকলীনে। তা হলে তাই কর, মালপত্র নিয়ে তুই আমার অ্যাপার্টমেন্টে চলে আয়। বেশী রাত করবি না, রাস্তাঘাট ভালো না, সন্ধে-সন্ধে চলে আসবি। আমি না থাকলেও গণেশ বলে একটা সাউথ ইণ্ডিয়ান ছেলে থাকবে। খুব ভালো ছেলে, তাকে তোর কথা বলে রাখবো।

এর পর যামিনীদার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমি সময় কাটাবার জন্য মেট্রোপলিটন মিউজিয়ামে ঢুকে পড়লুম।

নিউ ইয়র্কের মিউজিয়ামগুলোর বর্ণনা দিতে গেলে সাত কাণ্ড রামায়ণ লিখে ফেলতে হয়। সে কাজ জ্ঞানী-গুণীরা করবেন। মেট্রোপলিটান মিউজিয়ামের এমন একটা বৈশিষ্ট্য আছে, যা অন্য কোনো দেশের মিউজিয়ামে দেখিনি। এখানে প্রতিটি ছবির তলায় লেখা আছে সেই ছবি আঁকার ইতিহাস, সমসমায়িক ঘটনা, সেই ছবি সম্পর্কে তখন কে কী মন্তব্য করেছিলেন ইত্যাদি। মোটেই রস-কষহীন তথ্য নয়, প্রত্যেকটাই পাকা হাতের রচনা এমনই সরস যে না পড়ে উপায় নেই। সেই লেখা পড়বার পর আবার নতুনভাবে ছবিটা দেখতে ইচ্ছে করে। ইম্প্রেশনিস্টদের মাত্র পঁচিশ ছাব্বিশখানা ছবি দেখতেই আমার ঘন্টা তিনেক লেগে গেল। এখনো বাকি আছে ঘরের পর ঘর। শত শত ছবি। আমি অবশ্য একটানা বেশীক্ষণ ধরে শিল্প উপভোগ করায় বিশ্বাস করি না। তিন ঘন্টা যথেষ্ট।

বিকেল পড়ে গেছে, ফিরে এলুম হোটেলে। বিল চুকিয়ে বেরিয়ে এলুম মালপত্র নিয়ে। ব্রুকলীন ব্রীজ পার হবার সময় একবার মনে করলুম হার্ট ক্রেনের কবিতা, আর একবার দেখে নিলুম যামিনীদা-বর্ণিত সোনার ম্যানহাটন। সূর্যাস্তের আলোয় হর্ম্যসারিকে সত্যিই ও রকম দেখায়।

যামিনীদার বাড়িতে রাত্তিরটা খুব জমে গেল। যামিনীদা এরই মধ্যে

ভাত-ডাল-বেগুন ভাজা আর দু'তিন রকম মাছ রান্নার ব্যবস্থা করে ফেলেছেন। দক্ষিণ ভারতীয় ছেলেটির নাম বোধহয় গণেশন, তাকে বাংলায় গণেশ বলে ডাকা হয়। সে যামিনীদার এখানে থেকে লেখাপড়া করছে। মৃদুভাষী ছেলেটি ইংরিজি মিশিয়ে মোটামুটি বাংলা বলে। গৌতম আর সঙ্ঘমিত্রা নামে এক তরুণ দম্পতি এসেছে। শুরু হয়ে গেল তুমুল আড্ডা।

যামিনীদা ওঁর চাকরি জীবনের কয়েকটা ঘটনা বললেন। ওঁর বর্তমান চাকরিটা, আমাদের চোখে বিচিত্র মনে হবে। উনি এখানকার লেবার ইউনিয়নের সেক্রেটারি জাতীয় কিছু। এ দেশের লেবার ইউনিয়ান অসম্ভব শক্তিশালী, ইচ্ছে করলে তারা সারা দেশ কাঁপিয়ে দিতে পারে। ইউনিয়ানের কাজ চালাবার জন্য এরা মাইনে করা প্রফেশনাল লোক রাখে। যামিনীদা বললেন, বুঝলি, এ দেশে এসে অনেকদিন সরকারি কাজ করেছি। তারপর এক সময় মনে হলো, এবার অন্য দিকটা একটু দেখা যাক তো! তাই শ্রমিকদের দলে ভিড়েছি।

ভাবতে ভালো লাগে যে কলকাতার এক বাঙালীর ছেলে মার্কিন দেশের শ্রমিকদের পক্ষ নিয়ে ওদেশের সরকারের সঙ্গে বোঝাপড়া করে।

খেতে বসে যামিনীদার আর একটা বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পেলুম। এতদিন বিদেশে থেকেও উনি বাংলা বলার সময় অনর্থক ইংরিজি মিশিয়ে দেন না, বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতির খবর রাখেন, মনে প্রাণে সম্পূর্ণ বাঙালী। কিন্তু খাওয়ার টেবিলে উনি একেবারে সাহেব। টেবিলে এক ফোঁটা জল বা একটা ভাত পড়লে চলবে না তক্ষুনি পরিষ্কার করতে হবে। সাইড ডিসে স্যালাড যেমন তেমন করে দিলে চলবে না, সুন্দর করে সাজিয়ে রাখতে হবে। আলাদা আলাদা মাছের ঝোলের জন্য আলাদা আলাদা হাতা চাই। একজন কে যেন ডালের হাতাটা মাছের ঝোলে ডোবাতে উনি একেবারে হায় হায় করে চেঁচিয়ে উঠলেন। ওতে নাকি সব স্বাদ নষ্ট হয়ে যায়। উনি বললেন, বুঝলি না, পরিবেশনটাই তো একটা আর্ট, আমাদের ঠাকুমা-দিদিমারা যখন বড় থালায় ভাত পরিবেশন করতেন, কী রকম পরিপাটি করে সাজিয়ে দিতেন…।

আমরা খাওয়া শুরু করেছি, যামিনীদা ঘুরে ঘুরে পরিদর্শন করছেন, আমি জিজ্ঞেস করলুম, আপনি বসবেন না ?

যামিনীদা বললেন, না, আমি তো এসব খাই না, পরে একটা যা হোক বানিয়ে নেবো।

—সে কি ? আপনি এই ভালো ভালো মাছ খাবেন না ?

—না রে, আমি রাত্তিরে দুটো স্যাণ্ডুইচ ছাড়া আর কিছু খাই না।

তারপর একটু থেমে, আবার মুচকি হেসে বললেন, আমার কাছে কয়েকটা

বাংলা কবিতার বই আছে, কিছু গানের রেকর্ড আছে, মাঝে মাঝে সেই কবিতাগুলো পড়ি কিংবা গান শুনি, তখন আমি বাংলাদেশে ফিরে যাই মনে মনে। বাঙালী থাকবার জন্য আমার ভাত কিংবা ইলিশ মাছ খাবার দরকার হয় না।

॥ ২৭ ॥

নিউ ইয়র্কের কুইন্‌স পাড়ায় বাঙালীদের একটা উৎসব হচ্ছে শুনতে পেয়ে গেলুম এক সকালবেলা। গিয়ে চমৎকৃত হলুম একেবারে। এ তো শুধু উৎসব নয়, এ যে পুরোপুরি 'ফাংশান। একটা ইস্কুল বাড়ি ভাড়া নেওয়া হয়েছে, সেখানে গিসগিস করছে শুধু বাঙালী, এটা যে সাহেবেদের দেশ তা বুঝবার কোনো উপায়ই নেই।

মনে হলো যেন কানপুর বা জব্বলপুরের কোনো বাঙালী ফাংশানে হাজির হয়েছি। মঞ্চের ওপর গান বাজনা হয়েই চলেছে, একাধিক ঘোষক এক এক রকম ঘোষণা করছেন মাঝে মাঝে, হঠাৎ হঠাৎ ড্রপ সীন পড়ে যাচ্ছে ভুল করে, মাইক্রোফোনে মাঝে মাঝে চো-ও-ও-ও করে অদ্ভুত আওয়াজ হচ্ছে, কয়েকজন কর্মকর্তা অহেতুক ব্যস্ততায় দৌড়োদৌড়ি করছেন এদিক-ওদিক। এদিকে আডিটোরিয়ামে যুবক-যুবতীরা তো রয়েছেই, তা ছাড়াও আছে মাসি-পিসি, ঠাকুর্দা-ঠাকুমারাও, অনেকে বেশ জোরে জোরেই গল্প করছেন ও পাড়া-প্রতিবেশীদের খবর নিচ্ছেন, কাচ্চা বাচ্চারা ছুটোছুটি করছে আপন মনে। বেশ কয়েকজন পুরুষ সিগারেট টানতে টানতে আড্ডা দিচ্ছেন বাইরে দাঁড়িয়ে, মাঝে মাঝে কে যেন চেঁচিয়ে বলে উঠছে, বড্ড গোলমাল হচ্ছে, আস্তে! আস্তে!

একেবারে পুরোপুরি মফঃস্বলীয় বাঙালীদের ছবি।

গোড়ার দিকে লোকাল আর্টিস্টদের গান ও নাচ টাচ হচ্ছিল, শুনলুম কলকাতা থেকে কয়েকজন ভালো ভালো আসল রেডিও আর্টিস্টও এসেছেন। কারুর কারুর কথা থেকে জানতে পারলুম। ভূপেন হাজারিকা নাকি এসে ঘুরে গেছেন। তা ছাড়া রয়েছেন সলিল চৌধুরী, পূর্ণদাস বাউল ও তাঁর স্ত্রী, লক্ষ্মীশঙ্কর ও তাঁর সম্প্রদায়, আরও যেন কে কে। একজন সাহিত্যিকও নাকি রয়েছেন। তারপরই মঞ্চে ঘোষণা করা হলো, এবারে ভাষণ দেবেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়।

শুনেই আমার বুকটা ধক করে উঠলো। সুনীলদা! সলিল চৌধুরী কিংবা পূর্ণদাস বাউলদের সঙ্গে আমার আলাপই নেই, সুতরাং তাঁরা আমাকে পাত্তা দেবেন কেন? কিন্তু সুনীলদার সঙ্গে আমার অনেক দিনের পরিচয়!

বক্তৃতার ব্যাপারে সুনীলদা চিরদিনের ফাঁকিবাজ। স্টেজে দাঁড়িয়ে তিন চার মিনিট কী সব এলেবেলে কথা বলেই নেমে এলেন। বসলেন সামনের দিকের একটা চেয়ারে। আমি দৌড়ে গেলুম সেখানে। আরও সহর্ষ বিস্ময়ে দেখলুম, সুনীলদার সঙ্গে স্বাতীদিও রয়েছেন।

সুনীলদাকে চমকে দেবার জন্য একেবারে কানের কাছে মুখ নিয়ে বললুম, ভালো আছেন, সুনীলদা? আমায় চিনতে পারছেন?

সুনীলদা চমকে মুখ ঘুরিয়ে তাকালেন। ভুরু কুঁচকে একটু দেখে নিয়ে বললেন, খানিকটা চেনা চেনা লাগছে। তুমি কে বলো তো?

আমার বুকটা দমে গেল, সঙ্গে সঙ্গে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো। হায়, সময় কি নিষ্ঠুর! সুনীলদা আমায় চিনতে পারলেন না? অথচ এক সময় সুনীলদা আর আমি কত কাছাকাছি ছিলুম, প্রায় হরিহর আত্মা বলতে গেলে। সেই সুনীলদা এখন অনেক দূরে সরে গেছেন। পুরোপুরি এস্টাবলিশমেন্টের মধ্যে ঢুকে পড়েছেন, চেহারাও অনেকটা ভারিক্কী হয়ে গেছে। মুখে খানিকটা উদাসীন ভাব, আমার দিকে তাকিয়ে আছেন কিন্তু যেন আমায় দেখছেন না। যেন আমার মতন ছোটখাটো মানুষদের দিকে তেমন মনোযোগ না দিলেও চলে।

স্বাতীদি কিন্তু ঠিক আগের মতনই আছেন। আন্তরিক উৎসাহের সঙ্গে বললেন, ওমা, নীলু! তুমি কবে এলে? দারুণ ভালো লাগছে তোমায় দেখে। এত সব অচেনা মানুষের মধ্যে হঠাৎ একজন চেনা লোক দেখলে এত ভালো লাগে।

পাশে একটা চেয়ার দেখিয়ে স্বাতীদি বললেন, বসো। তোমার মুখটা শুকনো শুকনো দেখাচ্ছে কেন? সকালে কিছু খাওনি তুমি?

আমি মুখটা নিচু করলুম। প্রবাসে একাকী ভ্রাম্যমাণ জীবনে হঠাৎ কারুর কাছ থেকে একটা স্নেহের কথা শুনলে চোখে জল এসে যায়। যামিনীদার বাড়িতে ক'দিন একা একা নিজে রান্না করে খাচ্ছি। কিন্তু রোজ রোজ কি আর শুধু নিজের জন্য রান্না করতে কারুর ইচ্ছে করে?

এই সময় ঘোষক পরবর্তী নাচের অনুষ্ঠানের প্রস্তুতির জন্য দশ মিনিটের বিরতি চাইলেন। সুনীলদা উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, চলো, বাইরে চা খেয়ে আসি।

তিনজনে চলে এলুম বাইরে। এ দেশে মাটির ভাঁড় পাওয়া যায় না, তার বদলে পেপার কাপ। সেই কাগজের ভাঁড়ে তিনটে চা জোগাড় করে আনলুম উদ্যোক্তাদের কাছ থেকে। চা শেষ হবার পর চারমিনারের প্যাকেট বাড়িয়ে দিয়ে

সুনীলদাকে জিজ্ঞেস করলুম, নেবেন ?

সুনীলদা এবারে আমার প্রতি একটু উৎসাহ দেখিয়ে বললেন, কোথায় পেলে ? আমার তো স্টক শেষ, তাই এখন আমি ক্যামেল খাচ্ছি, অনেকটা এই রকমই।

আমি বললুম, আমার কাছে কয়েক প্যাকেট মাত্র আছে, সাবধানে জমিয়ে রেখেছি, খুব স্পেশাল কারুর সঙ্গে দেখা হলে একটা করে দিই। আপনারা কতদিন হলো এসেছেন, সুনীলদা ?

—মাস তিনেক হয়ে গেল বোধ হয় ? এবারে ফিরে গেলেই হয়।

—আপনি এখানে লেকচার টেকচার দিতে এসেছেন বুঝি ?

—ধ্যাৎ, লেকচার কে দেয় ! এক জায়গায় সত্যজিৎ রায়ের "অরণ্যের দিন রাত্রি" আর "প্রতিদ্বন্দ্বী" দেখানো হলো, সেই সঙ্গে আমি বই দুটো বিষয়ে সামান্য দু'চার কথা বলেছি মাত্র, ব্যাস, তাতেই আমার কাজ ফুরিয়ে গেছে। এখন শ্রেফ বেড়ানো।

—দেশে থাকতে শুনেছিলুম আপনার কী একটা অপারেশান হয়েছিল ?

খুব একটা অগ্রাহ্যের ভাব দেখিয়ে কাঁধ ঝাঁকিয়ে সুনীলদা বললেন, সে কিছু নয়। তারপর বললেন, কবিতা সিংহও এসেছেন জানো তো ?

—কোথায় ? এখানে আছেন ?

—না, এখন নিউ ইর্য়কে নেই। কবিতা সিংহ এসেছেন আয়ওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ইন্টারন্যাশনাল রাইটিং প্রোগ্রামের নেমন্তন্ন নিয়ে...আমাদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

আরও দু'একটা টুকিটাকি কথার পর জিজ্ঞেস করলুম আপনার কেমন লাগছে সুনীলদা ?

মুখখানা আগের মতন উদাসীন করে উনি বললেন, আমার এবার খুব যে ভালো লাগছে তা বলতে পারি না। তবে স্বাতীর খুব ভালো লাগছে।

সুনীলদা ধুতি-পাঞ্জাবীও পরেননি, আবার সুট-টাই-ও পরেননি। সাধারণ প্যান্ট শার্ট, সামান্য শীত পড়েছে বলে তার ওপরে একটা পাতলা কোট। স্বাতীদি একটা চওড়া নীল পাড়ের শাড়ি পরেছেন, তার ওপরে রোঁয়া রোঁয়া তুলোর মতন একটা বেশ জমকালো সোয়েটার। একটু স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়েছে স্বাতীদির, মুখখানা উৎফুল্ল।

—আপনার খুব ভালো লাগছে বুঝি স্বাতীদি।

স্বাতীদি হেসে বললেন, হ্যাঁ। খুব ভালো লাগছে। তাতে আমি নিজেই আশ্চর্য হয়ে গেছি। জানো, নীলু, আগে আমেরিকা বিষয়ে আমার তেমন আগ্রহই

ছিল না। আমেরিকায় বেড়াতে আসার শখও ছিল না। আমার স্বপ্ন ছিল ফ্রান্স। ছেলেবেলা থেকেই ভেবে রেখেছিলুম, একদিন না একদিন ফ্রান্সে যাবোই। আর্ট গ্যালারিগুলো দেখবো। এবারে সত্যি সত্যি ফ্রান্সে এসে আমার চোখ জুড়িয়ে গেছে, প্রাণ ভরে গেছে। খুব ভালো ছিলুম প্যারিসে। তারপর প্যারিস থেকে দেশে ফিরে গেলে আমার খুব একটা আপত্তি ছিল না। তারপর ও এখানে একটা নেমন্তন্ন পেল, তখন ভাবলুম একবার ঘুরে আসাই যাক। এখানে এসে কিন্তু অবাক হয়ে গেছি। যত মানুষ জনের সঙ্গে মিশছি, ততই ভালো লাগছে।

—দেখবারও অনেক কিছু আছে।

—দেখবার জিনিস তো আছেই। কিন্তু আমেরিকানদের সম্পর্কে আমার আগে অন্যরকম ধারণা ছিল, একটু অহংকারী আর মাথা মোটা ধরনের। কিন্তু আমি এখানে এখানে এসে অল্প বয়সী ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মিশে দেখছি, বেশীর ভাগই কী সরল আর সুন্দর, কত রকম বিষয়ে আগ্রহী। এক একজনের হাসি দেখলেই বোঝা যায়, তাদের মনটা কত পরিষ্কার। আমরা বেশ কিছুদিন একটা খুব ছোট জায়গায় থেকেছি। সেটা একটা ইউনিভার্সিটি-টাউন, প্রায় সবাই ছাত্রছাত্রী বা পড়ান। তাদের সঙ্গে মিশে দেখলুম, এমন আন্তরিক ব্যবহার...আমার অনেক বন্ধু হয়ে গেছে...ও কিন্তু বিশেষ কারুর সঙ্গে মেশে না, বেশীর ভাগ সময়ই বই মুখে নিয়ে শুয়ে থাকে কিংবা টিভি দেখে।

সুনীলদা বললেন, একটা নতুন দেশে এসে সে দেশের টিভি পরদায় ক'দিন মন দিয়ে দেখলে সেখানকার সমাজ ও মানুষ সম্পর্কে অনেক কিছু জানা যায়।

আমি জিজ্ঞেস করলুম, আপনার কেন ভালো লাগছে না সুনীলদা ?

আর একটা সিগারেট ধরিয়ে সুনীলদা বললেন, স্বাতী অনেকটা ঠিকই বলেছে, দেশের মানুষ জনের সঙ্গে মিশলে ভালোই লাগে। অনেকেই সরল ও আন্তরিক, বেশ একটা পরোপকারের ঝোঁক আছে। কিন্তু টিভি, রেডিও বা খবরের কাগজে এ দেশের সরকারি নীতিগুলো যখন দেখি বা শুনি, তখন রাগে গা জ্বলে যায় ! মানুষ হিসেবে আজো আমেরিকানদের বেশ পছন্দ হয়, কিন্তু রাষ্ট্র হিসেবে আমেরিকাকে আমি ঠিক পছন্দ করতে পারি না।

—একটা দেশের অধিকাংশ লোকই যদি ভালো হয় তবে সে দেশের সরকার খারাপ হয় কী করে ?

—তাই তো হয় দেখছি। এ দেশের লোক কী করে তা মেনে নেয়, তাও বুঝি না। এ দেশের নির্বাচন ব্যবস্থাটা আমাদের বোধগম্য হয় না। রীতিমত বড়লোক না হলে কারুর পক্ষে প্রেসিডেন্ট-নির্বাচনে দাঁড়ানোই অসম্ভব। রুজভেল্ট-এর পর সত্যিকারের কোনো ভদ্দরলোক এ দেশের প্রেসিডেন্ট হয়েছে ? কেনেডি

ছাড়া ? তাও কেনেডির চেহারা ও কথাবার্তায় খানিকটা চাকচিক্য থাকলেও মানুষ হিসেবে তিনি যে খুব সুস্থ ছিলেন না, সেটা তাঁর জীবনীকাররা ফাঁস করে দিয়েছেন জানো তো ? এ দেশে কত নোবেল লরিয়েট, কত জ্ঞানী-গুণী, কত উদার মানুষ রয়েছে, তবু এদের প্রেসিডেন্ট হয় নিক্সনের মতন খিস্তিবাজ কিংবা রেগনের মতন দ্বিতীয় শ্রেণীর এক সিনেমার ভিলেন ? এটা একটা ট্র্যাজিডি নয় ! আসলে এদের সরকার চালায় কয়েকটা বড় বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, এদেশে যাদের বলে কর্পোরেশন, আমরা যাদের বলি মাল্টি ন্যাশনাল কম্পানি । লাভের জন্য এরা মানুষের রক্ত শুষে নিতেও দ্বিধা করে না । এরাই নিজেদের স্বার্থে পৃথিবীর এক এক জায়গায় যুদ্ধ লাগায় ।

—আপনি বেশ রেগে আছেন দেখছি, সুনীলদা ।

—ভারতীয় হিসেবে এই সরকারের অনেক আচার আচরণ দেখলে তোমার, রাগ হতে বাধ্য । রাষ্ট্র হিসেবে ভারতবর্ষকে এরা পাত্তাই দেয় না, তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে । আমি টানা তিন মাস এদের টিভি দেখেছি, তুমি বিশ্বাস করবে কি, মাত্র একদিন একটা ভারতীয় বিমানের হাইজ্যাকিং ছাড়া আর কোনো দিন একবারও ভারতবর্ষ সম্পর্কে একটাও খবর দেয়নি ! এদের খবর শুনলে মনে হয়, পৃথিবীতে এখন পোলাণ্ড ছাড়া আর কোনো দেশ নেই । সব সময় রুশ বিরোধী প্রচার একেবারে বিরক্তিকর পর্যায়ে চলে গেছে । এমন অবস্থা, এ দেশে বাচ্চা ছেলেমেয়েদের মনেও রুশ জুজুর ভয় দানা বেঁধে যাচ্ছে । এটা কী সুস্থ ব্যাপার ? রাশিয়াতেও এরকম প্রচার হয় কি না আমি জানি না ! আমি কিন্তু এ দেশে বসেই অনুভব করছি, রুশ-মার্কিন যে আণবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতা চলছে, তাতে রাশিয়ার চেয়ে মার্কিন দেশের দায়িত্বই যেন বেশী । এক একটা আণবিক মিসাইলের জন্য যা খরচ, সেই খরচে ১৩ লক্ষ শিশুকে এক বছর খাদ্য দেওয়া যায় । শুধু আমাদের দেশে কেন, এ দেশেও অপুষ্টিতে ভোগা শিশু আছে । এদিকে এখন চীনের সঙ্গে এদের খুব ভাব, কারণ চীনের সঙ্গে চুটিয়ে ব্যবসা চলছে কি না !

—কিন্তু সুনীলদা, আমি যতদূর জানি, আণবিক অস্ত্রের স্টক পাইল আমেরিকানদের চেয়ে রাশিয়ারই বেশী ।

—রাশিয়ার বেশী হলে এরা আরও বেশী রাখতে চায় । আবার এদের যদি একটা দুটো বেশী হয়ে যায়, তখন রাশিয়া আবার বেশী বানাবে । এই রকম করতে করতে পৃথিবীটা এক দিন হঠাৎ দুম ফটাস হয়ে যাবে ।

স্বাতীদি বললেন, আমরা সেই যে একটা কম্পানি অফিসে নেমন্তন্ন খেতে গিয়েছিলুম—

স্বাতীদিকে থামিয়ে দিয়ে সুনীলদা বললেন, একা ঐ রকম মাল্টি ন্যাশনাল কম্পানি আমাদের অনেককে খেতে নেমন্তন্ন করেছিল, আমাদের দলে কয়েকজন চীনে লেখক লেখিকাও ছিলেন । সে এক এলাহী ব্যাপার । কম্পানিটির নাম জন্ ডিয়ার কম্পানি., আমাদের দেশে অনেকে নাম শোনেনি, কারণ আমাদের দেশে এদের ঠাঁই গাড়তে দেওয়া হয়নি । এরা পৃথিবীতে কৃষির যন্ত্রপাতি বানাবার বৃহত্তম কম্পানি । ট্রাক্টর ফ্রাকটর বানায় । এদের অফিস বাড়িটি দেখলে চোখ ধাঁধিয়ে যায়, বিশ্ববিখ্যাত সব শিল্পীদের আসল ছবি দিয়ে সাজানো, স্বয়ং হেনরি মুরকে ডেকে এনে ভাস্কর্য গড়িয়ে রাখা আছে বাগানে । খাওয়া দাওয়াও হলো দারুণ । কথায় কথায় এই কম্পানির একজন ডিরেকটর খুব আহ্লাদ করে আমাদের জানালেন যে ইদানীং চীনে এরা কত হাজার কোটি ডলারের যেন কয়েকটা কারখানা বসিয়েছে । তখন আমার মনে হলো, এই যে আড়ম্বর ও বিলাসিতা, তার অনেকটাই নিশ্চয়ই সাম্যবাদী চীনকে শোষণ করা টাকায় । সাম্যবাদী চীনও হঠাৎ কেনই বা নিজেদের এখন মার্কিনীদের দিয়ে শোষিত হতে দিচ্ছে, তাই বা কে জানে !

আমি বললুম, যাক গে, ওসব বড় বড় রাজনীতির ব্যাপার । সুনীলদা আপনার সঙ্গে এখানকার অনেক লেখকদের সঙ্গে আলাপ হয়েছে নিশ্চয়ই ?

স্বাতীদি অনুযোগের সুরে বললেন, দ্যাখো না, ও কারুর সঙ্গে আলাপই করতে চায় না । আজকাল ভীষণ অমিশুকে হয়ে গেছে ।

সুনীলদা বললেন, যখন বয়েস কম ছিল, তখন ঝোঁক ছিল বিখ্যাত লেখকদের সঙ্গে আলাপ করবো । তাঁদের কথা শুনবো । এখানে অনেক ভালো লেখক আছেন নিশ্চয়ই, কিন্তু আজকাল তাঁদের সঙ্গে কথা বলার উৎসাহ পাই না । ওদের সামনে গেলে একটা হীনমন্যতা জাগে । কারণ কী জানো, ওরা আমাদের বিষয়ে কিছুই জানে না, আমাদের কারুর লেখা পড়েনি । অথচ আমরা এদের সম্পর্কে অনেক কিছু জানি, অনেক লেখা পড়েছি । এখানে সব আলোচনাই এক তরফা হতে বাধ্য । তাতে আমার রুচি নেই । আমি মনে করি, আমাদের বাংলা সাহিত্যের মান এখানকার চেয়ে কোনো অংশে কম নয়, এদের কিছু লেখা খুব ভালো হলেও অধিকাংশ লেখাই তো রাবিশ ! এরা যদি বাংলা সাহিত্য পড়তে না চায় তা হলে নিজে গিয়ে সেধে সেধে কিছু জানবার আগ্রহ আমার একটুও নেই । তার চেয়ে এ দেশটা বেড়াবার পক্ষে ভালো, টাকা পয়সা জুটলে কিছুদিনের জন্য বেড়িয়ে যেতে বেশ ভালোই লাগে ।

—আপনাকে যদি অনেক টাকা দেওয়া হয়, তা হলে আপনি এ দেশে থেকে যাবেন ?

—যদি আমায় মাসে এক লাখ ডলারও দেয়, তা হলেও আমি এ দেশে থাকবো না। যদি আমায় জেলে বন্দী করে রাখে পরের দিনই আমি আত্মহত্যা করবো!

সুনীলদার এমন তীব্র মন্তব্য শুনে আমি আর স্বাতীদি দু'জনেই হাসতে লাগলুম। তাতে সুনীলদা একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন। বেশী বড় বড় কথা বলা হয়ে যাচ্ছে বুঝতে পেরে নিজেকে একটু সামলে নিলেন। তারপর নিজেও হাসতে হাসতে বললেন, আরে বাবা, বাংলায় কিছু লিখতে গেলে আমাকে তো নিজের দেশের মানুষের মধ্যেই থাকতে হবে। নিজেরদেশের মানুষকে না জানলে তো কিছু লেখা যায় না।

স্বাতীদি বললেন, আমারও খুব বেশী দিন এ সব দেশে থাকবার খুব একটা ইচ্ছে নেই। জানো তো, ও ক্যালঘেরি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরও চার মাস থেকে যাবার একটা প্রস্তাব পেয়েছিল, কিন্তু ও নিতে রাজি হয়নি। ভালোই করেছে। বেড়াতে এসেছি, বেড়িয়ে ফিরে যাবো।

সুনীলদা আবার হঠাৎ মেজাজ বদলে কড়া গলায় আমায় জিজ্ঞেস করলেন, তুমি আমায় এত কথা জিজ্ঞেস করছো কেন? তুমি কি আমার ইণ্টারভিউ নিচ্ছো নাকি?

—না, না, এমনি। এসব কথা আর কাকে জিজ্ঞেস করবো, বলুন?

—এসব আবার কোথাও ছাপিয়ে টাপিয়ে দিও না!

—এখন আবার ফাংশান শুনবেন না একটু রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াবেন? আজ কিন্তু চমৎকার রোদ উঠেছে।

স্বাতীদি খুব উৎসাহের সঙ্গে বললেন, চলো চলো, সেই ভালো। এই সব গান-বাজনা তো আমরা কলকাতায় রোজই শুনি—।

আমরা তিনজনে বেরিয়ে পড়লুম পথে।

॥ ২৮ ॥

এখন নিউ ইয়র্কে রাত দেড়টা, তা বলে কলকাতায় এখন ক'টা বাজে? খুব সম্ভবত দশ ঘণ্টার তফাৎ। অর্থাৎ কলকাতায় এখন বেলা সাড়ে এগারোটা। নিউ ইয়র্কে শনিবার রাত, কলকাতায় এখন রবিবারের দুপুর সবে মাত্র আসছে।

তখন পরিষ্কার দেখতে পেলুম কলকাতায় রবিবারের সকাল-দুপুরের ছবি।

প্রত্যেক রবিবার আমাদের একটা আড্ডা আছে। সাধারণত সেই আড্ডাটা সাড়ে এগারোটা-বারোটা থেকেই শুরু হয়, চলে বিকেল পর্যন্ত। কোনো কোনো দিন সন্ধেও গড়িয়ে যায়। নিয়ম না-মানা, বল্গা-ছাড়া আড্ডা।

হঠাৎ আমার ভীষণ মনটা ছটফট করে উঠলো। দূর ছাই, কিছছু ভালো লাগছে না! এই সাহেবদের দেশে আমি কী করছি? আমার এক্ষুণি চলে যেতে ইচ্ছে করছে। জলের মাছকে জলে ফিরিয়ে দিলেই যেমন সে সবচেয়ে সাবলীল থাকে, কলকাতাটা আমার সেই রকম নিজস্ব জলাশয়।

বেশ বড় অ্যাপার্টমেণ্ট, তিন খানা শোবার ঘর, একটা মস্ত লিভিং-কাম-ডাইনিং রুম। গৃহস্বামী অনুপস্থিত, আমাকে চাবি দিয়ে গেছেন, সারাদিন ঘুরে ফিরে এখানে রাত্রে চলে আসি।

কিছুতেই ঘুম আসছে না আজ। এক একবার সব অন্ধকার করে দেখছি বাইরের আলো। আবার হঠাৎ সব ঘরের আলো জ্বেলে দিচ্ছি। কিছুরই অভাব নেই, ফ্রিজ-ঠাসা খাবার, সেলারে অনেক রকম পানীয়, তিনটে ঘরের তিন রকমের বিছানাতেই শুতে পারি, তবু মনে হচ্ছে এক ছুটে কলকাতায় গিয়ে নিজের বালিশে শুয়ে পড়ি।

মন খারাপটা শুরু হয়েছিল বিকেল থেকেই।

নিউ ইয়র্কের মতন পেল্লায় শহরের রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ একজন চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়ায় আশ্চর্যের কিছু না। কিন্তু পর পর দু'দিন একই লোকের সঙ্গে এখানকার রাস্তায় দেখা হয়ে যাওয়া সত্যিই অত্যাশ্চর্য ব্যাপার। আমার কিন্তু সেই রকমই হলো।

গতকাল বিকেলে গুগেনহাইম মিউজিয়াম থেকে সবে মাত্র বেরিয়েছি, একজন আমার পিঠে ঘুষি মেরে বললো, হ্যাল্লো, নীলু!

চমকে পেছন ফিরে আমার আক্রমণকারীকে দেখে আমি খুবই খুশী হলুম। এক একজন মানুষ থাকে, যাদের দেখলেই ভালো লাগে। এই মানুষটি সেই রকম।

ইংরিজি বানানে এর নাম জর্জ, কিন্তু আসল উচ্চারণ ইয়র্গো। এই ইয়র্গো একজন গ্রীক লেখক। কিছুদিন আগে একটা ছোট শহরে এর সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল। লেখক-টেখকদের সংস্পর্শে যেতে আমার ভয় করে, কারণ সাহিত্য-আলোচনা ফালোচনা আমার দ্বারা কিছুতেই হয় না। সাহেব-লেখকদের সম্পর্কে তো আমার আরও ভয়, ওদের সঙ্গে আবার ইংলিশে সাহিত্য আলোচনা করতে হবে, বাপরে!

কিন্তু ইয়র্গোর চেহারায় কিংবা ব্যবহারে একদম সাহিত্যিক-সাহিত্যিক ব্যাপার

নেই। বেশ রুক্ষ চেহারা, নাকের নিচে ঝোলা গোঁপ, অতিরিক্ত ধূমপানের জন্যই বোধহয় দাঁত একটু ক্ষয়ে গেছে। গোঁফের ফাঁক দিয়ে ও মিচ্‌কি মিচ্‌কি হাসে আর সব সময় মজার কথা বলতে ভালোবাসে। সাহিত্য ছাড়াও পৃথিবীর অন্যান্য বহু বিষয়ে ওর টগবগে আগ্রহ। যদিও গ্রীসে ইয়র্গো খুব নাম করা নাট্যকার এবং চলচ্চিত্র-নাট্যকার। নিজের দেশে স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়েছে। লেখক হিসেবে ওর খুব সম্মান আছে। পুরো নাম ইয়র্গো কুরটিস।

প্রথম দিন আলাপেই ইয়র্গো আমাকে একটা অদ্ভুত কথা বলে চমকে দিয়েছিল। সেটা ছিল বেশ বড় গোছের একটা সম্মিলন, নানা জাতের লোক, তার মধ্যে সাহেবই বেশী। সবাই সবার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে কথা বলছে, এর মধ্যে ইয়র্গো এক সময় আমার পাশে এসে ওর স্বভাবসিদ্ধ মুচকি হেসে বললো, একটা জিনিস লক্ষ্য করেছো, নীল্লু? আমরা যারা কালো লোক, আমরা কক্ষনো কোনো পার্টির ঠিক মাঝখানে থাকি না, আস্তে আস্তে কোনো না কোনো দেয়ালের দিকে সরে যাই। তুমি দ্যাখো, সব কালো লোকরাই দেয়ালের পাশে।

আমি চমকে ইয়র্গোর দিকে তাকিয়ে ছিলুম। ও নিজেকে কালো লোক বলছে কেন? গ্রীকরাও তো পুরোপুরি সাহেব। আর ইয়র্গোর গায়ের রঙ-ও হাতির দাঁতের মতন।

—তুমি নিজেকে কালো বলছো কেন, ইয়র্গো? আমরা ভারতীয়রা কালো হতে পারি, কিন্তু তুমি...

—আরো, কালো মানে তো গরীব! গ্রীকরাও আমেরিকানদের তুলনায় ভীষণ গরীব! সুতরাং তোমরা আমরা সমান। আর গায়ের রং-এর কথা যদি বলো, তা হলেও, ইওরোপের দেশগুলো, যেমন সুইডেন, নরোয়ে, ওয়েস্ট জার্মানি—ওরা গ্রীকদের প্রায় কালোর মতনই অবজ্ঞা করে বুঝলে?

আমি বললুম, তুমি সত্যি আমাকে নতুন কথা শোনালে, ইয়র্গো। আমরা বাঙালীরা এখনো কোনো সুন্দর দেখতে ছেলের বর্ণনা দিই 'গ্রীক যুবকের মতন' কিংবা 'তরুণ গ্রীক দেবতা'।

ও বললো, সে তো তিন হাজার বছর আগেকার গ্রীসের মানুষের কথা তোমরা ভাবো। মুশকিল হচ্ছে কী, সবাই ক্লাসিকাল আমলের গ্রীসের কথা জানে, কিন্তু এখনকার গ্রীসের অবস্থা কেউ জানারও চেষ্টা করে না। আমরা আবার বড়লোক হই, তখন আবার সুন্দর হয়ে যাবো! তোমরা ভারতীয়রাও যদি এখন হঠাৎ বড়লোক হয়ে যাও, তাহলেই দেখো, তোমাদের ঐ জলপাই রঙের চামড়া নিয়ে ইংরেজিতে কাব্য লেখা হবে, মেমসাহেবরা তোমার পেছনে ছুটোছুটি করবে।...

এ হেন ইয়র্গোকে নিউ ইয়র্কের রাস্তায় হঠাৎ দেখতে পেলে আমার তো ভালো লাগবেই। ইয়র্গো একটি ছোট শহরের মাঝারি বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণ পেয়ে কয়েক মাসের জন্য এখানে এসেছে।

আমি মাঝে মাঝে ওর সঙ্গে বাংলায় কথা বলি। ও বাংলা এক বর্ণও বোঝে। কিন্তু আমাকে ও বলেছিল যে বাংলা শব্দ ঝংকার শুনতে ওর ভালো লাগে।

আমি ওর হাতে চেপে ধরে বললুম, কী গো ইয়র্গো সাহেব, তুমি কোথা থেকে হঠাৎ এখানে উদয় হলে? আকাশ থেকে খসে পড়লে নাকি?

ইয়র্গো আমার প্রশ্ন বুঝলো না বটে কিন্তু উত্তরে বললো, এই নিউ ইয়র্কে কয়েকদিনের জন্য একটু ফুর্তি করতে এসেছি। শুনেছিলুম নিউ ইয়র্কের পথে পথে জুনিপার ফুলের মতন ছড়ানো থাকে সুন্দরী মেয়ে, যেন কারুর দিকে একটু ভুরুর ইশারা করলেই সঙ্গে সঙ্গে আসে। দু'দিন ধরে ভুরুর ইশারা করতে করতে আমার চোখ ব্যথা হয়ে গেল। কই একজনও তো এলো না!

ইয়র্গো ভালো ইংরিজি জানে না। ভাঙা ভাঙা বলে। মাঝে মাঝে ঠিক শব্দটা খুঁজে না পেয়ে হাওয়ায় হাতড়াতে থাকে।

কোনো সাহেবের মুখে ভাঙা ইংরিজি শুনলে আমার বড্ড আরাম হয়। আমিও তার সঙ্গে বেশ স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে পারি।

ইয়র্গোর কথা শুনে আমি হাসতে লাগলুম।

ইয়র্গো জিজ্ঞেস করলো, তুমি কোনো বান্ধবী পেয়েছো নিউ ইয়র্কে?

আমি ডান হাতের বুড়ো আঙুল নেড়ে বললুম, লবডঙ্কা।

ইয়র্গো প্রথমে একটা গ্রীক গালাগালি দিল। সেটা নিশ্চয়ই শালার প্রতিশব্দ। তারপর বললো, আমাদের দেশের যে-সব লেখকরা এদেশ ঘুরে গিয়ে ভ্রমণ কাহিনী লেখে, সব্বাই ডাহা গুল মারে!

দুঃখের বিষয় এরকম সরস গল্প আমরা বেশীক্ষণ জমাতে পারি নি। কারণ কাল বিকেলে আমাদের দু'জনেরই তাড়া ছিল। আমার একটা থিয়েটার দেখতে যাবার কথা, ইয়র্গো কেটে রেখেছে একটা ফরাসী সিনেমার টিকিট। সুতরাং কাছাকাছি একটা ম্যাকডোনাল্ডের দোকানে ঢুকে আমরা চটপট কফি খেয়ে নিলুম এবং লিখে দিলুম পরস্পরের ঠিকানা।

কিন্তু ঠিকানা খুঁজে যোগাযোগ করবার আগেই আজ সন্ধেবেলা আবার ইয়র্গোর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল রাস্তায়। একই থিয়েটার দেখে বেরুলাম দু'জনে।

আজ ইয়র্গোর সঙ্গে একটি স্বাস্থ্যবতী যুবতী, ঝলমলে মুখ, ডাগর-ডাগর চোখ, তার স্কার্টে অত্যুজ্জ্বল লাল-নীল ফুল।

ইয়র্গো আর আমি প্রথম বিস্ময় বিনিময় করবার পর সে জিজ্ঞেস করলো,

নীলু, আজ এর পর তোমার কোনো কাজ আছে ? কোথাও যাবার কথা আছে ?

আমি কাঁধ ঝাঁকালুম। অর্থাৎ সেরকম কোনো কথা থাকলেও কিছু আসে যায় না।

—তা হলে কিছুক্ষণ কোথাও বসে আড্ডা মারা যাক ? হ্যাঁ ?

—নিশ্চয়ই !

মেয়েটি পৃথিবীর দুর্বোধ্যতম ভাষায় ইয়র্গোকে কী যেন বললো। ইয়র্গোও সেই একই ভাষায় উত্তর দিয়ে তারপর আমাকে আবার মিষ্টি ভাঙা ইংরিজিতে বললো, এই মেয়েটি থাকতে চাইছে না, ওর বাবা ওর সঙ্গে আজ দেখা করতে আসবে বলছে, তা হলে ওকে ছেড়ে দিই, কী বলো !

আমি আর কী বলবো, হাসি হাসি মুখ করে তাকিয়ে রইলুম। মেয়েটিও আমার দিকে এক ঝলক হেসে গুড বাই বলে নেমে গেল মাটির তলায় ট্রেন ধরতে।

কিছুক্ষণ ইয়র্গো আর আমি পাশাপাশি হাঁটবার পর আমি বললুম, এই তো আজ বেশ একটি সুন্দরী সঙ্গিনী পেয়ে গিয়েছিলে দেখছি !

ইয়র্গো দারুণ বিরক্তির সঙ্গে বললো, দূর দূর ! ও তো গ্রীক মেয়ে। এখানে এসে উঠেছি এক গ্রীকের বাড়িতে, নেমন্তন্ন খাচ্ছি গ্রীকদের বাড়িতে, আলাপ হচ্ছে গ্রীক মেয়েদের সঙ্গে···তাহলে আর নিউ ইয়র্কে আসা কেন ? আথেন্সেই তো এসব পাওয়া যায়। আমার নাম শুনলে গ্রীক মেয়েরা আমার সঙ্গে প্রেম করতে আসে, নিউ ইয়র্কেও সেই একই ব্যাপার !

আমি যতদূর জানি, বাঙালী লেখকদেরও প্রায় একই অবস্থা। তারাও বিদেশে গেলে বাঙালীদের বাড়িতে উঠে। বাঙালীদের নানান বাড়িতে নেমন্তন্ন খায়/ তবে বাঙালী মেয়েরা লেখকদের নাম শুনে প্রেম করতে আসে কি না তা অব আমি জানি না। অন্তত আমার কোনো প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নেই।

ইয়র্গো জিজ্ঞেস করলো, নিউ ইয়র্ক তোমার কেমন লাগছে ?

আমি পাল্টা প্রশ্ন করলুম, কারুর কি খারাপ লাগতে পারে ?

ও বললো, ইত ইজ এ গ্রেত্ সিতি···সব সময় জীবন্ত···এত রকমের নাটক···এত ধরনের ফিল্ম···মিউজিক কনসার্ট···আর্ট গ্যালারিগুলো তো আছেই, সব দেখে শেষ করা যায় না···বাত্ আই দোনত লাইক ইত্ ! ইত ইজ দিপ্রেসি

রাস্তায় দু' পাশের অতিকায় বাড়িগুলো দেখিয়ে ইয়র্গো আরও কী যেন বলতে গেল, ভাষা না খুঁজে পেয়ে কাঁধ ঝাঁকিয়ে, ঠোঁট উল্টে বুঝিয়ে দিল।

তারপর থমকে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো, তুমি কখনো উজো খেয়েছো ? আজ দেখলুম এখানকার দোকানে পাওয়া যায়। দেখেই কেমন মন খারাপ হয়ে

গেল। তুমি খাবে ?

—উজো কী ?

—আমাদের গ্রীসের দেশী মদ। খেয়ে দ্যাখো না একটু।

—কেন খাবো না ? জানো, আমার মা আমায় ছেলেবেলাতেই শিখিয়ে দিয়েছেন, পরের বাড়িতে গিয়ে এটা খাবো না, সেটা খাবো না বলতে নেই। যে যা দেবে মুখ বুজে খেয়ে নেবে।

ইয়র্গো এক গাল হেসে বললো, চলো তাহলে !

ম্যানহাটনে বার অসংখ্য। কিন্তু উজো অতি সস্তা দামের পানীয়, বারে বোধ হয় সার্ভ করে না। তা ছাড়া আমরা দু'জনেই গরীব দেশের মানুষ, ডলারকে ভক্তি করি। বারে বসে পেগের দামে অনেক খরচ পড়ে যাবে।

হাঁটতে হাঁটতে আমরা গ্রীনিচ্ ভিলেজে এসে পড়েছি। ইয়র্গো সট্‌করে এক দোকান থেকে এক বোতল উজো কিনে নিয়ে এলো। তারপর বললো, এখানেই কোথাও বসে যেতে হবে। দাঁড়াও ব্যবস্থা করছি।

রাত প্রায় দশটা বাজে। গ্রীনিচ্ ভিলেজের সেই আগেকার রব্‌রবা এখন আর নেই। বাউণ্ডুলে শিল্পী সাহিত্যিকরা নগর-উন্নয়নকারীদের অত্যাচারে অনেকেই এ পাড়া ছেড়ে পালিয়েছে। তবু এখনো এখানকার পথে বেশ ভিড়।

একটা ফাঁকা ধরনের রেস্তোরাঁর ফুটপাথের টেবিলে বসলুম আমরা। পরিচারিকাকে ডেকে খুব সরলভাবে ইয়র্গো বললো, আমাদের দু' কাপ কফি দাও। আর দুটো কাচের গেলাস দাও। আর বেশ বড় এক জাগ জল দাও। আমরা কফির দাম দেবো কিন্তু কফি খাবো না। আমরা অন্য জিনিস খাবো।

মেয়েটি বিনা বাক্যব্যয়ে কফি, গেলাস ও জল নিয়ে এলো। তারপর জিজ্ঞেস করলো, তোমরা কী খাবে ?

কাঁধের ঝোলা থেকে বোতলটি বার করে ইয়র্গো গেলাসে ঢাললো। আমাকে বললো, প্রথমে নিট্ খেয়ে দেখো। যদি বেশী কড়া লাগে, তা হলে জল মিশিয়ে নিও। তবে তাড়াতাড়ি খেও না কিন্তু, হঠাৎ কিক্ করে।

পরিচারিকাটি ইয়র্গোর গেলাসটা তুলে নিয়ে ছোট্ট একটা চুমুক দিল। একটুক্ষণ সময় নিয়ে জিনিসটা উপলব্ধি করে সে বললো। হ্যাঁ, খেতে পারো। আমি ঘুরে ঘুরে আসবো, আমাকে একটু একটু দিও।

আমি প্রথমে সাবধানে চুমুক দিলুম। মোটেই অচেনা লাগলো না। উজো একেবারে জলের মতন স্বচ্ছ পানীয়। সাঁওতাল পরগনায় আমি অনেকবার মহুয়া খেয়েছি, স্বাদটা অনেকটা সেই রকম লাগলো। কিংবা গোয়ার কাজু ফেনীর মতনও বলা যায়। মেক্সিকোর টাকিলা আমি অনেকবার খেয়েছি, তার চেহারা ও

স্বাদও এর কাছাকাছি। জল না মিশিয়েই দু'জনে চুমুক দিতে লাগলুম চুক চুক করে।

একটুবাদে ইয়র্গো বললো, তুমি গ্রীসে যাওনি, না ? চলে এসো। ছোট ছোট দ্বীপ...গ্রীসে এলে তুমি বুঝতে পারবে জল কত সুন্দর দেখতে হয় ! এই যে নিউ ইয়র্ক শহর, এটা কি মানুষের বসবাসযোগ্য ? দেখলে মনে হয় না এটা দৈত্যদের জন্য বানানো হয়েছে ? তার বদলে...গ্রীস...মানুষ আর প্রকৃতি সেখানে এখনো এক সঙ্গে মিশে আছে অনেকখানি...অভাব আছে, দারিদ্র্য আছে...কিন্তু এখনো মানুষের মন টাটকা আছে...

ব্যাস, অমনি শুরু হয়ে গেল আমার বুকে ব্যথা। কলকাতা শহরের রূপের কোনো খ্যাতি নেই, কিন্তু সে যে বিষম আপন, তাই নিউ ইয়র্কের তুলনায় সেই মুহূর্তে কলকাতাকে মনে হলো স্বর্গের মতন প্রিয়। গ্রীসের মতন আমাদের বাংলা হয়তো তত সুন্দর নয়, কিন্তু তারও তো একটা আলাদা রূপ আছে। শুধু বাংলা কেন, গোটা ভারতবর্ষটাই তো আমার। সেই জনম দুখিনী দেশটার জন্য টন টন করতে লাগলো হৃৎপিণ্ড।

দু'জনে মিলে ফিস ফিস করে গল্প করতে লাগলুম দু'জনের দেশের। বোতল প্রায় শেষ। আমার এখন একা থাকতে ইচ্ছে করছে খুব। শেষের দিকে পরিচারিকাটি খুব ঘন ঘন এসে চুমুক দিচ্ছিল গেলাসে, আমি তাই ইয়র্গোকে বললুম, এর দিকে ভুরুর ইশারা করলে বোধহয় কাজ হবে। তুমি চেষ্টা করে দ্যাখো না।

ইয়র্গো পরিচারিকাটির নাম ধাম জিজ্ঞেস করলো। তারপর সে বসে যেতেই বললো, ধুর ! ওতো ইটালিয়ান। সবে মাত্র কিছুদিন হলো এসেছে। আমাদের গ্রীসেও তো কত ইটালিয়ান মেয়ে কাজ করতে যায়।

হঠাৎ গা ঝাড়া দিয়ে ইয়র্গো বললো, আমরা বড্ড সেন্টিমেন্টাল হয়ে যাচ্ছি, না ? এটা ছেলেমানুষী হয়ে যাচ্ছে। চলো, অন্য কোথাও যাই, যেখানে অনেক লোক, সেখানে খানিকটা হৈ চৈ করবো...।

কিন্তু খানিকবাদে আমি ইয়র্গোর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিজের অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে এলুম। ফেরার পর অবশ্য বুঝলুম ভুল করেছি। এক মুহূর্ত স্থির থাকতে পারছি না। কলকাতা যেন বিরাট এক লাটাই গুটিয়ে আমায় ঘুড়ির মতন টানছে। মনে হচ্ছে এই মুহূর্তে ফিরে যাই। আমার কাছে রিটার্ণ টিকিট আছে। বিমান কম্পানিকে ফোন করবো, যদি পরের ফ্লাইটেই জায়গা পাওয়া যায় ! কিন্তু এত রাত্রে...।

শুধু আমার মন নয়, আমার শরীরও যেন কলকাতার জন্য মোচড়াচ্ছে। এখন

রোববার সাড়ে এগারোটা, আড্ডাধারীরা যে-যার বেরুচ্ছে বাড়ি থেকে এই সময়। আজ কোথায় আড্ডা ? এর বাড়ি, বা ওর বাড়ি, না তার বাড়ি ! কিংবা লেকের গাছতলায় চেয়ার টেবিলে !

নিজেই এক সময় হেসে উঠছি। আমি এত সেন্টিমেন্টাল ? তা হোক, এখন সম্পূর্ণ একা, যতই সেন্টিমেন্টাল হই, যতই ছেলেমানুষী করি, কেউ তো দেখছে না !

হঠাৎ মনে হলো, এখন একটু বাংলায় কথা বললে তবু ভালো লাগবে। অনেক দিন দীপকদা-জয়তীদের সঙ্গে যোগাযোগ নেই। ওঁদের ওখানে এখন কত রাত ? যাই হোক, ওঁদের জাগানো যেতে পারে। আমি টেলিফোন তুলে ওঁদের নম্বর ঘোরালুম।

॥ ২৯ ॥

ইংলণ্ডের নিসর্গ-দৃশ্য সম্পর্কে সেখানকার কবি ও শিল্পীরা বরাবরই উচ্ছ্বসিত। রোমান্টিক প্রকৃতি বর্ণনা ইংরেজি কবিতায় যেমন সুন্দর আছে, অন্য ভাষায় তার তুলনা পাওয়া ভার। সেইজন্যই বোধহয় ইংরেজ ঔপনিবেশিকরা আটলান্টিক মহাসাগর পেরিয়ে এই নতুন দেশে এসে যখন আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে, তখন ম্যানহাটন দ্বীপ ছাড়িয়ে তার পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলি দেখে হয়তো তারা মুগ্ধ ও চমকিত হয়েছিল। সেখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্যের সঙ্গে মিল খুঁজে পেয়েছিল নিজের দেশের। সেই জন্যই তারা এই এলাকার নাম রাখে নিউ ইংল্যাণ্ড। ম্যাসাচুসেট্স, রোড আয়ল্যাণ্ড, কানেটিকাট ইত্যাদি জায়গা এই নিউ ইংল্যাণ্ডের মধ্যে পড়ে।

সত্যি বড় অপূর্ব এখানকার প্রকৃতি। নিউ ইয়র্ক শহর থেকে ট্রেনে চেপে খানিকটা দূরে গেলেই দু'পাশের দৃশ্যে চোখ জুড়িয়ে যায়। খুব যে আহা মরি সাংঘাতিক কিছু দ্রষ্টব্য ব্যাপার আছে তা নয়, ছোট ছোট টিলা, হাল্কা-হাল্কা গাছ আর ক্ষুদে ক্ষুদে নদী। সৌন্দর্য এটাই যে প্রকৃতিকে এখানে অবিঘ্নিত রাখা হয়েছে, গাছপালাগুলোকে ছেঁটে ছেঁটে সাজানো হয়নি, নদীগুলো চলেছে আপন মনে। ঝোপঝাড়ে ফুটে আছে অজস্র ফুল। তাদের নামও বেশ মজার, বাটারকাপ, ইণ্ডিয়ান পেইন্ট ব্রাস, লেডিজ স্লিপার, কুইন অ্যানিজ লেস, মারিপোসা লিলি, নিউ ইংল্যাণ্ড অ্যাস্টর। তাদের কতরকম রঙ।

একদিন এরকম একটা পথ দিয়ে গাড়িতে যেতে যেতে আমাকে নদীর ধারের একটা জায়গা আঙুল তুলে দেখিয়ে একজন বলেছিলেন, ঐ গাছতলায় আমার

এক বান্ধবীর বিয়ে হলো কিছুদিন আগে।

আমি জিজ্ঞেস করলুম, গাছতলায় বিয়ে?

তিনি বললেন, হ্যাঁ। খুব চমৎকার বিয়ে। পাত্র আর পাত্রী ছাড়া আরও আমরা দশ বারোজন এসেছিলুম সকালবেলা। নদীর ধারে গাছের ছায়ায় বসে প্রথমে ছেলেটি আর মেয়েটি পরস্পরকে উদ্দেশ্য করে একটা করে কবিতা পড়লো। তারপর বরযাত্রী আর কন্যাযাত্রীদের প্রত্যেককেই পড়তে হলো নিজেদের পছন্দমত একটা করে কবিতা। ব্যাস, হয়ে গেল বিয়ে।

আমি আকুল, সতৃষ্ণ নয়নে অনেকক্ষণ সেই ছোট্ট নদীর ধারে ছায়াময় জায়গাটির দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়েছিলুম অনেকক্ষণ।

সেই রকমই একটা নিরিবিলি ছিমছাম, সুশ্রী জায়গার নাম স্কারস্‌ডেল। এখানে থাকেন ডঃ অম্বুজ মুখোপাধ্যায় এবং স্নিগ্ধা মুখোপাধ্যায়। অম্বুজ মুখোপাধ্যায় ভারতের বাইরে এসেছিলেন প্রথম যৌবনে, এখন তিনি প্রৌঢ়ত্বের সীমায় পৌঁছে গেছেন। তিনি অধ্যাপক এবং শান্ত ধরনের মানুষ, চাকরির সময়টুকু ছাড়া বাকি সময়টুকু বাড়িতে বসে শুধু বই পড়েন। কত রকম বই আর পত্রপত্রিকা, তার মধ্যে 'দেশ' এবং অনেক বাংলা বইও আছে। স্নিগ্ধা দেবী তাঁর জীবনের যে-কটা বছর স্বদেশে কাটিয়েছেন, তার চেয়ে বেশী বছর কেটে গেল বিদেশে। কিন্তু কলকাতার বনেদী বাড়ির মহিলাদের মুখে যে একটা বিশেষ ছাপ থাকে, সে ছাপ তাঁর মুখে এখনো অক্ষুণ্ণ আছে। রূপও ফেটে পড়ছে এখনো।

এঁদের দুই ছেলেমেয়ে হস্টেলে থেকে পড়াশুনো করে। স্নিগ্ধা দেবীও সকালবেলা কয়েক ঘণ্টার জন্য একটা চাকরি করতে যান, ফিরে এসে শিল্পীর মতন যত্ন করে নানারকম রান্নাবাড়া করেন। শুধু নিজেদের জন্য নয়, এঁদের বাড়িতে প্রায়ই অতিথি আসে। এঁরা দু'তিন বছর অন্তর নিয়ম করে একবার দেশে যান।

এইসব বাড়িতে এলে মনে হয়, আমেরিকা আসলে খুব একটা কিছু দূরের দেশ নয়। এক সময় বাঙালীবাবুরা পশ্চিমে চাকরি করতে যেত, পশ্চিম মানে লাহোর, দেরাদুন, মীরাট এই ধরনের জায়গা। তখন সেই সব জায়গাই ছিল বহু দূরে। দু'তিন বছর অন্তর তাঁরাও বাংলাদেশে আসতেন ছুটি নিয়ে, আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য। সঙ্গে আনতেন প্রচুর রোমাঞ্চকর গল্প, মেওয়া-খোবানি জাতীয় নতুন ধরনের খাদ্য আর স্থানীয় রঙ-চঙে পোশাক।

এখন মস্কো-নিউইয়র্ক-টরোণ্টো হয়েছে সেই লাহোর, দেরাদুন, মীরাট।

অম্বুজবাবু ও স্নিগ্ধা দেবীকে পূর্ব উপকূলের বাঙালীরা প্রায় সকলেই চেনে।

শুধু বাঙালী কেন, অনেক ভারতীয়রাও, কারণ প্রধানত এঁদেরই উদ্যোগে স্থাপিত হয়েছে 'টেগোর সোসাইটি'। এই টেগোর সোসাইটির নানান অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন বাঙালী-অবাঙালী অনেকেই।

উত্তমকুমার এসে উঠেছিলেন এই বাড়িতে। তাছাড়া হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সুচিত্রা সেন, সুবিনয় রায় প্রমুখ আরও সব অনেক নামকরা মানুষ এ বাড়িতে এসে থেকেছেন কিংবা অনুষ্ঠান করে গেছেন। কী একটা সূত্রে যেন সুনীলদা আর স্বাতীদি এখানে অতিথি। সেইজন্য আমারও নেমন্তন্ন হলো।

সেইখানে খেলুম ইলিশ মাছ। ইলিশের মতন ইলিশ বটে! কলকাতার বাজারে মাঝে মাঝে এক রকম ইলিশ পাওয়া যায়, তাকে বলে খোকা ইলিশ। সেই অনুযায়ী ওই ইলিশকে বলা যায় মহারাজ ইলিশ। এক একটির ওজন আট-দশ পাউণ্ড, চেহারাও অপূর্ব। এই মাছের স্থানীয় নাম শ্যাড্‌। কিন্তু ইলিশ বলে চিনতে আমাদের কোনো অসুবিধেই হবার কথা নয়। স্বাদ-গন্ধ সবই ঠিকঠাক। নিমন্ত্রিতরা সবাই ধন্য ধন্য করতে লাগলেন। কিন্তু আমার মতন কাঠ-বাঙাল অত চট্‌ করে ইলিশকে সার্টিফিকেট দিতে পারে না। স্নিগ্ধা দেবীর রান্না অতি চমৎকার, আর সবই ঠিকঠাক আছে, কিন্তু মাছটা কেমন যেন একটু তুলতুলে ধরনের। পেটীর মাছে সেই তৈলাক্ত তেজী ভাবটা যেন নেই।

এই বাড়িতেই আলাপ হলো দু'জনের সঙ্গে। একটি মেয়ের নাম প্রীতি, সে আমাদের যাদবপুরের চন্দন সেনগুপ্ত নামে এক সুদর্শন ও মেধাবী যুবকের সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ। চন্দনকে বেশী দেখা যায় না, সে খুবই লাজুক, তাছাড়া নিজের কাজকর্মে খুব ব্যস্ত, সারাদিন অফিস করবার পর সন্ধের সময় সে আবার এক স্কুলে পিয়ানো শিখতে যায়। প্রীতি আগে একটি ট্রাভেল এজেন্সিতে কাজ করতো, এখন ছেড়ে দিয়েছে, তাই তার হাতে এখন অনেক সময়। প্রীতি আমাদের বন্ধু, 'দার্শনিক ও পথপ্রদর্শিকা' হয়ে পরে অনেক দ্রষ্টব্য স্থান নিয়ে গেছে।

প্রীতি মেয়েটি গুজরাটি। চন্দনের সঙ্গে নিউইয়র্কেই তার পরিচয়। কলকাতায় না এসেই সে তার স্বামীর ভাষা বাংলা পড়তে, লিখতে এবং বলতে শিখে নিয়েছে। আমি অবশ্য আগেও অনেক জায়গায় দেখেছি যে গুজরাটি নারী পুরুষরা অনেকেই বেশ চট করে বাংলা শিখে নিতে পারেন। এই প্রসঙ্গে একটা মজার কথা মনে পড়ে গেল। বোম্বাইতে নলিনী মাডগাঁওকর নামে একজন কবি এবং অধ্যাপিকা বাংলা বলতে পারেন তো খুব ভালোই, লেখেনও চমৎকার। এই নলিনী গুজরাটের মেয়ে, এঁর স্বামী বলবন্ত্‌ মহারাষ্ট্রীয়। এই বলবন্ত্‌-এর কৃতিত্ব আরও বেশী। ইনি কখনো একটানা কলকাতায় থাকেননি, শান্তিনিকেতন

একবার দেখতে গিয়েছেন মাত্র, তবে নিজের শখে ইনি রবীন্দ্রসঙ্গীত এতই ভালো শিখেছেন যে বোম্বাইতে রবীন্দ্রসঙ্গীতের ক্লাস নেন। বলাই বাহুল্য এঁর ক্লাসের অনেক ছাত্র-ছাত্রীই বাঙালী। নতুন গান শেখাবার আগে বলবন্ত যখন ছাত্রছাত্রীদের সেই গানটা লিখে নেবার জন্য ডিকটেট করেন, তখন মুশকিল হয় এই যে, অনেক বাঙালী ছাত্র-ছাত্রীই বাংলা অক্ষর লিখতে পারে না। তারা বলে, স্যার, গানের কথাগুলো আমাদের রোমান স্ক্রিপ্টে লিখিয়ে দিন।

প্রীতি বাংলা শিখেছে নিছক নিজের শখে, কেননা সে ইচ্ছে করলেই তার স্বামীর সঙ্গে ইংরেজিতে কথাবার্তা চালিয়ে দিতে পারতো। তাছাড়া সে কবিতা ভালোবাসে, গান ভালোবাসে, ছবি ভালোবাসে। সে কখনো শাড়ি পরে, কখনো স্কার্ট, কখনো বা গুজরাটি বা রাজস্থানী পোশাক, কিন্তু কখনো তার পোশাক বেশী জমকালো নয়, বরং তাতে সূক্ষ্ম রুচি মিশে থাকে।

সবচেয়ে আশ্চর্য হলো তার ভ্রমণের নেশা। প্রীতি এক সময় ট্র্যাভেল এজেন্সিতে কাজ করতো, তখন কম দামে কিংবা বিনা দামে টিকিট পাবার সুযোগ ছিল। এখন সে সুযোগ নেই, তবু তার সেই নেশা রয়ে গেছে। আমরা ভারতবর্ষে বসে ভাবি টোকিও, পীকিং বা কায়রো কত দূরে। কিন্তু নিউ ইয়র্কে এলে মনে হয় সারা পৃথিবীটাই খুব কাছে। এখানকার ছেলেমেয়েদের মুখে প্রায়ই শোনা যায়, এই তো গত মাসে চীনে গিয়েছিলুম, পরশুই আবার ভিয়েনা যেতে হবে, সেখান থেকে ফিরেই আবার ভেনেজুয়েলায়...। প্রীতি বেড়াতে যায় বিনা উদ্দেশ্যে। তার স্বামীকে যখন অফিসের কাজে কোথাও যেতে হয়, তখন একা একা নিউ ইয়র্কে থাকতে ভালো লাগে না প্রীতির, সেও বেরিয়ে পড়ে পৃথিবী-পথে। ইজিপ্ট কিংবা মেক্সিকো কিংবা চীনে সে অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্যে একলা ঘুরে আসে। তবে এত দেশ ঘুরেও প্রীতি দারুণ ভালোবাসে নিউ ইয়র্ক শহরটিকে। এরকম প্রাণবন্ত শহর নাকি আর একটাও নেই। এ বিষয়ে আমি ঠিক মতামত দিতে পারি না, কেন না আমি আর এ পৃথিবীর কতটুকু দেখেছি!

আমাদের সঙ্গে ডাউন টাউন বেড়াতে এসে ট্রেন থেকে নেমেই প্রীতি একটা বড় গোল বোতাম কিনে নেয়, তাতে লেখা, 'আই লাভ নিউ ইয়র্ক'।

আর একজনের নাম কামাল। তার পুরো নাম মুস্তাফা কামাল ওয়াহিদ, কিন্তু সবাই তাকে কামাল বলেই চেনে, এমনকি তাকে শুধু 'কে' বলে ডাকলেই নাকি চলে। কামাল হচ্ছে সেই ধরনের মানুষ, যার সঙ্গে যে-কারুর মাত্র পাঁচ মিনিট আলাপেই ভাব জমে যায়।

প্রথম আলাপে সাধারণত আমরা সৌজন্যবশত নমস্কার বলে চুপ করে থাকি। এর পর কে কথা শুরু করবে, তাই নিয়ে খানিকক্ষণ দ্বিধা চলে। কিন্তু

কামাল ঐ সব অযথা আদব-কায়দার ধার ধারে না, প্রথম আলাপের সঙ্গে সঙ্গেই সে আগ্রহী হয়ে পড়ে, সেই মানুষটির কাজকর্ম বিষয়ে জানতে চায়, এবং বিদেশে তার কোনো রকম সাহায্যের দরকার আছে কিনা, তাই নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়ে। পরোপকার করাটা যেন তার ডাল-ভাত খাওয়ার মতন জীবনযাপনের একটা অতি স্বাভাবিক অঙ্গ।

কামাল চাকুরিজীবী নয়, সে ব্যবসা করে। সে কিসের ব্যবসা করে জিজ্ঞেস করলেই টপ্ করে উত্তর দেবে, আলপিন টু এলিফ্যান্ট যে-কোনো কিছুর! এর সরল অর্থ হলো, ভারতীয় উপমহাদেশের যে-সব জিনিসের চাহিদা আছে আমেরিকায়, সেগুলো সে আনিয়ে বিক্রির ব্যবস্থা করে। যেমন চটের থলে, হ্যাণ্ডব্যাগ, পাথরের মূর্তি ইত্যাদি। কিন্তু কামালের সঙ্গে কয়েকদিন মেশার পর আমি বুঝতে পেরেছিলুম, খাঁটি ব্যবসায়ী হওয়া ওর দ্বারা কোনোদিন বোধহয় সম্ভব হবে না। কারণ ওর কোনো টাকার লোভই নেই। কিছু একটা করতে হবে, এই জন্য ও এক একদিন এক একটা কাজের নেশায় ছোটে। কাজটা আসল নয়, ঐ ছোটাতেই ওর আনন্দ। কামাল কোনো নেশা-ভাঙ করে না, পোশাক-পরিচ্ছদের প্রতি মনোযোগ নেই, খায়ও অতি সামান্য। মাঝে মাঝে সে তার ভবিষ্যৎ কোনো ব্যবসা থেকে লাখ-লাখ কিংবা কোটি কোটি টাকা লাভের রঙীন স্বপ্ন শোনায়। একদিন আমি জিজ্ঞেস করেছিলুম, অত টাকা পেলেই বা তুমি তা নিয়ে কী করবে, কামাল? একটু থমকে গিয়ে ও উত্তর দিল, কাজে লেগে যাবে, অনেকের কাজে লেগে যাবে!

লম্বা, সুগঠিত চেহারা কামালের বয়স বছর পঁয়তিরিশেক হবে। আমি তার নাম দিয়েছি গেছোবাবা। কামালও একজন গ্লোব ট্রটার বা বিশ্ব পথিক। আজ নিউ ইয়র্ক, কাল কলকাতা, পরশু ঢাকা, তারপর কাঠমাণ্ডু, তারপর লণ্ডন, তারপর টরোন্টো, তারপর আবার কলকাতা...এই রকম চলে তার বছরে তিন চারবার। কিন্তু কামাল ঠিক ভ্রমণকারী নয়, সে নতুন দেশ বা প্রকৃতি দেখবার জন্য ঘোরে না। কিংবা এতবার ঘোরাঘুরিতে ওর ওসব আগেই দেখা হয়ে গেছে বলে এখন আর ওসব দিকে তাকায় না। সে ঘুরে বেড়ায় তার স্বপ্নের ব্যবসার অছিলায়। কোনো একদিন সে এক কোটি টাকা লাভ করবে, যে টাকাটা, 'অনেকের কাজে লাগবে'!

যে সন্ধেবেলা কামালের সঙ্গে আলাপ, সেদিনই সে ওয়াশিংটন ডি সি থেকে একটানা গাড়ি চালিয়ে এসেছে স্কারসডেলে। আধ ঘণ্টাখানেক গল্প করবার পরই হঠাৎ লাফিয়ে উঠে বললো, একটা জরুরি কাজের কথা মনে পড়েছে, এক্ষুণি ঘুরে আসছি! চলে গেল চল্লিশ মাইল দূরে। ফিরে আসার পর আমাদের

আলোচনায় একটু উঁকি দিয়েই কামাল বুঝলো যে আমাদের সিগারেট ফুরিয়ে গেছে, এখানে কোথায় সিগারেট পাওয়া যায়, সেই কথা ভাবছি অমনি আবার বেরিয়ে গেল কামাল, সেই রাত্রে কোথা থেকে যেন নিয়ে এলো এক পাহাড় সিগারেট ! আমি লক্ষ্য করলুম, সে পাঁচ মিনিটও এক জায়গায় চুপ করে বসে কথা বলতে পারে না।

খাওয়া দাওয়ার পর সবে আমরা জমিয়ে গল্প করবার জন্য বসেছি, কামাল আবার দপাস্ করে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, চলি ! সকলের প্রশ্নের উত্তরে সে জানালো যে সে সেই রাত্রেই বস্টন চলে যাবে। সবাই অবাক। স্নিগ্ধা দেবী কামালের রাত্রিবাসের জন্য বিছানার ব্যবস্থা করে ফেলেছেন পর্যন্ত। কিন্তু কামাল বললো, শুধু শুধু রাত্তিরটা নষ্ট করে কী লাভ ! ভোরের মধ্যে বস্টন পৌঁছে গেলে কাল সকাল থেকেই আবার কাজ করা যাবে !

সত্যি সত্যি গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেল কামাল। সারা রাতের যাত্রা। দু'একজন আশঙ্কা প্রকাশ করলো, একলা গাড়ি চালাতে চালাতে ঘুমিয়ে পড়বে না তো ! স্নিগ্ধা দেবী বললেন, না, ওর এরকম অভ্যেস আছে। আমারও মনে হলো, ঘুমোবে না, চোখ চেয়ে চেয়েই ও সেই অলীক রঙীন স্বপ্নটা দেখতে দেখতে রাত্রির অন্ধকার পার হয়ে যাবে।

॥ ৩০ ॥

প্রথম দৃশ্যে দেখা যাচ্ছে মা আর মেয়ে এসে ঢুকছে একটা সদ্য ভাড়া নেওয়া ফ্ল্যাটে। মেয়ের বয়েস সতেরো, রোগা আর লম্বা ; মায়ের বয়েস চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশের মধ্যে। সবে মোটা হতে শুরু করেছে শরীর, অসভ্য ধরনের রঙীন মুখখানা দেখলেই তার পেশা মোটামুটি অনুমান করা যায়। আগেকার ফ্ল্যাটের ভাড়া ফাঁকি দিয়ে তারা এই নতুন জায়গায় এসেছে। জিনিসপত্র গোছাবার আগেই মা ক্লান্ত হয়ে হুইস্কি খেতে শুরু করে, হুইস্কি এবং মায়ের প্রতি মেয়ের একই রকম ঘৃণা। এদের কথাবার্তা শুনে মনে হয় এরা খুব ঘনিষ্ঠ ধরনের শত্রু, পরস্পরের প্রতি স্নেহ-ভালোবাসার তিল মাত্র অস্তিত্ব নেই। বাড়িটি ইংল্যাণ্ডের ম্যানচেস্টারে এক অতি গরিব পাড়ায়, কাছাকাছি রয়েছে কবর খানা, কশাইখানা আর কারখানার চিমনি অনবরত ধোঁয়া ওগরাচ্ছে। ঘরটিও অতি অস্বাস্থ্যকর ও অন্ধকার ও স্যাঁতসেঁতে। যার তুলনা দেওয়া হয়েছে, 'ব্ল্যাক হোল অফ ক্যালকাটা'র সঙ্গে।

একটু পরেই এক চোখে ঠুলি লাগানো জলদস্যুর মতন চেহারার একজন লম্বা

কৃষ্ণাঙ্গ এবং বাচ্ছাটার রং-ও কালো হতে পারে, তখন সে বিতৃষ্ণায় আবার মেয়েকে ছেড়ে চলে যায়।

নিঃসঙ্গ গর্ভবতী কুমারী জো খালি ঘরের মধ্যে একা দাঁড়িয়ে একটি ছেলে-ভুলোনো ছড়া বলতে থাকে আস্তে আস্তে।

এই হলো 'আ টেস্ট অফ হানি' নাটকের কাহিনী। শেলাগ ডেলানি নামে একটি উনিশ বছরের ব্রিটিশ চাকুরে-মেয়ে এই নাটকটি রচনা করেছিল। এক সময় স্ট্রাটফোর্ডের থিয়েটার রয়ালে সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়েছিল। ইংল্যাণ্ডের অ্যাংরি ইয়ংম্যানদের পর শেলাগ ডেলানিকে বলা হয়েছে রাগী যুবতী। এখন নাটকটি চলছে ব্রডওয়ে'র সেঞ্চুরি থিয়েটারে। পাঁচটি মাত্র চরিত্রের একটি পরীক্ষামূলক নাটক, তাও প্রচুর দর্শক টানে। নাটকটির কাহিনী আমি বিস্তৃত ভাবে লিখলুম একটি আধুনিক নাটকের পরিপূর্ণ পরিচয় দেবার জন্য। আমাদের কাছে এর বিষয়বস্তু খুবই ডিকাডেণ্ট মনে হবে। এখানে যেন জীবনের সমস্ত মূল্যবোধই মূল্যহীন। তবে একটা কথা মনে রাখা দরকার, আমাদের দেশে যেমন গরীব-দুঃখীদের নিয়ে প্রগতিশীল নাট্যরচিত হয়, সেই রকম এই নাটকের পাত্রপাত্রীও পশ্চিমী সমাজের একেবারে নিচের তলার গরীব-দুঃখী। প্রসঙ্গত এটাও উল্লেখযোগ্য যে এই নাটকে দৃশ্যত কোনো রকম অশ্লীলতা এমনকি সামান্য যৌন ইঙ্গিতপূর্ণ দৃশ্যও নেই। দু'ঘণ্টার নাটকটি টান টান হয়ে জমে যায় শুধু এর তীক্ষ্ন সংলাপের জন্য।

লংএকার থিয়েটারে চলছে মার্কমেডফ্-এর লেখা একটি অদ্ভুত নাটক 'চিলড্রেন অফ এ লেসার গড়'। নির্বাক ছায়াছবির মতন এটাও যেন নির্বাক নাটক। এই নাটকটি গড়ে উঠেছে মূক বধিরদের জন্য এক শিক্ষা কেন্দ্রের এক ছাত্রী ও তার শিক্ষককে নিয়ে। শিক্ষকটি কথা বলতে পারে। কিন্তু সে তার ঐ ছাত্রীর সঙ্গে কথা বলে হাতের আঙুলের ভাষায়। আমরা দর্শকরা কেউ ঐ আঙুল-ভাষা বুঝি না। তবু আস্তে আস্তে জমে ওঠে নাট্য কৌতূহল। আমরা বোবাদের জগতকে অপূর্ণ, অসমাপ্ত, অক্ষম বলে মনে করি, কিন্তু ক্রমে ক্রমে নাট্যকার দেখিয়ে দেন যে বোবাদের চোখে এই তথাকথিত সুস্থ জগতেও কত অপূর্ণতা, কত ব্যর্থতা।

আশ্চর্য, এই রকম নাটকও দর্শক টানে। পশ্চিমী দেশগুলিতে নাটক দেখা একটা উচ্চস্তরের সামাজিক কাজ। যাঁরা নিজেদের শিক্ষিত ও রুচিবান বলে মনে করেন, তারা নিয়ম করে নাটক দেখতে যান। নাটক দেখার দিনে তাঁরা বেশ যত্ন নিয়ে সাজগোজ করেন, এতে নাকি অভিনেতা-অভিনেত্রীদের প্রতি বিশেষ সম্মান জানানো হয়। এই জন্যই অনেক সিনেমা হল খালি থাকে কিন্তু যে-কোনো

ভালো নাটকের টিকিট পাওয়াই মুশকিল। নাটকের টিকিটের দামও সাঙ্ঘাতিক, খুব কম করেও তিরিশ-পঁয়তিরিশ ডলার, অর্থাৎ আমাদের টাকার হিসেবে প্রায় তিনশো-সাড়ে তিনশো টাকা। ওদের টাকার হিসেবেও যদি ধরি, তা হলেও তিরিশ-পঁয়তিরিশ টাকা দিয়ে ক'জন আমাদের দেশে থিয়েটার দেখতে যাবে?

নাটকের টিকিট কিছু সস্তায় পাবারও একটা ব্যবস্থা আছে। ব্রডওয়ে পাড়ার মাঝখানে একটা ছোট পার্কে একটা টিকিট কাউন্টার আছে। ও পাড়ার সব থিয়েটারেরই কিছু টিকিট বিক্রি হয় ঐখান থেকে, দাম অর্ধেক বা তিন চতুর্থাংশ। ভোরবেলা থেকে সেখানে লম্বা লাইন পড়ে। সঙ্ঘমিত্রা নামে একটি মেয়ের সঙ্গে আমাদের খুব ভাব হয়ে গেছে নিউইয়র্কে। নকশাল আন্দোলনের সময় কলকাতার অনেক বাবা মা চেষ্টা চরিত্র করে তাদের ছেলে মেয়েদের পাঠিয়ে দিয়েছিলেন বিলেত-আমেরিকায়। সঙ্ঘমিত্রা সেই রকমই একজন। কিছুদিন লণ্ডনে পড়াশুনো করে তারপর বেশ কিছুদিন নিউ ইয়র্কে আছে। নাটক ও চলচ্চিত্র বিষয়ে তার খুব আগ্রহ। এই সঙ্ঘমিত্রাই আমাদের ঐ সস্তায় টিকিট কাটার জায়গাটির সন্ধান দেয় এবং আমাদের সঙ্গে লাইনে দাঁড়িয়ে সে নাটক নির্বাচনেও সাহায্য করে।

টিকিটের দাম বিষয়ে একটি চমকপ্রদ সংবাদ এখানে উল্লেখ না করে পারছি না। চার্লস ডিকেন্সের নিকোলাস নিক্‌লবি উপন্যাসটির নাট্যরূপ দিয়ে একটি ব্রিটিশ দল অভিনয় করছে ব্রডওয়েতে। নাটকটি চলবে টানা সাড়ে আট ঘণ্টা এবং এর টিকিটের দাম একশো ডলার অর্থাৎ ন'শো কুড়ি টাকা। সাড়ে আট ঘণ্টা নাটক দেখার সুযোগ আর জীবনে ঘটবে না বলে বুক ঠুকে গিয়েছিলাম টিকিট কিনতে। কাউন্টারে গিয়ে শুনলুম আগামী দেড় মাস হাউস ফুল। এক মাস দশ দিন পরের একটা শো'র দু'খানা টিকিট পাওয়া যেতে পারে বটে, তাও পার্শিয়াল ভিউ, অর্থাৎ কোনো থামের আড়ালে বসে দেখতে হবে। নমস্কার ঠুকে চলে এলুম সেখান থেকে।

সবাই জানে, আমেরিকানরা সদা ব্যস্ত জাতি। অথচ তারা সাড়ে আট ঘণ্টার নাটকও ধৈর্য ধরে দেখতে জানে।

এই 'নিকোলাস নিক্‌লবি'ই কিন্তু ব্রডওয়ের দীর্ঘতম নাটক নয়। সংবাদ পত্রে এই সম্পর্কে আলোচনায় দেখলুম, কয়েক বছর আগে আর একটা নাটক হয়ে গেছে, যার নাম 'দা লাইফ অ্যাণ্ড ডেথ অফ জোসেফ স্ট্যালিন', সেটির দৈর্ঘ্য ছিল সাড়ে বারো ঘণ্টা। তার টিকিটের দাম কত ছিল কে জানে।

নিউ ইয়র্কের নাট্য আন্দোলন নানা ভাগে বিভক্ত। ব্রডওয়েতে দেখানো হয়, তথাকথিত কমার্শিয়াল নাটক। এছাড়া আছে অফ্‌-ব্রডওয়ে, অফ-অফ

ব্রডওয়ে। যেখানে চলে নানা রকম পরীক্ষা। অফ্‌-ব্রডওয়ের একটি সাড়া জাগানো নাটকের নাম সত্যাগ্রহ। নাটকটি ইংরেজীতে হলেও এর গানগুলি সব সংস্কৃত ভাষায়। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের আগে অর্জুনের দ্বিধা ও গীতার জন্ম, দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ আন্দোলন, মার্টিন লুথার কিং-এর অহিংস প্রতিরোধ ইত্যাদি নিয়ে গড়ে উঠেছে নাটকটি। টিকিট সংগ্রহের ঝঞ্ঝাটে নাটকটি শেষ পর্যন্ত আমার দেখা হয়ে উঠলো না। তবে যামিনীদার মুখে শুনেছি এর সঙ্গীতের প্রয়োগ নাকি অপূর্ব।

ব্রডওয়ের পেশাদারি দলের নাটকগুলি দর্শক টানে জমজমাট অভিনয় দিয়ে এবং প্রোডাকশনের চাকচিক্যে। নাটকগুলির বিষয়বস্তুও বিচিত্র ধরনের। যেমন একটি নাটকের নাম 'টেক্‌সাসের শ্রেষ্ঠ ছোট্ট বেশ্যালয়', আবার আর একটি নাটকের নাম 'ইভিটা'। এর মধ্যে প্রথমটি দেখার সুযোগ আমার হয়নি, দ্বিতীয়টি দেখেছি। তার বিষয়বস্তুই অভিনব। ইভাপেরন-এর নায়িকা, যিনি নিজেও পরে কিছুদিনের জন্য রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন। সামান্য নিচু অবস্থায় থেকে এক মহিলার উত্থানের কাহিনীই এর উপজীব্য, এর মধ্যে এসেছে দক্ষিণ আমেরিকার সেই দেশটির জন জাগরণ ও বিপ্লব-উত্থান। সেগুলি মাঝে মাঝে দেখানো হয়েছে টুকরো টুকরো চলচ্চিত্রে, অনেকটা ডকুমেন্টরির কায়দায়। নাটকটি দেখতে দেখতে মনে হয়েছিল, এই যদি পেশাদারী নাটক হয়, তা হলে আমাদের দেশের শৌখিন নাটক অনেক পিছনে পড়ে আছে।

থিয়েটার হলগুলি তাদের প্রাচীনত্ব যথাযথ বজায় রাখবার খুব চেষ্টা করে। আধুনিক সিনেমা হলগুলিতে অনেক রকম কায়দা, কিন্তু থিয়েটার হল যেন এখনো পঞ্চাশ বা এক শো বছর পুরোনো অবস্থায় রয়ে গেছে। এরা সহজে ঐতিহ্য বদলাতে চায় না। তবে এই ধরনের প্রাচীন চেহারার মঞ্চ ও অডিটোরিয়মেও ইনফ্রারেড লিসনিং সিস্টেম চালু করা হয়েছে, যার জন্য মঞ্চে মাইক্রোফোন ঝুলতে দেখা যায় না, আর যে-কোনো জায়গায় বসলেই কুশী-লবদের কণ্ঠস্বর একই রকম শুনতে পাওয়া যায়।

ব্রডওয়ের আসল কৃতিত্ব তার মিউজিক্যালসগুলিতে। এমন সুচারু ও দক্ষ মিউজিক্যালস আর কোন দেশে দেখা যায় না। আমি আর যে সব নাটক দেখেছি, তার মধ্যে এরকম একটি মিউজিক্যালের কথা বলি। নাটকটির নাম 'কোরাস লাইন' অসম্ভব জনপ্রিয় এবং অনেকগুলি পুরস্কার পেয়েছে। এর বিষয়বস্তু খুব সামান্য। একটি নাটকের কোরাস নাচ-গানের দৃশ্যের জন্য কয়েকজন নতুন অভিনেতা-অভিনেত্রী নেওয়া হবে। এর জন্য দরখাস্ত পড়েছে অসংখ্য, তার মধ্যে থেকে চল্লিশ-পঞ্চাশ জন ছেলে মেয়েকে ডেকে ইন্টারভিউ

নেওয়া হচ্ছে। এইটুকুই গল্প। কত সামান্য এই চাকরি, তার জন্যই দেশের দূর-দূরান্ত থেকে এসেছে যুবক-যুবতীরা, কেউ কেউ অসাধারণ রূপসী ও রূপবান, কেউ এসেছে বাড়ি থেকে পালিয়ে, কেউ এসেছে খুবই গরীব ঘর থেকে, কেউ কেউ এসেছে ভবিষ্যতে নায়ক বা নায়িকা হবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিয়ে,কেউ এসেছে অসুখী সংসার থেকে মুক্তি পাবার জন্য। এসেছে একটি জাপানী মেয়ে, দু'তিনটি কৃষ্ণাঙ্গ ছেলে-মেয়ে। পঞ্চাশ জনের মধ্যে নেওয়া হবে মাত্র চার পাঁচ জনকে, কে কে হবে সেই সৌভাগ্যবান ও সৌভাগ্যবতী তা নিয়ে উৎকণ্ঠা থেকে যায় আগাগোড়া, পরীক্ষকের কাছে কেউ কেউ আপ্রাণ ভাবে নেচে কুদে গেয়ে তাদের প্রতিভা প্রমাণের চেষ্টা করে, কেউ হঠাৎ নার্ভাস হয়ে পড়ে। এরই মধ্যে ফুটে ওঠে তাদের জীবনের রেখাচিত্র। সমস্ত সংলাপই গানে। নাটকটি দেখতে দেখতে ধন্য ধন্য করতে হয় এর পরিচালককে, যিনি এতগুলি নামহীন চরিত্রের প্রত্যেকেই জীবন্ত করে তুলতে পেরেছেন।

এই প্রসঙ্গ শেষ করার আগে আর একটি খবর দেবার লোভ সংবরণ করতে পারছি না। ইংরাজিতে যাঁদের বলে 'ফিল্‌ম বাফ্‌' আর বাংলায় বলে 'সিনেমা আঁতেল' তাঁরা নিশ্চয়ই ক্লদেৎ কোলবার্টের নাম শুনেছেন। নির্বাক চলচ্চিত্র যুগে তিনি ছিলেন খুব নাম করা নায়িকা। সবাক যুগেও কয়েকটি ছবিতে অভিনয় করে তিনি হারিয়ে যান। ক্লদেৎ কোলবার্ট বেঁচে আছেন কি না তা-ই জানে না এখন অনেকে। সেই ক্লদেৎ কোলবার্ট এক কাণ্ড ঘটিয়েছেন। ইনি মঞ্চেও প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী ছিলেন, ব্রডওয়েতে প্রথম মঞ্চ নাটকে নায়িকা হন ১৯২৭ সালে। তাহলেই ভাবুন, এর এখন কত বয়স হতে পারে। সেই ক্লদেৎ কোলবার্ট এতদিন বাদে 'আ ট্যালেন্ট ফর মার্ডার' নাটকে নেমে অভিনয়ের জোরে হৈ হৈ ফেলে দিয়েছেন। প্রতিদিন সে নাটক হাউস ফুল। এই রকমই আর একজন লরিন বাক্‌কল ছিলেন আগেকার দিনের নায়িকা, ক্যাসাব্লাঙ্কা ছবিতে অপূর্ব অভিনয় করেছিলেন, ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন হামফ্রি বোগার্টের স্ত্রী। সেই হামফ্রি বোগার্ট কবে মারা গেছেন, সেই সব সিনেমার যুগও কবে শেষ হয়ে গেছে, তবু নতুন ভাবে মঞ্চে নেমে লরিন বাক্‌কল এখন জনপ্রিয় নায়িকা। অনুমান করুন তো, আমাদের চন্দ্রাবতী দেবী বা কানন দেবী কোন নাটকের নায়িকা হয়েছেন, আর সেই নাটক দেখার জন্য কলকাতার লোক রোজ ছুটে যাচ্ছে!

॥ ৩১ ॥

এক জনের নাম শক্তি, অন্য জনের নাম ধ্রুব। এঁরা দু'জনে বেশ বন্ধু, কিন্তু

সম্প্রতি একটা ব্যাপারে দু'জনে রয়েছেন দুই বিপরীত মেরুতে। শক্তি অনেকদিন 'ফরেন'-এ কাটাবার পর এক সময় ভাবলেন, যথেষ্ট হয়েছে। কলকাতার টানে, বাড়ির লোকজনের টানে, এবং হয়তো দেশের টানে তিনি একদিন আমেরিকা ছেড়ে ফিরে গেলেন কলকাতায়। চাকরি পেতেও অসুবিধে হয়নি। কিন্তু একবছর থাকবার পর ফিরে এসেছেন। নিউ ইয়র্কের বাঙালী মহলে এখন শক্তিই প্রধান আলোচ্য বিষয়। একজন আরেকজনের সঙ্গে দেখা হলেই বলে ওঠে, জানো, শক্তি ফিরে এসেছে? এর অবধারিত উত্তরটি শোনা যায়, জানতুম, আসতেই হবে!

নিউ ইয়র্ক শহরের উপকণ্ঠেই নিউ জার্সি। সেখানকার বাঙালীদের একটি ক্লাব আছে। সেই ক্লাবের কয়েকজন সদস্য এক সন্ধেবেলা আমাকে ডেকেছিলেন আড্ডা মারার জন্য। নিউ জার্সিতে অনেক বাঙালী। একজনের বাড়িতে কাঁচা লঙ্কা ফুরিয়ে গেলে প্রতিবেশী বাঙালীর বাড়ি থেকে চেয়ে আনা যায়। সেই আড্ডাতেই দেখা হলো শক্তি ও ধ্রুবর সঙ্গে। শক্তিকে নিয়েই আলোচনা চললো অনেকক্ষণ। আমি একবার জিজ্ঞেস করলুম, থাকতে পারলেন না? কী অসুবিধে হলো? শক্তি একটু লাজুক হেসে বললেন, নাঃ! কিছুতেই পারা গেল না! ট্রাম-বাসের ভিড়, মশা, লোডশেডিং এসবও আমি গ্রাহ্য করিনি, কিন্তু অফিসের পরিবেশটাই এমন যে টেঁকা যায় না।

আমেরিকায় চাকরি করার যোগ্যতা হিসেবে সরকারের কাছ থেকে গ্রীন কার্ড পাওয়া যায়। সেই গ্রীন কার্ড যারা পেয়েছে, তারা এক বছর দু'বছর অনুপস্থিত থাকলেও ফিরে এসে আবার চাকরি পেতে পারে। তাই শক্তির কোনো অসুবিধে হবে না এখানে।

পাশেই বসে আছেন ধ্রুব। তাঁর সুঠাম, বলিষ্ঠ চেহারা। চিবুকে দৃঢ়তার ছাপ আছে। ধ্রুব এখানে ভালো চাকরি করেন, বেশ সচ্ছল অবস্থা, তবু তিনি হঠাৎ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে সব ছেড়েছুড়ে তিনি দেশে ফিরে যাবেন। তাঁর পরিচিত বন্ধুবান্ধবরা শুধু যে অবাক হয়েছে তাই-ই নয়, সবাই শক্তির দৃষ্টান্ত দিয়ে বলছে, এতেও তোমার শিক্ষা হলো না? তুমিও সেই একই ভুল করবে? কেউ বা ঠাট্টা করে বলে, যাক্ না, গোঁয়ারের মতন যেতে চাইছে যাক। জানি তো বছর ঘুরতে না ঘুরতেই আবার দৌড়ে ফিরে আসবে।

ধ্রুব কিন্তু দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। অবহেলার সঙ্গে বললেন, আমায় ওসব কথা বলে কোনো লাভ নেই। আমি অনেক ভেবে চিন্তেই যাচ্ছি। গ্রীন কার্ড ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে যাবো। আমি বুড়ো বয়েসে একা একা সেন্ট্রাল পার্কে ঘুরে বেড়াবো না!

আমার দিকে ফিরে ধ্রুব জিজ্ঞেস করলেন, আপনি বলুন তো, আমি দেশে

গিয়ে থাকতে পারবো না ?

আমি আমতা আমতা করলুম। এই সব সিদ্ধান্ত এমনই ব্যক্তিগত যে অন্যের পরামর্শ কোনো কাজে লাগে না।

আড্ডা হচ্ছিল যাঁর বাড়িতে, তাঁর নাম ভবানী মুখার্জি, বেশ সুপুরুষ ও সুরসিক যুবা। এই ভবানীর সঙ্গে আমার আগে পরিচয় ছিল না। কিন্তু কথায় কথায় বেরিয়ে পড়লো যে ওঁর দাদা নারায়ণ মুখার্জি আমার অনেকদিনের চেনা। নারায়ণকে আমরা কলকাতায় ফরাসীভাষাবিদ বলে জানি। ওঁদের ছোট ভাই, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত গায়ক পিনাকী মুখার্জির কথাও অনেক শুনেছি। একবার এই রকম চেনাশুনো বেরিয়ে পড়লেই কথাবার্তা অনেক সহজ হয়ে যায়।

ভবানীর স্ত্রীর নাম আলোলিকা, এঁর রূপ ও ব্যবহারের মধ্যে বেশ একটা সঙ্গতি আছে। খুবই সুশ্রী ও কোমল। ইনি একজন লেখিকা এবং এখানকার বাচ্চাদের নিয়ে নাচ-গান ও নাটক করান। এঁদের বাড়ির পরিবেশটি চমৎকার। এসেছেন আরও কয়েকজন।

রাত্রি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আড্ডা বেশ জমতে লাগলো। তবে প্রায়ই ঘুরে ঘুরে প্রসঙ্গ উঠতে লাগলো শক্তি আর ধ্রুবের প্রত্যাবর্তন ও প্রস্থানের ব্যাপারটা। শক্তির মুখে খানিকটা লজ্জিত অস্বস্তির ভাব আর ধ্রুব'র মুখে জেদ।

উত্তমকুমারের মার্কিন দেশ সফর নিয়ে অনেক মজার মজার গল্প বলছিলেন ভবানী। এঁদের সকলের কথা থেকেই একটা জিনিস ফুটে উঠছিল যে উত্তমকুমারের ভদ্র ব্যবহারে সবাই মুগ্ধ হয়েছেন। কোনো চিত্র তারকার কাছ থেকে এ রকম ব্যবহার যেন আশা করা যায় না।

কথায় কথায় ভবানী আমায় জিজ্ঞেস করলেন যে, উত্তমকুমার তো এখান থেকে নায়েগ্রা ফলস্ দেখতে গিয়েছিলেন, আপনি যাবেন না ?

আমি বললুম, নায়েগ্রা বোধহয় এমনিতে এমন কিছু দ্রষ্টব্য স্থান নয়। তবে উত্তমকুমার যখন দেখেছেন, তখন নিশ্চয়ই আমারও দেখা উচিত !

ভবানী সঙ্গে সঙ্গে বললেন, তা হলে আমার বোন ওখানে থাকে, আপনি ওখানেই উঠবেন।

আলোলিকা বললেন, আমি এক্ষুনি টুনুকে ফোন করে দিচ্ছি।

আমি বললুম, না, না, এক্ষুনি দরকার নেই। কবে যাবো, তার ঠিক নেই।

—আপনি কবে কোথায় যাবেন, এখনো কিছু প্ল্যান করেননি ?

আমি বললুম, ঐ একটা জিনিসই করা হয়ে ওঠেনি।

এবারে ধ্রুব জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কাল কী করছেন ?

আমি বললাম, জানি না তো !

ধ্রুব বললেন, আমার কম্পানি আমাকে নতুন গাড়ি দিয়েছে। আমার তেলের খরচ লাগে না। কাল আমার কোনো কাজ নেই। আপনি কাল যদি কোথাও বেড়াতে যেতে চান, নিয়ে যেতে পারি।

আমি বললুম, এ যে আকাশ থেকে একটা হীরের টুকরো খসে পড়ার মতন প্রস্তাব। কিন্তু কোথায় যাওয়া হবে ?

—আপনি আটলান্টিক সিটিতে গেছেন কখনো ?

—আমি আটলান্টিক সিটির নামই শুনিনি। সেখানে কী আছে ?

—চলুন, ভালো লাগবে ?

তক্ষুনি প্রোগ্রাম হয়ে গেল। অনেকেই বেড়াতে যাবার ব্যাপারে আগ্রহী। কিন্তু সপ্তাহের মাঝখানে কাজের দিন বলে অনেকেরই অসুবিধে। ভবানী যেতে পারবেন না, তাঁর অফিসের কাজ আছে। কিন্তু আলোলিকার খুব আগ্রহ।

কে যেন একজন বললেন, ধ্রুবর সঙ্গে যাচ্ছেন, খুব, সাবধান। ও কিন্তু গাড়ির ড্যাসবোর্ডে রিভলবার রাখে।

ধ্রুব বললেন, এখনো রাখিনি, তবে রাখবার ইচ্ছে আছে। আমায় এদেশে কেউ অপমান করলে আমি তাকে ছাড়বো না।

সে রাত্রে বাড়িতে ফিরে মনটা খুব ভালো হয়ে গেল। নায়েগ্রা যাবার কোনো পরিকল্পনা ছিল না। অথচ একটা ব্যবস্থা হয়ে গেল কত সহজে। সদ্য পরিচিত একজন গাড়িতে আটলান্টিক সিটি নিয়ে যাবার প্রস্তাব দিল। একেই আমাদের ভাষায় বলে পূর্বজন্মের সুকৃতির ফল। সাহেবরা পূর্ব জন্ম মানে না, তবু তারাও এরকম কোনো ব্যাপার বিশ্বাস করে। সাউণ্ড অফ মিউজিকে জুলি অ্যান্ড্রুজ একটা গান গেয়েছিল, আমার অল্প বয়েসে নিশ্চয়ই আমি কোনো ভালো কাজ করেছিলুম, এখন তার ফল পেলুম।

পরের দিন আমাদের গাড়িতে যাত্রী সংখ্যা একটু বেড়ে গেল। অম্বুজ মুখার্জির বাড়িতে প্রীতি নামে যে মেয়েটির সঙ্গে আলাপ হয়েছিল সে যেতে চায়। এবং তার সঙ্গে ছোট্টিমা নামে তার এক বান্ধবী। এই ছোট্টিমা বাঙালী মেয়ে, মুখচোরা স্বভাবের। এবং আলোলিকা তো আছেনই।

মহিলারা বসলেন পেছনে আমি আর ধ্রুব সামনে। ধ্রুবর পুরো নাম ধ্রুব কুণ্ডু। তার ব্যবহারে বেশ একটা বনেদীয়ানা আছে, কথার মধ্যে আত্মপ্রত্যয়ের সুর। যাবার পথে একটা গ্যাস স্টেশনে ঢুকে সে বললো ট্যাঙ্ক ভর্তি করে দিতে। কী একটা কারণে অ্যাটেনড্যান্ট একটু দেরি করছিল, ধ্রুব গাড়ি থেকে নেমে তাঁকে প্রচণ্ড এক ধমক লাগালেন। বাঙালী হয়েও তাঁর এত সাহস যে সাহেবদের দেশে তিনি সাহেব জাতিকে এমন ধমক দিতে পারেন। ধ্রুব এ দেশে আছেন পুরো

ডাঁটের সঙ্গে, তিনি এদেশ ছেড়ে যাচ্ছেন স্বেচ্ছায়।

এক সময় ধ্রুব আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা, আমার তো এদেশে কোনো কিছুরই অভাব নেই, তবু আমি দেশে ফিরে যেতে চাই কেন বলুন তো ?

আমি বললুম, অনেকের কাছে বন্ধুবান্ধব, কলকাতার নিজস্ব আড্ডার টানই বেশী মনে হয় বোধহয়—

—ঠিক তা-ও নয়, আমার অনেক বন্ধু বান্ধব এ দেশে। ইন ফ্যাকট আমাদের ব্যাচের অনেক ছেলেই এদেশে চলে এসেছে। এদেশে আড্ডা দেবারও কোনো অসুবিধে নেই।

—তা হলে কেন যাচ্ছেন। আপনিই বলুন !

—যাচ্ছি, আমার যেতে ইচ্ছে করছে বলে। আমি জানি, আর বেশীদিন থাকলে, ফেরা যাবে না। এখানে শেকড় গজিয়ে যাবে !

নিউ ইয়র্ক শহর থেকে আটলান্টিক সিটি শ দেড়েক মাইল দূর। প্রশস্ত, নতুন রাস্তা। আড়াই ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে গেলুম। শহরে ঢুকবার মুখেই বাতাসে পেলুম সামুদ্রিক গন্ধ। শহরটি একেবারে সমুদ্রের ওপরেই। আগে এখানে ছোটখাটো শহর ছিল, এখন সেটিকে ঢেলে সাজানো হচ্ছে। এখানে তৈরি হচ্ছে বিরাট একটি জুয়া খেলা ও প্রমোদ কেন্দ্র।

আমেরিকার পশ্চিম দিকে লাস্ ভেগাস জুয়া ও ফুর্তির জন্য জগৎবিখ্যাত। পূর্বদিকে সে রকম কিছু ছিল না। সেই অভাব পূরণ করার জন্যই গড়ে তোলা হচ্ছে আটলান্টিক সিটিকে। এখন সব বাড়িগুলো সম্পূর্ণ হয়নি। তবে যা হয়েছে তা-ই এলাহী জগঝম্প ব্যাপার। এক একটা হলের মধ্যে অন্তত দু'তিন হাজার লোক এক সঙ্গে বসে জুয়া খেলতে পারে। শুধু একতলায় নয়। অনবরত এসকেলেটর চলছে, তা দিয়ে ওপরে উঠে গেলে দোতলা তিনতলাতেও প্রায় একই ব্যাপার। এ রকম পরপর অনেকগুলো বাড়ি। জুয়া খেলার পদ্ধতিও আছে নানারকম, মেশিন-জুয়া, ব্ল্যাক-জ্যাক, রুলেৎ, ডাইস, তাস। শনি-রবিবারেই এখানে ভিড় বেশী হয়। আমরা এসেছি সপ্তাহের মাঝখানে, তাও লোক কম নয়। তবে অধিকাংশই বুড়ো-বুড়ি, এবং বুড়ির সংখ্যাই বেশী। জুয়াড়ী বুড়ি মানেই পাগলিনীর মতন চেহারা। এক সঙ্গে হাজার হাজার উন্মাদিনী দেখাও একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা।

আমরা তো খেলতে আসিনি, আমরা দেখতে এসেছি। দেখার জিনিসও অনেক আছে। রয়েছে নীল জল বিধৌত চমৎকার বেলাভূমি, অনেক নাচ-গানের আসর। উপহার দ্রব্যের অনেক দোকান।

নিছক লঘু কৌতুকেই আমি বললুম, একবার একটু চেষ্টা করে দেখিই না।

নতুন খেলুড়েদের পক্ষে মেশিনই প্রশস্ত। অনেক রকম মেশিন আছে, কোনোটায় পাঁচ পয়সা ফেলতে হয়,কোনোটায় দশ পয়সা, কোনোটাতে সিকি, কোনোটাতে টাকা। আমি একটা খালি মতন মেশিন দেখে তাতে একটা কোয়ার্টার অর্থাৎ সিকি ফেললুম। তারপর একটা অলৌকিক কাণ্ড হলো। মেশিনটায় ঝকঝকাং শব্দ হতে হতে অনবরত পয়সা পড়তে লাগলো নিচে। পড়ছে তো পড়ছেই। মেশিনটা খারাপ হয়ে গেল নাকি ! পয়সার একটা স্তূপ জমে যাবার পর মেশিনটা থামলো।

ধ্রুব বললেন, আপনি একশোটা পেয়েছেন।

একটা সিকির বদলে একশো ? এ যে সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার। চার আনা দিয়ে পঁচিশ টাকা। সেই স্তূপ থেকে একটা সিকি তুলে নিয়ে আমি ফেললুম পাসের মেশিনটায়।

আবার সেই একই ব্যাপার। ঝকাং ঝকাং শব্দ ও পয়সা বর্ষণ। আবার একশো সিকি।

আমার বুক ধড়াস ধড়াস করছে।

আলোলিকা বললেন, বিগিনার্স লাক। আপনি আর খেলবেন না।

কথাটা আমার মোটেই পছন্দ হলো না। মেশিনের কি চোখ আছে না মন আছে যে বুঝতে পারবে আমি নতুন খেলতে এসেছি ? আজ আমার ভাগ্য ফেরাবার দিন।

কিন্তু এত খুচরো পয়সা নেবো কী করে ? কোটের পকেটেও তো রাখা যাবে না।

মাঝে মাঝে এক এক জায়গায় শক্ত কাগজের গেলাশ রাখা আছে। সেখান থেকে একটা গেলাশ এনে ধ্রুব আমাকে বললেন, পয়সাগুলো এতে ভরে নিন। কাছেই কাউণ্টার আছে, আপনি খুচরো বদলে টাকা করে আনতে পারেন।

কিন্তু ততক্ষণে আর একটা মেশিনের দিকে আমার চোখ পড়ে গেছে। তাতে লেখা পাঁচটা সিকি এক সঙ্গে দিলে পাঁচ হাজার পাওয়া যাবে।

গেলাশটা নিয়ে গিয়ে সেই মেশিনে পাঁচটা সিকি ফেলে উত্তেজনায় কাঁপতে লাগলুম। মেশিনটা নিঃশব্দ রইলো। বেমালুম হজম করে ফেললো। আবার ফেললুম পাঁচটা, আবার সেই একই ব্যাপার। তা হলে আমার পাঁচ হাজারের জন্য আর লোভ করা উচিত নয়।

তার পাশের মেশিনটাতেই অন্য প্রলোভন। এখানে এক ডলার ফেললে পাঁচ হাজার ডলার পর্যন্ত আসবে। এ তো সুবর্ণ সুযোগ। একবার পাঁচ হাজার ডলার পেলেই আমার অনেক সমস্যা মিটে যায়। আরও কত জায়গায় নিশ্চিন্তে

বেড়াতে পারবো।

সিকিগুলো সব বদলে টাকা করে নিয়ে এলুম।

এই ডলার মেশিনটাও টপ টপ টাকা খেয়ে ফেলে। কোনো শব্দ করে না। আমি মনে মনে হিসেব করলুম, যদি পঞ্চাশ ডলার ফেলেও পাঁচ হাজার ডলার পাই, তাতেও তো আমার দারুণ লাভ। পঞ্চাশ বারের মধ্যে আমার ভাগ্য ফিরবে না? তার মধ্যে মেশিনের একবার না একবার দয়া হবে নিশ্চয়ই।

পঞ্চাশ ডলার ফেলতে আমার পনোরো মিনিটও লাগলো না। এ মেশিন মহা পেটুক। কিছু বার করে না। আমার সঙ্গের মহিলারা আমায় অনবরত বারণ করে চলেছেন। আমি কর্ণপাত করছি না। পাঁচ হাজার ডলারের দাম যে আমার মতন বেকারের কাছে কতখানি তা ওরা কী বুঝবে!

এই সময় এক বৃদ্ধ আমার কাঁধে হাত দিয়ে বললেন, ওহে ছোকরা, এক মেশিনে বেশিক্ষণ খেললে লাক নষ্ট হয়ে যায়। মেশিন পাল্টে পাল্টে খেলতে হয়।

সেই শুনে আমি যেই সেখান থেকে সরে গেলুম, অমনি সেখানে সেই বৃদ্ধটি ডলার ফেলতে লাগলো। তিনবার ফেলার পরই মেশিন শুরু করলো ঝকাং ঝকাং আওয়াজ ও ডলার বৃষ্টি। আমি হাঁ। আর তিনবার ফেললে ঐ টাকা তো আমারই ভাগ্যে ছিল।

পাঁচ হাজার নয় অবশ্য, সেই বৃদ্ধ পেল পাঁচশো ডলার। কাঁটাটা কোথায় যায় তার ওপর নির্ভর করে কত টাকা পড়বে। পাঁচশো, টাকা কুড়িয়ে নিতে নিতে বৃদ্ধটি আমার দিকে চেয়ে একখানা দুষ্টুমির হাসি হাসলো।

আমার তখন মাথায় রক্ত চড়ে গেছে। আমি খেলতে লাগলুম একটা ছেড়ে আর একটা মেশিনে। তারপর রুলেৎ খেলায়। তারপর তাসের বাজিতে। আমার পকেটে নিজের যা ছিল তাও নিঃশেষ। আমি মেয়েদের কাছে ধার দেবার জন্য ঝুলোঝুলি করতে লাগলুম।

ওরা না, না করতে লাগলো সমস্বরে। প্রীতি বললো, কত সুন্দর সুন্দর মেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আপনি তাদের পর্যন্ত দেখছেন না। এত খেলার নেশা?

আমি রক্তচক্ষে বললুম, টাকা দেবে কিনা বলো!

ধ্রুব কিছুই না বলে মুচকি মুচকি হাসছেন আর মাঝে মাঝে নিজেও খেলে যাচ্ছেন এখানে সেখানে। ধ্রুবর ঠিক করাই আছে ঠিক পঁচিশ ডলার খেলবেন, তাতে হার জিৎ যাই হোক।

শেষ পর্যন্ত মেয়েরা আমাকে প্রায় জোর করেই টেনে নিয়ে এলেন বাইরে।

প্রীতি আমাকে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বললো, কী হয়েছিল আপনার?

শূন্য পকেটে হাত ঢুকিয়ে আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললুম, আমি সত্যিই পাগল হয়ে গিয়েছিলুম, তাই না!

॥ ৩২ ॥

শীত বেশ জাঁকিয়ে পড়েছে, এর মধ্যে দু'দিন তুষারপাত হয়ে গেল। পাতলা কোটে আর চলছে না, এবার আমার একটা ওভারকোট দরকার।

বঙ্গ সন্তানের পক্ষে ওভারকোট একটা অত্যুক্তি বিশেষ। কিংবা অবাস্তব জিনিসও বলা যায়। দু' মাস ছ' মাসের জন্য কলকাতা থেকে যারা পশ্চিম গোলার্ধে বেড়াতে যায়, তারাসাধারণতচেনা-শুনো, বন্ধু-বান্ধবের কাছ থেকে ধার নিয়ে আসে। আমার সে সুযোগ ঘটেনি। খুব একটা চেষ্টাও করিনি, কারণ আমি এদেশে এসেছি ঘোর গ্রীষ্মে, কলকাতা থেকে ওভারকোট নিয়ে এলে সারা গ্রীষ্ম ও শরৎকাল আমাকে অকারণে সেই বোঝা বইতে হতো।

সুতরাং আমাকে একটা ওভারকোট কিনতে হবে।

একটা ভদ্রগোছের গরম কাপড়ের ওভারকোটের দাম অন্তত আড়াই শো ডলার। এছাড়া সিনথেটিক জিনিসের হাওয়া বন্ধ-করা, শীত জব্দ-করা একরকমের জ্যাকেট পাওয়া যায় কিছু সস্তায়। সেগুলোতেও কাজ চলে বটে, কিন্তু কাউ বয়, মোটর রেসিং-এর চাম্পিয়ন কিংবা ব্যাঙ্ক-ডাকাতদের মতন যাদের চেহারা তাদের গায়েই ঐ জিনিস মানায়। আমি ঐ রকম জ্যাকেট পরলে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেই হাসবো।

অতএব আমি একটা ওভারকোট কিনে ফেললুম। সেটা দেখতে বেশ জমকালো ও প্রথাসম্মত। প্রথম প্রথম অনেকেই দেখে বলত, এই ওভারকোটটা নতুন কিনলে বুঝি? বাঃ, বেশ সুন্দর দেখতে তো! কাপড়টাও বেশ ভালো। যথেষ্ট গরম হয়, তাই না?

আমি যদি বলতুম, নিউ ইয়র্ক তথা আমেরিকার সর্বশ্রেষ্ঠ দোকান (কেউ কেউ বলে সারা পৃথিবীরও) মেসি থেকে তিনশো ছিয়াত্তর ডলার দিয়ে এটা কিনেছি, তা হলে বোধহয় কেউ অবিশ্বাস করতো না এখানে। কিন্তু কলকাতায় আমার বন্ধু-বান্ধবরা ঠিক ধরে ফেলতো। তারা ভুরু তুলে বলতো, এঃ! তুই দু পয়সার খদ্দের, তুই কিনেছিস পৌনে চারশো ডলার দিয়ে ওভারকোট। বললেই হলো।

আসলে, আমি ঐ চমৎকার ওভারকোটটা কিনেছি মাত্র দশ ডলার দিয়ে। কী করে অত সস্তায় পেলুম, সে রহস্য আমি একটু পরেই খুলে বলছি।

এ দেশে দোকানের নাম নিয়ে চাল মারার খুব রেওয়াজ আছে। কারুর

বাড়িতে নতুন কোনো জিনিস দেখলেই সেটা কোন্ দোকান থেকে কেনা সেটাও শুনিয়ে দেবে। অর্থাৎ কোনো বিখ্যাত দোকান। জিনিসের দামও দোকান অনুযায়ী বদলায়। প্রায় একই জিনিস কোনো সাধারণ দোকানে যা দাম, বিখ্যাত দোকানে দাম তার দ্বিগুণ। মেয়েরা এই সব বিখ্যাত দোকানগুলোর দাম খুব মুখস্থ রাখে। আবার বেশ সস্তারও দোকান আছে যেমন, কে-মার্ট। এই কে-মার্ট দোকান এদেশের প্রায় প্রত্যেক শহরেই একটা করে আছে। এই সব দোকানে জুতোর ফিতে থেকে টি ভি রেফ্রিজারেটার সবই পাওয়া যায়। দাম এমনিতেই সস্তা তারপর প্রায়ই লেগে থাকে 'সেল'। 'সেল'-এর সময় জিনিসের দাম অর্ধেকও কমে যায়। সেই জন্যই হিসেবী গৃহিণীরা প্রায়ই সন্ধের দিকে একবার কে-মার্ট ঘুরে যায়। কোন্ দিন কোন্ জিনিসের 'সেল' দিচ্ছে দেখবার জন্য। ক্যালিফোর্ণিয়ার মোহিতেশ ব্যানার্জি বলেছিলেন, কে-মার্ট হলো বাঙালী মেয়েদের নাইট ক্লাব।'

আমি কিন্তু আমার ওভারকোটটা কে-মার্ট থেকেও কিনিনি। কারণ কে-মার্টেও সস্তার একটা সীমা আছে, সেখানে তিনশো ডলারের জিনিস দেড়শো ডলারে দিতে পারে বড় জোর, দশ ডলারে তো দেবে না!

আরও এক রকমের দোকান আছে, যেগুলোর নাম বাজেট স্টোর, নেক্স্ট টু নিউ, সেকেণ্ডস, ব্যাগ-স্টক এই ধরনের। এই সব দোকানে ছাত্র ছাত্রীরাই বেশী যায়, আর মধ্যবিত্তরা সেখানে যায় লুকিয়ে, ঘোর দুপুরবেলা, যখন অন্য কেউ দেখবে না। আর ভারতীয়রা তো অতি মাত্রায় হিপোক্রিট, তারা মরলেও স্বীকার করবে না যে কেউ কোনোদিন ঐ সব দোকান থেকে জিনিস কিনেছে। সেই হিসেবে আমিই বোধহয় প্রথম ভারতীয় যে ঐ রকম দোকানের ক্রেতা হলো। সোজা বাংলায় ওগুলো হলো সেকেণ্ড হ্যাণ্ড জিনিসের দোকান।

সেরকম একটি বাজেট স্টোরে ঢুকে আমার তো চোখ ছানাবড়া হবার উপক্রম। কত রকমের জিনিস, আর দাম কি অবিশ্বাস্য সস্তা! একটা সিল্কের সার্টের দাম দু' ডলার, একটা লিভাইজ জিনস্-এর দাম তিন ডলার, পাঁচ ডলারে একটা জ্যাকেট। দশ ডলারের একটা বইয়ের দাম এক সিকি, একজোড়া বরফের জুতোর দাম দেড় টাকা। ইচ্ছে হয় সব কিছু কিনে নিই।

সব জিনিস্ই যে ব্যবহৃত তা নয়। কিছু কিছু জিনিস নতুনও আছে। যে-সব পোশাকের ফ্যাসান বদলে গেছে, অনেক বড় দোকান সেইসব পোশাক লট ধরে জলের দরে বিক্রি করে দেয়। যেমন ধরা যাক, হাত কাটা, সামনে-খোলা সোয়েটার, এর আর ফ্যাসান নেই ইদানীং, বড় বড় রাস্তার নাম করা সব দোকানে মাথা খুঁড়লেও সেরকম সোয়েটার খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু বাজেট স্টোরে

সেই রকম সোয়েটার সারি সারি ঝুলছে।

অনেক পরিবার তাদের বাড়ির অব্যবহৃত জিনিসপত্র স্যালভেশান আর্মিকে দান করে দেয়। যেমন, কোনো মহিলার স্বামী তাকে ছেড়ে শহরের অন্য প্রান্তে অন্য একটি মেয়ের সঙ্গে বসবাস করছে কিংবা কোনো ভদ্রলোকের স্ত্রী তাকে ছেড়ে চলে গিয়ে সিনেমার অভিনেত্রী হয়েছে, এই সব প্রাক্তন স্বামী বা স্ত্রীর জামা কাপড় এরা জমিয়ে রাখে না বেশী দিন, বিক্রিও করে না, দান করে দেয় কোনো সেবা প্রতিষ্ঠানকে। এরা যখন গৃহত্যাগ করে, তখন সব জিনিসপত্র নিয়ে যায় না, শুধু গয়না-গাঁটি আর দু'একটা জরুরি পোশাক একটা ছোট সুটকেসে ভরে বেরিয়ে যায়। সেবা প্রতিষ্ঠানগুলি সেইসব বিনা পয়সায় পাওয়া জিনিসগুলো এই সব দোকান মারফৎ বিক্রি করে। স্বাস্থ্য ব্যাপারে খুঁতখুঁতে বলে আগে এরা ভালোভাবে সব কিছু জীবানুমুক্ত করে নেয়। ঘন ঘন ফ্যাসান বদলাবার কারণে বাতিল জামা কাপড়ের সংখ্যা এত বেশী, তাই দামও এরকম সস্তা।

অপরের ব্যবহৃত রুমাল বা অন্তর্বাস ব্যবহার করা সম্পর্কে আমার আপত্তি আছে নিশ্চয়ই, কিন্তু অন্যের ব্যবহার করা ওভারকোট গায়ে দেওয়ার ব্যাপারে আমার কোনো শুচিবাই নেই। আমেরিকার একজন বিখ্যাত কবি একবার আমার ব্যবহৃত টুথ ব্রাশ দিয়ে দিব্যি অবলীলাক্রমে দাঁত মেজেছিলেন। এটা আমাদের কাছে অকল্পনীয়। কিন্তু সেই কবি বলেছিলেন, ভালো করে ধুয়ে নিলে সব কিছুই নাকি ব্যবহারযোগ্য হয়।

আমাকে বাজেট স্টোরে চিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিল উরুগুয়ের এক লেখক বন্ধু। তার নাম পেপে। পেপে অতি সুসজ্জিত ও সুপুরুষ। সে একগাদা জামা-প্যান্ট-কোট কিনে ফেললো। তিনটে বেশ বড় বোঁচকা হয়ে গেল। আমি পেপে-কে জিজ্ঞেস করলুম, তুমি এত পোশাক নিয়ে কী করবে? পেপে বললো, আমার স্বভাব কি জানো, পরি আর না পরি, আমার ওয়ার্ডরোবে অনেক জামা-কাপড় ঝুলিয়ে রাখতে খুব ভালো লাগে।

আমি অবশ্য ওভারকোট ছাড়া অন্য জিনিসপত্রে আর লোভ করলুম না, কারণ অনেক ঘোরাঘুরি করতে হবে, বেশী জিনিসপত্র বইবার ঝামেলা নিতে চাই না।

ওভারকোটটা পরে একটু ঘোরাঘুরি করতেই নিজেকে বেশ সাহেব সাহেব মনে হলো। ওভারকোটের পকেটে দু'হাত ঢুকিয়ে দিলে হাঁটার স্টাইলই পাল্টে যায়। আমার এই ওভারকোটটায় প্রায় সাত আটটা পকেট। প্রথম দিন ভালোভাবে দেখিনি, দ্বিতীয় দিনে সবকটি পকেটে তদন্ত করতে আমি পেয়ে গেলুম কিছু খুচরো পয়সা, কয়েকটা কাগজ আর দুটো লাল-পাথরের দুল। এই

দুল জোড়া হাতে নিয়ে আমি বিমূঢ় হয়ে গেলুম। ওভারকোটটা যে কোনো পুরুষের তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সেই কোর্টের পকেটে মেয়েলি দুল কেন ? এ যে রহস্য-কাহিনীর মতন।

দুল দুটো সোনালি হলেও সোনার নয়, পাথর দুটোও দামী মনে হয় না, এগুলোকে এদেশে বলে কস্টিউম জুয়েলারি। রহস্য কাহিনী বানাবার প্রতিভা আমার নেই, কিন্তু দুল দুটো নিয়ে আমি বেশ চিন্তায় পড়ে গেলুম। আমার কোটের ভূতপূর্ব মালিক কী রকম লোক ছিল ? সে ডাকাত নিশ্চয়ই না, তার পকেটে এত সস্তার দুল কেন ? তা হলে কি সে ছিল খুব প্রেমিক ধরনের ? কিংবা খুনী ?

টিউব ট্রেনে যেতে যেতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলুম। হঠাৎ ভাবলুম, কোথায় যাচ্ছি ? এ যে আমার গন্তব্যের উল্টোদিক। পরের স্টেশনেই নেমে ওপরে উঠে দেখলুম ফিফ্‌থ অ্যাভিনিউ আর ফিফটি নাইন্‌থ স্ট্রীটের মুখে এসেছি। এ পাড়ায় তো আমার কোনো দরকার নেই, এখানে এলুম কেন ? এ তো বড়লোকের পাড়া। ওভারকোটের ভূতপূর্ব মালিক কি এ পাড়াতেই থাকতো ?

সেন্ট্রাল পার্কের গা ঘেঁষে হাঁটতে লাগলুম ধীর পায়ে। মিহিন তুষারপাতে হচ্ছে, তার ওপর জুতোর দাগ ফেলতে বেশ লাগে। ওভারকোটের সঙ্গে একটা টুপীও দিয়েছে, সেটা পরে নিলুম মাথায়। এখন মনে হচ্ছে সিগারেটের বদলে একটা পাইপ ধরাতে পারলে বেশ হতো।

হাঁটতে হাঁটতে চলে এলুম প্লাজা হোটেলের কাছে। এই হোটেলের সামনে যতবারই এসেছি, একটা অভিনব দৃশ্যের দিকে চোখ আটকে যায়। লাইন করে দাঁড়িয়ে থাকা কয়েকটি ফিটন্। যে দেশে এখন মোটর গাড়িতে মোটর গাড়িতে ধূল পরিমাণ, সেখানে এখনো কয়েকটি ঘোড়ায় টানা গাড়ি টিকিয়ে রাখার চেষ্টা সত্যি বেশ মজার।

আমি একবার ভাবলুম, প্লাজা হোটেলে ঢুকে একটু চা-টা খেয়ে তারপর একটা ফিটন গাড়ি ভাড়া করে সেন্ট্রাল পার্কে এক চক্কর ঘুরে এলে কেমন হয় ?

পরক্ষণেই ভাবলুম, আমার কি মাথাটাথা খারাপ হয়ে গেছে ? আমি কি সাহারার জমিদার যে প্লাজা হোটেলে চা খাওয়ার শখ হয়েছে ? ভেতরে ঢুকলেই কুচ করে গলা কেটে নেবে। আর ফিটন গাড়ির ভাড়া ট্যাক্সি ভাড়ার প্রায় কুড়ি গুণ বেশী। এদেশে এসে আমি ট্যাক্সি চড়ারই সাহস পাই না। হঠাৎ আমার মাথায় এরকম উট্‌কো খেয়াল আসছে কেন ?

ছেলেবেলায় 'ওভারকোট' নামে কার যেন একটা গল্প পড়েছিলুম, খুব সম্ভবত

নিকোলাই গোগোল্-এর। আমারও কি সেই রকম কিছু হলো নাকি ? ওভারকোটের আগেকার মালিকের ভূত ভর করছে আমার ওপর ? নইলে এরকম বড়লোকি হুজুগ মনে আসছে কেন ? দশ টাকা দিয়ে ওভারকোট কিনে শেষ পর্যন্ত কি আমি সর্বস্বান্ত হবো, না জেলে যাবো ?

ঝাঁ করে একটা বাসে চেপে চলে এলুম গ্র্যাণ্ড সেন্ট্রাল স্টেশনের কাছে। এখান থেকে আবার অন্য ট্রেন ধরতে হবে। কিন্তু বেশ খিদে পেয়েছে, একটা কিছু না খেলে চলে না। স্টেশনের সামনেই ঠেলা গাড়িতে নানারকম মুখরোচক খাবার বিক্রি করে। মাইওনেজ সহযোগে কয়েকটি চিংড়ি মাছের বড়া ও এক কাপ কফি খেলুম। এক ডলার ষাট সেণ্ট দিতে হবে। দুটি ডলারের নোট বাড়িয়ে দিতে দোকানের মালিকানি জিজ্ঞেস করলো, তুমি খুচরো দিতে পারো ?

আমি বললুম, হ্যাঁ, পারি।

বলেই হাত ঢুকিয়ে দিলুম ওভারকোটের চার নম্বর পকেটে। খুচরোগুলো তুলে আনবার পরই আমি একটা বিষম খেলুম।

তখন মনে পড়লো, এই পয়সাগুলো আমার নয়। ওভারকোটের আগের মালিকের। এ পয়সা কি আমার নেওয়া উচিত ? আগের মালিক কি এরকম রাস্তায় দাঁড়িয়ে ঠেলাগাড়ির দোকানের খাবার খাওয়া অনুমোদন করতো ? আমি কি ওভারকোটটার অপমান করছি ?

ধুৎ, এসব কুসংস্কারের কোনো মানে হয় না ভেবে সে-দোকানের দাম চুকিয়ে দিয়ে চলে এলুম। কিন্তু মনের মধ্যে খচ্‌খচ্ করতে লাগলো। খুচরো পয়সাগুলো বোধহয় আমার ফেরৎ দেওয়া উচিত। লাল পাথরের দুল জোড়া নিয়েই বা আমি কী করবো ? কিন্তু এসব ফেরৎ দেবই বা কাকে ? পকেটে যে কাগজপত্রগুলো পাওয়া গেছে, সেগুলো অতি সাধারণ, কয়েকটা হোটেলের চেক অর্থাৎ বিল।

জিনিসগুলো একমাত্র ফেরৎ দেওয়া যায় যে-দোকান থেকে আমি কোটটি কিনেছি, সে-দোকানের মালিককে। আমি শুধু কোটটাই কিনেছি, তার সঙ্গে এক জোড়া দুল আর কিছু খুচরো পয়সা তো ফাউ হিসেবে আমার প্রাপ্য নয়। কিন্তু এইট্‌থ স্ট্রিটের সেই দোকানে আবার যেতে আসতেই আমার যা খরচ পড়বে, তাতে কোটটির দাম বেশ বেড়ে যাবে। তাছাড়া এই সামান্য জিনিস ফেরৎ দিতে গেলে দোকানের মালিক যদি আমার প্রতি একটা হুংকার দেয় ? তিনশো ডলারের ওভারকোট মাত্র দশ ডলারে যারা বিক্রি করে, তারা সামান্য কিছু খুচরো আর দুটো ঝুটো পাথরের দুল ফেরৎ নিতে রীতিমতন অপমানিত বোধ করতে পারেন।

কলকাতা হলে কোনো সমস্যাই ছিল না। কোনো ভিখিরিকে দিয়ে দিতুম পয়সাগুলো, আর রাস্তায় যে-সব ছেলে-মেয়েরা শুয়ে থাকে, তাদের মাথার কাছে দুল দুটো ফেলে দিয়ে বিবেকের দায় থেকে মুক্ত হতে পারতুম। কিন্তু ওদের খুঁজে পাওয়া মুশকিল।

বেজার মুখ করে স্টেশ'নে ঢুকে আমার নির্দিষ্ট প্ল্যাটফর্মে গিয়ে একটা ট্রেনে চেপে বসলুম। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ঠিক করেছিলুম, কোনো ফাঁকা জায়গা দেখে ট্রেনের জানলা দিয়ে দুল জোড়া ছুঁড়ে ফেলে দেবো। ট্রেনে উঠবার পর বুঝতে পারলুম সেটা সম্ভব নয়। এয়ার কণ্ডিশান্‌ড ট্রেন, সব জানলাই পুরো কাচ দিয়ে ঢাকা, শীতকালে কেউ জানলা খোলার কথা কল্পনাও করে না।

ট্রেনটা মোটামুটি ফাঁকাই ছিল, দুটি স্টেশ'ন যাবার পর একজন লোক ঠিক আমার মুখোমুখি আসনটিতে এসে বসলো। বছর চল্লিশেক বয়েস, বেশ হাসিখুশী মানুষটি।

কয়েকবার আমার আপাদমস্তক চোখ বুলিয়ে লোকটি উচ্ছল গলায় বললো, হাউডি!

আমি বললুম, হ্যাল্লো!

—মনে হচ্ছে আজ রাত্তিরে আবার বরফ পড়বে, তাই না?

—তাই তো মনে হচ্ছে।

—আজ খেলায় কারা জিতেছে বলতে পারো?

—আমি ঠিক বলতে' পারছি না।

এইরকম খাজুরে আলাপ কিছুক্ষণ চললো। এর আগে কোনো পুরুষ মানুষ ট্রেনে আমার সঙ্গে যেচে কথা বলেনি। নিউ ইয়র্কের নাগরিকদের স্বভাবই হলো ঠোঁট বন্ধ করে রাখা। ট্রেনে উঠেই তারা মুখের সামনে একটা কাগজ মেলে ধরে অথবা চোখ বন্ধ করে থাকে। কথাবার্তা কদাচিৎ শোনা যায়।

আজ এই লোকটি যে আমার প্রতি মনোযোগ দিয়েছে, তা নিশ্চয়ই আমার ওভারকোটের জন্য। সাধারণত ট্রেনে উঠে সকলেই ওভারকোটটা খুলে ভাঁজ করে পাশে রাখে, আমি অন্যমনস্কভাবে সেটা গায়েই পরে আছি।

এটা টিউব ট্রেন নয়, মফস্বলে যাবার ট্রেন। এতে চেকার ওঠে। একটু বাদেই চেকার মহাশয় এসে টিকিট দেখতে চাইলেন। আমার রিটার্ণ টিকিট কাটা ছিল সেটা বার করে দিলুম।

চেকার একগাল হেসে বললেন, তুমি ভুল ট্রেনে উঠেছো। এটা তো অন্য দিকে যাচ্ছে।

আমি আকাশ থেকে পড়লুম। এরকম ভুল তো আমার হয় না। টিপে টিপে

পয়সা খরচ করতে হচ্ছে, এরকম ভুল মানেই তো গচ্চা। সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালুম, যত দূরে যাবো ততই ক্ষতি।

চেকার খুব সহৃদয়ভাবে আমাকে বললো, তা হলে এই ভাড়াটা দিয়ে দাও!

ট্রেনটি আবার এক্সপ্রেস, পরপর চারটি স্টেশ'ন ছেড়ে গিয়ে তারপর থামলো। বেশ সুন্দর, নির্জন একটা স্টেশ'ন। কিন্তু স্টেশ'নটিকে দেখেই আমার গা জ্বলে গেল। এখানে আমায় কে এনেছে, নিশ্চয়ই এই ওভারকোটের মালিকের ভূত আমাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে এসেছে। এখানে তার কে ছিল? প্রেমিকা? যার জন্য এই দুল কিনেছিল সাহেবটি?

ওভারব্রিজ পেরিয়ে অন্যদিকে গিয়ে টিকিট কাটতে হবে। দুপুর বেলা টিকিটের দাম সস্তা থাকে, কিন্তু এখন সন্ধে ছ'টা, এখন টিকিটের দাম বেশী। উপায় নেই, ফিরতে তো হবেই।

ফেরার ট্রেন আসতে কুড়ি মিনিট দেরি, বসলুম গিয়ে টিকিট ঘর সংলগ্ন ওয়েটিং রুমে। আমিই একমাত্র যাত্রী এখানকার। টিকিট বিক্রয়িত্রী রমণীটি দু'তিনবার কৌতূহলী চোখে তাকালো আমার দিকে। ওভারকোটটা ওর চেনা চেনা লাগছে নিশ্চয়ই। এই মেয়েটিই আমার পূর্বসূরীর প্রেমিকা ছিল নাকি?

ট্রেন আসার শব্দ পেয়ে উঠে দাঁড়ালুম। বেপরোয়াভাবে দুল দুটো আর কাগজপত্রগুলো বেঞ্চের ওপর ফেলে রেখে ছুটে গিয়ে উঠে পড়লুম ট্রেনে। প্রতি মুহূর্তে ভয় হচ্ছিল, মেয়েটি বুঝি ছুটে আসবে আমায় ধরতে। ট্রেন ছাড়ার পর আমার যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো।

ভুল ট্রেন ভাড়ার গচ্চা গেল প্রায় সতেরো ডলার। অর্থাৎ এখন ওভারকোটটার দাম পড়লো সাতাশ ডলার। অনেকটা ভদ্রমতন দাম, এর পর আর আগেকার মালিককে নিয়ে মাথা ঘামাবার কোনো মানে হয় না।

॥ ৩৩ ॥

হঠাৎ একদিন ঠিক করলুম ওয়াশিংটন ডি সি ঘুরে আসা যাক। এলোমেলো ভ্রমণে যদি শেষ পর্যন্ত ওয়াশিংটন ডি সি না যাওয়া হয় তা হলে বড় দুঃখের ব্যাপার হবে। রাজধানী বলে নয়, আমেরিকায় বেড়াতে এসে ওয়াশিংটন ডি সি'র স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউট না দেখে ফিরে যাওয়া একটা অমার্জনীয় অপরাধ।

বন্ধুরা আমাকে বাস স্টেশ'নে পৌঁছে দিয়ে গেল। ওয়াইওমিঙে আমার সেই সাঙ্ঘাতিক বাস দুর্ঘটনার কথা শুনে নিউ ইয়র্কে অনেকে বলেছিলেন, তুমি

আবার বাসে ঘোরাঘুরি করছো, তোমার ভয় করে না ? এর উত্তরে সেই পুরোনো কথাটাই বলতে হয়, রোজ কয়েক লক্ষ লোক তো বিছানায় শুয়ে মরে যাচ্ছে, তা হলে তো বিছানায় শুতেই মানুষের ভয় পাওয়া উচিত।

নিউ ইর্য়ক থেকে ওয়াশিংটনের বাস এক ঘণ্টা অন্তর ছাড়ে। ঘণ্টা পাঁচেকের জার্নি। আমি অ্যাকসিডেণ্টে পড়েছিলুম বটে তবু গ্রে হাউণ্ড বাস সার্ভিসের মুক্ত কণ্ঠে প্রশংসা করতে হয়। কাঁটায় কাঁটায় ঠিক সময়ে বাস ছাড়ে, আর হাজার মাইল পেরিয়েও অবিকল নির্দিষ্ট সময় পৌঁছোয়।

আমি পৌঁছোতে পাঁচ মিনিট দেরি করে ফেলেছি বলে পরবর্তী বাসের জন্য পঞ্চান্ন মিনিট অপেক্ষা করতে হবে। সময় কাটাবার কোনো সমস্যা নেই। প্রত্যেক বাস স্টেশনেই আছে সস্তার খাবার দোকান। তার চেয়েও সস্তা চাইলে মেশিন থেকেই পাওয়া যায় ঠাণ্ডা ও গরম পানীয় এবং নানান ধরনের স্ন্যাক্‌স। একটা বাস স্টেশনের মেশিন থেকে আমি চিকেন সুপ্ পর্যন্ত পেয়েছিলুম, বেশ সুস্বাদু আর জিভে-গরম। সেদিন সত্যি খুব অবাক হয়েছিলুম। এ দেশের এসব ছোট খাটো ব্যাপারই বেশী বিস্ময়কর।

আগে গেলুম একটা টেলিফোন করতে। ওয়াশিংটন ডি সি তে রমেন পাইনের বাড়িতে আমার আশ্রয় নেবার কথা, তাঁকে জানিয়ে দিতে হবে আমার বাসের সময় বদলে যাবার কথা। কিন্তু টেলিফোন বুথগুলোর কাছে একটা দৃশ্য দেখে থমকে গেলুম।

একটি মেয়ে তার বয়েস ষোলো সতেরোর বেশী নয়, মাটিতে বসে পড়ে নিঃশব্দে শরীর মুচড়ে মুচড়ে কাঁদছে অত্যন্ত ব্যাকুল ভাবে, আর একটি আঠারো-উনিশ বছরের ছেলে ফিসফিস করে খুব আন্তরিক ভাবে তাকে কিছু বোঝাবার চেষ্টা করছে। মেয়েটি পরে আছে একটা গাঢ় হলুদ রঙের স্কার্ট, তার মাথার চুল সম্পূর্ণ সোনালী। আর ছেলেটি পরে আছে একটা নীল কর্ডের ট্রাউজার্স আর সাদা গেঞ্জি, তার চোখ দুটি নীল, তাকে দেখতে অবিকল অল্পবয়েসী অ্যান্টনী পারকিন্সের মতন। ছেলেটি একবার করে একটা টেলিফোনের রিসিভার হুক থেকে নামিয়ে জোর করে মেয়েটির হাতে দিচ্ছে, আর মেয়েটি ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে সেটা। দেয়ালে ধাক্কা লেগে টেলিফোনটি ঝুলছে কর্ডে। একবার মেয়েটি নো-ও-ও-ও বলে এত জোরে টেলিফোনটি ছুঁড়ে দিল যে তার অর্ধেকটা ভেঙে উড়ে গেল।

কাছাকাছি দশ-বারোটা টেলিফোন বুথ। তিন চারজন নারী-পুরুষ অন্য বুথ গুলোতে নির্বিকার ভাবে ফোন করে যাচ্ছে, কেউ ওদের দিকে একবারও তাকাচ্ছে না। বোধহয় তাকাবার নিয়মও নয়। এমনকি ওরা কেন একটি

টেলিফোন ভেঙে ফেলছে, সে ব্যাপারেও কেউ আপত্তি জানাতে আসছে না।

কিন্তু আমার ছোটখাট বাঙালী হৃদয় ওরকম নির্বিকার থাকতে পারে না। কান্নার দৃশ্য আমি একেবারেই সহ্য করতে পারি না। ফট করে আমার নিজেরও কান্না পেয়ে যায় ক্যাবলার মতন। ঐ ফুটফুটে সুন্দর মেয়েটি কাঁদছে কেন অমন বুক উজাড় করে ? কি ওর দুঃখ ?

ওদের পাশে দাঁড়িয়ে এখন আমার পক্ষে টেলিফোন করা সম্ভব নয়। আমি ওখান থেকে সরে গেলুম। একেবারে দুরেও চলে যেতে পারলুম না। একটা কোকাকোলা মেশিনের আড়ালে এমনভাবে দাঁড়ালুম যেখান থেকে ওদের দেখা যায়। দৃশ্যটা একই রকম। ছেলেটি বার বার মেয়েটিকে অনুরোধ করছে কোথাও টেলিফোন করার জন্য, মেয়েটি কিছুতেই টেলিফোন করবে না, সে এক একবার রেগে উঠছে, আবার অঝোরে কাঁদছে। আমি মেয়েটির মুখ ভাল করে দেখতে পাচ্ছি না, তার মুখ দেয়ালের দিকে।

প্রথমেই মনে হয়, এরা দু'জনে নিশ্চয়ই বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছে। এটা এখানকার নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। হাজার-হাজার ছেলেমেয়ে বাড়ি ছেড়ে নিরুদ্দেশে চলে যায়। এই নিয়ে কত নাটক, কত সিনেমা হয়েছে। কিন্তু কখনো তো কোনো ছেলেমেয়েকে কাঁদতে কিংবা পরাজয় স্বীকার করতে দেখিনি। আমেরিকান যৌবন সব সময় দুঃসাহসের পতাকা তুলে ধরে থাকে। এই মেয়েটি কাঁদছে যেন বুক নিঙড়ে নিঙড়ে। আর ছেলেটির মুখেও একটা অপরাধী-অপরাধী ভাব।

এক সময় মেয়েটি উঠে দাঁড়ালো, ছেলেটি তার কাঁধ ধরলো। কয়েক পা মাত্র এগিয়েই মেয়েটি কান্নায় ভেঙে পড়লো আবার। আবার সে মাটিতে বসে পড়লো। এবারে আমি তার মুখ দেখতে পেয়েছি চোখের জলে একেবারে মাখামাখি। মুখখানা যেন কোন বিখ্যাত শিল্পীর আঁকা। মাথা ভর্তি ওরকম সোনালী চুলের জন্যই মনে হয় মেয়েটি যেন এই পৃথিবীর নয়। অন্য কোনো গ্রহ টহ থেকে এসেছে। মেয়েটির শরীরের নিখুঁত গড়নের তুলনায় ওর কোমরের কাছটা যেন একটু স্ফীত। খুব সম্ভব মেয়েটি গর্ভবতী। এই বয়েসের ছেলে মেয়ের বিবাহ কিংবা একসঙ্গে থাকা তো খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। এরা যৌবনের একটুও বাজে খরচ করতে চায় না।

মনে হয়, ওরা দু'জনে বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছে, হয়তো দূরের কোনো শহরে থাকতো, নিউ ইয়র্কে এসে টাকা পয়সা সব ফুরিয়ে ফেলেছে, তার ওপরে এই বিপদ। টাকা পয়সা না থাকলে নিউ ইয়র্কের মতন বড় শহর বড় নির্দয়। ছেলেটি কি মেয়েটিকে বলছে ওর বাবা-মা'র কাছে ফোন করে সাহায্য চাইতে ?

ছেলেটি নিজে তো ফোন করছে না !

এই রকম অবস্থায় সাধারণত সবাই ছেলেটিকেই দোষ দেয়। সবাই বলবে, বদমাস ছেলে, একটা কাঁচা-বয়েসী মেয়েকে ভুলিয়ে ভালিয়ে এনে এখন এই অবস্থায় ফেলেছে। কিন্তু ছেলেটি মেয়েটির চেয়েও অনেক বেশী রূপবান, এমন সরল আর নিষ্পাপ মুখ আমি আগে কখনো দেখেছি বলে মনে পড়ে না। ছেলেটি কোনো ভুল করতে পারে, কিন্তু ওর মনে কোনো কু-মতলব থাকতে পারে না। তাছাড়া, এই সব ব্যাপারে ছেলে আর মেয়ের দায়িত্ব সমান। এ দেশে ষোলো বছরের মেয়ে কচি খুকী নয়, তারা ছেলেদের সঙ্গে সব ব্যাপারে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলে।

এক জায়গায় বেশীক্ষণ থাকলে মনে হয় সবাই আমাকে দেখছে। কাছাকাছি অনেক বসবার জায়গা থাকতেও আমি কোকাকোলা মেশিনের পাশে দাঁড়িয়ে আছি কেন ? আমি পয়সা ফেলে একটা কোকাকোলার টিন বার করে অন্য দিকে চলে গেলুম।

ওদের জন্য আমার মন কেমন করতে লাগলো। বাস স্টেশনে কত লোক, কেউ ওদের একটা কথা জিজ্ঞেস করছে না। এরা ব্যক্তি স্বাধীনতাকে অত্যন্ত সম্মান দেয়, কিন্তু আমার মনে হলো তারও একটা সীমা থাকা দরকার। ঐ বয়েসের দুটি বিভ্রান্ত ছেলে মেয়ে, এখন কারুর কাছ থেকে সামান্য একটা সান্ত্বনা বা সহানুভূতির কথা শুনলেই অনেক ভরসা পায়। দারুণ কোনো মানসিক সংকটে না পড়লে আমেরিকার মেয়ে প্রকাশ্যে কিছুতেই কাঁদবে না।

আমার নিজেকে খুব অসহায় বোধ হলো। আমি কি কিছু করতে পারি ? সব সময়েই মনে হয় আমি বিদেশী। আমার আর সাধ্য কতটুকু ? তা ছাড়া আমি কিছু বলতে গেলেই যদি ওরা আমার দিকে সন্দেহের চোখে তাকায় ?

বেশীক্ষণ দূরে থাকতে পারলুম না। তা ছাড়া আমায় তো টেলিফোন করতেই হবে।

এখনো সেই একই দৃশ্য। সেই রকম ভাবেই কেঁদে চলেছে মেয়েটি, ছেলেটিও তার পাশে বসে তাকে বোঝাবার চেষ্টা করে যাচ্ছে। তবে এমনিই এদের শিক্ষা যে মেয়েটির কান্নায় ফোঁপানি ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই, ছেলেটিও কথা বলছে যথা সম্ভব নিম্ন স্বরে। তিন চার জন নারী পুরুষ ওদের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে টেলিফোন করে যাচ্ছে। এদের এই নির্লিপ্ততা এক এক সময় আমার হৃদয়হীনতা বলে মনে হয়।

টেলিফোন করতে করতে আমি আসলে কান খাড়া রাখলুম ওদের দিকে। যদি ওদের একটি কথাও শুনতে পাওয়া যায়। শুধু শুনতে পেলুম ছেলেটি

বলছে, প্লীজ, রোজি, প্লীজ, প্লীজ···। আর মেয়েটির শরীর দুলে দুলে উঠছে কান্নায়। আমার মনে হলো, এই পুরো বাস স্টেশনের এমনকি বাইরেও আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে গেছে একটি সপ্তদশী মেয়ের কান্না।

টেলিফোনে কথাবার্তা সেরে আমি আবার একটি যন্ত্র থেকে এক গেলাস কফি নিলুম। আমার বাস ছাড়তে আরও তেইশ মিনিট বাকি। এ দিকে ওদিকে জোড়ায় জোড়ায় নারী-পুরুষ গল্প করছে, কেউ হাসছে, এক বৃদ্ধা মহিলাকে সম্ভবত তার ছেলে ও ছেলের বউ (কিংবা মেয়ে-জামাইও হতে পারে) চুমু খাচ্ছে দু'দিকের গালে, মাইক্রোফোনে নানান জায়গার বাস আগমন-নির্গমনের কথা ঘোষিত হচ্ছে, অনেক গেটে যাত্রীদের লাইন পড়েছে, ছুটোছুটি করছে দুটি শিশু···জীবন চলেছে জীবনের নিয়মে। এখানেই একটি মেয়ে যে বুক ভাসিয়ে কেঁদে যাচ্ছে, সেদিকে কারুর খেয়াল নেই।

আমার আর একটা ঘটনা মনে পড়লো। সেটাও আর একটা বাস স্টেশনের। সেখানে বাস বদলের কারণে ঘণ্টা দু'-এক অপেক্ষা করার ব্যাপার ছিল। সময় কাটাবার জন্য কেউ কেউ টি ভি দেখে। কেউ কেউ ঘুমোয়। আমি একটা বই পড়ছিলুম। আমার হ্যাণ্ডব্যাগটা আমার পায়ের কাছে রাখা। মাঝে মাঝে সেদিকে নজর রাখছি। বন্ধু-বান্ধবের মুখে শুনেছি আজকাল স্টেশন থেকে ব্যাগ-ট্যাগ চুরি যাওয়া আশ্চর্য কিছু নয়, যদিও আগে এরকম ছিঁচকে চোর ছিল না।

একটি তিন-চার বছরের ফুটফুটে বাচ্চা মেয়ে দৌড়োদৌড়ি করছে ওয়েটিং রুমে। এক একবার সে এসে আপন খেয়ালে টানাটানি করছে আমার হ্যাণ্ড ব্যাগটা। আমি মুখ তুলে সস্নেহ হাসি দিচ্ছি। পাশের সীট থেকে মা ধমকাচ্ছে মেয়েকে। মেয়েটির মাথায় বেশ বড় একটা ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। যা দুষ্টু মেয়ে, নিশ্চয়ই আছাড় খেয়ে মাথা ফাটিয়েছে। মেয়েটি একবার আমার ব্যাগটা খুলে ফেলবার চেষ্টা করতেই ওর মা বেশ জোরে বকুনি দিল।

আমি মুখ ফিরিয়ে ভদ্রতা করে বললুম, থাক, থাক। কিছু হয়নি। ও তো খেলা করছে। ওর মাথায় অতবড় ব্যাণ্ডেজ কেন ?

মহিলা তীব্র গলায় বললেন, ওর বাবা ওকে মেরেছে। ওর বাবা মাতাল, বর্বর, নরপশু।

আমি চমকে গেলুম। অপরিচিত লোককে তো কেউ এভাবে এসব কথা বলে না। ভালো করে তাকিয়ে দেখলুম, ভদ্রমহিলার বয়েস বছর পঁয়তিরিশেক হবে, সাজ পোশাকে কোনো মনোযোগ দেননি, চুল এলোমেলো, চোখ দুটো ফোলাফোলা। কোলে আর একটা বাচ্চা।

ভদ্রমহিলা আবার বললেন, ওর বাবা আমাদের তাড়িয়ে দিয়েছে। হি জাস্ট কিক্‌ড আস আউট, লাইক অ্যানিম্যালস, ডিডন্‌ট গিভ আস আ নিকল...একটা পয়সা দেয়নি, স্রেফ মারতে মারতে বার করে দিয়েছে।

আমি হতবাক। এতো আমাদের রাধার মা। আমার ছোট মাসীর বাড়িতে বাসন মাজার কাজ করতো রাধার মা। একদিন তার জীবন কাহিনী শুনেছিলুম। চব্বিশ পরগনার এক গ্রামে তার বিয়ে হয়েছিল। তিনটি বাচ্চা হয় তার, তিনটিই মেয়ে, সেই অপরাধে তার স্বামী তাকে বাচ্চা সমেত মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে। কলকাতার অনেক বাড়ির দাসী রাঁধুনীই স্বামী বিতাড়িত। এ দেশেও তা হলে রাধার মায়েরা আছে। এ দেশে অবশ্য মামলা মোকদ্দমা করে স্বামীর কাছ থেকে মোটা খোরপোশ আদায় করা যায়। কিন্তু মামলা করতে গেলেও তো খরচ লাগে। এই মহিলাতো দেখছি নিঃসম্বল, ইনি কী করে মামলা করবেন? মেয়েরা সব দেশেই এখনো অসহায়।

আমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে মহিলা কেঁদে ফেললেন। সেদিনও আমি খুব অসহায় বোধ করেছিলুম। আমি তাঁকে কী সাহায্য করতে পারি? দশ-কুড়ি ডলার দিয়ে তো সাহায্য করা যায় না। তার বেশী সামর্থ্যও আমার নেই। বাচ্চা দুটিকে নিয়ে ভদ্রমহিলা কোথায় চলেছেন তা জিজ্ঞেস করার সাহসও আমি পাইনি। শুধুই মহিলাকে বলেছিলুম, আমি কফি খেতে যাচ্ছি, তোমার বা তোমার বাচ্চাদের জন্য কি কিছু এনে দিতে পারি? তিনি তাঁর বড় মেয়েকে একটি চকলেট বার নেবার অনুমতি দিয়েছিলেন শুধু।

...আমার বাস ছাড়তে আর সাত মিনিট দেরি আছে। পাঁচ মিনিট আগে লাইনে দাঁড়াতে হবে। ঐ সপ্তদশী মেয়েটি আর কতক্ষণ কাঁদবে?

টেলিফোন বুথের দিকে ওদের আবার দেখতে গেলুম। ছেলেটি আর মেয়েটি ওখানে নেই। ওরা যেখানে বসে ছিল সেখানে এখনো কয়েকটি চোখের জলের ফোঁটা রয়েছে। ঠিক যেন রক্ত।

কোথায় গেল ওরা। একটু খুঁজতেই পেয়ে গেলুম, এক কোণের দিকে একটা বেঞ্চে বসে আছে ওরা। মেয়েটি সম্ভবত এখনো কাঁদছে, সে দু'বাহুর মধ্যে ঢেকে রেখেছে মুখ। ছেলেটি নার্ভাস ভাবে সিগারেট টানছে ঘন ঘন, তার একটা হাত মেয়েটির পিঠে।

এখান থেকে এর মধ্যে অনেক জায়গার বাস ছাড়ছে। ওরা বাস স্টেশনে এসেছিল কেন, কোথাও যাবার জন্য? ওদের কাছে কি বাস ভাড়াও নেই?

আমি যা ভাবছি, হয়তো সে সব কিছুই ঠিক নয়। ওদের সমস্যা বোধহয় অন্য। কিন্তু মেয়েটির কান্নাটা তো সত্যি।

আমি বাসে উঠে গেলুম, আর ওদের দেখা গেল না। জানি না ওরা এর পর কী করবে। অনেকক্ষণ ওদের দু'জনের জন্য আমার বুক টন টন করতে লাগলো।

॥ ৩৪ ॥

রাত সাড়ে ন'টা আন্দাজ ওয়াশিংটন ডি সি বাস স্টেশনে পৌঁছোতেই পরিচিত, সুদর্শন, দীর্ঘকায় মানুষটিকে দেখতে পেলুম। ভারী একটা ওভারকোট পরা, ফর্সা গায়ের রঙ, মাথায় একটা টুপী থাকলেই সাহেব মনে হতো। বাঁ হাতে বড় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। ইনি রমেন পাইন, কলকাতার টি ভি দর্শকদের নিশ্চয়ই মনে আছে এঁর কথা।

রমেনদা তাঁর সুস্থ হাতটি দিয়ে আমার সুটকেসটি তুলে নিতে যাচ্ছিলেন, আমি বললুম, আরে, ছাড়ুন, ছাড়ুন। আপনার হাতে কী হলো? অতবড় ব্যাণ্ডেজ?

রমেনদা নির্লিপ্তভাবে বললেন, এই একটু পড়ে গিয়ে ফ্রাকচার হয়েছে। এমন কিছু না।

—আপনি এক হাতে গাড়ি চালাবেন নাকি?

—কেন, তুমি ভয় পাচ্ছো?

আমি হেসে বললুম, না। আমার ভয় পাবার কোনো প্রশ্নই নেই। কারণ, আমি জেনে গেছি, গাড়ির অ্যাকসিডেন্টে আমার মৃত্যু নেই। আমি ভাবছিলুম আপনার অসুবিধের কথা।

বাইরে ছিপ ছিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। সূচ ফোটানো ঠাণ্ডা বাতাস। আমার হাত জমে আসছে, এবারে এক জোড়া গ্লাভস আর না কিনলেই নয়।

রাস্তা পেরিয়ে এসে একটু দূরে পার্ক করা লাল রঙের গাড়িটায় উঠে বসলুম। সিনেমার স্টাণ্টম্যানদের কায়দায় রমেনদা হুস্ করে দারুণ স্পীডে গাড়ি চালিয়ে দিলেন।

ওয়াশিংটন ডি সি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী হলেও জায়গাটি ছোট। এখানে যারা কাজ করে, তারা অনেকেই থাকে এর বাইরে। রমেনদা থাকেন ভার্জিনিয়ায়। আধ ঘণ্টার মধ্যেই আমরা বাইরের শীত থেকে রমেনদার অ্যাপার্টমেন্টের উষ্ণতায় পৌঁছে গেলুম। এই উষ্ণতা শুধু আবহাওয়ার নয়, আন্তরিকতারও।

অনেকদিন বাদে আমি বেশ একটা বাড়ি বাড়ি পরিবেশ পেলুম। এর আগে

যে-সব বাঙালী পরিবারে গেছি, প্রায় সব জায়গাতেই স্বামী-স্ত্রীর সংসার ও একটি বাচ্চা, বড় জোর দুটি। তারা সন্ধে একটু গাঢ় হলেই শুতে চলে যায়, তারপর থেকে বাড়ি একেবারে চুপচাপ। রমেনদার দুটি মেয়েই বেশ বড় হয়েছে, ওদের ছেলেটিও অনেক রাত জাগে, সবাই মিলে এক সঙ্গে বসে আড্ডা দেওয়া যায়। ওঁদের ছেলে রঞ্জন অবশ্য একটাও কথা বলে না, সে শুধু দেখে, আর মজার কথা শুনলে হাসে।

জুলি বৌদির বোধহয় দুটি নয়, আটখানা হাত। একই সঙ্গে তিনি রান্না করছেন, জামা কাপড় কাচছেন, বিছানা পাতছেন, চা-কফি বানাচ্ছেন, ছেলেকে খাবার দিচ্ছেন, আমাদের জন্য বাদাম ও বরফ এনে দিচ্ছেন, অথচ এই সব কাজ করতে করতেও আমাদের সঙ্গে বসে হাসি মুখে গল্পও করছেন। এ এক আশ্চর্য ব্যাপার। জুলি বৌদির আরও নানান গুণপনার পরিচয় আমি আস্তে আস্তে পেতে থাকি।

রমেনদা-জুলি বৌদি এখানে সাত-আট বছর কাটিয়ে দেশে ফিরে গিয়েছিলেন। কলকাতাতেই থাকবেন ভেবেছিলেন, আমেরিকায় আর ফিরে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল না। টানা চার বছর কলকাতায় ছিলেন চাকরি জীবনের নানান দলাদলির সঙ্গে যুদ্ধ করে। শেষ পর্যন্ত আবার এ-দেশে ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছেন। সে যাই হোক, কৈশোরের শেষ দিকটায় চার বছর কলকাতায় কাটানো ও পড়াশুনো করার ফলে ওঁদের দুই মেয়ে বাংলা তো শিখেছে বটেই, বাঙালী হিসেবে আত্মমর্যাদাবোধও এসেছে। আবার শৈশব ও যৌবনে আমেরিকায় এসেছে বলে ওরা অনেক ব্যাপারে সাবলম্বী ও জড়তাহীন। অর্থাৎ দু'দেশেরই গুণ বর্তেছে ওদের মধ্যে। মেয়ে দুটির নাম মুনু আর মোম।

আমরা পৌঁছোনোর পরই রমেনদা পোশাক পাল্টে পাজ্ঞাবি আর পা-জামা পরে ফেললেন। তারপর বললেন, বুঝলে নীললোহিত, তুমি আসবে বলে আমি অফিস থেকে ছুটি নিয়ে ফেলেছি। ক'দিন আর কোথাও বেরুবো না, শুধু আড্ডা হবে।

প্রথম রাতে আড্ডা চললো প্রায় রাত দুটো পর্যন্ত। পরদিন আমরা চা খেলুম সকাল দশটায়। তারপর আবার আড্ডা। রমেনদা আগে থেকেই যে কত রকম খাদ্য পানীয় এনে জমিয়ে রেখেছেন, তার ঠিক নেই। মুনু আর মোম কলেজে পড়ে আবার চাকরিও করে, সারাদিন ধরেই তারা ব্যস্ত। কেউ ভোরে বেরিয়ে যাচ্ছে দুপুরে ফিরছে, কেউ দুপুরে বেরুচ্ছে, অন্য জন বেরুবার পর আর একজন ফিরছে, এই রকম চলতে থাকে রাত পর্যন্ত। এ বাড়ির দুটি গাড়ির মধ্যে কে কোন্‌টা নিয়ে কখন যাচ্ছে, তার হিসেব রাখতে হয় জুলি বৌদিকে। কারণ,

টুকিটাকি জিনিসপত্র কেনার জন্য তাঁকে প্রায়ই গাড়ি নিয়ে বেরুতে হয়।

রমেনদার মেজাজটা অনেকটা জমিদার ধরনের। যখন ছুটি নিয়েছেন, তখন আর বাড়ি থেকে বেরুবার কোনো মানে হয় না। বসবার ঘরে পায়ের ওপর পা তুলে বসে থাকবেন আর বারবার চা, কফি ও অন্যান্য জিনিসের হুকুম করবেন। আজকালকার স্বামীরা অবশ্য বৌদের হুকুম করার সাহস পায় না, বৌদের ভুরু তোলা কিংবা ঝাঁঝালো কথা শোনার ভয়ে সব সময় তটস্থ থাকাই বিংশ শতাব্দীর বাঙালী যুবকদের নিয়তি। অবশ্য বাড়িতে কুমারী কন্যা থাকলে স্নেহময় পিতার পক্ষে তাদের যে-কোনো হুকুম করা যায়, মেয়েরা সাধারণত বাবার খুব বাধ্য হয়।

রমেনদা কিন্তু অকুতোভয়। তাঁর দুটি বড় বড় মেয়ে থাকলেও তিনি মেয়েদেরও হুকুম করেন, বৌকেও হুকুম করেন। জুলি বৌদি আমার দিকে তাকিয়ে বলেন, দেখেছো, দেখেছো ও নিজে কোনো কাজই করবে না। সব সময় হুকুম! আমার যদিও ধারণা হয় যে, জুলি বৌদি স্বামীকে দিয়ে কোনো কাজ করাতে ভরসাও পান না। ওঁর বদ্ধমূল বিশ্বাস যে, রমেনদা নিজের হাতে এক গেলাস জল গড়াতে গেলেও হয় মেঝেতে জল ফেলে কার্পেট ভেজাবেন অথবা গেলাসটা ভাঙবেন।

এডমাণ্টনে দীপকদা বলেছিলেন, আমাদের দেশের লোকদের সবচেয়ে সুখ কিসে জানো? খাবার পরে থালাটা রেখে উঠে যেতে পারে। আর এই দেশে আমাদের খাওয়ার পরে লঙ্গরখানার ভিখিরির মতন এঁটো থালাখানা হাতে নিয়ে উঠে যেতে হয়, তক্ষুনি গিয়ে থালা-বাসন মাজতে হয়।

সত্যি কথা, এদেশে, সব জায়গাতেই ঐ এক নিয়ম দেখেছি। এমনকি নিমন্ত্রিত অতিথিদেরও নিজের থালা ধুয়ে দেওয়াই প্রথা। একমাত্র রমেনদাকেই দেখলুম এ ব্যাপারে তোয়াক্কা করেন না। খাওয়ার পর বেমালুম এঁটো থালা টেবিলে রেখে উঠে যান। একবার রমেনদাকে এ ব্যাপারটা উল্লেখ করায় রমেনদা বললেন, আরে যাও, যাও ও-সব থালা-বাসন মাজায় আমি বিশ্বাস করি না। আমেরিকায় এসেছি বলে কি মাথাটাও বিকিয়ে দিয়েছি নাকি?

ওঁর দুই মেয়ে এই কথা শুনে খলখলিয়ে হাসে। মেয়েরা এই ব্যাপারে বাবাকে সস্নেহ প্রশ্রয় দেয়।

দু'দিন টানা আড্ডা মারার পর আমি একটু উসখুস করতে লাগলাম। আড্ডার চেয়ে প্রিয় জিনিস আমারও কিছু নেই। বাছা বাছা দ্রষ্টব্য স্থানগুলো আমায় দেখতেই হবে, এরকমও কোনো ঝোঁক আমার নেই। অনেক কিছুই তো ছবিতে দেখা যায়। নতুন কোথাও এসে সেই জায়গাটা অনুভব করাই আসল ব্যাপার।

কিন্তু স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউট ? সেখানে একবার না গেলে যে মনে ক্ষোভ থেকে যাবে !

একবার মিনমিন করে এই প্রসঙ্গ তুলতেই রমেনদা উদারভাবে বললেন, হবে, হবে ! অত ব্যস্ততা কিসের ?

জুলি বৌদি রান্নাঘর থেকে বললেন, ওর কথা শুনলে তোমার আর কোনোদিনই যাওয়া হবে না, নীলু। আমি বরং নিয়ে যাবো তোমাকে।

পরদিন সকাল দশটায় জুলি বৌদি আমায় স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউটের স্পেস মিউজিয়ামের দরজায় ছেড়ে দিয়ে বললেন, তুমি ঘুরে ঘুরে দ্যাখো, তোমায় আমি আবার বিকেল ছ'টার সময় তুলে নিয়ে যাবো এখান থেকে।

স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউট শুধু একটা বাড়িতে আবদ্ধ নয়, বিশাল একটি পাড়া জুড়ে এই ব্যাপার। একটি মাত্র হিসেব দিলে এই এলাহি কারবারের কিছুটা আন্দাজ পাওয়া যাবে। এখানে যতগুলি দেখবার জিনিস আছে, তার প্রত্যেকটির সামনে যদি মাত্র এক মিনিট করে দাঁড়ানো যায়, তাহলেই সময় লাগবে আড়াই বছর !

সুতরাং কারুর পক্ষেই পুরোটা দেখা সম্ভব নয়। যার যাতে আগ্রহ, সে শুধু সেই অংশটুকু দেখে। তার মধ্যে স্পেস মিউজিয়াম অবশ্য দ্রষ্টব্য। আকাশ ও মহাকাশ বিষয়ে এমন বিপুল সম্ভার পৃথিবীর আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। এখানে সবই গোটা-গোটা ব্যাপার। চার্লস লিণ্ডবার্গ যে প্লেনটি চেপে প্রথম আটলান্টিক পাড়ি দিয়েছিলেন, সেটা অটুট অবস্থায় রয়েছে এখানে। যে-সব রকেট মহাশূন্য থেকে ফিরে এসেছে, সে রকম কয়েকটি রাখা আছে। এগুলো দেখলেই রোমাঞ্চ লাগে। নীল আর্মস্ট্রং যে যানটি চেপে চাঁদে নেমেছিলেন, দেখলুম সেটাও। শুধু এই প্রদর্শনী ভবনটিই যে কত বিরাট, তা ঠিক বলে বোঝানো যাবে না। মানুষের আকাশে ওড়ার প্রথম চেষ্টা থেকে আধুনিকতম আবিষ্কার পর্যন্ত দেখানো হয়েছে স্তরে স্তরে। কোথাও রয়েছে প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের এক একটি দৃশ্যের মডেল। আমরা অবশ্য প্রদর্শনীর মডেল বলতেই ভাবি কৃষ্ণনগরের ছোট ছোট পুতুল। এখানে সবই জীবন-প্রমাণ সাইজের, কোথাও তার চেয়েও বড়।

একটি ফিলমের কথাই বলি। এ রকম ফিল্ম দেখার অভিজ্ঞতা আমার জীবনে আগে হয়নি। এখানে নানান বৈজ্ঞানিক ব্যাপার নিয়ে বিশেষ প্রক্রিয়ার তোলা ফিলম দেখাবার ব্যবস্থা আছে, আমার মাত্র দুটিই দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। নির্দিষ্ট সময়ে টিকিট কেটে লাইন দিয়ে ঢুকলুম। বসবার ব্যবস্থা বেশ উঁচু গ্যালারির মতন। ছবি দেখার পর্দা অন্তত ছ' গুণ বড়। অর্থাৎ একটি হাতি,

বা নারকোল গাছ বা ছোট ডাকোটা প্লেনকে দেখা যায় তাদের অবিকল আকারে। একটা বাংলো বাড়ির ছবি ঠিক সেই বাড়িটিরই সমান। প্রথম ফিল্মটি হচ্ছে একটি আগেকার দিনের চারটি ডানাওয়ালা, প্রপেলার সমেত বিমানের অ্যাডভেঞ্চার। বিমানটি যখন একটা নির্জন নদীর খাতে ঘুরতে ঘুরতে পড়ে যাচ্ছিল, তখন আমি আঁতকে উঠে আমার চেয়ারের হাতল শক্ত করে চেপে ধরেছিলুম। যেন আমিই সেই বিমানে বসে আছি। আমিই পড়ে যাচ্ছি। সত্যিকারের বিমান যাত্রায় আমার কখনো এরকম ভয় হয়নি।

আর একটি ছবি পৃথিবীতে জীবন বৈচিত্র্য বিষয়ে। এই ছবির নির্মাতার ভারতবর্ষ সম্পর্কে দুর্বলতা আছে, কারণ বারবার ভারতবর্ষের ছবি ফিরে ফিরে আসছিল আর আমি উৎফুল্ল হচ্ছিলুম। ছবির কলাকৌশলে আমি নিজেই যেন উপস্থিত হচ্ছিলাম ভারতবর্ষের গঙ্গাতীরে।

ওয়াশিংটন ডি সি-তে যিনি বেড়াতে যাবেন তিনি এই ফিল্মগুলি না দেখলে এক দুর্লভ অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত হবেন।

এর পাশাপাশি আছে মুদ্রার বিবর্তনের প্রদর্শনী, অস্ত্রের বিবর্তন, প্রাণীতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, ভাস্কর্য, চিত্রকলা ইত্যাদি। আমি দু'দিনে শুধু ঐ আকাশ-যান ও অভিব্যক্তিমূলক চিত্রকলার প্রদর্শনী দেখে উঠতে পেরেছি।

স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউটের পুরো পাড়াটা বাইরে থেকে ঘুরে দেখতেও ভালো লাগে। মনে হয় যেন প্রাচীন রোমের কোনো অভিজাত এলাকায় এসে পড়েছি, বাড়িগুলি এই রকম। এদের অনেক টাকা, পৃথিবীর যে-কোনো প্রান্ত থেকে দুর্লভতম শিল্প সামগ্রী সংগ্রহ করতে এরা সদা-উৎসাহী।

এ সম্পর্কে একটি কাহিনী আছে। একবার এই সংস্থার কর্তৃপক্ষ আগাগোড়া সোনা দিয়ে একটি মূর্তি গড়িয়ে রাখার সংকল্প করলেন। সেইজন্য তাঁরা আমেরিকার সবচেয়ে বিখ্যাত ভাস্করের কাছে জানতে চাইলেন, তাঁর ইচ্ছে মতন পারিশ্রমিক পেলে তিনি খাঁটি সোনার কোনো ভাস্কর্য গড়তে পারবেন কি না। ভাস্করটি উত্তর দিয়েছিলেন, কেন পারবো না, নিশ্চয়ই পারবো ! তবে তৈরি করার পর আমি মূর্তিটি কালো রঙ করে দেবো।

প্রথম দিন জুলি বৌদি এলেন আমাকে তুলে নিতে। বাড়ি ফেরার পথে জুলি বৌদি বললেন, একটু মাছ কিনতে হবে, তুমি যাবে আমার সঙ্গে মাছের দোকানে ?

ভাগ্যিস রাজি হয়েছিলুম, তাই আর একটা নতুন জিনিস দেখা হয়ে গেল। অবশ্য বাজারে যেতে আমার সব সময়ই ভালো লাগে।

এ দেশের সব গ্রসারি স্টোরেই মাছ পাওয়া যায়। নানা রকমের মাছ, কুচো

মাছ, কাটা মাছ, বড় বড় আস্তো মাছ, আধ সেদ্ধ মাছ, কিন্তু সবই ফ্রোজেন। বরফে জমিয়ে কাঠ। বাড়িতে এনে সেগুলো অনেকক্ষণ ধরে থ করার পর রাঁধতে হয়।

কিন্তু জুলি বৌদি আমায় নিয়ে এলেন টাট্‌কা মাছের বাজারে। এ এক অপূর্ব বাজার, এখানে প্রত্যেকটি দোকানই ভাসমান। বন্দরের জেটির চার পাশ ঘিরে রয়েছে অনেকগুলো লঞ্চ। সেই সব লঞ্চের বারান্দা কিংবা সামনে পেতে রাখা পাটাতনেই বিক্রি হচ্ছে মাছ। খুব ছেলেবেলায় দেখা পদ্মার বুকে ইলিশ মাছের নৌকোগুলোর কথা মনে পড়ল। এখানেও এক এক দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে এক একটা ছোকরা হাঁকাহাঁকি করছে, এদিকে আসুন, এদিকে, ভালো মাছ, টাট্‌কা মাছ!

মাছ অনেক রকম, ভেট্‌কির মতন কাৎলার মতন, পার্শের মতন, বান মাছের মতন, আড় মাছের মতন। সবই কিন্তু মতন, আসল নয় এগুলো সামুদ্রিক মাছ। আরও নানা রকম অদ্ভুত চেহারায় মাছ, যার সঙ্গে আমাদের চেনা কোনো মাছই মেলে না। সামুদ্রিক জীবজন্তুও বিক্রি হচ্ছে মনে হয়। একমাত্র চিংড়িটাই আসল। তবে বাগদা বা গল্‌দা নয়, কলকাতার বাজারে যাকে বলে চাবড়া চিংড়ি, সেইগুলোই রয়েছে। অর্থাৎ সাদা রঙের চিংড়ি।

জুলি বৌদি অনেক চিংড়ি কিনলেন। এক দোকানে বেশ বড় বড় কাঁকড়া রয়েছে, তা দেখে জুলি বৌদির চোখ চকচক করে উঠলো। আমায় জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কাঁকড়া খাও, নীলু?

আমি হুতোমের অনুকরণে উত্তর দিলুম, জলচরের মধ্যে নৌকো, খেচরের মধ্যে ঘুড়ি আর চতুষ্পদের মধ্যে খাট ছাড়া আমি সবই খাই!

জুলি বৌদি মুখ ম্লান করে বললেন, আমিও কাঁকড়া খুব ভালোবাসি, আমার ছেলেমেয়েরাও ভালোবাসে। কিন্তু মুশকিল হয়েছে কী জানো, তোমার রমেনদা নিজে তো কাঁকড়া খায়ই না, বাড়িতে রান্না হলেও সে গন্ধ সহ্য করতে পারে না।

একই চিন্তা করে জুলি বৌদি আবার বললেন, এক কাজ করলে হয়। কাঁকড়া নিয়ে তো যাই। ও বাথরুমে ঢুকলে রান্না করে ফেলবো। ও বাথরুমে ঢুকলে অন্তত এক ঘণ্টা লাগে, তার মধ্যে রান্না হয়ে যাবে। তারপর…তারপরও ও যদি এবার বাড়ি থেকে বেরোয়, তখন আমরা চট করে খেয়ে নেবো। কী বলো? ঘরে রুম ফ্রেশনার ছড়িয়ে দেবো, তা হলে ও আর গন্ধ পাবে না!

সেই রকমই হলো। কাঁকড়া কিনে নিয়ে যাওয়া হলো, রমেনদা স্নান করতে ঢুকলে রান্নাও সেরে ফেলা হলো। কিন্তু খাওয়া হবে কি করে? রমেনদার অফিস ছুটি, ওঁর তো বাড়ি থেকে বেরুবার কোনো প্রয়োজনও নেই, ইচ্ছেও নেই। জুলি

বৌদি মাঝে মাঝে আমার দিকে তাকাচ্ছেন, মেয়েরা মায়ের সঙ্গে চোখাচোখি করছে, কিন্তু রমেনদার বাইরে বেরুবার কোনো লক্ষণই নেই।

জুলি বৌদি একবার জিজ্ঞেস করলেন, তুমি ড্রিংকস বা সিগারেট কিনতে যাবে না?

রমেনদা গম্ভীরভাবে বললেন, আমার সব স্টক আছে।

ঘণ্টাখানেক বাদে একটা টেলিফোন এলো। ওঁদের এক মেয়ে ফোন করছে ইউনিভার্সিটি থেকে। তার গাড়িটা খারাপ হয়ে গেছে। এখন সে কী করবে?

রমেনদা দারুণ বিরক্ত হয়ে উঠলেন। এখন তাঁকে যেতেই হবে। তিনি না গেলে গাড়ি সারাবার কোনো ব্যবস্থা করা যাবে না।

রমেনদা বললেন, এই জন্যই আমি আমেরিকান গাড়িগুলো একদম পছন্দ করি না। এর চেয়ে আমাদের দেশের অ্যামবাসেডর গাড়ি কত ভালো! পানের দোকানেও পার্টস পাওয়া যায়, যে-কেউ সারিয়ে দিতে পারে। এখানে গাড়ি খারাপ হলেই খরচের রাম ধাক্কা।

অন্য গাড়িটা নিয়ে রমেনদা বেরিয়ে গেলেন। আমরা অমনি তাড়াতাড়ি কচর মচর করে কাঁকড়া খেয়ে নিলুম। যে মেয়েটি আত্মত্যাগ করলো, তার জন্য কিছুটা রেখে দেওয়া হলো আলাদা করে। সে পরের দিন কোনো এক সুযোগে খেয়ে নেবে। রমেনদা ফেরার আগেই ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে ফেলা হলো সব কিছু।

রমেনদা ফিরলেন অনেকটা প্রসন্ন মুখে। গাড়িটার বিশেষ কিছু হয়নি, স্টার্ট বন্ধ হয়ে গিয়েছিল শুধু, আবার ঠিক হয়ে গেছে।

এবার আমায় অফিসিয়ালি খেতে বসতে হলো রমেনদার সঙ্গে। কিন্তু আমি আর খাবো কী করে, পেটে আর জায়গা নেই। খাবারগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করছি শুধু।

রমেনদা মুখ তুলে বললেন, কী যে আজ-বাজে রান্না করো, ও বেচারি খেতেই পারছে না। ভালো কিছু করতে পারো না? এখানে ভালো কাঁকড়া পাওয়া যায়, কাল কাঁকড়া এনে নীললোহিতকে খাইয়ো!

রমেনদা এবার জুলি বৌদির দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলেন।

॥ ৩৫ ॥

কয়েকদিন বেশ এক টানা, আড্ডা হলো। এলেন আরও বাঙালীরা। সন্ধের পর জমলো গান ও কাব্য-টাব্য পাঠ। তারপর একদিন সকালবেলা রমেনদা গা ঝাড়া

দিয়ে বললেন, চলো, নীললোহিত, তোমায় একটা মনে রাখবার মতন জায়গা দেখিয়ে আনি।

ওঁদের দুই মেয়ে মুনু আর মোম ইচ্ছে থাকলেও যেতে পারবে না। কারণ ওদের ক্লা ে আছে। বেলাবেলি বেশ মিষ্টি রোদে আমরা বেরিয়ে পড়লুম, সঙ্গে কফির ফ্লা- ক আর ফলটল। রাস্তার দু'পাশে ঝুরো ঝুরো বরফ পড়ে আছে, মাঝে মাঝে দু'এক পশলা তুষার পাত হয়ে যাচ্ছে। গাড়ি চলেছে নির্জন প্রকৃতির মধ্য দিয়ে। মাঝে মাঝে দু'একটা ছোট গ্রাম, যা শহরও বলা যায়। এই ছোট্ট গ্রাম-শহরগুলোই যেন এক একটা স্বাস্থ্যকর বেড়াবার জায়গা, এখানে রয়েছে বড় বড় কয়েকটা হোটেল আর পর্যটকদের আকর্ষণ করার জন্য লোভনীয় বিজ্ঞাপন। বড় শহরের টান টান করা জীবন থেকে বেরিয়ে এসে দু'চার দিনের জন্য এই পাহাড়ের কোলে আর জঙ্গলের পাশে কয়েকদিন কাটিয়ে যাওয়া বেশ চমৎকার ব্যাপার। কয়েক ঘণ্টা মাত্র গাড়ির যাত্রা।

যেতে যেতে রমেনদা এক সময় বললেন, এ দেশে আমি কোন জিনিসটা খুব মিস করি জানো? মনে করো খুব একটা বৃষ্টির দিন, তার মধ্যে বেরিয়ে পড়লুম, সুবর্ণরেখা কিংবা রূপনারায়ণ নদীর ধারে একটা ছোট্ট চায়ের দোকান, সেখানে বসে বসে মুড়ি, তেলে-ভাজা আর কাঁচা লঙ্কা খেতে খেতে বৃষ্টি দেখা। সে আনন্দ এ দেশে পাবার উপায় নেই!

বুঝলুম, রমেনদার মধ্যে এখনো একটা বেশ রোমান্টিক মন গেছে। এই ধরনের লোকরা প্রায়ই দুঃখ পায়।

নদীর ধারে ছোট্ট চায়ের দোকান নয় অবশ্য, আমরা মধ্যাহ্ন ভোজ সারতে ঢুকলুম বার্গার কিং-এ। ম্যাকডোনালড্স এ যেমন কফি ও আলু ভাজা বিখ্যাত, বার্গার কিং-এর হ্যাম বার্গারের স্বাদে ও চেহারায় বেশ বিশেষত্ব আছে। এক একটি দোতলা হ্যামবার্গার একা খেয়ে প্রায় শেষ করা যায় না।

এই দোকানে একটা বিজ্ঞপ্তিতে দেখলুম যে কোনো কোকাকোলার ছিপিতে বিশেষ একটা চিহ্ন থাকলে আর একটি কোকাকোলা বিনামূল্যে পাওয়া যাবে। আমরা তিনটি কোকাকোলা নিয়েছিলুম, তিনটিতেই সেই চিহ্ন। নিয়ে এলুম বিনে পয়সায় তিনটে। সেগুলোর ছিপিতেও আবার সেই চিহ্ন। এ তো মহা মুশকিল। এত কোকাকোলা নিয়ে আমরা কী করব? এক সঙ্গে এত তো খাওয়া যায় না। শেষের তিনটি কোকাকোলার বোতলের ছিপি আর আমরা ভয়ে খুললুম না, সঙ্গে নিয়ে চললুম গাড়িতে।

ক্রমশ রাস্তা জন বিরল হয়ে আসছে। পাশে কোথাও ফসলের খেত, কোথাও বা জঙ্গল। এখানে জঙ্গলের মধ্যেও কিন্তু মানুষ থাকে, অবশ্য তারা জংলি নয়।

এক এক সময় দেখতে পাই এই জঙ্গলের রাস্তা দিয়েই চলেছে স্কুলের বাস, মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে আছে মায়েরা, তাদের বাচ্চারা বাস থেকে নেমেই ছুটে যাচ্ছে মায়ের কাছে। এক কালে এই অঞ্চলে রেড ইণ্ডিয়ানদের ঘন বসতি ছিল, এখন আর একজনও চোখে পড়ে না।

আরও একটু দূর যাবার পর চোখে পড়লো ব্লু রীজ পর্বতমালা দূর থেকে সব পাহাড়কেই দেখতে এক রকম। কিন্তু এই ব্লু রীজ পর্বতমালা পৃথিবীর প্রাচীনতমদের মধ্যে একটি। এর বয়েস প্রায় এক শো কোটি বছর। আমাদের হিমালয় এর তুলনায় ছেলে মানুষ। আল্‌পস বা অ্যাণ্ডিজও এর চেয়ে বয়েসে ছোট। এই পৃথিবীতে যখন কোনো জন্তু জানোয়ার ছিল না, ঝোপ ঝাড় বা বৃক্ষও জন্মায়নি, সেই আদিম যুগে এই প্রস্তরস্তূপ দানা বেঁধেছে।

এই ব্লু রীজ পর্বতমালার গায়েই আছে বিখ্যাত শেনানডোয়াহ উপত্যকা এবং শেনানডোয়াহ ন্যাশনাল পার্ক। কিন্তু আমাদের গন্তব্য সেদিকে নয়। আমরা যাচ্ছি একটা গুহা দেখতে। গুহা বললে অবশ্য কিছুই বোঝা যায় না। লুরে ক্যাভার্ন সারা পৃথিবীর বিখ্যাত দ্রষ্টব্য স্থানগুলির অন্যতম।

বিকেল বিকেল আমরা পৌঁছোলুম সেখানে। ওপরটা দেখলে কিছুই বোঝবার উপায় নেই। গোটা কয়েক দোকান, জিনিস পত্রের ও খাবার দাবারের। টিকিট কেটে লিফটে নামতে হয় নিচে।

রমেনদ নেকবার দেখেছেন বলে নিচে নামবেন না, তাঁরা ওপরেই রয়ে গেলেন। আটজনের একটা দলে আমি জায়গা পেলুম, সেই দলে রয়েছেন আর একজন বাঙালী মহিলা। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন একজন গাইড, আমি আবার ঐ বাঙালী মহিলার গাইড।

মাটির অনেক নিচের গুহায় ঘুটঘুটে অন্ধকার থাকবার কথা। কিন্তু কোথাও কোথাও সেই অন্ধকার অবিকৃত রাখা রয়েছে, আবার কোথাও কোথাও ব্যবস্থা করা হয়েছে লুকোনো আলোর। এমনই চমৎকার ব্যবস্থা যে কোথাও আলোর নগ্ন বাল্‌ব বা টিউব দেখতে পাওয়া যায় না, যেন অনৈসর্গিক এক দীপ্তি বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

প্রকৃতি দেবী চল্লিশ কোটি বছর ধরে শিল্পীর মতন খোদাই করে নির্মাণ করেছেন এই লুরে ক্যাভার্ন। মাটির অনেক নিচে যেন এক অমরাবতী। দেখতে দেখতে বিস্ময়ে চোখ জুড়িয়ে আসে।

বারবার বাঙালী মেয়েটি আমাকে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন, সত্যিই। এসব মানুষে তৈরি করেনি? এমনি এমনি হয়েছে?

আমার তখন মনে হয়, মানুষ এখনো এত সুন্দর স্থাপত্য নির্মাণ করতে

শেখেনি। যেমন আকাশের অনেক রকম রঙ দেখি, কোনো শিল্পীর তুলিতে আজও তো যথাযথ সেই রকম রঙ দেখলুম না।

পৃথিবীতে যখন বিপুল উত্থান পতন চলছিল, সেই সময় সৃষ্টি হয় এই বিশাল গুহাটি। প্রায় এক বর্গ মাইল। এর মধ্যে চাপা পড়ে গিয়েছিল কিছু জল ও বাতাস। সেই জল ও বাতাসের তুলি ও বাটালিতে তৈরি হয়েছে নানা রকম রঙের ডিজাইন এবং অনেক রকম আকার। কোথাও মনে হয় পাতা আছে একটা সিংহাসন, কোথাও উঠে গেছে বিরাট মন্দিরের মহান কারুকার্য করা থাম। নিউ ইয়র্ক শহরটিকে দূর থেকে যে-রকম দেখায়, এক জায়গায় দেওয়ালে ফুটে উঠেছে অবিকল সেই রকম একটি মডেল। এক জায়গায় রয়েছে যেন সদ্য ভাজা একটা ডিমের পোচ, অবশ্য সেটা রক পাখির ডিম হতে হবে। এক জায়গা পুরোপুরি একটা গীর্জার অভ্যন্তরের মতন, সেই জায়গাটির নামও দেওয়া হয়েছে "ক্যাথিড্রাল"। সেখানে রাখা আছে একটি অর্গান, তাতে একটু ঝংকার তুললেই গম্‌গম্ করে এক অপূর্ব রাগিণীর সৃষ্টি হয়।

খানিকটা ঘুরতে ঘুরতে শরীরে রোমাঞ্চ লাগে। মনে হয়, আমরা যেন দেবতাদের গোপন আস্তানায় হঠাৎ এসে হাজির হয়েছি। এখানে জোরে কথা বলতে ইচ্ছে করে না, মনে হয়, তা হলে এর পবিত্রতা নষ্ট হয়ে যাবে।

মাঝে মাঝে কাকচক্ষু জল জমে আছে। তার মধ্যে পড়ে আছে প্রচুর পয়সা। এ দেশের লোকরা পবিত্র জল দেখলে মানত করে পয়সা দেয়, আমাদের দেশে যে রকম লোকে গঙ্গায় পয়সা ছুঁড়ে দেয়। এক এক জায়গায় দেখলুম, খুচরো পয়সায় প্রায় দশ বারো-হাজার টাকা হবে। নিচু হয়ে হাত বাড়ালেই সে পয়সা তুলে আনা যায়। কিন্তু কেউ নেয় না। আমাদের মহিলা গাইডটি বললেন, বছরের শেষে এরকম প্রায় সত্তর-আশী হাজার ডলার পাওয়া যায়, সে টাকা দিয়ে দেওয়া হয় কোনো অনাথ আশ্রমকে।

যদিও একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান প্রথমে এই গুহাটি "আবিষ্কার" করে এবং এখন তারাই এটা পরিচালনা করছে, তবু এই বিস্ময়কর গুহাটির অস্তিত্ব জানা ছিল রেড ইণ্ডিয়ানদের। এর মধ্যে একটি রেড ইণ্ডিয়ান কিশোরের কঙ্কাল পাওয়া গেছে। দূর অতীতে কোনো একদিন সে এই গুহায় ঢুকে পথ হারিয়ে ফেলেছিল।

আর একটি জায়গায় পাওয়া গেছে কিছু পোড়া কাঠ কয়লা ও জন্তুর হাড়। সম্ভবত রেড ইণ্ডিয়ানদের একটি ছোট দল এখানে লুকিয়ে ছিল এক সময়, তারা রান্না বান্না করে খেয়েছে।

এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের লোকেরা দৈবাৎ

দেখতে পায় যে এক জায়গায় মাটি ফুঁড়ে ঠাণ্ডা হাওয়া বেরুচ্ছে। তখন জায়গাটি অনেকখানি খুঁড়ে ফেলে তারা দেখতে পায় তাদের স্বপ্নের অতীত এক বিশাল প্রাকৃতিক রাজপ্রাসাদ। এখানকার বাতাস এতই ঠাণ্ডা যে সেই বাতাস নিয়ে সে-যুগে প্রথম এয়ার কণ্ডিশানিং ব্যবস্থা চালাবার চেষ্টা হয়েছিল।

এখনো লুরে ক্যাভার্নের পরিচালনা সেই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের হাতেই এবং তারা লাভও করে নিশ্চয়ই। কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তারা এই অতল গুহায় কোনো রেস্তোরাঁ বসায়নি। বিরাট চিৎকারের গান-বাজনার ব্যবস্থা করেনি এবং প্রকৃতির ওপর খোদকারি করে আরও সুন্দর করবার চেষ্টা করেনি। তারা পুরো জায়গাটিকে নিখুঁত অবিকল রাখার ব্যবস্থা করেছে।

আমাদের দেশে এরকম সুবৃহৎ কিংবা অপূর্ব সৌন্দর্যময় গুহা কোথাও আছে কি না আমি জানি না। হয়তো এখনো সেরকম আবিষ্কৃত হয়নি। তবে ছোট আকারের যে-গুলি আছে, সেগুলি রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থার কথা ভাবলেই হৃৎকম্প হয়। মধ্যপ্রদেশের পাঁচমারীতে আমি এর থেকে অনেক ছোট হলেও একটা চমৎকার গুহা দেখেছিলুম। আমাদের দেশের যে-কোনো প্রাকৃতিক বিস্ময়কর জায়গাতেই তো একটা মন্দির বানিয়ে তোলা হবেই। আর মন্দির মানেই নোংরা আবর্জনা, দুর্গন্ধ। ঐ পাঁচ মারীতেই এক জায়গায় পাথরের বুকে রোদ-বৃষ্টি বাতাসের ভাস্কর্যে একটি মহাদেবের ছবির আদল ফুটে উঠেছিল। এরকম একটা জিনিসকে যেমন আছে ঠিক তেমনটি রাখলেই যে সৌন্দর্য খোলে, সেটা অনেকেই বোঝে না। সেই মহাদেব মূর্তিটির গায়ে বিকট হলুদ আর নীল রঙ বুলিয়ে দিয়েছে কেউ, মাথায় আবার একটা সাপ এঁকে দিয়েছে। ফলে, সেটার দিকে আর তাকানোই যায় না।

লুরে ক্যাভার্নের মধ্যে অনেকক্ষণ ধরে ঘুরলেও ক্লান্তি লাগে না। গাইডের কাছ ছাড়া হয়ে পথ হারিয়ে ফেললে খুবই বিপদের সম্ভাবনা। এক একবার আমার লোভ হচ্ছিল অন্ধকারের মধ্যে হারিয়ে যাই। তারপর বহুকাল পরে সেই রেড ইণ্ডিয়ান কিশোরটির মতন এই ভারতীয়টিরও হাড় গোড় অন্যরা খুঁজে পাবে।

তা অবশ্য হলো না, ওপরে উঠে এলুম যথা সময়ে।

বাড়ি ফিরলুম ঘোর সন্ধের পর। একটু পরেই টেলিফোন বেজে উঠলো। রমেনদা ধরে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমায় ডাকছে।

আবার বিস্ময়। টেলিফোন করছে কামাল। নিউ ইয়র্কের কাছে স্কারসডেলে ওর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল একদিন। কামালের জানার কথা নয় যে আমি এখানে এসেছি। এসে কার বাড়িতে উঠেছি তা তো কেউ জানে না। তবু কোন মন্ত্রবলে

কামাল ঠিক এখানে টেলিফোন করেছে।

কামাল বললো, একি, তুমি নিউ ইয়র্ক থেকে বস্টনে না এসেই ওয়াশিংটন ডিসি তে চলে গেলে যে ? ওটা তো উল্টো দিকে ? না, না, ওসব চলবে না। শিগগির বস্টনে চলে এসো। কালই—।

॥ ৩৬ ॥

একটা আশী-নব্বই বছরের অট্টালিকা ইওরোপের মানদণ্ডে এই তো সেদিনকার, আর মার্কিন দেশের বিচারে রীতিমতন প্রাচীন। অনেক হাইওয়ের পাশে পাশে নির্দেশ থাকে, কাছেই একটা ঐতিহাসিক দ্রষ্টব্য স্থান, দেখবার জন্য এখানে থামুন। কয়েকবার থেমে বেশ ঠকেছি। এইখানে সত্তর বছর আগে প্রথম ঘোড়ার গাড়ি ও মোটর গাড়ির রেস হয়েছিল, কিংবা 'নব্বই বছর আগে এইখানে অমুক চন্দ্র অমুক প্রথম ঘুড়িতে চেপে শূন্যে উঠেছিল', এইরকম। আমরা পাঁচ সাত শো বছরের কম কিছু হলে তাকে ঠিক ইতিহাস বলে মানতে চাই না। কিন্তু অত বছর আগে আমেরিকান নামে কোনো জাতই ছিল না পৃথিবীতে।

এ দেশের তুলনায় বস্টন বেশ বনেদী শহর। এখানেই রয়েছে এ দেশের শ্রেষ্ঠ দুটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হার্ভার্ড এবং এম আই টি। দু'একটি পাড়া দেখলে চমকে উঠতে হয়। মনে হয় মার্কিন দেশ তো নয়, হঠাৎ যেন লণ্ডনে চলে এসেছি। বাড়িগুলির শ্রী-ছাদ একেবারে ব্রিটিশ ধরনের। আমেরিকার নতুন শহর মানেই অতি ঝকঝকে চকচকে ঢাউস ঢাউস সড়কে ভর্তি। কিন্তু বস্টনে এখনো কিছু সরু সরু রাস্তা আছে, কলেজ-পাড়ায় সেরকম কোনো রাস্তায় গেলে আমাদের মনে পড়তে পারে কলকতার কলেজ স্ট্রিটের কথা। মানুষের অভ্যেসই হলো নতুন অভিজ্ঞতার সঙ্গে পুরোনোকে মিলিয়ে দেখা। এক একজন মহিলা থাকেন যাঁরা কোনো নতুন লোক দেখলেই বলেন, একে ঠিক ছোট বৌদির ভাইয়ের মতন দেখতে না ? কিংবা, আমাদের পাড়ার দর্জির মতন, কিংবা সঞ্জয় গান্ধীর মতন, কিংবা উত্তমকুমারের ছোট ভাইয়ের মতন।

হয়তো বস্টনের কলেজ পাড়ার সেই রাস্তার সঙ্গে কলকাতার কলেজ স্ট্রিটের কোনো মিল অ-কলকাতাবাসী কারুর চোখে পড়বে না। কিন্তু আমরা মিল খুঁজে পাই। মনে হয় যেন ছাত্র-ছাত্রীদের স্বভাবও একই রকম।

বাস স্টেশন থেকে কামাল নিয়ে এলো তার বাড়িতে। সেখানে এসে পেয়ে গেলুম চমৎকার এক আড্ডার পরিবেশ। ব্যবসায়ী কথাটার সঙ্গে বোহেমিয়ান

চরিত্রটি কিছুতেই মেলানো যায় না। কিন্তু কামালকে বলা যায় সত্যিকারের বোহেমিয়ান ব্যবসায়ী। তার পায়ের তলায় সর্ষে, সে প্রায়ই সারা দুনিয়া টো-টো করে ঘুরে বেড়ায়, তার মুখে সব সময় নানারকম ব্যবসার পরিকল্পনা, কিন্তু আসলে সে রয়েছে একটা স্বপ্নের জগতে।

কামালের সঙ্গে থাকে তার ভাগ্নে খুস্‌নুদ্। এই খুস্‌নুদ্ কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্সের ছাত্র, এখন এখানে পড়াশুনো করতে এসেছে, তার মুখে এখনো লেগে আছে কৈশোরের শ্রী। এক একটা মুখ থাকে, যা প্রথম দেখলেই খুব ভালো লেগে যায়। খুস্‌নুদের মুখখানা সেই ধরনের। সব সময় একটা দুষ্টু দুষ্টু হাসি লেগে আছে ঠোঁটে। পড়াশুনোতে সে খুবই ভালো, আবার হাসিমুখে সে যে কত রকম কাজ করতে পারে তার ঠিক নেই। এই চা বানাচ্ছে সকলের জন্য, কিংবা ডিম সেদ্ধ করে ফেললো ডজনখানেক, আবার ধাঁ করে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে মাখন কিংবা চাল কিনে আনতে।

এই খুস্‌নুদের মাকে আমি কলকাতায় দেখেছি। কোনো কোনো মানুষকে সময় স্পর্শ করতে ভয় পায়। ওঁর রয়েছে সেই রকম স্থির লাবণ্য।

বসবার ঘরে বসে আছেন সলিল চৌধুরী। নিউ ইয়র্কের বাঙালীদের অনুষ্ঠানে তাঁকে ক্ষণেকের তরে দেখেছিলুম। এখানে তাঁকে খুব কাছাকাছি দেখার সৌভাগ্য অর্জন করলুম। একটি দক্ষিণ ভারতীয় তরুণীও রয়েছে সেখানে, সে সেতার বাজায়। আধুনিক সঙ্গীত জগতে সলিল চৌধুরী যে কত বড় প্রতিভা এ মেয়েটি বোধহয় তা ঠিক জানে না, তাই সে অকুতোভয়ে ওঁর সঙ্গে তর্কে মেতে উঠেছে। তরুণীটি শুধু বিশুদ্ধ রাগ সঙ্গীতের অনুরাগিনী। তর্কের বিষয় বস্তু হলো, সঙ্গীতের জনপ্রিয়তা। তরুণীটির বক্তব্য, বিশুদ্ধ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সকলের জন্য নয়, ইনিসিয়েটেড বা অনুপ্রানিতদের জন্য। প্রকৃত সমঝদার ছাড়া এই সঙ্গীতের বিশুদ্ধতা রক্ষা পাবে না। আর সলিল চৌধুরী বলতে লাগলেন, সমস্ত মানুষ, সাধারণ গরিব-দুঃখী মানুষের কাছেও সঙ্গীতকে পৌঁছতে হবে। অন্তত পৌঁছবার চেষ্টা করতে হবে।

এ তর্কের কোনো মীমাংসা নেই, তাই আমি চুপ করে বসে বসে শুনতে লাগলুম। অবশ্য তর্কযুদ্ধ তো নয় নিজের নিজের মত প্রতিষ্ঠার চেষ্টা তাই ওঁদের দু'জনেরই যুক্তিগুলো শুনতে বেশ লাগছিল।

প্রথম দিনের আড্ডা শেষ হলো প্রায় রাত দু'টোয়। পরের দিন দুপুর থেকেই একটা পিকনিকের আবহাওয়া শুরু হয়ে গেল। বাইরে অবিশ্রান্ত বরফ পড়ছে। ঠিক আমাদের বর্ষার মতন, এই রকম দিনে খিচুড়ি আর ইলিশ মাছ ভাজা খুব জমে। তারই কাছাকাছি কিছু একটা বিকল্প রান্না হবে, এক এক জন এক একটা

পদ রান্না করবে। অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্টের ইংরেজি প্রবাদ হলো অধিক পাচকে তরকারি নষ্ট। সুতরাং আমি রান্না টান্নার ব্যাপার থেকে দূরে রইলুম।

আস্তে আস্তে চড়ুইভাতির দলটাও বেশ বড় হলো। খুস্‌নুদ্ ডেকে আনলো তার বন্ধুদের। এসেছে সলিল চৌধুরীর ছেলে বাবুন। এই সপ্রতিভ যুবকটি নিউইয়র্কে সাউণ্ড রেকর্ডিং-এর ব্যাপারে পড়াশুনো করছে, এখন বোস্টনে এসেছে বেড়াতে। ডেকে আনা হলো শর্মিলা বসুকে। নেতাজী পরিবারের মেয়ে শর্মিলা শরৎ বোসের পৌত্রী, যেমন রূপসী, তেমন বিদূষী আবার তেমনই ভালো রবীন্দ্র সঙ্গীত গায়। খুব ঠাণ্ডা স্বরে আস্তে আস্তে কথা বলে শর্মিলা, কিন্তু কুটুস কুটুস করে মাঝে মাঝে বেশ মজার মন্তব্যও করে।

শর্মিলা আলাদা অ্যাপার্টমেণ্ট নিয়ে থাকে, সে জন্য প্রায়ই তাকে নিজের রান্না করতে হয়। সেই জন্য সেও পিকনিকের রান্নার ঝামেলায় গেল না। সে আলাদা বসে টি ভি খুলে একটা মহাজাগতিক বিষয়ের অনুষ্ঠান দেখতে লাগলো খুব মন দিয়ে। একটু বাদেই সে নিজেও নিমগ্ন হয়ে গেল মহাকাশে।

কামালের বাড়িতে ঘরের সংখ্যা অনেক, কিন্তু একটি মাত্র ঘরেই তিনখানা টিভি। এর কারণ শুধু কামালই জানে।

আর একটি মেয়ের নাম মহুয়া মুখার্জি। এর মুখে বাংলা শুনলে যেন কেমন কেমন লাগে। মনে হয় যেন লক্ষ্ণৌ কিংবা দেরাদুনের প্রবাসী বাঙালী পরিবারের মেয়ে। তা কিন্তু নয়। মহুয়া প্রায় জন্ম থেকেই আছে ভারতবর্ষের বাইরে, বাবা-মায়ের সঙ্গে কাটিয়েছে, বিভিন্ন দেশের ভারতীয় দূতাবাসে, এখনও ওর বাবা-মা রয়েছেন ভিয়েনায়, ইন্দ্রাণী এখানে এসেছে পড়াশুনো সমাপ্ত করতে।

অনেক দেশ ঘোরার জন্য অনেকগুলো ভাষা শিখেছে মহুয়া। কলকাতার সঙ্গে তার যোগাযোগ ক্ষীণ হওয়া সত্ত্বেও সে বাংলা শিখেছে নিজের চেষ্টায়। সে একটু সচেতন উচ্চারণে পরিষ্কার বাংলা বলে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলুম। তুমি কেন বাংলা শিখলে, মহুয়া?

সে অবাক হয়ে উত্তর দিল, বাঃ, বাংলা না শিখলে এরকম একটা সুন্দর ভাষা থেকে বঞ্চিত থাকতুম যে!

সত্যি কথা বলতে কী, মহুয়ার মতন একটি সরল, তেজস্বিনী মেয়ের সঙ্গে আগাগোড়া ইংরেজিতে কথা বলতে হলে আমি বেশ দুঃখিতই হতুম!

আরও এলেন একটি বাঙালী দম্পতি এবং আর কয়েকজন, কিন্তু সকলের সঙ্গে আর সেরকম আলাপ পরিচয়ের সুযোগ হলো না।

সদা ব্যস্ত কামালকে মাঝে মাঝে দেখতে পাচ্ছি, আবার হঠাৎ হঠাৎ সে অদৃশ্য

কাজ। এরই মধ্যে অন্তত পঞ্চাশ জায়গায় তাকে দেখা [illegible] প্রত্যেক জায়গাতেই সে ঠিক সময়ে ঘুরে আসে। দক্ষিণ [illegible] জই চলে যাবে। তাকে পৌঁছে দিয়ে আসে এয়ারপোর্টে, [illegible] আড্ডাতেও তাকে দু'পাঁচ মিনিটের জন্য বসতে হবে কিংবা [illegible]র্যের জন্য কুচিয়ে দিতে হবে পেঁয়াজ। আবার আমাদের নিয়ে সে শহরটা দেখিয়ে আনতে চায়। রাস্তার ধারের কোনো দোকানে বসে কফি খাওয়াও দরকার। এত সব কাজ কর্ম নিয়ে কামাল যেন প্রত্যেক দিনের চব্বিশ ঘণ্টাকে টেনে আটচল্লিশ ঘণ্টা লম্বা করে ফেলে।

মামা ভাগ্নের সংসারটি খুস্‌নুদই চালায় বোঝা গেল। স্বপ্ন-পাগল মামাটিকে খানিকটা সামলে রাখার দায়িত্বও তার। এদের সংসারটি খুব মজার। ব্রেকফাস্ট খেতে বসে মনে পড়ে নুন নেই, তখুনি একজন গাড়ি নিয়ে ছুটে যায় নুন কিনতে। মাছ ভাজার জন্য উনুনে প্যান চাপাবার পর দেখা যায় তেলের শিশি শূন্য। আবার একজন ছুটলো দোকানে। কিন্তু বাড়ির যত লোকই আসুক, সকলেই সুস্বাগতম, সকলকেই বলা হবে, আরে, বসো, বসো। এখানে খেয়ে যাও আজ!

বাঙালীর আড্ডা মানে জায়গা ছেড়ে নড়া নেই। রান্না ঘরেই আমরা যে-যার এক একটি চেয়ার নিয়ে বসে গেছি। কামালই এক সময় আমাদের জোর করে তুললো। শহরটা এক চক্কর ঘুরিয়ে দেখাবে।

তার স্টেশান ওয়াগানটিই তার দ্বিতীয় সংসার। এতে থাকে তার জামা-কাপড়, সংক্ষিপ্ত বিছানা, কাগজ-টাগজ আর ব্যবসার জিনিসপত্র। এটা নিয়ে সে প্রায় অর্ধেক আমেরিকা চষে বেড়ায়। সেই সব জিনিস টিনিস টেনে নামিয়ে সে আমাদের জন্য জায়গা করে দিল। তারপর হুস করে ছেড়ে দিল গাড়ি।

কামালকে গাইড হিসেবে নিলে দু'মিনিটে তাজমহল দেখা হয়ে যায়, এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং দেখতে লাগবে এক মিনিট, গ্র্যাণ্ড কেনিয়ান দেখা হয়ে যাবে তিন মিনিটে আর মাউণ্ট এভারেস্ট ঘুরে আসতে বড় জোর পাঁচ মিনিট লাগতে পারে।

চলন্ত গাড়ি থেকেই সে বলতে লাগলো, ঐ দ্যাখো এম আই টি, ঐ যে হার্ভার্ড, আর এটা কী যেন, খুব বিখ্যাত জায়গা এখন নাম মনে পড়ছে না, আর ঐটা হলো—।

সলিল চৌধুরীই এক সময় বললেন, ওহে মুস্তাফা, এবারে একটু থামাও তো। কোথাও একটু চুপ করে দাঁড়াই!

গাড়ি চলছিল একটা পার্কের পাশ দিয়ে, সেখানেই ব্রেক কষে কামাল বললো, এই পার্কে যাবেন ?

নামা হলো সেখানেই। প্রায় সন্ধে হয়ে এসেছে, বরফ পড়া বন্ধ হয়ে দারুণ ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে। সেই জন্য পার্কটি এখন জন বিরল।

সেই পার্কে পা দিয়েই আমার মনে পড়লো ভের্লেনের কবিতা : শীতের নির্জন পার্ক, চতুর্দিকে ছড়ানো তুষার/দুটি ছায়ামূর্তি এইমাত্র হলো পার। সত্যিই বরফ ছড়িয়ে আছে এখানে সেখানে। পার্কের মাঝখানের হ্রদটির জলও প্রায় অর্ধেকটা জমে শক্ত হয়ে গেছে। শন্‌শনে হাওয়া লেগে কাঁদছে উইলো গাছগুলো। নিষ্পত্র চেরিগাছগুলোর ডালে এমন থোকা থোকা বরফ জমে আছে যে ঠিক মনে হয় ফুল।

হঠাৎ আমার খেয়াল হলো, আমরা সবাই গরম জামা-কাপড় পরে এসেছি। কিন্তু কামালের গায়ে শুধু একটা জামা। আমি ওভারকোট আনতে ভুলে গেছি। পরে আছি অন্য একটা জ্যাকেট, তাতেই আমার শীত লাগছে। আস্তে আস্তে কাঁপুনি দিচ্ছে শরীরে। আর কামাল শুধু একটা জামা পরে দাঁড়িয়ে আছে কী করে ?

আমি জিজ্ঞেস করলুম, কী ব্যাপার, তুমি কোট-ফোট আনোনি ?

বুকের ওপর দু'হাত আড়াআড়ি রেখে কামাল বললো, ঠিক আছে। আমার অত শীত লাগে না।

আমার এরকম অবস্থা হলে আমি দৌড়ে গিয়ে গাড়িতে উঠতুম। কারণ গাড়ির ভেতরটা গরম। কিন্তু কামাল সত্যি দাঁড়িয়ে রইলো। ক্যামেরা বার করে ছবি তুলতে লাগলো অনেকে, তখনও কামাল শীতে কাঁপছে না।

আমাদেরই গরজে আমরা ফিরে এলুম গাড়ির উষ্ণতায়। এবার প্রস্তাব উঠলো, গরম কফি খাওয়ার।

সলিল চৌধুরী বললেন, তার সঙ্গে যদি গরম গরম পেঁয়াজি কিংবা ফুলুরি পাওয়া যেত, তা হলে আরও ভালো হতো !

কামাল বললো, চলুন, সেরকম জিনিসই খাওয়াবো।

শহর ছাড়িয়ে বেশ খানিকটা দূরে একটা নিরিবিলি দোকানের সামনে গাড়ি থামালো কামাল। পরিষ্কার, ঝকঝকে বেশ বড় দোকান, কিন্তু এখন প্রায় ফাঁকা। কাউণ্টারে একজন মহিলা। খাদ্য-তালিকা দেখে কোনটা যে কী তা আমরা ঠিক বুঝতে পারি না, কিন্তু খুসনুদ সব জানে। সে অর্ডার দিয়ে দিল চটপট। কামাল গাড়ি পার্ক করে এলো একটু পরে। তার মধ্যেই অর্ডার দেওয়া হয়ে গেছে দেখে সে নিজে আবার একটা কিছু যোগ করে দিল।

ছোট্ট ছোট্ট বেতের ঝুড়িতে এলো পকৌড়ার মতন একটা কিছু। বেশ সুস্বাদু। তারপর চিংড়ি মাছ ভাজা। কফির স্বাদও উত্তম। গল্প জমে গেল আমাদের।

এক সময় দেখি টেবিলের ওপরে কতকগুলো ছাপানো কাগজ পড়ে আছে। এই দোকানের পরিচারিকাদের ব্যবহারের কিংবা খাদ্যের গুণাগুণ কিংবা অন্য কোনো বিষয়ে যদি খদ্দেরদের কোনো অভিযোগ থাকে, তবে তা জানাবার জন্যই এই ফর্ম। খাদ্য বিষয়ে আমাদের কোনো অভিযোগ নেই, কিন্তু আমরা সকলেই এক মত হলুম যে এই দোকানটির বাইরের চাকচিক্যের তুলনায় বাথরুমটি বেশ নোংরা। আমেরিকানদের পরিচ্ছন্নতার বাতিক আছে তারা বাথরুম-সজাগ এবং জলের ব্যবহারে অকৃপণ। সুতরাং এরকম অপরিচ্ছন্ন বাথরুম সত্যিই ব্যতিক্রম। তাই সেই অভিযোগ জানাবার সুযোগ পেলেই কিছুটা লিখে দিতে ইচ্ছে করে। তাই সেই ছাপানো ফর্মে আমরা বাথরুম বিষয়ে খুব কড়া করে লিখলুম।

তারপর সবাই মিলে উঠে যখন বেরিয়ে যাচ্ছি তখন কাউন্টারের মহিলাটি এমন মিষ্টি করে হাসলো যে আমার মাথা ঘুরে গেল। বিনা পয়সায় এমন মিষ্টি হাসি ক'জন দেয় ? অন্যরা বেরিয়ে যাচ্ছে, আমি থমকে দাঁড়িয়ে বললুম, আমি আসছি।

টেবিলের কাছে ফিরে গিয়ে সেই অভিযোগ পত্রটি তুলে নিয়ে ছিঁড়ে ফেললুম। জীবনে আর কোনো দিন আমি এই রেস্তোরাঁয় হয়তো আসবো না; শুধু শুধু এরকম একটা বাজে অভিযোগ লিখে যাওয়ার কোনো মানে হয় না।

বেরুবার সময় মেয়েটি আর একবার সেই রকম হাসি দিয়ে ধন্য করে দিল আমাকে। ইস্ট কোস্টের মেয়েদের হাসির খ্যাতি আমি ওয়েস্ট কোস্টেই শুনে এসেছিলুম, এই প্রথম তার চাক্ষুষ প্রমাণ পেলুম।

॥ ৩৭ ॥

এবারে একটা ক্যামেরা না কিনলেই নয়। এত জায়গায় ঘোরাঘুরি করছি, এসব ছবিতে ধরে রাখলে পরে সে সব ছবির দিকে তাকিয়ে বেশ দীর্ঘশ্বাস ফেলা যাবে। সকলেই সে রকম করে। যে-কোনো বিখ্যাত জায়গাতে গেলেই দেখি অন্য সবাই ক্যামেরা বার করে ঝিলিক মারতে শুরু করেছে। আমার ক্যামেরা নেই, তাই একটু বোকাবোকা লাগে। শুধু তাই নয়, অন্য কারুর ক্যামেরার ফোকাসের মধ্যে ঘোরাফেরা করছি কি না, সে ভেবেও সন্ত্রস্ত থাকতে হয়। আমার মতন এলেবেলে লোকের ছবি অন্য কেউ তুলবেই বা কেন !

আমি অনেক পাহাড়ে-জঙ্গলে গেছি বটে, কিন্তু বন্দুক-পিস্তল বা ক্যামেরা কখনো ব্যবহার করিনি। সঙ্গে অতিরিক্ত কোনো জিনিসপত্র রাখার অভ্যেসই আমার নেই।

বেশ ছেলেবেলায় আমার বন্ধু আশু আমায় একবার ছবি তোলার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করেছিল। তার ছিল ক্যামেরার নেশা, তার নিজেরও ছিল বেশ দামী দামী কয়েকটা ক্যামেরা। আমাকে হাত পাকাবার জন্য সে একটা বক্স ক্যামেরা দিয়েছিল। আমি তা দিয়ে মনুমেন্ট, ভিকটোরিয়া মেমোরিয়াল, দক্ষিণেশ্বরের মন্দির ইত্যাদি তুলেছিলাম সারা দিন ঘুরে। পরে দেখা গেল, বারো খানা ফিল্মের একটাও ওঠেনি। এটা নাকি ব্যর্থতার একটা বিশ্ব রেকর্ড। একেবারে নভিসরাও বক্স ক্যামেরায় বারো খানার মধ্যে ছ'খানা তুলতে পারে। সেই থেকে আমি আর ক্যামেরায় হাত দিই নি।

কিন্তু বিদেশে ঘোরাঘুরির সময় একটা ক্যামেরার অভাব খুবই বোধ করতে লাগলুম। মাস তিনেক ধরে দোনা-মনা করার পর একদিন ভাবলুম, নাঃ, এবারে একটা কিনতেই হয়।

ছবি তোলার ব্যাপারটা আজকাল অনেক সহজ হয়ে এসেছে। অ্যাপারচার, ফোকাস ঠিক করা, আলো মাপামাপির দরকার হয় না। কিংবা হয়তো এখনো দরকার হয়, কিন্তু আন্তর্জাতিক ফটোগ্রাফি প্রদর্শনীতে প্রথম পুরস্কার পাবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা তো আমার নেই, কোনো রকম কাজ-চালানো ছবি তোলার জন্য অনেক সহজ ক্যামেরা বেরিয়েছে।

সবচেয়ে সহজ হচ্ছে পোলারয়েড ক্যামেরা। চোখের সামনে ক্যামেরাটি ধরে শাটার টেপো, আর সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে আসবে ছবি, একেবারে হাতে গরম। দোকানে যাবার ঝঞ্ঝাটও নেই। কিন্তু এ ক্যামেরা এদেশে একেবারে বাচ্চারা ব্যবহার করে। জয়তীদি-দীপকদার ছ'বছরের মেয়ে ছুটকি এই ক্যামেরায় পটাপট ছবি তুলতো। সুতরাং রাস্তায়-ঘাটে ঐ রকম ক্যামেরা আমার হাতে দেখলে লোকে হাসবে।

সস্তায় আরও নানা ধরনের ইনস্টোম্যাটিক ক্যামেরা পাওয়া যায়, যাতে ছবি তোলা খুবই অনায়াসের ব্যাপার, কিন্তু মুশকিল হচ্ছে সে রকম ক্যামেরা দেশে নিয়ে গেলে একেবারে অকেজো হয়ে যাবে। ওদের ফিল্ম্ বা ব্যাটারি আমাদের দেশে পাওয়া যায় না। আজকাল অধিকাংশ ক্যামেরাতেই নানা রকম ব্যাটারির কারসাজি থাকে।

বিখ্যাত, দামী যে-সব ক্যামেরার নাম শুনলে আমাদের দেশের অনেক শৌখিন ফটোগ্রাফারের চোখ চকচক করে ওঠে, সেরকম কোনো ক্যামেরা

কেনার সাধ্যও আমার নেই, ইচ্ছেও নেই। এখনকার পরিচিতরা আমায় পরামর্শ দিয়েছিল, মাঝারি দামের মধ্যে মজবুত ক্যামেরা যদি কিনতে চাও, তা হলে ইণ্ডিয়ান দোকান থেকে কিনো। কারণ, ওরা বলতে পারবে, কোন্ ক্যামেরার ফিল্ম্ বা ব্যাটারি দেশে পাওয়া যাবে, দরকার হলে মেরামতও করা যাবে।

গিয়েছিলুম নিউইয়র্কের সেরকম একাধিক দোকানে। এদেশের "ইণ্ডিয়ান" দোকানগুলির প্রায় অধিকাংশেরই মালিক পাকিস্তানী। এত দূর দেশে ভারতীয় ও পাকিস্তানীরা অনেক ব্যাপারেই একরকম। সবাই যে ভারতীয় উপ মহাদেশের মানুষ, সেই একাত্মতা এখানে এলে ভালো করে বোঝা যায়।

কিন্তু ঐ সব "ইণ্ডিয়ান" দোকানে মাঝারি বলেই যে-সব ক্যামেরা আমাকে দেখিয়েছে, তার দাম আমার পকেটের সাধ্যের বাইরে। পারলে হয়তো আমি অতি সস্তায় কোনো সেকেণ্ডহ্যাণ্ড ক্যামেরাই কিনে ফেলতুম, কিন্তু যে-হেতু ওভারকোট আর ক্যামেরা এক নয়, তাই ঠিক ভরসা হয় না তবে, ওয়াশিংটনে থাকবার সময় একটা ক্যামেরার দোকানে অবিশ্বাস্য রকমের রিডাকশান সেল-এর বিজ্ঞাপন দেখে ঢুকে পড়েছিলুম। কোনো জিনিস দোকানে বেশী দিন জমে গেলেই এরা এরকম করে। সুতরাং রমেনদার কাছ থেকে নৈতিক সমর্থন নিয়ে নতুনের প্রায় অর্ধেক দামে কিনে ফেললুম একখানা ক্যামেরা। অলিম্পাস টু। ছোট্টখাট্টো স্মার্ট চেহারা, কলকব্জার বিশেষ ঝামেলা নেই, এমনকি ভুল-প্রতিশোধক কয়েকটি ব্যবস্থাও আছে। দোকানদারের কাছ থেকেই শিখে নিলুম নিয়ম-কানুন। সেই সঙ্গে পেলুম আরও অনেক ছাপানো কাগজ পত্র, যা পড়লে প্রচুর জ্ঞান লাভ হয়। মোদ্দা কথা, এ ক্যামেরায় অন্ধও ছবি তুলতে পারে।

পৃথিবীর ঠিক উল্টো দিকে বলেই এ দেশে অনেক ব্যাপারও উল্টো। আমাদের দেশে কালো-সাদা ছবিরই চল এখনও বেশী, রঙীন ছবির ফিল্মের দামও বেশী আর পরিস্ফুটন ও ছাপানোতেও অনেক ঝকমারি। আর এ দেশে সাদা-কালো ফিল্ম অতি দুর্লভ, যদি বা পাওয়াও যায়, তার ডেভলপিং-প্রিন্টিং-এর খরচ রঙীনের চেয়ে অনেক বেশী, অনেক জায়গায় সাদা কালো ছবি ফোটানো ও ছাপানোর ব্যবস্থাই নেই। সুতরাং আমি ভরে নিলুম রঙীন ফিল্ম।

একটা ক্যামেরা হাতে থাকার সুবিধে এই যে রাস্তায় ঘাটে যখন তখন এক চোখ টেপা যায়। ভদ্রসমাজে এক চোখ টেপার অধিকার শুধু ফটোগ্রাফারদেরই আছে। তাছাড়া এক গাদা লোকের সামনে হঠাৎ ঝপাং করে হাঁটু গেড়ে বসা যায়, কোনো বিখ্যাত দৃশ্যের সামনে দাঁড়িয়ে একটা ক্যামেরা খুলে অনায়াসেই

কাছাকাছি লোকদের সরে দাঁড়াতে বলতে পারা যায়।

প্রথম দফায় অতি উৎসাহে বারোখানা ছবি তুলে ফেললুম মাত্র দু'দিনে। নদীর ছবি, গাছের ছবি, সূর্যাস্তের ছবি, পার্কে সুন্দরী মেয়েদের নাচের ছবি, অর্থাৎ যা যা তুলতে হয় আর কি! এদেশে অনেক ক্যামেরার দোকানে একদিনের মধ্যেই, এমনকি এক ঘন্টার মধ্যে নেগেটিভ ফোটানো ও ছাপানো হয়ে যায়। সে রকম এক দোকানে আমার রোলটি জমা দিয়ে এলুম।

পরদিন ছবি আনতে গিয়েই চমক। কাউন্টারে দাঁড়িয়ে এক ভাবুক ও দার্শনিক চেহারার যুবক। আমার রসিদ দেখাতেই সে অনেকগুলি খামের মধ্য থেকে আমার খামটি খুঁজে বার করে আনলো। তারপর সেটি খুলে সে ছবিগুলো দেখতে লাগলো গভীর মনোযোগ দিয়ে। ছবিগুলো সে দেখে আর এক একবার আমার মুখের দিকে তাকায়। আস্তে আস্তে তার ললাটে ফুটে ওঠে বিস্ময় ও চিন্তার ঢেউ।

আমার বুক ধড়াস ধড়াস করতে লাগলো। ব্যাপার কি, এবারেও কি আমার একটাও ছবি ওঠে নি? জাপানের বিখ্যাত অলিমপাস টু ক্যামেরা দিয়েও কি এতখানি ব্যর্থতা সম্ভব? কিংবা, আমি এমনই ভালো ছবি তুলে ফেলেছি যে এই যুবকটি বিশ্বাসই করতে পরছে না।

ছেলেটি অস্ফুট ভাবে বললো স্ট্রেঞ্জ! ভেরি স্ট্রেঞ্জ!

আমি আবার ফাঁপরে পড়লুম। না হয় আমার ছবিগুলো খারাপ হয়েছে, কিংবা একটাও ওঠেনি, তাতে স্ট্রেঞ্জ বলার কী আছে?

আমি পকেটে হাত দিয় বললুম, কত দিতে হবে?

ছেলেটি বললো, তোমার ক্যামেরাটা একটু দেখতে পারি কি?

আমি ঝোলা থেকে ক্যামেরাটা বার করে দিলুম ওর হাতে। সে ক্যামেরাটা নেড়ে চেড়ে, ভেতরটা খুলে দেখে বললো, এটা তো ঠিকই আছে মনে হচ্ছে।

আমি এবারে বুক ঠুকে জিজ্ঞেস করলুম, আমার ছবিগুলো ঠিক নেই বুঝি?

সে খানিকটা ইতস্তত করে বললো না, মানে, ছবিগুলো ঠিকই আছে, কিন্তু রঙের ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না, তুমি বরং নিজেই দ্যাখো।

আমি খামটা টেনে নিয়ে ছবিগুলো ছড়িয়ে ফেললুম। অদ্ভুত ব্যাপার! অলৌকিক!, আমার তোলা নদী, গাছ, সূর্যাস্ত, পার্কে মেয়েদের নাচ—সবই উঠেছে, সবাইকেই চেনা যায়, কিন্তু সকলেরই রঙ শুধু হলদে! গাছ-নদী-মেয়েরা তো বটেই, এমনকি সূর্যাস্ত পর্যন্ত হলুদ। আজকালকার রঙীন ছবিতে লাল-নীল-গোলাপি ইত্যাদি সব রঙই ফোটে, আমার ছবি শুধু হলুদ কেন?

যুবকটির মুখের দিকে তাকাতেই সে বললো, আমি আগে কখনো এরকম

দেখিনি। ঠিক বিশ্বাসই করতে পারছি না!

আমাদের দেশে ব্যাঙ্কের চেক ফেরৎ দেবার সময় যেমন একটি ছাপানো কাগজ দেয়, অনেকগুলো কারণের মধ্যে একটাতে টিক দেওয়া থাকে। এরাও ছবি ছাপানোর সঙ্গে দেয় সেই রকম একটা ছাপানো কাগজ, কিন্তু আমারটাতে কোনো ছাপানো কারণেই দাগ দেওয়া নেই, তলায় হাতে লেখা আছে। সম্ভবত রোলটা ক্যামেরায় ভরার সময় কিছু গণ্ডগোল হয়ে থাকবে। অর্থাৎ আমার ছবির খুঁতের আসল কারণটা এরা ধরতে পারেনি, ব্যাপারটা অভিনব।

ছেলেটি অপরাধীর মতন বললো, হয় সব রঙ আসবে, অথবা ছবিগুলো কালো হয়ে যাবে, কিন্তু শুধু হলদে রঙটা কী করে এলো···

কিছুকাল আগে একটা স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান ফিল্ম খুব হৈ চৈ তুলেছিল। ফিল্মটির নাম 'আই অ্যাম কিউরিয়াস—ইয়োলো!' টাইম সাপ্তাহিকে ছবিটির সমালোচনার হেডিং দেওয়া হয়েছিল, 'আই অ্যাম ফিউরিয়াস—রেড!' এই হলদে ছবিগুলো দেখে আমারও টাইম পত্রিকার সমালোচকের মতন মনের অবস্থা। পল গগ্যাঁ হলদে রঙের মেয়ে এঁকেছেন। কিন্তু ফটোতে শুধু হলদে রঙের মেয়ে যে এত খারাপ দেখায় তা আমি কি আগে জানতুম! হলদে রঙের গাছও অতি বিকট ব্যাপার।

আমি বললুম, ওসব আমি জানি না। তোমরা আবার ভালো করে প্রিন্ট করে দাও!

ছেলেটি বিনীত ভাবে বললো, তোমার এই নেগেটিভে নতুন করে প্রিন্ট করলে আর ভালো করা যাবে না। তুমি বরং আর একটা রোল তুলে দিয়ে যাও, সেটা আমরা বিনা পয়সায় করে দেবো!

কিন্তু ততদিনে সেই শহর ছেড়ে আমি চলে গেছি।

তা বলে আমি হতোদ্যম হয়ে ছবি তোলায় ইস্তফা দিলুম না, আবার নতুন রোল ভরে নিলুম ক্যামেরায়। আবার ছবি তুলতে লাগলুম ঝপাঝপ।

দ্বিতীয় রোলটি ডেভেলপ করতে দিলুম বস্টনে। এবারে আর কোনো রকম এদিক ওদিক নয়, সব কটি ছবিই উঠেছে। সেটা আমার কৃতিত্ব না হোক, জাপানী ক্যামেরার কৃতিত্ব তো বটেই। লাল-নীল-সবুজ-হলদে সব রঙগুলোও ঠিকঠাক। তবে ছবিগুলো একটু ঝাপসা-ঝাপসা, কিন্তু সে দোষ আমার নয়, সব সময় ঝিরিঝিরি বরফ পড়লে আমি কী করবো? দোষটা আকাশের।

সুতরাং ছবি তোলার ব্যাপারে আমার বেশ একটা আত্মবিশ্বাস জন্মে গেল। এখন আমি মাটিতে শুয়ে কিংবা রেলিং-এর ওপরে দাঁড়িয়ে নতুন নতুন কায়দায় অস্থিরকে শাশ্বত করে রাখি। অন্ধকারেও পরোয়া নেই, ফ্ল্যাস আছে। এমন

স্পর্শকাতর শাটার যে একটু আঙুলের ছোঁয়া লাগতে না লাগতেই সেটা পড়ে যায়। ফলে আমার বুট জুতোর ছবি, আমার বাঁ হাতের তিনটি আঙুলের ছবি, গাড়ির চাকার অর্ধেকটার ছবি, এমনকি নিছক শূন্যতার ছবিও উঠে গেল বেশ কয়েকটা। এ হলো নিউ ওয়েভ ফটোগ্রাফি! কোনো বিখ্যাত ফটোগ্রাফার শুধু একজোড়া বুট জুতোর ছবি তোলার কথা কখনো স্বপ্নেও ভেবেছে? ভ্যান গঘ্ সেই কবে বুট জুতোর ছবি এঁকেছিলেন, তারপর এতদিন পরে আমি সেরকম ছবি ক্যামেরায় তুললুম।

বস্টন থেকে আবার ফিরে এসেছি নিউ ইয়র্কে। গত মাসের নিউ ইয়র্ক ছিল শুধু আমার নিজের চোখে দেখা, এবারে ক্যামেরার চোখে। আগেরবারে আমি ছিলুম স্বাধীন, যখন যেখানে খুশী গেছি। এবারে আমার মধ্যে একটু বেশ টুরিস্টের মতন ভাব এসেছে, অবশ্য-দ্রষ্টব্য স্থানগুলো আর না দেখলেই নয়।

যেমন এর আগে যতবার নিউ ইয়র্কে এসেছি, কোনোবারই স্ট্যাচু অব লিবার্টি দেখা হয়নি। ঐ মর্মর মহিলাটিকে দূর থেকেই স্তুতি জানিয়েছি। কিন্তু এবারে মনে হলো, ওর কাছে গিয়ে আমার নিজের হাতে ছবি তোলা অবশ্য কর্তব্য।

কাছাকাছি যাওয়ার ঝামেলা আছে। হাডসন নদীর ওপর একটা ছোট দ্বীপে আছে ঐ বিশ্ববিখ্যাত মূর্তিটি। ম্যানহাটনের হৃৎপিণ্ডের কাছে একটা পার্ক, সেখান থেকেও দূরবীনে দেখা যায়, অথবা ফেরি স্টিমারে কাছাকাছি যাওয়া যায়। আমি এসে পড়েছি রবিবারে, ফেরির জন্য লম্বা লাইন। কিছুক্ষণ একটা বেঞ্চে বসে রইলুম। একবার গেলুম একটা দোকানে কফি-হ্যামবার্গার খেয়ে আসতে, তখনও লাইন খুব বড়। অত বড় লাইনে দাঁড়াবার ধৈর্য আমার নেই। এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করছি।

হঠাৎ খেয়াল হলো, ক্যামেরা? যাঃ! সেটা তো নেই! এর মধ্যে কোথায় যেন ফেলে এসেছি! কোথায়? যে-বেঞ্চটায় বসেছিলুম একটু আগে, সেখানে নিশ্চয়ই। দৌড়োতে দৌড়োতে গেলুম সেদিকে।

কাছাকাছি গিয়েই একটা স্বস্তির নিশ্বাস পড়লো। যাক, পাওয়া গেছে। এক জোড়া তরুণ দম্পতি দাঁড়িয়ে আছে, স্বামীটির হাতে আমার ক্যামেরা, তার স্ত্রী নদীর দিকে তাকিয়ে হাসি মুখে পোজ দিয়ে আছে। তা তুলছে তুলুক না। আমি ঠিকানা জেনে নিয়ে পরে ওদের ছবির কপি পাঠিয়ে দেবো।

ওরা দু' তিনখানা ছবি তোলার পর আমি কাছ ঘেঁষে দাঁড়ালুম। স্বামীটি আমার দিকে ভুরু কুঁচকে তাকাতেই আমি হেসে বললুম, ভুল করে আমার ক্যামেরাটা ফেলে গিয়েছিলুম, অলিমপাস টু।

ছেলেটি ততোধিক ভুরু কুঁচকে বললো, কী বলছো? কার ক্যামেরা?

আমি বললুম, তোমার হাতে অলিমপাস টু দেখছি, মানে আমিও আমারটা ফেলে গেছি, ওটা কি তোমার?

ছেলেটি বললো, নিশ্চয়ই!

বলেই সে একটা অতি সুদৃশ্য কেসের মধ্যে ক্যামেরাটা ভরে ফেললো। তা হলে কি আমি আমারটা এখানে ফেলিনি? স্টিমার ফেরির কাউন্টারের কাছে? ওখানে একবার খোঁজ নিতে গিয়েছিলাম।

আবার দৌড়োলুম সেদিকে। সেখানেও একজন লোকের হাতে অলিমপাস টু। এবারে সতর্ক হয়ে জিজ্ঞেস করলুম, আমি এখানে একটা ক্যামেরা ফেলে গেছি, এই খানিকটা আগে।

লোকটি কোনো উত্তর না দিয়ে নিজের ক্যামেরাটা লুকিয়ে ফেললো।

সেই লাইনে আরও দু'তিন জনের হাতে আমি দেখলুম ঐ একই ক্যামেরা। এখানেও নিশ্চয়ই ফিফটি পারসেন্ট রিডাকশন সেল দিচ্ছে।

শেষ চেষ্টা হিসেবে গেলুম কফির দোকানে। তার কাউন্টারের ওপর জ্বলজ্বল করছে আর একটা অলিমপাস টু। আমি অবশ্য কাউন্টারে দাঁড়াইনি, টেবিলে বসেছিলুম, তবে ওখানে ক্যামেরাটা গেল কী করে? কোনো সহৃদয় লোক বোধহয় ওটা পেয়ে এখানে রেখে গেছে।

দোকানদারকে কিছু জিজ্ঞেস না করে ক্যামেরাটা তুলে নিয়েই বেরিয়ে গেলুম গট গট করে। ঠিক সেই মুহূর্তে বাথরুম থেকে একটা লোক বেরিয়ে কী যেন বলতে লাগলো, আমি আর তাতে কান না দিয়ে হাঁটতে লাগলুম জোরে জোরে। একেবারে পার্ক ছেড়ে বাস স্টপের দিকে।

পরের দিন সেই ছবির রোল ডেভেলপ করে আবার একটি সাঙ্ঘাতিক চমক। ওর একটা ছবিও আমার তোলা নয়। সব অচেনা নারী পুরুষ ও অদেখা দৃশ্য।

কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে ভাবলুম, কী আর করা যাবে!

মানুষের জীবনটাই নশ্বর, নিছক কিছু ছবি আমার তোলা কিংবা অন্য কারুর, তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে আর কী হবে!

॥ ৩৮ ॥

নিউ ইয়র্কে সারা বছর ধরেই আন্তর্জাতিক ফিল্ম ফেসটিভাল চলছে বললে বিশেষ অত্যুক্তি হয় না। অসংখ্য সিনেমা হল, তাতে দেখানো হয় সারা পৃথিবীর বাছাই করা চলচ্চিত্র। এছাড়া বিভিন্ন মিউজিয়াম ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানে থাকে বিখ্যাত

পরিচালকদের রেট্রোসপেকটিভ। আর প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ের আছে নিজস্ব অডিটোরিয়াম ও সারা বছরব্যাপী নির্বাচিত চলচ্চিত্র প্রদর্শনী। সেখানে টিকিটের দাম সস্তা এবং বাইরের লোকেরও সেখানে প্রবেশের কোনো বাধা নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা শুধু আমেরিকান ছবি দেখে না, তারা দেখে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রগুলি।

আমেরিকান সিনেমার এখন বেশ খারাপ অবস্থা চলছে। হলিউড একসময় রোমান্স ও হাই ড্রামার পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিল। সেই সব বিষয়বস্তু এখন আর চলে না। বীভৎস রকমের হিংস্রতা কিংবা যৌনতার বাড়াবাড়ি দেখিয়ে কিছুদিন বাজার মাৎ করার চেষ্টা চলেছিল, এখন তাও পুরোনো হয়ে গেছে। 'স্টার ওয়ারস' খুব চলেছিল কল্প-বিজ্ঞানের চাকচিক্যের জন্য, কিন্তু তার পরের ছবি, 'এম্পায়ার স্ট্রাইকস ব্যাক' তত বেশী দর্শক টানতে পারেনি। সেই ফর্মূলায় 'সুপার ম্যান' বেশ চললেও, 'সুপার ম্যান টু' একঘেয়ে লেগেছে। অনেকদিন পর 'রেইডারস অফ দা লস্ট আর্ক' নামে একটা ভয়াবহ শিহরণ-জাগানো ছবি আবার বক্স-অফিস ফাটিয়েছে। এর বিষয়বস্তুখানিকটা অলৌকিক, খানিকটা কল্প-বিজ্ঞান আর অনেকটাই হিংস্রতা। যতক্ষণ ছবিটা চলে ততক্ষণ কাঁটা হয়ে বসে থাকতে হয়, আমি তো বেশ কয়েক জায়গায় চোখ বুজে ফেলেছি। মানুষের মুখ মোমের মতন গলে যাচ্ছে, এই দৃশ্য কি দেখা যায়?

হলিউডের ছবির সম্মান বর্তমানে হু হু করে নেমে যাচ্ছে। খুব বড় কোনো পরিচালক নেই, সীরিয়াস ফিল্মের সংখ্যা খুবই কম। 'রেড্‌স', 'র‍্যাগ টাইম' ইত্যাদি কিছু সীরিয়াসধরনের চেষ্টা দেখেও মন ভরলো না। 'ফ্রেঞ্চ লিউটেনান্টস্ উয়োম্যান' সম্প্রতি কালের একটি বিখ্যাত উপন্যাস, তার চিত্ররূপ দেখেও হতাশ হলুম। এর চিত্রনাট্য লিখেছেন বিখ্যাত নাট্যকার হ্যারল্ড পিন্টার। পিন্টার অতিরিক্ত কায়দা করতে গিয়ে ছবিটির রস নষ্ট করলেন। গল্পটি গত শতাব্দীর একটি প্রেম কাহিনী, পিন্টার তাঁর চিত্রনাট্যে মাঝে মাঝে ইন্টার কাট করে এই ফিল্মের নায়ক নায়িকাদের ব্যক্তি জীবনের টুকরো দেখিয়ে বুঝিয়ে দিতে চাইলেন, প্রেমের সমস্যা এ যুগেও একরকম। তবে এই ছবির নায়িকা হিসেবে মেরিল স্ট্রিপ অসাধারণ। মেরিল স্ট্রিপ এই দশকের প্রধান আবিষ্কার। ভারতীয় দর্শকরাও অনেকে মেরিল স্ট্রিপকে চেনেন নিশ্চয়ই, 'ক্রেমার ভার্সাস ক্রেমার'-এর নায়িকাকে মনে নেই?

বর্তমান কালের ছবির যখন এরকম দৈন্য দশা চলে, তখন হঠাৎ হঠাৎ পুরোনো আমলের কিছু কিছু ছবি আবার জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। পুরোনো কোনো অভিনেতা বা অভিনেত্রীকে নিয়ে হুজুগ ওঠে। যেমন, দু'এক বছর ধরে খুব

শোনা যাচ্ছে, হামফ্রি বোগার্ট অসাধারণ অভিনেতা ছিলেন, তাঁর জীবৎকালে তাঁর প্রতিভার ঠিক সম্মান দেওয়া হয়নি। সমস্ত শহরগুলিতে দেখানো হচ্ছে হামফ্রি বোগার্টের পুরোনো ছবি। আফ্রিকান কুইন। কাসাব্লাঙ্কা, স্যাব্রিনা ইত্যাদি। ছেলে-ছোকরারা বোগার্টের অনুকরণে কথা বলছে ঠোঁট চেপে। আমি হামফ্রি বোগার্টের ভক্ত, এই সুযোগে তাঁর অনেক পুরোনো ছবি দেখে নিলুম। জন ওয়েন-কেও এইভাবে এখন সম্মান দেখানো হচ্ছে। সেই তুলনায় চার্লি চ্যাপলিন আর তেমন জনপ্রিয় নেই মনে হলো। চার্লির 'লাইম লাইট' দেখতে গিয়ে দেখি হল ফাঁকা।

ফ্রান্স, জার্মানি, পোলাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, জাপান, সুইডেন, ইটালি ইত্যাদি যে-সব দেশের চলচ্চিত্রের বিশেষ খ্যাতি আছে, সেসব দেশের ভালো ভালো ছবি আমেরিকায় বসে অনায়াসেই দেখা যায়। চলচ্চিত্রের ওপর এ দেশে কোনোরকম সরকারি নিয়ন্ত্রণই নেই, এমনকি সেনসরশীপও নেই, তাই এখানকার প্রদর্শকরা পৃথিবীর যে কোনো দেশ থেকেই ভালো ছবি এনে দেখাতে পারে। এমনকি, চীন ও রাশিয়ার ফিল্মও দেখার সুযোগ আছে।

একটি রাশিয়ান ফিল্মের কথা এখানে বলতে চাই। আইজেনস্টাইন পুড়ভকিনের যুগ কেটে গেছে কবে, সম্প্রতিকালের রুশ চলচ্চিত্র সম্পর্কে আমাদের খুব একটা উচ্চ ধারণা নেই। কারণ, ভারতে বসে আমরা যে-সব রাশিয়ান ফিল্ম দেখি, সেগুলি হয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঘটনা, নয় হালকা-অ্যাডভেঞ্চার ধরনের এবং কয়েকটি শেক্‌সপীয়ারের পুনর্নির্মাণ। কিন্তু আমেরিকায় বসে আমি একটি অসাধারণ রুশ ছবি দেখলুম।

ছবিটি বছর দশেকের পুরোনো, নাম সোলারিস। আন্দ্রেই টারকোভস্কি পরিচালিত কল্প-বিজ্ঞান কাহিনী। আমার মতে, এ যাবৎ আমেরিকা যতগুলো বিজ্ঞানভিত্তিক চলচ্চিত্র তুলেছে, তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলো স্ট্যানলি কুবরিক পরিচালিত 'স্পেসঅডিসি।' আর এই 'সোলারি' যেন সেই 'স্পেস অডিসি'রই যোগ্য প্রত্যুত্তর। মহাকাশ অভিযানে রাশিয়া অনেক এগিয়ে থাকলেও এই ছবিতে সে-সব নিয়ে কোনো বাড়াবাড়ি করা হয়নি। চোখ ধাঁধানো কৃত্রিম রকেট-ফকেটও নেই, বরং এই ছবিতে মিশেছে বিজ্ঞানের সঙ্গে দর্শন। দূর মহাশূন্যে সোলারিস নামে অজ্ঞাত ভয়ঙ্কর সমুদ্রের কাছাকাছি এক শূন্যযানে বসে কয়েকজন মানুষ অভিভূত হয়ে যাচ্ছে তাদের মনের রহস্যময় শক্তি অনুভব করে।

ফরাসী ছবি প্রায় সবই দেখা যায় এদেশে। বোধহয় ফরাসীরা প্রত্যেক ছবিতেই ইংরেজি সাব-টাইটল বসিয়ে দেয় এ দেশের বিশাল বাজার পাবার

জন্য। ফরাসী ফিল্ম মাত্রই ভালো নয়। কিছু ছবি বেশ বাজে। তবে মাঝারি ধরনের ঝকঝকে তকতকে ছবি তুলতে ফরাসীরা বেশ দক্ষ। সেই সব ছবির বেশ চাহিদা আছে এদেশে। এর পাশাপাশি ত্রুফো, গদার, রেনে'র ছবিও বেশ চলে। ত্রুফোর 'গার্ল নেক্সট ডোর' ছবির জন্য একমাস আগে থেকে টিকিট কাটতে হয়।

কায়দা-কানুনের ব্যাপারে ফরাসী পরিচালকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী টেক্কা দেন অ্যালাঁ রেনে। এর একটি ছবি দেখলুম, যার নামটিতে বেশ মজা আছে। মঁনক্ল দা'মেরিক অর্থাৎ 'আমার আমেরিকান কাকা'। আমেরিকার দর্শদের কথা ভেবেই এইরকম নাম দেওয়া কিনা, সে রকম সন্দেহ জাগতে পারে। কারণ এ ছবিতে আমেরিকার ছিটে-ফোঁটাও নেই, আমেরিকান কাকার কোনো চরিত্রও নেই, ফরাসী নারী-পুরুষদেরই গল্প, শুধু একটি লোক বার দু'এক বলেছে যে তার এক কাকা আমেরিকায় গিয়ে খুব উন্নতি করেছে। ফিল্মটি প্রায় প্রবন্ধ ঘেঁষা, এমনকি এতে ফরাসী জীব বিজ্ঞানী আঁরি লেওরি'র কয়েকটি তত্ত্ব এবং পরীক্ষাও দেখানো হয়েছে। সাদা ইঁদুর ও খাঁচার বন্দী বাঁদরের সঙ্গে মানুষের যে কত মিল, তা ফুটে উঠেছে এক একটা সংকট মুহূর্তে। ছবিটি শেষ পর্যন্ত সার্থক হয়ে ওঠে পরিচালকের মুনশীয়ানায়। এই ধরনের ছবি দেখলে একরকমের আরাম হয়, মনে হয়, চলচ্চিত্র জগতে তবু কেউ কেউ এখনো নতুন ধরনের চিন্তা করছে।

কিছু কিছু ছবি দেখলেই দীর্ঘশ্বাস ফেলে মনে হয়, এইসব ছবি অন্তত বিংশ শতাব্দীর মধ্যে ভারতবর্ষে দেখাবার কোনো সম্ভাবনাই নেই। কোনো কোনো চলচ্চিত্র-উৎসবে দু'চারটে দেখানো হতে পারে। সেইসব সময় টিকিটের জন্য হুড়োহুড়ি ও হ্যাংলামির কথাও সবাই জানে। সাধারণ ভারতীয় দর্শক এইসব ছবি দেখার যোগ্য নয়, কারণ, এর মধ্যে নগ্ন নারী ও পুরুষেরা আছে, সুতরাং আর সব গুণ নষ্ট। এইরকমই একটি ফিল্ম হলো 'টিন ড্রাম'। যদিও আমেরিকায় অস্কার পেয়েছে, তবু চলচ্চিত্র হিসেবে খুব উচ্চাঙ্গের বলে আমার মনে হয়নি। কিন্তু এর আকর্ষণ অন্য, এটি গুনটার গ্রাস-এর নোবেল পুরস্কারজয়ী উপন্যাসের চিত্ররূপ। পরিচালক ভলকার শ্লোনড্রফ্ মোটামুটি বর্ণনামূলক চিত্ররূপ দিয়ে গেছেন।

টিন ড্রামের গল্প নিশ্চয়ই অনেকেই জানেন। তিন বছরের একটি পোলিশ ছেলে অস্কার বড়দের জগৎ যৌন-লাম্পট্য, হিংস্রতা ও হিটলারের নাজিবাদের উত্থান দেখে তিক্ত হয়ে আর বড় হয়ে উঠতে চায়নি। তার শরীর সেখানেই থেমে ছিল। ক্রমে তার বয়েস বাড়লো কিন্তু তার শরীরটা তিন বছরেই রয়ে গেল। তার গলায় ঝোলে একটা টিনের ড্রাম, মন খারাপ হলে সেটা সে বাজায়,

মন খারাপ হলে সে এমন একটা চিৎকার করে যাতে সব কাচ ভেঙে যায়। তার মা ও বাবা দু'জনেই ব্যভিচারী। হিটলারের দাপটে সমস্ত জার্মান জাতটাই মানসিক রোগী। অস্কার এর মধ্যে দিয়ে রেখে যাচ্ছে তার নিজস্ব বামন-প্রতিবাদ। কাহিনীর অভিনবত্বই মনকে দারুণ স্পর্শ করে এবং পরিচালক এর সাহিত্যরূপটা যথাযথ রাখবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এর যৌন দৃশ্যগুলো দেখলে গা শিউরে ওঠে। তিন বছরের ছেলের ভূমিকা তো প্রায় ঐ বয়েসী কোনো শিশুকে দিয়েই করানো হয়েছে, সেই শিশু যখন একটি সতেরো বছরের মেয়ের সঙ্গে যৌন সহবাস করতে যায়, তখন আমি মনে মনে আতঙ্কিত হয়ে ভাবি, সত্যিই কি সবটা দেখাবে ? আভাসে সারবে না? কিন্তু এরা সবটাই দেখিয়ে দেয় !

আমাদের দেশের সাধারণ সিনেমা-দর্শকদের ধারণা আছে যে আমেরিকান সিনেমায় বুঝি খুব অসভ্য ব্যাপার থাকে ! এটা এক সময়ে হয়তো সত্যি ছিল, কিন্তু এখন নেই, আমেরিকানরা এ ব্যাপারে বেশ পিছিয়ে পড়েছে। আমেরিকানরা ভেতরে ভেতরে আসলে রক্ষণশীল ও গোঁড়া, খানিকটা ভণ্ডও বটে। আমরা এক সময় নিরামিষ বাংলা ছবির পাশাপাশি আমেরিকান ছবিতে চুম্বন, খানিকটা নগ্ন বুক ও উরুর ঝলক দেখে রোমাঞ্চিত হতুম, বেশীর ভাগ আমেরিকান ছবি এখনো সেই স্তরেই আছে। কিন্তু জার্মান, ইটালিয়ান, ফরাসীরা এখন আর কিছুই বাদ রাখছে না। সেইসঙ্গে যোগ দিয়েছে জাপানীরা। হাঙ্গেরিয়ান ছবিতেও নগ্নতা জল-ভাত ! এক হাঙ্গেরিয়ান লেখক দম্পতি সত্যজিতের 'অরণ্যের দিনরাত্রি দেখে মহাবিস্ময়ে আমাকে বলেছিল, সে কি এতগুলো ছেলে-মেয়ে এতক্ষণ একসঙ্গে রইলো, কেউ কারুকে চুমু খেল না, একবারও জড়িয়ে ধরলো না ?

আমেরিকায় সরকারি সেনসরশীপ উঠে গেলেও প্রযোজকদের নিজস্ব একটা স্তর-বিন্যাসের ব্যবস্থা আছে। প্রযোজক সংস্থা ছবিগুলো সম্পর্কে আগে থেকে জনসধারণকে জানিয়ে দেবার দায়িত্ব নিয়েছে। অর্থাৎ কোন ছবি সপরিবারে দেখার যোগ্য, কোন ছবি নয়। বিভিন্ন স্তরের ছবির নির্দেশ দেওয়া থাকে। যেমন, কোনো ছবির পরিচয় পত্রে লেখা থাকে পি জি, অর্থাৎ পেরেন্টাল গাইডেন্স, অর্থাৎ সে ছবি বাচ্চাদের দেখা উচিত কি না তা বাবা-মা বুঝবেন। 'আর' মার্কা অর্থাৎ রেসট্রিকটেড। ষোলো বছরের কম ছেলে-মেয়েদের এই ছবি না দেখাই কাম্য। এর পরেরটি হলো 'এক্স', তা অবশ্যই প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য। শুধু যৌন দৃশ্যের জন্যই নয়, বিষয়বস্তুর জন্যও।

এর পরেও আছে 'ডবল্ এক্স।' সেগুলো একেবারেই হার্ড কোর পর্নোগ্রাফি।

আমি আগেই বলেছি, এ দেশের ভদ্র-শিক্ষিত লোকরা তো বটেই, এমনকি ছাত্র-ছাত্রীরাও ঐসব ছবি দেখা পছন্দ করে না। সেই জন্যই ডবল এক্স ছবি বাজার মোটেই ভালো নয়। তবু যে ঐসব ছবি তৈরি হচ্ছে, তার কারণ ওগুলো তোলার খরচ খুব কম। পাহাড়, সমুদ্র বা ঘোড়া ছোটানোর আউটডোর শুটিং তো দরকার হয় না, কয়েকখানা শরীর পেলেই কাজ চলে যায়। ঐসব ছবির বেশীরভাগ দর্শকই নাকি বিদেশী টুরিস্টরা। বিদেশে গিয়ে অনেকেই একটু-আধটু দুষ্টুমী করতে চায়।

এক বিশ্ববিদ্যালয়ের রত্ন রঙ্গালয়ে (বিজু থিয়েটার) একই দিনে দুটি ছবি ছিল। ইটালির পাওলো পাসোলিনির 'অ্যারেবিয়ান নাইটস' আর গ্রিফিথ্-এর বহু পুরোনো ছবি বার্থ অব আ নেশান। পাসোলিনির অ্যারেবিয়ান নাইটস এক্স মার্কা ছবি, তাছাড়াও এর রগরগে যৌন দৃশ্যের কথা অনেক পত্র-পত্রিকায় লেখা হয়েছে। সুতরাং ধরেই নিয়েছিলুম, অ্যারেবিয়ান নাইটসের টিকিটের জন্য বিরাট লাইন পড়বে, এমনকি মারামারিও হতে পারে। টিকিট কাটতে গিয়ে আমি অবাক। গ্রিফিথ-এর ছবির জন্যই লাইন অনেক বড়। বার্থ অফ আ নেশান ১৯১৫ সালের ছবি, তা দেখার জন্য একালের যুবক-যুবতীদের এত উৎসাহ সত্যি বিস্ময়কর। একটি যুবককে আমি জিজ্ঞেস করলুম, তোমরা অ্যারেবিয়ান নাইটস দেখতে আগ্রহী হলে না? সে বললো, ঐ ছবিটা সম্পর্কে আগেই কাগজে পড়েছি, বুঝেছি, এমন কিছু দেখবার মতন নয়।

এই রকমই অভিজ্ঞতা হয়েছিল আরেকবার। এটা বিশ্ববিদ্যালয়ে নয়, তার বাইরে।

পাশাপাশি দুটো সিনেমা হলের একটিতে হচ্ছে 'বডি হীট', অন্যটিতে 'ব্ল্যাক অ্যাণ্ড হোয়াইট লাইক ডে অ্যাণ্ড নাইট'। প্রথম ছবিটির অনেকখানি পরিচয় আছে তার নামের মধ্যে। এক ধনী ব্যবসায়ী তরুণী স্ত্রী তার শরীরের অত্যধিক উত্তাপের তাড়নায় গোপন প্রেমিককে নিয়মিত শয়ন কক্ষে নিয়ে আসে। তারপর তারা দু'জনে মিলে স্বামীটিকে খুন করে ইত্যাদি। অর্থাৎ যৌনতা ও রহস্যকাহিনী মেশানো। এক্স মার্কা ছবি। আর দ্বিতীয়টি একটি জার্মান ছবি, বিশ্ব দাবা প্রতিযোগিতার এক অংশগ্রহণকারীর মানসিক ঝড় ও অতিরিক্ত আত্মগরিমার বিশ্লেষণ। এই দ্বিতীয় ছবিটি লোকে উৎসাহ নিয়ে দেখছে, আলোচনা করছে। আর প্রথম ছবিটির হলে মাত্র পঁচিশ-তিরিশজন দর্শক, টিকিটের দাম কমিয়ে দিয়েও তারা লোক টানতে পারছে না!

সেনসর ব্যবস্থা তুলে দিয়ে এই একটা লাভ হয়েছে, নিষিদ্ধ দৃশ্য বলতে এখন আর কিছু নেই, সেইজন্যই শুধু ঐ ধরনের দৃশ্য দেখবার জন্যই কেউ এখন আর সিনেমা হলে যাবার আগ্রহ বোধ করে না।

॥ ৩৯ ॥

একদিন বিকেলবেলা ভাবলুম, তা হলে নায়েগ্রাটা ঘুরে আসা যাক। এত কাছে এসে একবার নায়েগ্রা দর্শন না করে চলে যাওয়ার কোনো মানে হয় না।

কাছে মানে অবশ্য তিনশো সাড়ে তিন শো মাইল। কলকাতা থেকে জলপাইগুড়ি যেমন কাছেই। বাসে লাগে ছ'সাত ঘণ্টা। কেটে ফেললুম রাত্তিরের বাসের টিকিট। ঝাঁকুনিহীন রাস্তা, নিশ্চিন্তে ঘুমোনো যায়, ভোরবেলা চোখ মেলেই দেখলুম বাফেলো পৌঁছে গেছি।

প্রথমবার জব্বলপুর যাওয়ার সময় আমার ধারণা ছিল, ট্রেন থেকে নেমেই মার্বেল রক দেখতে পাবো। কিন্তু জব্বলপুর স্টেশন থেকে কোনো পাহাড়ই দেখতে পাওয়া যায় না, মার্বেল রক দেখতে হয় নৌকোয় চেপে। সেই রকমই, আমার মনে বোধহয় এই রকম একটা ছবি ছিল যে বাফেলো স্টেশনে পৌঁছোতে না পৌঁছোতেই শুনতে পাবো বিশাল জলপ্রপাতের শব্দ, বাতাসে উড়বে জলকণা, আকাশে আঁকা থাকবে রামধনু।

বলাই বাহুল্য, সে সব কিছুই দেখলুম না, বাফেলো বাস স্টেশনটি অন্য আর পাঁচটা স্টেশনেরই মতন। বরং একটু যেন নিষ্প্রাণ।

কোনো নতুন জায়গায় পৌঁছোলে কিছুক্ষণ একটা অনিশ্চয়তার অস্বস্তি থাকে। এখানে অবশ্য আমার তা নেই। নিউ জার্সি থেকে ভবানী আর আলোলিকা আগেই এখানে ওঁদের আত্মীয় কল্লোল আর টুনুকে খবর দিয়ে রেখেছেন। আমার সঙ্গেও কল্লোলের একবার টেলিফোনে কথা হয়েছিল, সুতরাং সবই ঠিকঠাক। তবে, কার কাছে যেন শুনেছিলুম, কল্লোল একটু ঘুমকাতুরে, খুব ভোরে তাকে বাস স্টেশনে উপস্থিত হতে বলা একটা নিষ্ঠুরতা। আমি পৌঁছেছি ভোর সাড়ে পাঁচটায়। এক্ষুনি কল্লোলকে ফোন না করে আমি কফি আর হট ডগ নিয়ে বসে গেলুম এক জায়গায়। তারপর সময় আর কাটতেই চায় না। একটা স্থানীয় সংবাদপত্র টেনে নিলুম। এইসব স্থানীয় সংবাদপত্রগুলিতে এত বেশী স্থানীয় খবর থাকে যে তাতে বাইরের লোক কোনো রস পায় না। বাফেলো শহরের ট্রাফিক জ্যাম নিয়ে এক পৃষ্ঠা জোড়া আলোচনা পড়ে আমার কী লাভ! কিংবা এখানকার পুরোনো জেলখানাটি ভেঙে আধুনিক ধরনের জেলখানা ভবন বানানো হবে কি না সে সম্পর্কে আলোচনা। আমি এখানে দু'এক দিনের বেশী থাকবো না। ট্রাফিক জ্যামে ভোগবার ভয় আমার নেই কিংবা এখানকার

জেলখানায় পদার্পণ করার গৌরবময় সুযোগও বোধহয় আমার জুটবে না।

সাতটা পনেরোর সময় যখন বাইরে বেশ চড়া রোদ উঠেছে, তখন আমি ফোন করলুম কল্লোলকে। সে বললো। নীললোহিত, তুমি এসে গেছো। দাঁড়াও, আমি এক্ষুনি আসছি। বাস স্টেশন থেকে ওদের বাড়ি যথেষ্ট দূরে। তবু সে প্রায় কয়েক মিনিটের মধ্যেই এসে গেল ঝড়ের বেগে। দেখলেই বোঝা যায়, সে সদ্য বিছানা ছেড়ে উঠেই কোনো ক্রমে জামা-প্যান্ট গলিয়ে চলে এসেছে। চোখ এখনো ভালো করে খোলেইনি।

কল্লোলকে আমি আগে কখনো দেখিনি, কিন্তু প্রথম দেখেই চেনা চেনা লাগলো। পাতলা, মজবুত শরীর, মুখে হাল্‌কা দাড়ি। ওর চেহারাতেই যাদবপুর ইউনিভার্সিটির ছাপ আছে। ঠিক তাই, কল্লোল বসু যাদবপুরের ইঞ্জিনিয়ার। আমি নিজে যদিও কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকবার যোগ্যতাই অর্জন করতে পারিনি, তবু বন্ধু-বান্ধবদের পয়সায় চা-খাবার জন্য কলকাতা-যাদবপুর রবীন্দ্রভারতী ইত্যাদি সব বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যান্টিনেই গেছি। সেই জন্য ছাত্রদের আলাদা আলাদা টাইপগুলো জানি।

কল্লোলকে যদিও এখনো ছাত্র-ছাত্র দেখায়, কিন্তু আসলে সে এখানে খুব দায়িত্বপূর্ণ কাজ করে। তার এখানকার কম্পানি তাকে প্রায়ই চীনে পাঠায় বিশেষজ্ঞ হিসেবে।

গাড়ি ছেড়ে দেবার পর কল্লোল বললো, বুঝলে ভাই, নীলু, প্রত্যেকদিন ভোরবেলা আমায় চাকরির জন্য দৌড়োতে হয়। এ দেশের চাকরিতে বড্ড খাটিয়ে মারে। আজ আমার ছুটির দিন, সেই জন্য বিছানা থেকে উঠতেই ইচ্ছে করছিল না।

আমি কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলুম, আমাকে থামিয়ে দিয়ে সে আবার বললো, না, কিন্তু কিন্তু করবার কিছুই নেই, আমাদের এখানে কেউ এলে আমরা খুব খুশী হই, খুব চুটিয়ে আড্ডা দিই।

আর কিছুক্ষণ যেতে যেতেই ওর সঙ্গে বেশ ভাব হয়ে গেল। বেরিয়ে পড়লো অনেক চেনা শুনো। ওর দু'জন বন্ধু আমারও বন্ধু। তাদের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল আন্দামান যাবার পথে জাহাজে।

কল্লোল আমায় জিজ্ঞেস করলো, তুমি তো এদেশের অনেক জায়গায় ঘুরছো। কেমন লাগছে?

এক কথায় এর উত্তর দেওয়া যায় না। আর যদি একটা মাত্র শব্দেই উত্তর দিতে হয়, তা হলে বলতে হয়, ভালোই!

কল্লোল বলল, আমাদের মতন এত বেশীদিন থাকতে হলে ভালো লাগতো

আমি চমকে উঠে বললুম, কেন, তোমার ভালো লাগে না?

—আমি তো প্রায়ই ফিরে যাওয়ার স্বপ্ন দেখি!

এটা খুবই আশ্চর্যের কথা। কারণ, কল্লোলের দাদা-বৌদি, বাবা-মা সবাই থাকেন এখানে। একই বাড়িতে নয়, কাছাকাছি। বলতে গেলে গোটা পরিবারটাই এ দেশে। সবাই সুপ্রতিষ্ঠিত। তবু তার মন দেশের জন্য ব্যাকুল, এটা বিস্ময়কর তো বটেই!

বাফেলো শহরটি তেমন সুদৃশ্য নয়। কেমন যেন ন্যাড়া ন্যাড়া ভাব। কল্লোলরা থাকে শহর ছাড়িয়ে খানিকটা বাইরে, ওদের রাস্তার নাম প্যারাডাইজ রোড, এই নামটিকে খুবই উচ্চাকাঙ্ক্ষী বলা যায়। কিন্তু ওদের বাড়িটি চমৎকার। বাড়িটি নতুন কেনা হয়েছে, এখনো বেশী আসবাব পত্র আসেনি। এইরকম বাড়িই আমার দেখতে ভালো লাগে, বেশ একটা খোলামেলা ভাব পাওয়া যায়। অত্যধিক জিনিসপত্রে ঠাসা বাড়িগুলোতে ঢুকলে যেন দম বন্ধ হয়ে আসে।

দরজা খুলে দিল কল্লোলের স্ত্রী টুনু। তাকে দেখে চমকে উঠলুম। ঠিক মনে হয় আগে দেখেছি। দেশপ্রিয় পার্কের সামনে কিংবা সাদার্ন এভিনিউ ধরে রঙীন ছাতা মাথায় এরকম একটি যুবতীকে কি আমি হাঁটতে দেখিনি? কিংবা ছবিতে দেখেছি? দক্ষিণ কলকাতার সুন্দরী বললেই এই রকম চেহারার একটি মেয়ের কথা মনে পড়ে।

কল্লোল তার স্ত্রীকে বললো, তুমি একে চা-টা খাওয়াও, আমি ততক্ষণে আর একটু ঘুমিয়ে নিই!

টুনু শুধু উজ্জ্বল রূপসী নয়, তার বেশ একটা ব্যক্তিত্ব আছে। খুব সুন্দর গল্প বলতে পারে সে। লুচি ভাজতে ভাজতে সে আমায় অনেক গল্প শোনালো। সত্যিই সে দক্ষিণ কলকাতার একটি বিখ্যাত পরিবারের মেয়ে। অনেক ভাই-বোনের সঙ্গে সে মানুষ হয়েছে, সেই সব স্মৃতি তার মনে এখনও জ্বল জ্বল করে। তার মায়ের অনেক কথা সে এমন চমৎকার ভাবে বর্ণনা করলো যে আমার মনে হলো, টুনু যদি লিখতো, তা হলে সে নিখুঁত চরিত্র সৃষ্টি করতে পারতো।

টুনুর যে মানুষের চরিত্র পর্যবেক্ষণ করার বিশেষ ক্ষমতা আছে, তার পরিচয় পরে আরও পেয়েছি। আমরা যাদের কাছাকাছি যাবার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারি না, যেমন কোনো নামকরা সাহিত্যিক বা সিনেমা পরিচালক বা অভিনেতা অভিনেত্রী বা গায়ক-গায়িকা, তাঁদের অনেককেই এরা বেশ ভালো চেনে। যাঁরা

নিউ ইয়র্কে বেড়াতে আসেন, তাঁরা অনেকেই একবার নায়েগ্রা দেখবার জন্য বাফেলো ঘুরে যান। তাঁদের আতিথ্য দেয় কল্লোল বা তার দাদা কুশল। কলকাতা থেকে কখনো নাটকের দল বা গানের দলও নিয়ে যায় এরা। মৃণাল সেন, উত্তমকুমার, শর্মিলা ঠাকুর, স্মিতা পাতিলের মতন সব খ্যাতিমানরা এখানে এসে থেকেছেন শুনেই তো আমি রোমাঞ্চিত বোধ করলুম। ভাগ্যিস নেহাৎ চেনা শুনোর জোরে আমিও এখানে জায়গা পেয়ে গেছি!

বিখ্যাত লোকদের নানান্ দুর্বলতাও বেশ লক্ষ্য করে দেখেছে টুনু। স্মিতা পাতিলের বেশী বেশী বিদ্যা জাহিরপনা কিংবা শর্মিলা ঠাকুরের মেমসাহেবীর নানা কাহিনী শুনে আমি বেশ কৌতুক বোধ করি।

দুপুরবেলা কল্লোলের দাদা-বৌদি এসে পড়ায় আরও জমাট আড্ডা জমে গেল। কলকাতা থেকে কত দূরে এই বাফেলো, কিন্তু আড্ডাটা ঠিক কলকাতার মতন।

কুশলের খুব ঝোঁক সিনেমার দিকে। সে বাংলা সিনেমার অনেক খবর রাখে, একটা মুভি ক্যামেরা কিনেছে। কোনো একদিন সে নিজেই একটা ফিল্ম তুলবে।

এইবার তো একবার নায়েগ্রা দেখতে যেতেই হয়। কিন্তু কে নিয়ে যাবে? কল্লোল বললো, আমি নিয়ে যাচ্ছি, কুশল বললো, না, না, তুই থাক আমি নিয়ে যাচ্ছি। অর্থাৎ দু'জনের কারুর খুব ইচ্ছে নেই। কল্লোলের বৌদি কিংবা টুনু যে যাবে না, তা তারা আগেই বলে দিয়েছে। এই অনিচ্ছে খুব স্বাভাবিক। আমার বন্ধু পার্থসারথি চৌধুরী এক সময় ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন দার্জিলিং-এ। কলকাতা থেকে যারাই বেড়াতে যেত সকলেই বায়না ধরতো টাইগার হিলে বিখ্যাত সূর্যোদয় দেখার। এই ভাবে দু'বছরে অন্তত পঞ্চাশ বার টাইগার হিলে গিয়ে সূর্য ওঠা দেখতে হয়েছে তাঁকে। আমিই তো তাঁর সঙ্গে অন্তত তিনবার গেছি। তার ফলে টাইগার হিলে সূর্যোদয়ের ব্যাপারটা নিশ্চয়ই খুব বীভৎস ও বিকট মনে হয় এখন তাঁর কাছে। কেন যে লোকে ভোরবেলা উঠে ঐ জিনিস দেখবার জন্য ছোটে!

নায়েগ্রা সম্পর্কেও কল্লোলদের এই রকমই মনোভাব হবে নিশ্চয়ই।

আমি সঙ্কুচিত বোধ করলুম একটু। বেশ তো আড্ডা হচ্ছে, এই আড্ডা ভেঙে নায়েগ্রা কি দেখতেই হবে? না দেখলেই বা ক্ষতি কী? ছবি টবিতে তো অনেকবার দেখা আছে।

কিন্তু আমাকে বাফেলোতে এসেও নায়েগ্রা না দেখে ফিরে যাবার রেকর্ড করতে দিতে ওরা রাজি নয়। এবং অতিরিক্ত ভদ্রতা দেখিয়ে দুই ভাই-ই এক

সঙ্গে যেতে উদ্যত হলো, আমার আপত্তি তারা শুনলো না।

ওদের বাড়ি থেকে নায়েগ্রা প্রায় দশ বারো-মাইল দূরে। কিংবা কিছু বেশীও হতে পারে। গুঁড়ো গুঁড়ো বৃষ্টির মধ্যে আমাদের গাড়ি ছুটে চললো, জলপ্রপাতের দিকে।

নায়েগ্রা নদীতে আমেরিকা ও ক্যানাডার সীমানা। নদীটি যেখানে প্রপাতিত হয়েছে, সেই মুখের কাছটাতেই একটা দ্বীপ, ফলে প্রপাতটি দু'ভাগ হয়ে গেছে। এক দিকেরটি আমেরিকার, অন্য দিকেরটি ক্যানাডার। তবে এই একটা ব্যাপারে ক্যানাডা জিতে আছে, তাদের দিকের নায়েগ্রাই বিশাল এবং আসল দর্শনীয়। শুধু আমেরিকান দিকটি দেখে ফিরে এলে কিছুই প্রায় দেখা হয় না।

আগে ভারতীয়দের ক্যানাডায় যাওয়ার ব্যাপারে কোনো বাধা ছিল না। এই যাত্রার প্রথমে আমিই তো ক্যানাডায় ঢুকেছি বিনা বাধায়। কিন্তু এর মধ্যে খালিস্তান আন্দোলনকারী একদল শিখ ক্যানাডায় রাজনৈতিক আশ্রয় চাওয়ার ফলে ক্যানাডার সরকার এখন ভারতীয়দেরও বিনা ভিসায় ক্যানাডা সীমান্ত পার হতে দেয় না। আমি অবশ্য এই সব খবর-টবর জেনে আগেই ওয়াশিংটন ডি সি থেকে ভিসা করিয়ে এসেছি।

বিশাল ব্রীজ পেরিয়ে চলে এলুম ক্যানাডার দিকে। কল্লোল ও কাজলের ভিসার দরকার নেই, কারণ ওরা আমেরিকায় বসবাসকারী। জলপ্রপাতটির দিকে এগোতে এগোতে আমি একটু একটু নিরাশ হলুম। মানুষের দাপটে প্রকৃতির মহিমা এখানে খর্ব হয়ে গেছে। আফ্রিকার গভীর জঙ্গলে ডঃ লিভিংস্টোন যেদিন প্রথম ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত আবিষ্কার করেন, তাঁর সেই বিস্ময়ের কথা আমরা একটু একটু অনুমান করতে পারি। একদিন এখানেও নিশ্চয়ই জঙ্গল-টঙ্গল ছিল, তার মধ্যে এই এক নদীর বিরাট অধঃপতন নিশ্চয়ই সবাইকে চমকে দিত। কিন্তু এখন এই জলপ্রপাতকে উপলক্ষ করে গড়ে উঠেছে রীতিমতন এক বাণিজ্য কেন্দ্র। প্রচুর দোকানপাট, হোটেল, টাওয়ারে উঠে দেখবার ব্যবস্থা, রাত্তিরবেলা আলোকসম্পাত, আরও কত কাণ্ড! প্রকৃতি নিয়ে এমন ব্যবসাদারী আমার পছন্দ হয় না। হোটেল-ফোটেল থাকবেই জানি, কিন্তু কিছুটা দূরে সেসব করা যেত না? অন্তত এক মাইল ফাঁকা জায়গা দিয়ে হেঁটে হঠাৎ দেখতে পেলে কত বেশী ভালো লাগতো! তার বদলে গাড়ি চেপেই উপস্থিত হলুম একেবারে নায়েগ্রার গায়ের ওপর।

আমরা ইস্কুলের ভূগোলে 'নায়েগ্রা' নামটাই পড়েছি, কিন্তু বানান অনুযায়ী এর সঠিক উচ্চারণ বোধহয় 'নায়েগ্রা' কিংবা 'নায়েগারা'। আমরা অবশ্য নায়েগ্রাই বলবো। প্রথম দর্শনে এর বিশালত্ব সত্যিই বুকে ধাক্কা মারে। আমরা

ছেলেবেলায় রাঁচির হুড্ডু জলপ্রপাত দেখে মুগ্ধ হয়েছি। হঠাৎ সেই হুড্ডুর কথা মনে পড়ায় একটু দুঃখ হয়। হুড্ডুও বেশ জমকালো জলপ্রপাত ছিল, এখন শুকিয়ে গেছে, কেন তা কে জানে! নায়েগ্রা যাতে শুকিয়ে না যায়, সে জন্য অবশ্য দুই দেশের সরকার আগেই চুক্তি করে রেখেছে, জলবিদ্যুতের জন্য কেউই নির্দিষ্ট পরিমাণ জলের বেশী টানতে পারবে না।

কল্লোল ও কাজল জানালো যে নায়েগ্রা জলপ্রপাতের একেবারে তলা পর্যন্ত নৌকোয় যাবার ব্যবস্থা আছে, কিন্তু এখন শীত পড়ে যাওয়ায় সেই নৌকো সার্ভিস বন্ধ আছে। আর কিছুদিন পরে এই জলপ্রপাতটিই বরফে জমে যাবে প্রায় সবটা। এখন আর এক রকম ভাবে খুব কাছাকাছি গিয়ে দেখা যায়। সেখানে আমার যাওয়া উচিত।

ওরা দুই ভাই আমার জন্য অনেক স্বার্থত্যাগ করেছে, কিন্তু সেই পর্যন্ত আর কেউ সঙ্গে যেতে রাজি হলো না। ওরা আমাকে ব্যবস্থাটা বুঝিয়ে দিয়ে ওপরে অপেক্ষা করতে লাগলো।

পাথর কেটে বিরাট সুড়ঙ্গ বানিয়ে ফেলা হয়েছে। সেখানে নামতে হয় লিফ্‌টে। তারপর ভাড়া করা ওয়াটার প্রুফ ও জুতো পরে যেতে হয় এক ল্যাবিরিনথের মধ্য দিয়ে। এখানেই সাহেব জাতির কারিকুরি। অত বড় সাংঘাতিক এক জলপ্রপাতের একেবারে মাঝখানে নিয়ে যায় দর্শকদের। হাত বাড়ালেই জল ছোঁয়া যায়। অবশ্য জল ছুঁতে গেলে আর রক্ষে নেই, প্রচণ্ড ঝাপটে টেনে নিয়ে যাবে কিংবা হাত ভেঙে দেবে।

এখানে সঙ্গী হিসেবে এক বাঙালী দম্পতিকে পেয়ে আমার বেশ সুবিধেই হলো। বেশ বাংলায় গল্প করতে করতে অনেকক্ষণ ধরে ঘুরে দেখা গেল বিভিন্ন সুড়ঙ্গ থেকে বিভিন্ন রকমের এই বিশাল ব্যাপারটি। ওপরে উঠে আসবার পর আমাদের খুশী করবার জন্যই যেন কুয়াশা কেটে গিয়ে বেরিয়ে এলো রামধনু। বেশ ছবি-টবিও তোলা হলো।

ফেরার পথে কল্লোল হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো, নীলু, তুমি এবারে পুজো সংখ্যাগুলো পড়েছো; তোমার সঙ্গে কিছু আছে?

আমি বললুম, না, আমি তো চার পাঁচ মাস ধরে ঘোরাঘুরি করছি। এ বছরই প্রথম একটাও বাংলা পূজা সংখ্যা চোখে দেখিনি!

কল্লোল বললো, জানো, আমি যখন প্রথম এদেশে প্লেন থেকে নামি, আমার হাতে ছিল দু'তিনটে মোটা মোটা পূজা সংখ্যা। বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে পূজা সংখ্যা না পড়লে আমার ভাত হজম হতো না। তারপর প্রথম কয়েক বছর দেশ থেকে পূজা সংখ্যা আনাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে থাকতুম। এখন···সব কিছু বদলে

গেছে··· বছরের পর বছর কেটে যায়, একটাও পূজা সংখ্যা চোখে দেখি না! মানুষ এভাবেও বদলে যায়।

॥ ৪০ ॥

বসে আছি ক্লিভল্যাণ্ড বাস স্টেশনে। এই শহরে আমার চেনাশুনো কেউ নেই, তাই এখানে আর থাকা হবে না। যদিও ক্লিভল্যাণ্ডে বাঙালির সংখ্যা অনেক, বেশ ধুমধাম করে দুর্গাপুজো হয় শুনেছি।

আমি যদিও এ দেশের দুর্গাপুজো দেখিনি একটাও, তবে অনেক গল্প শুনেছি। যুক্তরাষ্ট্রের সব বড় শহরেই বাঙালির দুর্গাপুজো হয়, কোনো কোনো শহরে একাধিক। এখানকার বাঙালিরা পুজোর ব্যাপারটা বেশ আধুনিক করে নিয়েছে। পঞ্জিকার তোয়াক্কা করে না। যেহেতু ছুটি পাবার কোনো উপায় নেই, তাই পশ্চিমবাংলার দুর্গাপুজোর দিনের কাছাকাছি কোনো শনি বা রবিবারে পুজো হয় এখানে। চারদিন ধরে নয়, একদিনেই। কোথাও নাকি পুজো হয় মোট চার ঘণ্টা, প্রথম ঘণ্টায় সপ্তমী আর চতুর্থ ঘণ্টায় বিজয়ার কোলাকুলি। শাস্ত্রকাররা তো বলেই দিয়েছেন, প্রবাসে নিয়ম নাস্তি।

আমার ইচ্ছে এখন শিকাগো যাওয়ার। ক্যালিফোর্নিয়া থেকে নিউ ইয়র্কের দিকে চলে আসার পর আবার শিকাগোর দিকে ফিরে যাওয়াটা অনেকের কাছে পাগলামি মনে হতে পারে। কিন্তু বাসের সীজন টিকিট কেটে নিয়েছি, এখন এত বড় দেশটার যেখানে-খুশী যেতে পারি। আমার আর অতিরিক্ত ভাড়া লাগে না।

চোখে কালো চশমা, হাতে একটা ছড়ি, মাথার চুল লালচে রঙের একজন প্রৌঢ় বলশালী সাহেব আমার পাশে এসে বসলেন। তারপর পকেট থেকে সিগারেট দেশলাই বার করে ধরাতে গিয়ে দেশলাই-এর পাতাটা পড়ে গেল মাটিতে। লোকটি নিচু হয়ে হাতড়ে হাতড়ে দেশলাইটি খুঁজতে লাগলেন, কিন্তু ঠিক সেটা ছুঁতে পারছেন না। আমি দেশলাইটি তুলে দিলুম ওঁর হাতে।

লোকটি বললেন, থ্যাঙ্কস্! আচ্ছা বলো তো, পাঁচ নম্বর গেটে যে বাসটি দাঁড়িয়ে আছে, সেটা কি ডেট্রয়েটের?

আমি বললুম, না। ও বাসটা তো দেখছি সল্ট লেক যাচ্ছে।

প্রৌঢ়টি বললেন, আমার বাসটা যে কোন্ গেটে আসবে, কখন ছাড়বে কিছুই বুঝতে পারছি না। আজকাল এই এক ফ্যাসান হয়েছে। অ্যানাউন্স করে না, বাস টাইমিং টিভি-তে দেখায়। তাতে আমার মতন লোকের কী সুবিধে হয়?

এবারে লক্ষ্য করলুম, লোকটির হাতের ছড়িটি সাদা রঙের। অর্থাৎ লোকটি

অন্ধ।

সত্যিই তো, এখন অনেক জায়গায়তেই টিভি-তে বাসের খবরাখবর দেখা যায় শুধু। তাতে আমাদের সুবিধে হলেও অন্ধদের কথা তো চিন্তা করা হয়নি।

আমি বললুম, আপনি কোথায় যাবেন? আমি জেনে দিতে পারি?

তুমি আমার জন্য এটুকু কষ্ট করবে? দ্যাট্‌স অফুলি কাইণ্ড অফ্ ইউ।

ঘুরে এসে জানালুম, ওঁর ডেট্রয়েটের বাস ছাড়তে আরও ঠিক এক ঘণ্টা বাকি আছে। পাঁচ নম্বর গেটেই বাস ছাড়বে।

ভদ্রলোক আবার প্রচুর ধন্যবাদ জানিয়ে তারপর জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি ব্রিটিশ? তোমার উচ্চারণ শুনে মনে হচ্ছে—

আমি চমৎকৃত হলুম। আমার টুটো-ফুটো ইংরেজি শুনে এরকম কমপ্লিমেন্ট আগে আর কেউ দেয়নি।

—না আমি ভারতীয়। এ দেশের ভারতীয় নয়, ভারতের ভারতীয়।

লোকটি একটু চিন্তা করে বললো, তোমাদের ভারত এক সময় ব্রিটিশ কলোনি ছিল না? আমার মনে আছে, আমার গ্র্যাণ্ডফাদার তোমাদের দেশের খুব প্রশংসা করতেন। উনি ওঁর বাবার সঙ্গে আয়ার্ল্যাণ্ড ছেড়ে চলে এসেছিলেন এখানে। ওঁদের খুব রাগ ছিল ব্রিটিশদের ওপর।

—আপনারা আইরিশ?

—না, না, আমি আইরিশ নই। আমি অ্যামেরিকান। আমার পূর্বপুরুষ ছিল আইরিশ। অবশ্য, আয়ার্ল্যাণ্ড সম্পর্কে আমার মনে একটু দুর্বলতা আছে ঠিকই। এখন যে আয়ার্ল্যাণ্ডে মারামারি চলছে, সে জন্য আমি কনসার্নড হয়ে পড়ি মাঝে মাঝে।

—আপনি সিস্টার নিবেদিতার নাম শুনেছেন?

—সে কে?

—আগে নাম ছিল মিস্ মাগারেট নোবল। তিনি আমাদের দেশে গিয়ে হিন্দু হয়েছিলেন, আমাদের দেশের জন্য অনেক কাজ করেছেন।

—না, শুনিনি। আমি অনেক কিছুই জানি না। আমি বেশী লেখাপড়া জানা লোক নই। সারাজীবন কাজ করেছি একটা এক্সপ্লোসিভ ফ্যাক্টরিতে। এমনকি আয়ার্ল্যাণ্ড আমি কখনো দেখিনি। ঠাকুর্দার কাছে গল্প শুনেছি শুধু। ভেবেছিলুম রিটায়ার করার পর সারা পৃথিবী ঘুরতে বেরুবো, তখন একবার আয়ার্ল্যাণ্ডেও যাবো। কিন্তু দু'বছর আগে অ্যাকসিডেন্ট হলো, তাতে চোখ দুটো গেল। কম্পানি অনেক টাকা দিয়েছে অবশ্য, কিন্তু আয়ার্ল্যাণ্ড আর আমার দেখা হবে না। তবে ঈশ্বরকে অশেষ ধন্যবাদ, তিনি শুধু চোখ দুটো নিয়ে আমার প্রাণটা

তো বাঁচিয়ে রেখেছেন—

বুঝলুম, ভদ্রলোক কথা বলতে ভালোবাসেন। চোখাচোখি হবার সম্ভাবনা নেই বলে সব কথা না শুনলেও চলে। শুধু মাঝে মাঝে হুঁ-হ্যাঁ দিয়ে গেলেই হলো। আমি সন্তর্পণে একটা গল্পের বই খুলতে যাচ্ছিলুম, এমন সময় তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা বলো তো, অন্ধ হয়ে থাকার চেয়ে কি একেবারে মরে যাওয়া ভালো ছিল?

এ রকম অদ্ভুত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নয়। সুতরাং আমতা আমতা করে ধোঁয়াটে ভাবে বললুম, সেটা নির্ভর করে, কে কতটা জীবনকে ভালোবাসে—

ভদ্রলোক বললেন, আমি জীবনকে খুবই ভালোবাসি। শুধু বেঁচে থাকাই খুব সুন্দর। যখন কম বয়স ছিল, তখন মনে হতো, মৃত্যুটা কিছুই না, যে কোনো সময় মরে গেলেই হয়! কিন্তু এখন বুঝতে পারি, মৃত্যুকে যতক্ষণ দূরে সরিয়ে রাখা যায়, ততই ভালো। তাছাড়া, জানো, অন্ধ হলে এমন অনেক কিছু দেখতে পাওয়া যায় যা আমি আগে দেখিনি।

—যেমন?

—আমার স্ত্রী অ্যালাবামার মেয়ে। অ্যালাবামা কোথায় জানো?

—দক্ষিণ অঞ্চলে।

—এখানে কি কাছাকাছি কোনো নিগ্রো অর্থাৎ কালো লোক বসে আছে?

—আমি নিজেই তো কুচকুচে কালো।

—ভারতীয় কালো নয়, আমেরিকান কালো?

—না, এখানে আর কেউ বসে নেই।

—আমার স্ত্রী ঐ কালোদের একদম দেখতে পারে না। আমার নিজেরও কিছুটা প্রেজুডিস ছিল। আমার মেয়ে একটা কালো ছেলের সঙ্গে ঘোরাঘুরি করতো, আমার ছেলের বন্ধুরা তাকে খুব ঠ্যাঙালো। তাতে আমরা খুশীই হয়েছিলাম। এখন বুঝতে পারি। মাই গড্, হোয়াট স্টুপিডিটি! মানুষের গায়ের রঙে কী আসে যায়? চোখ থাকতে সেটা বুঝতে পারিনি, সেজন্য এখন মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করে।

এত সরল ব্যাখ্যা শুনে আমি ঠিক সন্তুষ্ট হতে পারলুম না। আমি কালো লোক বলেই কি লোকটি আমায় খুশী করার জন্য এই কথা বললেন? অবশ্য ওঁর গলায় বেশ একটা আন্তরিকতা আছে।

লোকটি আসলে খুব সরলই। এর পরেও উনি এমন সব সাদামাটা কথা বলতে লাগলেন, যা আসলে খুব সার সত্য হলেও সে সব কথা আমরা আজকাল আর মুখে আলোচনা করি না। যেমন এর পরেই তিনি বললেন, আগে আমার

খুব টি ভি দেখার বাতিক ছিল। কারখানা থেকে বাড়ি ফিরেই আঠার মতন চোখ আটকে রাখতুম টি ভি'র পর্দায়। এখন আর টি ভি দেখি না। তবে রেডিও শুনি। মাই গড্, চারদিকে শুধু যুদ্ধের খবর আর খুনোখুনি। জীবন এত মূল্যবান, তবু মানুষ মানুষকে মারে কেন? ভগবান আমাদের জীবন দিয়েছেন, অথচ মানুষই তা নষ্ট করে দেয়।

এত সাদা সিধে আমেরিকানের সঙ্গে আগে আমার পরিচয় হয়নি। সুতরাং খানিকটা কৌতুকের সঙ্গেই আমি ওঁর কথা শুনতে লাগলুম।

হঠাৎ প্রসঙ্গ বদলে উনি আমায় জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি রিপাবলিক্যান?

আমি বললুম, আপনি ভুল করছেন, আমি এ দেশের নাগরিক নই, বেড়াতে এসেছি মাত্র।

ভদ্রলোক আমার উত্তর গ্রাহ্য না করে বললেন, এই যে রেগান্, তুমি একে সাপোর্ট করো? মাই গড, এ তো দেশটার সর্বনাশ করে ছাড়বে! তুমি জানো, এবারের বাজেটে শিক্ষার জন্য টাকা কমিয়ে দিয়ে সেই টাকা ঢালছে অস্ত্র বানাবার জন্য। ইস্কুলের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের খাবারের খরচ পর্যন্ত বাড়িয়ে দিয়েছে। মাই গড, এ লোকটা কি বাচ্চাদেরও ভালোবাসে না? এ কি চায়, ছেলেমেয়েরা লেখাপড়ায় চর্চা ছেড়ে দিয়ে সবাই সেনাবাহিনীতে নাম লেখাবে?

এ রকম আলোচনায় অংশ গ্রহণ করা আমার পক্ষে রীতি বিরুদ্ধ হবে বলে আমি চুপ করে রইলুম।

ভদ্রলোক আবার বললেন, আমি কালকেই খবরে শুনলুম, নেভাডায় মাটির নিচে আবার একটি আণবিক বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে। এ সব কিসের জন্য, বলতে পারো? আমরা আমেরিকানরা শান্তিতে থাকতে চাই। তুমি জানো নিশ্চয়ই, আমাদের সংবিধানে আছে আমরা কোনোদিনই অন্য দেশ আক্রমণ করবো না। এটা আমি জানতুম না, রেডিওতেই একজন বললো। পেন্টাগানে কতকগুলো বাজপাখি বসে আছে, তাদের ডানায় ভর দিয়ে পৃথিবীটাকে ক্ষত বিক্ষত করে দেবার জন্য উড়ে চলেছে এই রিপাবলিকান রেগন! এটা আমি একদিন স্বপ্নে দেখলুম, জানো! মাই গড, ক্যালিফোর্নিয়ায় একটা যুদ্ধ-বিরোধী শান্তি মিছিলের ওপর পুলিশ হামলা করেছে! এ রকম কথা আগে কখনো শুনেছো?

ভদ্রলোক তাঁর একটা হাত তুলে মাথার চুলে বুলোতে লাগলেন। কালো চশমা-পরা চোখ দুটি আমার দিকে ফিরিয়ে বললেন, আমি যে কারখানায় এতদিন কাজ করেছি, সেখানে অস্ত্র বানানো হয়। আমি নিজেও এতদিন তা বানিয়েছি। সেই সব অস্ত্র পৃথিবীর অন্য অন্য দেশে যায়। এখন আমি বুঝতে

পারছি, আমার মতন আরও কত মানুষ অন্ধ হয়, মানুষের হাত-পা ভাঙে, প্রাণও যায়। মাই গড্ এটা এতদিন আমি খেয়াল করিনি, আমি এত বোকা ছিলাম!

তারপর ধরা গলায় তিনি বললেন, ঈশ্বরকে অশেষ ধন্যবাদ, তিনি আমায় অন্ধ করেছেন বলেই এখন আমি এ সব বুঝতে পারছি। আসলে, যাদের চোখ আছে, তারাই বেশী অন্ধ। তাই না, তুমি এ কথা মানো না?

আমি বললুম, আপনার সঙ্গে কথা বলে খুব ভালো লাগলো। আমার বাস এসে গেছে, আমি এবার উঠি?

—যুবক, তুমি কোথায় যাচ্ছে জিজ্ঞেস করতে পারি?

—আপাতত শিকাগো শহরে।

—যদি সময় পাও, পরশুদিন একবার ডেট্রয়েটে এসো। সেদিন ওখান থেকে আর একটা শান্তি মিছিল বেরুবে। তাতে যোগ দেবার জন্যই আমি যাচ্ছি।

প্রৌঢ় এবারে তাঁর একটা হাত বাড়িয়ে দিলেন আমার দিকে। আমি সেই হাত ধরে ঝাঁকুনি দিলুম। সেই হাতখানি বেশ আত্মীয়ের মতন উষ্ণ।

॥ ৪১ ॥

শিকাগো শহরের নামটির মধ্যেই একটা রোমাঞ্চ আছে। বাল্যকাল থেকেই আমাদের কাছে এই শহরটির সঙ্গে দুটি নাম জড়িত। স্বামী বিবেকানন্দ এবং আল্ কাপন। অবশ্য বাংলায় স্কুল পাঠ্য বিবেকানন্দ-জীবনীতে এখনো এই শহরটির নাম চিকাগো কেন লেখা হয় তা জানি না। আর এযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ দস্যু আল্ কাপনের অনেক রোমহর্ষক কীর্তির কথাও আমরা নানান বইতে পড়েছি, ফিল্মেও দেখেছি।

অনেকদিন আগে প্রথমবার শিকাগো শহরে পা দেবার মুহূর্তেও আমার ধারণা ছিল, এই শহরের পথে ঘাটে বুঝি সব সময় মাফিয়ারা গিস্‌গিস্ করছে। প্রথম দিনের অভিজ্ঞতায় আমার সেই ধারণা খানিকটা সমর্থিতও হয়েছিল। সেবারে উঠেছিলুম ডাউন টাউনে ওয়াই এম সি এ হস্টেলে। দুপুরবেলা খাবারের সন্ধানে সেখানে থেকে সদ্য বেরিয়েছি, সাউথ ওয়াবাশ নামে রাস্তার ওপরে হঠাৎ দু'দল লোক একটা খণ্ডযুদ্ধ শুরু করে দিল। ঠিক দু'মিনিটের মধ্যে এসে গেল পুলিসের গাড়ি, ততক্ষণে রাস্তা ফাঁকা, শুধু মাঝখানে পড়ে আছে একজন ছুরি বিদ্ধ মানুষ।

আমি এমনই ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিলুম যে পালাবার কথাও মনে পড়েনি। দাঁড়িয়ে ছিলুম দেয়াল সেঁটে। একজন পুলিস আড় চোখে কয়েকবার আমাকে দেখেও কিছু বলেনি অবশ্য। বোধহয় আমাকে ধর্তব্য বলেই মনে

করেনি।

কোনো শহরে এসেই এরকম একটা প্রথম অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই সুখকর নয়। কিন্তু আরও কয়েকদিন কাটিয়ে দেবার পর ওরকম দ্বিতীয় ঘটনা কিন্তু আমার আর চোখে পড়েনি। পরে আমার মনে হয়েছিল, শিকাগো শহর ঐ ছোট্ট ঘটনাটি মঞ্চস্থ করেছিল বোধহয় শুধু আমাকেই ভয় পাইয়ে দেবার জন্য। নইলে, এ রকম একটা দৃশ্য কলকাতা, দিল্লী, বোম্বাইতেও এমন কিছু অস্বাভাবিক নয়। মানুষ তো সব জায়গাতেই মানুষকে ছুরি মারছে, নইলে ছুরির ব্যবসা চলবে কেন ?

শিকাগো শহরকে আসলে ভয় পাবার কিছুই নেই। অন্যান্য বড় শহরের মতনই এই শহরটি হিংস্র, তার বেশী কিছু নয়। এক সময় বোধহয় হিংস্রতর ছিল, কিন্তু সেই আল্ কাপনদের দিন আর নেই, এখনকার দিনের মাফিয়াদের কায়দা অনেক সূক্ষ্ম হয়েছে, পথে ঘাটে যখন তখন খুনোখুনির দরকার হয় না।

শিকাগো শহরের একটা উগ্র সৌন্দর্যও আছে। আমেরিকার একদিকে নিউ ইয়র্ক অন্যদিকে লস এঞ্জেলিস্, মাঝখানে এই শিকাগো। দুই প্রান্তের দুটি শহরের তুলনায় শিকাগো-ও কিছুতেই কম যায় না। নিউ ইয়র্ক আর লস এঞ্জেলিস দুটিই সমুদ্র-উপকূলবর্তী, শিকাগোর কাছে সমুদ্র নেই বটে, তবে আছে লেক মিশিগান। এই হ্রদটিও সমুদ্র-প্রতিম, এর বুকে রীতিমতন জাহাজ চলে।

দৈর্ঘ্যে-প্রস্থেও শিকাগো বাড়ছে এবং ওপর দিকেও মাথা চাড়া দিচ্ছে। সিয়ার্স কোম্পানির বাড়ি যার নাম সিয়ার্স টাওয়ার, সেটা নাকি বর্তমান পৃথিবীর উচ্চতম হর্ম্য। আরও অনেক লম্বা লম্বা বাড়ি দেখতে গিয়ে ঘাড় অনেকখানি পেছনে হেলে যায়। এর মধ্যে দু'একটি বিশাল বাড়ির নকশা তৈরি করেছেন বাংলাদেশের একজন স্থপতি। কোনো বাঙালীর এমন কৃতিত্বের কথা জেনে আমার গর্ব হয়।

আগের বারে সফরে এসে আমি শিকাগোয় এত লম্বা বাড়ির ছড়াছড়ি দেখিনি। লেক মিশিগানের ধার দিয়ে বেড়াতে বেড়াতে ঠিক জলের বুক থেকে উঠে যাওয়া এক একটি প্রাসাদ দেখে স্তম্ভিত হয়ে যাই। সত্যি জলের ওপরে বাড়ি, কলকাতার অনেক মাল্টি স্টোরিড বিল্ডিং-এর যেমন নিচের তলাটায় শুধু গাড়ি থাকে, এখানে সেরকম রয়েছে মোটরবোট।

আকাশের অবস্থা ভালো নয়। প্রায়ই গুঁড়ো গুঁড়ো বরফ পড়ছে। শিকাগোর তুষার ঝড় বিখ্যাত, একবার শুরু হলে আর থামতে চায় না। খবরের কাগজে প্রায়ই সেরকম ঝড়ের পূর্বাভাসের কথা জানাচ্ছে। আমার ইচ্ছে শুধু শিকাগোর আর্ট গ্যালারিগুলো দেখে শেষ করা। কিন্তু তা-ও সম্ভব হবে কি না জানি না।

মদনদা যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর বন্ধু গৌতম গুপ্তর সঙ্গে। উঠেছি সেই গৌতম গুপ্তর বাড়িতে। শহরতলীতে সুন্দর নিজস্ব বাড়ি। স্বামী-স্ত্রী ও দুটি ছেলেমেয়ের ছিমছাম সংসার। আমি এখানে চমৎকার আরামে আছি, শুধু একটাই অসুবিধে, এখান থেকে মধ্য শহর বেশ দূরে। আমি সপ্তাহের মাঝখানে এসে পড়ে খুব ভুল করেছি। সারা সপ্তাহ এখানে সবাই খুব ব্যস্ত থাকে, বেরিয়ে যেতে হয় কাক-ডাকা ভোরে, আর সন্ধেবেলা পরিশ্রান্ত হয়ে ফেরার পর আর কারুর বেরুবার উৎসাহ থাকে না। তবে গৌতমবাবু দু'এক সন্ধে আমাকে বেড়াতে নিয়ে যাচ্ছিলেন বলে আমি খুব লজ্জা পাচ্ছিলুম।

দুপুরের দিকে আমি একাই শহরে যাই ট্রেনে চেপে। এখানকার ট্রেনকে যদি আমাদের ট্রাম বলে গণ্য করা যায় তা হলে ভাড়া খুব বেশী। পাঁচ ছ'ডলার। আমার মতন পকেট-ঠনঠনদের বেশ গায়ে লাগে। এখানে অনেক দোকানের সেলে পাঁচ-ছ'ডলারে একটা জামা কিনতে পাওয়া যায়। সুতরাং ট্রাম ভাড়া একটা জামার দামের সমান ?

একদিন দুপুরে বৌদির হাতের অতীব সুস্বাদু রান্না খেয়ে সবে মশলা চিবুচ্ছি, এমন সময় বাইরের দরজায় একটা গাড়ি থামলো। তারপর এ বাড়ির বেলই বেজে উঠলো। বৌদি দরজা খুলতেই একটি আঠারো-উনিশ বছরের বাঙালী তরুণ ভেতরে এসে বললো, উঃ রাস্তা খুঁজতে খুঁজতে হয়রান। যা ঘুরতে হয়েছে না !

ছেলেটিকে আমিও চিনি না, বৌদিও চেনেন না।

সে আবার আমার দিকে চেয়ে বললেন, চলুন, চলুন, ব্যাগ গুছিয়ে নিন। আমি বেশী দেরি করতে পারবো না।

আমি অবাক হয়ে বললুম, আমায় যেতে হবে ? কোথায় ?

ছেলেটি একটু ধমকের সুরে বললো, কোথায় মানে ? আমাদের বাড়িতে !

আমি আমতা আমতা করে বললুম, না, মানে, আমি তো আপনাকে ঠিক চিনতে পারছি না। তা ছাড়া আমি এখানে তো বেশ ভালোই আছি।

ছেলেটি বললো, এখানে আপনি ভালো নেই, তা কি আমি বলেছি ? এই বৌদি নিশ্চয়ই আপনাকে অনেক যত্ন করেছেন। অনেক যত্ন তো পেয়েছেন, এবারে আমাদের ওখানে চলুন !

তারপর বৌদির দিকে ফিরে সে বললো, কী বৌদি, বলুন ! আপনার এখানে তো ক'দিন রইলোই। এবার নীলুদার কয়েকটা দিন আমাদের কাছে থাকা উচিত নয় ?

বৌদি বললেন, আপনাকে তো চিনতে পারলুম না।

ছেলেটি বললো, আমার নাম বললেও আমায় চিনতে পারবেন না। তা ছাড়া নাম দিয়ে কী দরকার ? মনে করুন আমি একজন মানুষ। আমার সঙ্গে যেতে আপনার আপত্তি আছে নীলুদা ?

আমি বললুম, না, না, আপত্তি থাকবে কেন ? তবে ঠিক বুঝতে পারছি না কোথায় যেতে হবে।

ছেলেটি এবার আমার দিকে চোখ পাকিয়ে বললো, মনে করুন আপনাকে আমি কিড্‌ন্যাপ করে নিয়ে যাচ্ছি। তারপর আপনার বাড়ির কাছ থেকে র‍্যানসম দাবী করবো। কত চাওয়া যায় বলুন তো ?

আমি বললুম, আমার বাড়ির লোক বলবে, ওকে যদি আর কখনো না ফেরৎ পাঠাও তা হলে বরং দু'চার পয়সা দিতে পারি!

ছেলেটি হাহা করে হেসে উঠলো।

ছেলেটিকে প্রথম দর্শনেই আমার দারুণ ভালো লেগে গিয়েছিল। ওর মুখে সারল্য আর দুষ্টুমি সমান ভাবে মিশে আছে।

সে আবার বললো, আমি কিন্তু সত্যিই আপনাকে ধরে নিয়ে যেতে এসেছি। আমার দাদা বললো, নীললোহিত এসে শিকাগো শহরে থাকবে অথচ আমাদের বাড়িতে একবারও আসবে না ? যা তো, ধরে নিয়ে আয়!

—তোমার দাদা কে ভাই ?

—সুব্রত চৌধুরী!

এবারে আমার কাছে সব পরিষ্কার হয়ে গেল। এই সুব্রত চৌধুরীকেও আমি কখনো চোখে দেখিনি বটে, তবে দু'একবার টেলিফোনে কথা হয়েছে। আমার এক বন্ধুর বন্ধু। কিন্তু শুনেছিলুম যে সে এখন পড়াশুনো নিয়ে খুব ব্যস্ত, তাই শিকাগোতে এসে তার সঙ্গে যোগাযোগ করিনি। আমি শিকাগোতে এসে যে গৌতম গুপ্তর বাড়িতে উঠেছি, সে খবর ওরা পেল কী করে কে জানে ?

বৌদির কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে আমি আমার পোটলাপুঁটলি নিয়ে উঠলুম ছেলেটির গাড়িতে। গাড়ি ছাড়বার পর আমি জিজ্ঞেস করলুম, আমার নাম নীলু, তোমার নামটা এবারে জানতে পারি কি ?

সে বললো, আমার নাম টুটুল। হোল ওয়ার্লর্ড আমাকে এই নামে চেনে।

আমি বললুম, তাতো বটেই। এই নাম আমি কত জায়গায় শুনে এসেছি।

—আমি যেতে যেতে কয়েকবার রাস্তা ভুল করবো, পুলিস টিকিটও দিতে পারে, তবে ভয় নেই, অ্যাকসিডেন্ট হবে না। আমি খুব ভালো গাড়ি চালাই।

—আমার অ্যাকসিডেন্টের কোনো ভয় নেই। গোটা একটা বাস উল্টে গেলেও আমি অক্ষত থেকেছি। একবার আমি একটা প্লেনে উঠতে পারি নি

সময়ের অভাবে, সেই প্লেনটাই দুর্ঘটনায় পড়ে চুরমার হয়ে যায়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, আমি অমর!

টুটুল হো হো করে হেসে উঠে বললো, যাক বাঁচা গেল। আমি ভেবেছিলুম, আপনি গম্ভীর লোক। আমি গম্ভীর লোকদের বেশীক্ষণ সহ্য করতে পারি না।

—আমি কিন্তু একবার কথা বলতে শুরু করলে আর থামি না। আমায় জোর করে থামাতে হয়।

গাড়িটা প্রায় একটা মাঠের মধ্যে পৌঁছে গিয়ে থামলো। টুটুল বললো, এইবার কোন দিকে ? দেখা যাক, ম্যাপে কী বলে!

টুটুলের চেহারাটা এতই বাচ্চা যে ওর লাইসেন্স আছে কিনা তাতেই সন্দেহ হতে পারে। আমার অবশ্য এরকম উল্টো পাল্টা গাড়ি চালানো বেশ ভালোই লাগে। সবাই কি পৃথিবীর সব কিছু ঠিকঠাক নির্ভুলভাবে চালিয়ে যাবে ?

অবশ্য খুব বেশী ঘুরতে হলো না, বিকেলের মধ্যেই আমরা পৌঁছে গেলুম ওদের বাড়িতে। আলাদা বাড়ি না, অ্যাপার্টমেন্ট, শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকার একেবারে গায়েই বলতে গেলে। মিশিগান হ্রদও খুবই কাছে।

অ্যাপার্টমেন্টে আপাতত আর কেউ নেই। মাঝখানের বসবার ঘরটি দেখলে মনে হয় এই মাত্র যেন এখানে খুব তুমুল আড্ডা চলছিল, হঠাৎ সবাই এক সঙ্গে উঠে গেছে।

টুটুল এরই মধ্যে আপনি থেকে তুমিতে নেমে এসে বললো, শোনো, নীলুদা, তুমি কী কী দেখতে চাও সব ছকে ফেল। তোমাকে আমরা প্রত্যেকটি জিনিস ঘুরে দেখিয়ে দেবো। তুমি গঙ্গানগরের নাম শুনেছো ?

—গঙ্গানগর ?

—শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত সাহেবরা গঙ্গা নাম দিয়ে একটা নতুন শহর বানাচ্ছে। সেটা আমি ছাড়া তোমায় আর কেউ দেখাতে পারবে না।

—বাঃ, খুব চমৎকার।

—এখন তুমি একটু একা থাকো। ইচ্ছে হলে কিচেনে গিয়ে চা-টা বানিয়ে নিতে পারো। খিদে পেলে ফ্রিজ খুলে দেখে নিও কী পাও। আর হুইস্কি টুইস্কি পান করতে চাইলে তাও পেয়ে যাবে। এ বাড়িতে আমরা কেউ ড্রিংক করি না, তবে অতিথিদের জন্য সব রাখি। আমি এখন একটু ঘুরে আসছি, আমার ক্লাস আছে।

বলেই সে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল। একটি অপরিচিত বাড়িতে আমি সম্পূর্ণ একা। প্রথমে একটু অস্বস্তি লাগলেও সেটা কাটিয়ে ফেললুম।

আরাম কেদারায় বসে বইটই পড়ছি, এমন সময় দরজায় খুট খুট শব্দ হলো।

কেউ যেন খুব সন্তর্পণে তালা খুলছে। এই রে, চোরটোর নয়তো! শরীরে একটা শিহরন খেলে গেল।

দরজা খুলে ঢুকলো একজন বলিষ্ঠকায় তরুণ। আমার দিকে তাকিয়ে হাসলো।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললুম, আপনিই কি সুব্রত চৌধুরী?

তরুণটি বললো, না। আমার নাম বাব্‌লু। আপনি নীলুদা তো? টুটুল আপনাকে ঠিক মতন নিয়ে এসেছে, কোনো অসুবিধে হয়নি?

আমি বললুম, না, না। খুব মজাসে গল্প করতে করতে এসেছি।

—ও খুব ভালো গাড়ি চালায়, তবে রাস্তা ভুলে যায়। আপনি কিছু খেয়েছেন? খাবার বানিয়ে দেবো!

—না, না, আমার খিদে পায় নি। দুপুরে খুব ভারি লাঞ্চ খেয়েছি।

বাবলু তবু চা তৈরি করে ফেললো। তারপর খুব কাচুমাচুভাবে বললো, আপনার কি একটু একা থাকতে কষ্ট হবে? আমি এতক্ষণ চাকরি করে এলুম, এবার একটা ক্লাস করতে যাবো। টুক করে ঘুরে আসবো, অ্যাঁ?

আবার আমি একা। আধঘণ্টা বাদে আবার দরজায় সেই রকম খুটখাট শব্দ। আমি ভাবছি, এবার কি টুটুল ফিরলো, না অন্য কেউ?

দরজা খুলে প্রথমে ঢুকলো একটি মেয়ে। মাথায় কোঁকড়া চুল, মুখখানা প্রতিমার মুখের মতন। আমায় দেখে সে একটু থমকে গেল। তারপর ঢুকলো একজন ফর্সা চেহারার যুবক, চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা।

আমি জিজ্ঞেস করলুম, কাকে চাই? আপনারা ঠিক বাড়িতে এসেছেন তো?

ফর্সা যুবকটি হেসে বললো, আপনিই নিশ্চয়ই নীললোহিত? আমার নাম পিণ্টু।

আমি বললুম, টুটুল, বাব্‌লু, পিণ্টু। বাঃ, খুব চমৎকার নাম। কিন্তু এর মধ্যে সুব্রত চৌধুরী কে?

পিণ্টু বললো, আমিই। আর এ আমার স্ত্রী প্রভাতী।

প্রভাতী বললো, ও মা, এই নীললোহিত? আমি ভেবেছিলুম বুঝি ভারিক্কী চেহারার কোনো লোক হবে!

পিণ্টু বললো, আজ কার ভাত রাঁধার টার্ন?

প্রভাতী বললো, তোমার।

—কিন্তু আমার যে রাত্তিরে একটা ক্লাস আছে।

—তা হলে ভাতটা আমি করে দিচ্ছি। বাবলু এসে মাংস রাঁধবে।

একটু বাদেই আবার বেরুতে হবে। সুব্রত পুরো পোশাক ছাড়লো না। চায়ের কাপ নিয়ে বসে সে বললো, আপনার কোনো অসুবিধা হবে না। আমরা সবাই পড়ি আবার চাকরিও করি। তবে পালা করে একজন আপনাকে সঙ্গ দেবো। আর রাত্তিরে আড্ডা হবে একসঙ্গে। তারপর শনিবার-রবিবার এলে তো খুব বেড়ানো যাবে কেমন?

আমি বললুম, আমার একা থাকা নিয়ে আপনারা চিন্তা করবেন না। আমি মাঝে মাঝে একাই বাইরে থেকে ঘুরে আসবো।

সুব্রত বললো, একা ঘুরবেন? গাড়ি ছাড়া? দেখুন, এই জানলার কাছে আসুন।

সুব্রত জানলার পর্দা সরালো। বাইরে অঝোর ধারায় বরফ পড়ছে। এর মধ্যে পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়ানোর কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

চমৎকার এদের সংসারটি। একটা মেসের ঘর বলে মনে হতে পারতো। কিন্তু প্রভাতী থাকায় পারিবারিক আবহাওয়াটা বজায় আছে। প্রভাতীও বলতে গেলে বাচ্চা মেয়ে, মাত্র কিছুদিন আগে তার বিয়ে হয়েছে, তার দুই দেওর তাকে নানান ছুতোয় রাগিয়ে দেয় মাঝে মাঝে।

এ দেশে পড়াশুনোর শেষ নেই। মধ্য বয়েসেও অনেকেই ছাত্র থাকে। এদের মধ্যে সুব্রত ইঞ্জিনিয়ার ও খুব বড় চাকরি করে, তবু সে আরও দু'একটি কোর্স নিয়ে যোগ্যতা বাড়াচ্ছে। তার ছোট দুই ভাইকে সে একে একে আনিয়েছে দেশ থেকে। ওদের আরও দুই দাদা থাকেন এ দেশে।

পিণ্টু-বাব্‌লু-টুটুল আর প্রভাতী যেমন অতিথি বৎসল আর পরোপকারী তেমনি লাজুক। ওরা নিজেদের বিষয়ে কিছু বলে না, কিন্তু দু'দিনেই বুঝতে পারলুম, শিকাগোতে কোনো ভারতীয় কোনো বিপদে পড়লে ওরা নিঃস্বার্থভাবে সাহায্য করবার জন্য ছুটে যায়। কার থাকার জায়গা নেই, কে হঠাৎ এয়ারপোর্টে এসে পড়েছে কিন্তু গাড়ি পাচ্ছে না, সবরকম ব্যবস্থা করা যেন ওদের দায়িত্ব। শুধু ভারতীয় কেন, বাংলাদেশেরও অনেকে এসে থেকে যায় ওদের কাছে।

সকালে উঠে আমি বসবার ঘরে একটা চেয়ারে বসি। ওরা তিন ভাই আর প্রভাতী দাবা খেলার মতন কখনো দুজন থাকে দুজন বেরিয়ে যায়। কখনো একজন একটা আইটেম রান্না করে চলে যায়, আর একজন এসে অন্য কিছু রান্না করে। এরই ফাঁকে ফাঁকে আড্ডা। আমিই শুধু কনস্ট্যাণ্ট ফ্যাক্টর।

তারপর এলো শনিবার। আজ সবার ছুটি। আজ তো বেড়াতে যেতেই হবে। কিন্তু সারাদিনই ছুটি যখন, তখন তাড়াহুড়োর তো কিছু নেই। কাপের পর কাপ চা খেয়ে যাচ্ছি। ভাইদের মধ্যে বাবলু নিঃশব্দ কর্মী। আড্ডার ফাঁকে ফাঁকে সে সংসারের অনেক কাজ সেরে ফেলে। আবার বাইরেও ঘুরে আসে। টুটুল

সবচেয়ে ছোট ভাই এবং আদরের, তাকে বিশেষ কাজ দেওয়া হয় না। আর সুব্রত এই পরিবারের কর্তা হিসেবে চেয়ারে বসে নানান রকম নির্দেশ দিতে ভালোবাসে।

হঠাৎ এক সময় খেয়াল করলুম সন্ধ্যে হয়ে গেছে। সারাদিন আমরা একভাবে বসে আড্ডা দিয়েছি। বাইরে বরফ পড়ছে অঝোরে। এখন আর বেরুবার কোনো মানে হয় না। আমরাও খুব একটা গরজ নেই। ঠিক হলো, পরদিন আমরা খুব ভোরে উঠে তৈরি হবো।

পরের দিন রবিবার। সেদিন আমরা ঘুম ভেঙে প্রথম কাপ চা খেলুম দুপুর সাড়ে বারোটায়। আজও বরফ পড়ার বিরাম নেই। কে আর এই দুর্যোগে বেরুতে চায়!

এর মধ্যে আমি যেন ওদের আত্মীয় হয়ে গেছি। বাইরে বরফ আর ঠাণ্ডা, তার চেয়ে ঘরের মধ্যেকার আন্তরিকতা ও আড্ডার উষ্ণতা অনেক বেশী উপভোগ্য।

॥ ৪২ ॥

নিউ ইয়র্কে আমার স্কুলের বন্ধু সূর্যর সঙ্গে দেখা হয়েছিল দৈবাৎ এক পার্টিতে। সে যে এ দেশে আছে আমি জানতুম না, অনেকদিন ওর সঙ্গে যোগাযোগই নেই। কিন্তু স্কুলের বন্ধুদের কেউ কখনো ভোলে না। সুট-টাই পরা লম্বা-চওড়া বলিষ্ঠকায় মানুষকে দেখেও আমি তার মুখে আদল পেলুম আমার সহপাঠী এক কিশোরের। তার কাছে গিয়ে কাঁধে চাপড় মেরে বলেছিলুম, সূর্য না? সূর্যও সঙ্গে সঙ্গে মুখ ফিরিয়ে বলেছিল, নীলু? তুই?

আমার চেয়েও সূর্যই বেশী অবাক হয়েছিল। কারণ আমাকে ও কোনোদিন নিউ ইয়র্কে দেখবে, এরকম ওর সুদূরতম কল্পনাতেও ছিল না। আমার সহপাঠীদের মধ্যে অনেকেই জীবনে যথেষ্ট উন্নতি করেছে, সূর্য নিজেও একজন ইঞ্জিনিয়ার। কিন্তু ওরা সবাই জানে, শুধু আমারই কিছু হলো না, লেখাপড়াতেও সুবিধে করতে পারিনি, চাকরির ব্যাপারেও গাড্ডু পাওয়া, আমি এখনো একটা ভ্যাগাবণ্ডই রয়ে গেছি।

স্কুলের বন্ধুর সঙ্গে ফর্মালিটির ব্যাপার নেই। সুতরাং অন্য কেউ এ পর্যন্ত যে কথা জিজ্ঞেস করেনি, সূর্য সরাসরি তাই জানতে চাইলো, তুই এদেশে কী করে এলি রে নীলু? তোকে কে পাঠালো?

আমি বললুম, সুব্রতকে চিনতিস তো? সেই সুব্রতর মামার বিরাট ট্রাভেল এজেন্সি আছে। কেন জানি না, উনি আমায় খুব ভালোবাসেন। উনি আমায়

বিনে পয়সায় একটা রিটার্ন টিকিট দিয়েছেন। আর দিয়েছিলেন দুশো ডলার। তাই নিয়ে ভেসে পড়েছি। তারপর এর ওর বাড়িতে থাকছি। একদম টাকা ফুরিয়ে গেলে রাস্তায় রাস্তায় গান গেয়ে ভিক্ষে করি। হরেকৃষ্ণ হরে রাম গানটা এখানে বেশ চলে, সবাই পয়সা দেয়।

আমার কথাটা কতটা সত্যি আর কতটা ইয়ার্কি তা সূর্য হয়তো ঠিক বুঝলো না। কিন্তু সে খুব আফসোস্ করতে লাগলো। কারণ, পরের দিন সকালেই সে নাইজিরিয়া চলে যাবে। আমার সঙ্গে সময় কাটাতে পারবে না।

যাই হোক, সেই রাত্রে সূর্য আমাকে একটা চাবি দিয়েছিল। বলেছিল, তুই যদি কখনো শিকাগোর দিকে যাস, তাহলে আমার বাড়িতে একবার যাস। ছোট্ট জায়গা, কিন্তু তোর ভালো লাগবে। তুই ওখানে যতদিন ইচ্ছে থাকতে পারিস। আমার স্টোরে দেখবি চাল-ডাল মজুত আছে প্রচুর, দেশ থেকে আনা আচার আছে। তুই রান্না করে খাবি। মাস দেড়েক পরেই আমি ফিরে আসবো—।

আমি বলেছিলুম, তুই চাবি দিচ্ছিস, যদি আমার ওদিকে না যাওয়া হয়?

সূর্য বলেছিল, তাতে কোনো অসুবিধে নেই। চাবিটা তুই একটা খামে ভরে আমার ঠিকানায় পোস্ট করে দিবি। আর যদি যাস তো ফেরার সময় চাবিটা আমার লেটার বক্সে রেখে আসবি।

সূর্যর সেই চাবিটা এতদিন আমার পকেটেই রয়ে গেছে। শিকাগোতে এসে দোনা-মনা করতে লাগলুম, যাবো কি যাবো না! নিউ ইয়র্কে সেই দেখা হবার পর মাস দেড়েক কেটে গেছে, এর মধ্যে সূর্য ফিরে আসতেও পারে। তাহলে একটা চান্স নেওয়া যাক। সূর্যকে পেলে কয়েকদিন বেশ চুটিয়ে ছেলেবেলার গল্প করা যাবে।

সিডার র‍্যাপিডস একটা ছোট্ট শহর। দোকান-পাট বা রাস্তার বহর দেখলে অবশ্য ছোট্টত্ব বোঝবার উপায় নেই। কয়েকটি দোকান সত্যিই বিরাট। কিন্তু মার্কিন দেশের সিডার র‍্যাপিডস-এর চেয়ে বড় শহর অন্তত দুশোটা আছে।

সূর্য তার বাড়ির অবস্থান বেশ ভালো করেই বুঝিয়ে দিয়েছিল। সুতরাং খুঁজে পেতে অসুবিধে হলো না। একটি বিরাট জলাশয়ের প্রান্তে একটি দশতলা অ্যাপার্টমেন্ট হাউস। বাড়িটিতে প্রায় চারশো অ্যাপার্টমেন্ট আছে। পুরো একটি পাড়াই বলা যায়। এই বাড়ির মধ্যেই রয়েছে দুটি ঢাকা সুইমিংপুল, যেখানে শীতকালেও সাঁতার কাটা যায়, দুটি টেনিস কোর্ট, তা ছাড়া সনা বাথ্ ও নানারকম খেলার ব্যবস্থা ও লাইব্রেরী। ইউনিভার্সিটির অনেক ছাত্র-ছাত্রী ও অধ্যাপক থাকেন এখানে।

সূর্য এখনো ফেরেনি, একতলার অফিস ঘরে খোঁজ নিয়ে জানলুম। তারপর

তাদের জানিয়ে আমি চলে এলুম সূর্যর ঘরের দিকে। ওর অ্যাপার্টমেন্ট আটতলায়। চাবি খোলার আগেই শুনতে পেলুম। ঘরের মধ্যে কারা যেন বেশ জোরে জোরে কথা বলছে। তাহলে কি অন্য কেউ আছে? কিন্তু আমি এসে পড়েছি, এখন তো ফিরে যেতে পারবো না। কয়েকবার বেল দিলুম, কেউ দরজা খুললো না। অথচ ভেতরে কথা বার্তা চলছেই! যা থাকে কপালে বলে ঘুরিয়ে দিলুম চাবি।

প্রথমে বসবার ঘর। সেখানে কেউ নেই। পাশে রান্নাঘর। উঁকি দিলুম সেখানে, কারুকে দেখতে পাওয়া গেল না। কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে পাশের শয়ন কক্ষ থেকে। কয়েকবার সে দরজায় ঠক ঠক করলুম, তাও কেউ সাড়া দিল না। তারপর সেই দরজাটা ঠেলে খুলে ফেলতেই রহস্যটা বোঝা গেল। টি ভি-টা খোলা রয়েছে!

হ্যাঁ, ইস্কুল-জীবনেও সূর্য বেশ ভুলো-মনা ছেলে ছিল বটে, এখানে এসেও শোধরায়নি! যাবার সময় টি ভি বন্ধ করতে ভুলে গেছে, দেড় মাস ধরে সেটা একটানা চলছে! দেশে ফিরে গিয়ে সূর্যর মাকে জানাতে হবে একথা।

সূর্যর অ্যাপার্টমেন্টটা বেশ বড়, একলা মানুষের পক্ষে অঢেল জায়গা। তার শয়ন কক্ষের জানলা দিয়ে দেখা যায় সেই জলাশয়টি, আর বসবার ঘরের জানলা দিয়ে দেখা যায় একটা জঙ্গল।

সূর্যর ভাঁড়ারেও অনেক জিনিস মজুত আছে, চাল-ডাল-আলু-পেঁয়াজ, সূর্যমুখী তেল, আর নানা রকম গুঁড়ো মশলা, হলুদ-লঙ্কা-জিরে আরও কত কী। আর কিছু না হোক আমি খিচুড়ি খেয়েই বেশ কিছুদিন এখানে চালিয়ে দিতে পারবো।

হিসেব করে দেখলুম, আমি প্রায় পাঁচ মাস ধরে ইউরোপ, কানাডা ও আমেরিকায় চর্কি বাজির মতন ঘুরছি। এখন এখানে কয়েকদিন একেবারে চুপচাপ বিশ্রাম নিলে মন্দ হয় না। এই শহরে আমায় কেউ চেনে না। আমিও কারুকেই চিনি না। সুতরাং এখানে আমার হবে অজ্ঞাতবাস।

প্রথম দুদিন একলা এই অ্যাপার্টমেন্ট-এ কাটিয়ে দিলুম। একবারের জন্যও বাইরে পা দিইনি। অবশ্য ঠিক একলা নয়, টেলিভিসন আছে সর্বক্ষণের সঙ্গী। প্রথম এসে সেই যে এক ডেকচি খিচুড়ি রেঁধেছি, চারবেলা ধরে তা-ই খাচ্ছি। ফ্রিজে রাখা খিচুড়ি জমে একেবারে শক্ত হয়ে যায়। তার থেকে এক স্লাইস কেটে নিই, ঠিক যেন মনে হয় খিচুড়ির কেক। সেটার সঙ্গে একটু জল মিশিয়ে গরম করে নিলেই হলো। খাবারটা আমি বিছানায় শুয়ে শুয়েই সেরে নিই। রাত্তিরবেলা টি ভি-তে সলিড গোল্ড অনুষ্ঠানে নর্তকীদের নাচ, আমি বিছানায়

অর্ধেক হেলান দিয়ে শোওয়া, হাতে খাবারের পাত্র—রোমান সম্রাটের সঙ্গে আমার তফাৎ কী? ছবিটাকে আর একটু নিখুঁত করার জন্য আমি এতে একটা সুরার পাত্র যোগ করতে চেয়েছিলুম, কিন্তু সূর্যর ঘরে ওয়াইন-জাতীয় কিছু নেই, আছে মস্ত বড় কোকাকোলার বোতল। তার থেকেই ঢেলে নিই গেলাসে, কেউ যদি ছবি তোলে তাহলে এই কোকাকোলাকেই রাম মনে হবে।

তৃতীয় দিন সকালে প্রাণটা একটু আনচান করতে লাগলো। আর কিছু নয়, ডিমের জন্য। পশ্চিমী সভ্যতা আমাদের প্রত্যেক দিন সকালে ডিম খাওয়ার বদ অভ্যেস ধরিয়ে দিয়েছে। তাছাড়া খিচুড়ির সঙ্গে ডিম ভাজা অতি উপাদেয়।

আসবার দিন কাছেই একটা শপিং মল দেখে এসেছিলুম। নিজের গাড়ি না থাকলে এখন বেশী দূরে যাবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। কাল সন্ধে থেকে তুষারপাত থামলেও রাস্তায় জমে আছে বরফ। তাছাড়া, তুষারপাতের সময়ই শীত একটু কম থাকে, রোদ উঠলেই কনকনে শীত। ধরাচুড়ো সব পরে নিয়ে বেরুলাম। কাছেই একটা ব্যাঙ্কের মাথায় তাপাঙ্ক নির্দেশক ঘড়ি আছে। সেখানে দেখলুম, শূন্যের নিচে সাত ডিগ্রি নেমেছে। এই তো সবে শুরু। এখনো ক্রিসমাসের একুশ দিন বাকি। এই সব অঞ্চলে শূন্যের নিচে তিরিশ পর্যন্ত নেমে যায়।

শপিং মলে গিয়েই একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হলো। সামনেই একটা ছোট খাটো ভিড়, মানুষজন গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমি এর আগে এ দেশের কোথাও কোনো রাস্তায় এরকম গোল হয়ে দাঁড়ানো ভিড় দেখিনি। এদেশের রাস্তায় পকেটমার ধরা পড়ে না, গাড়ির অ্যাকসিডেন্ট হলেও অন্য কেউ গ্রাহ্য করে না, এমনকি কেউ কারুকে খুন করলেও অন্যরা ফিরে না তাকিয়ে সোজা হেঁটে যায়।

এগিয়ে গিয়ে উঁকি মেরে আরও অবাক হলুম। ভিড়ের মাঝখানে একটা বিরাট শিংওয়ালা হরিণ। হরিণটির একটা পা কোনো কারণে জখম হয়েছে, উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করেও সে পারছে না। আমাদের দেশে এরকম একটা ব্যাপার হলে সবাই উত্তেজিতভাবে চ্যাঁচামেচি করতো, এখানে জনতা একেবারে নিস্তব্ধ। আমি একজন বয়স্ক লোককে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলুম ঘটনাটা কী? উনি আমাকে সংক্ষেপে জানিয়ে দিলেন।

কাছাকাছি কোনো জঙ্গল থেকে এই হরিণটা হঠাৎ শহরে চলে এসেছে। দিনের আলোয় এরকমভাবে কোনো হরিণকে কেউ আগে কখনো আসতে দেখেনি। হরিণটা কেন এসে পড়েছে কে জানে! কিন্তু শপিং মলের সামনে অজস্র গাড়ির সামনে পড়ে সে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায়। এদিকে ওদিকে ছুটতে

শুরু করে। গাড়ির চালকরা ওকে বাঁচাবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু ওরই দোষে একটা গাড়ির সঙ্গে ওর ধাক্কা লেগেছে।

হরিণটার টানা টানা কাজল আঁকা চোখ, মাথায় শিং-এর ডালপালা, গায়ের চামড়া হলুদ আর সবুজ মেলানো। অতবড় শরীরটা নিয়ে সে অসহায় ভাবে তাকাচ্ছে।

এ দেশের মানুষ হরিণ খুব ভালোবাসে। গোটা আমেরিকা জুড়ে সরীসৃপের মতন অসংখ্য রাস্তা, তার অনেক রাস্তাই গেছে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে। সেসব রাস্তায় যেতে যেতে অনেক বোর্ড দেখেছি, কশান ! ডিয়ার ক্রসিং। সেই সব জায়গা দিয়ে সাবধানে, আস্তে গাড়ি চালানো নিয়ম। একদিন রাত্তিরবেলা দীপকদাদের সঙ্গে গাড়িতে আসতে আসতে হেড লাইটের আলোয় এরকম একটা হরিণকে রাস্তা পার হতেও দেখে ছিলুম। কিন্তু শহরের মোটর গাড়ির জঙ্গলের মধ্যে এরকম একটি বন্য হরিণকে কেমন যেন করুণ আর বেমানান লাগে।

হরিণ মারার ব্যাপারে অনেক বিধিনিষেধ আছে। অথচ আহত হরিণটিকে জঙ্গলে কী করে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে, তাই বা কে জানে ! পুলিস এসে গেছে, নানান রকম জল্পনা কল্পনা চলছে। হরিণটা এত জোর শিঙ ঝাঁকাচ্ছে যে কাছে গিয়ে ওকে ধরাও খুব শক্ত। এদেশের যা ব্যাপার, হয়ত বিশাল এক ক্রেন এনে হরিণটাকে তুলে নিয়ে যাবে। সে দৃশ্য দেখবার জন্য আমি আর সেখানে দাঁড়ালুম না।

সূর্যর অ্যাপার্টমেন্টে থাকার সময় আমার আর একটা বিচিত্র অভিজ্ঞতা হলো।

প্রথম দিন ডিম ভাজতে গিয়েই ঘরের মধ্যে কোথায় যেন বেশ জোরে প্যাঁক করে একটা শব্দ হলো। একলা ঘরে এরকম কোনো শব্দ শুনলে চমকে উঠতেই হয়। আওয়াজটা এমন যেন কোনো দুষ্টু ছেলে লুকিয়ে থেকে তালপাতার শানাই বাজাচ্ছে। আরও দু'বার ঐ রকম প্যাঁক প্যাঁক হতেই কারণটা আন্দাজ করতে পারলুম।

আমার আনাড়ি হাতে ডিম ভাজার জন্য তেল ঢালতে গিয়ে সসপ্যানে একটু বেশী তেল পড়ে গেছে। গ্যাসের আঁচটাও বেশী। তাই ধোঁয়া হয়েছে। ওই প্যাঁকটা হচ্ছে স্মোক অ্যালার্ম। এইসব বড় বড় বাড়িতে আগুন লাগার খুব ভয়। তাই একটু ধোঁয়া উঠলেই সাবধান করে দেবার ব্যবস্থা আছে।

স্মোক অ্যালার্ম যন্ত্রটা আমি আগে দেখেছি। কিন্তু এই অ্যাপার্টমেন্টে সেটা কোথায় ? খুঁজে দেখলুম, বসবার ঘরের আর শোবার ঘরের দেওয়ালে দুটো সেই

গোল যন্ত্র লাগানো আছে

ধোঁয়া যতক্ষণ না বেরুবে ততক্ষণ মাঝে মাঝেই এরকম প্যাঁক প্যাঁক চলবে। শীতের জন্য জানলা খোলার কোনো উপায় নেই। কে যেন আমায় বলেছিল, জল ছিটিয়ে দিলে ঐ প্যাঁকপ্যাঁকানি বন্ধ হয়। কিন্তু জল ছিটাতে আমি সাহস না করে ফ্রিজ থেকে বরফের ট্রে বার করে একটা যন্ত্রের ওপর চেপে ধরলুম। তাতে সাময়িক ভাবে সে শান্ত হল।

কিন্তু ততক্ষণে আমার ভয় ঢুকে গেছে। আজই আমি ডিম কিনতে গিয়ে এক দোকানে বেশ টাটকা বাঁশপাতা মাছ দেখতে পেয়ে লোভের বশে কিনে এনেছি। এদেশে এসে বহুদিন কুচো মাছ খাইনি। ভেবেছিলুম মাছ ভাজা খাবো। কিন্তু ধোঁয়াহীন মাছ ভাজা কী করে সম্ভব, তা তো আমি জানি না।

একদিন বাদ দিয়ে পরের দিন ভরসা করে শুরু করলুম মাছ ভাজতে। আঁচ খুব কম, তেলও দিয়েছি যৎসামান্য। বরফের ট্রে-ও রেডি রেখেছি। একটু পরেই শুরু হলো পর্যায়ক্রমে প্যাঁক প্যাঁক। বরফের ট্রে চেপে ধরলুম, কোনো কাজ হলো না। ডিমের ধোঁয়া যদি বা সহ্য করেছে, মাছের ধোঁয়া কিছুতেই সহ্য করছে না।

দরজায় কে যেন বেল দিল। আমি দরজা খুলতেই একজন কৃষ্ণকায় লোক রাগী মুখে ঘরের মধ্যে ঢুকে এসে বললো, হোয়াটস হ্যাপেনিং ?

আমি তাকে ব্যাপারটা বোঝাতে যেতেই সে পুরোটা না শুনে দু' দেয়াল থেকে টপটপ যন্ত্র দুটো খুলে ফেললো। তারপর সে-দুটো টেবিলের ওর রেখে দিয়ে আর কোনো কথা না বলে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। তারপর আওয়াজ একেবারেই বন্ধ।

আমি মনে-মনে বললুম, কে-হে তুমি উপকারী বন্ধু ?

এরপর আমি নিশ্চিন্তে মাছ ভাজলুম। ঘর ধোয়ায় ভর্তি হয়ে গেল। কিন্তু কেউ আর প্যাঁকপ্যাঁক করলো না।

দু-তিনদিন নিশ্চিন্তে কাটলো। তারপর হঠাৎ একদিন মাঝরাত্তিরে আমি আঁতকে উঠলুম। দুটি যন্ত্রই পর্যায়ক্রমে প্যাঁকপ্যাঁক শুরু করেছে। আমি ধড়মড় করে উঠে বসলুম। সত্যি কি তাহলে ঘরে আগুন লেগেছে ?

সমস্ত অ্যাপার্টমেন্টটা খুঁজে দেখলুম তন্ন তন্ন করে। কোথাও আগুন নেই, ধোঁয়া নেই, কোনো আলো জ্বলছে না। কোনো গরম-জলের-কলও খোলা নেই। সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থা। মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারলুম না। সারারাত ওইরকম চললো। আমার চোখের পাতা এক হলো না।

সকালবেলা খালি পায়েই সেই যন্ত্রদুটো নিয়ে ছুটলুম একতলার অফিসে।

সেখানকার তরুণীটিকে খুব উত্তেজিতভাবে এই অলৌকিক ঘটনাটা বোঝাতে যাচ্ছিলাম, তরুণীটি খুব শান্তভাবে বললো, ও, ব্যাটারি ফুরিয়ে গেছে। তারপর সে আরেকটু ব্যাখ্যা করলো, ব্যাটারি ফুরিয়ে গেলে এরকম আওয়াজ করে জানিয়ে দেয়।

ধন্য, বাবা যন্ত্র। আমরা তো জানতুম, ব্যাটারি ফুরিয়ে গেলে সব জিনিসই চুপ মেরে যায়। মরা ব্যাটারির এমন ডাক আমি আগে কখনো শুনিনি।

॥ ৪৩ ॥

এদেশে এখনো ভগবানের বেশ জনপ্রিয়তা আছে। ভগবানের তল্পিবাহকরাও বেশ জোরদার। টি ভি-তে প্রত্যেক রবিবার সকালে যে-কোনো চ্যানেল খুললেই শোনা যায় পাদ্রীদের বক্তৃতা। আজকাল আর অনেকেই কষ্ট করে রবিবার সকালে গীর্জায় যেতে চায় না, তাই টি ভি-তেই শোনানো হয় পাদ্রীদের সারমন।

সকাল মানে অবশ্য সাড়ে নটা-দশটা। শনিবার রাত্তিরে পার্টি সেরে রবিবার এর চেয়ে আগে কেউ ঘুম থেকে উঠবে না। ভোরে ওঠে বাচ্চারা। তাই ভোর থেকে শুরু হয় ছোটদের জন্য চমৎকার সব মনোহারী অনুষ্ঠান। তারপর একটু বেলা হলে বাচ্চারা টি ভি ছেড়ে যখন খেলতে যাবে, বাবা-মায়েরা বিছানায় শুয়ে দিনের প্রথম কাপ চা বা কফিতে চুমুক দিয়ে সবে মাত্র টি ভি'র দিকে তাকাবে, অমনি চোখের সামনে ভেসে উঠবে পাদ্রীদের মুখ।

পাদ্রীদের বক্তৃতা সাধারণত অন্তহীন হয়। গল্পে আছে, এক পাদ্রী তার সুদীর্ঘ বক্তৃতা শেষ করার পর বলেছিলেন, দুঃখিত, আমার হাতে ঘড়ি নেই, তাই বুঝতে পারিনি এতটা সময় কেটে গেছে! তখন শ্রোতাদের একজন উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিল, দেয়ালে তো ক্যালেণ্ডার রয়েছে, সেটাও দেখেননি?

টি ভি-র মতন চাক্ষুষ-মাধ্যমে লম্বা বক্তৃতা সাধারণত দেখানো হয় না। কিন্তু পাদ্রীদের বক্তৃতা চল্লিশ-পঞ্চাশ মিনিটের কম হবে, এ তো ভাবাই যায় না। সেই জন্য টি ভি'র পাদ্রীরা সকলেই অত্যন্ত জবরদস্ত বক্তা, কথার মায়াজাল বোনায় দক্ষতা অসাধারণ এবং উচ্চাঙ্গের অভিনেতাদের মতন তাঁদের কণ্ঠস্বরও নাটকীয়ভাবে ওঠে-নামে।

আমি নিজেই টি ভি-তে এরকম দু'একজন পাদ্রীর বক্তৃতা একটুখানি শোনবার পরই মন্ত্রমুগ্ধের মতন আটকে গেছি। চোখ সরাতে পারিনি। বক্তৃতার মধ্যে ধর্মের নাম গন্ধও নেই, বিষয়বস্তু হচ্ছে বিশ্বশান্তি। ইতিহাস ও সাহিত্য থেকে অজস্র উদাহরণ টেনে আনছেন তিনি, পৃথিবী যে এক অনিবার্য ধ্বংসের দিকে

এগোচ্ছে তাও মর্মন্তুদ ভাবে বুঝিয়ে দিলেন। তবে শেষ পর্যন্ত তাঁর সার কথা, ভগবান যীশুর শরণ নিলে এই সব সমস্যাই মিটে যাবে, এমনকি অ্যাটম বোমাও ব্যর্থ হতে বাধ্য! এ যেন নদীর ঢেউ দেখাতে দেখাতে সটকে শেখানো।

ভগবানের সঙ্গে ডারউইন সাহেবেরও নতুন করে ঝগড়া লেগেছে। ডারউইনের বিবর্তনবাদ ধর্মীয় সৃষ্টিতত্ত্বের একেবারে গোড়ায় কোপ বসিয়ে দিয়েছে গত শতাব্দীতে। ডারউইনের মৃত্যু শতবার্ষিকীর বছরে বাইবেল-পন্থীরা আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছেন। তাঁদের দাবি, যে-সব স্কুল-কলেজে ডারউইনের বিবর্তনবাদ পড়ানো হয়, সেখানে বাইবেলের সৃষ্টিতত্ত্বও পড়াতে হবে। যাতে ছাত্র-ছাত্রীরা দুটো দিকই যাচাই করতে পারে। অনেক স্টেটে এই নিয়ে মামলা হয়েছে, টি ভি-তেও এর প্রচার খুব জোরদার। আশ্চর্যের ব্যাপার এই, এই প্রচারে কয়েকজন বৈজ্ঞানিককেও দেখা যায়। তাঁদের বক্তব্য, ডারউইনের মতবাদ অকাট্য নয়, সুতরাং ধর্মীয় তত্ত্বই বা অগ্রাহ্য করা হবে কেন?

বিজ্ঞানের ডিগ্রি থাকলেই বৈজ্ঞানিক হওয়া যায় না। বাইবেলের সৃষ্টিতত্ত্ব যদি কারুর ঠিক খেয়াল না থাকে, তবে আমি একটু মনে করিয়ে দিচ্ছি। পশু-পাখি, তরু-লতাসমেত সব কিছু এবং মানুষকে ভগবান আস্তো আস্তো ভাবে সৃষ্টি করেছেন মাত্র ছদিনে। সপ্তম শতাব্দীর এক আর্চ বিশপ বাইবেল থেকে হিসেব করে দেখিয়েছিলেন যে, ভগবানের এই সৃষ্টিকার্য সম্পন্ন হয়েছিল ঠিক খৃষ্টপূর্ব চার হাজার চার সালে। সপ্তদশ শতাব্দীতে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ডঃ জন লাইটফুট এই হিসেবটি আরও নিখুঁত করেছিলেন। তাঁর মতে প্রথম মানুষের জন্ম হয়েছিল ঠিক খৃষ্টপূর্ব চার হাজার চার বছরের তেইশে অকটোবর সকাল নটার সময়। অর্থাৎ মানুষের ইতিহাস মাত্র ছ'হাজার বছরের। সুসভ্য, সুশিক্ষিত, ইংরেজি-জানা ভদ্রলোকেরা এখনো যে এই মতের সমর্থনে বক্তৃতা করতে পারে, তা নিজের কানে না শুনলে বিশ্বাসই করতুম না আমি। ঈশ্বর বিশ্বাস যে মূককেও বাচাল করে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই!

প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা ধরেই টি ভি চলে, তার মধ্যে অন্তত এই ধরনের ধর্মীয় প্রচার খুব সামান্য সময় জুড়ে থাকে। তবে যে-টুকু সময় নেয়, তা খুব দামি সময়, অর্থাৎ যে-সময় সকলেই টি ভি খোলে। এখানকার টি ভি'র সিংহভাগ জুড়ে থাকে খেলা। তাও বিশেষ একটি খেলায় যে-খেলার নাম, ফুটবল বটে, কিন্তু আমরা যাকে ফুটবল বলে জানি, তা নয়। এই ফুটবল খেলায় পায়ের থেকে হাতের ব্যবহার বেশী, খেলোয়াড়দের শরীরে থাকে বর্ম, মুখে লোহার মুখোশ। বিদেশীদের পক্ষে এ খেলার রস পাওয়া শক্ত। আমি কয়েকবার স্টেডিয়ামে ফুটবল খেলা দেখতে গেছি, কিন্তু নিয়ম-কানুন ঠিক মাথায়

ঢোকেনি। সারা মাঠে যখন দারুণ উত্তেজনা, দর্শকরা উত্তাল, আমি তখন বরফের মতন শীতল ও স্থির।

আমেরিকান টি ভি'র সঙ্গে সরকারের কোনো সংস্রব নেই। প্রধান তিনটি জাতীয় নেটওয়ার্ক হলো আমেরিকান ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন, সেন্ট্রাল ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন আর ন্যাশনাল ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন এরা নানা রকম অনুষ্ঠান বানায়। আর আছে অসংখ্য স্থানীয় অনুষ্ঠান। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, আপনি বালুরঘাট কিংবা ঘাটাল কিংবা চুঁচুড়োয় থাকেন। এরকম প্রত্যেক জায়গাতেই আছে নিজস্ব টি ভি কেন্দ্র। অর্থাৎ চুঁচুড়োয় বসে আপনার টি ভি-তে আপনি চুঁচুড়োর আশে পাশের ঘটনা অনর্গল দেখতে পাবেন। সেই সঙ্গে জাতীয় অনুষ্ঠানও দেখবেন। বালুরঘাটের বাসিন্দা টি ভি-তে দেখবেন বালুরঘাটের নানা অনুষ্ঠান, সেই সঙ্গে জাতীয় অনুষ্ঠান। ছোটখাটো জায়গায় স্থানীয় অনুষ্ঠানেরই প্রাধান্য। আমেরিকানরা বিশ্বপ্রেমিক যত না, তার চেয়ে বেশী অঞ্চল-প্রেমিক। ওখানকার স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা ভূগোল ক্লাসে পৃথিবীর মানচিত্রের আগে পাড়ার মানচিত্র আঁকতে শেখে।

তিনটি জাতীয় নেটওয়ার্কের মধ্যে প্রতিযোগিতা আসে কে কত চিত্তাকর্ষক অনুষ্ঠান করতে পারে। সরকারি ব্যাপার তো নয়। সব কিছুই ব্যবসায়-ভিত্তিক। স্থানীয় কেন্দ্রগুলো কার কাছ থেকে কোন্ অনুষ্ঠান কিনবে তার ওপর নির্ভর করে ওদের ক্ষতি বৃদ্ধি। এই রকম প্রতিযোগিতা আছে বলেই অনুষ্ঠানের বৈচিত্র্যের শেষ নেই।

এই সব অনুষ্ঠানের মধ্যে সবচেয়ে বেশী জনপ্রিয়তা সোপ অপেরার। সংক্ষেপে সোপ। অভিধানে এখনো সোপ-এর অর্থ সাবান হলেও এখানকার খবরের কাগজে 'সোপ' শব্দে একরকম টিভি'র নাটক বোঝায়, যার সঙ্গে অপেরার কোনো সম্পর্ক নেই। সাবানেরও কোনো প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই। এগুলো হচ্ছে টিভি'র ধারাবাহিক নাটক, এর কোনো শেষ নেই। এর কাহিনীর কোনো মাথামুণ্ডু নেই, নতুন নতুন চরিত্র আর ঘটনা এনে বছরের পর বছর ধরে চলে। এই সব নাটক কিন্তু সপ্তাহে একদিন নয়, প্রত্যেকদিন। রবিবার বা বিশেষ ছুটির দিন বাদে। এবং প্রত্যেকদিন এরকম ধারাবাহিক নাটক মাত্র একখানা নয়, অন্তত পাঁচ খানা। তাহলে কী বিপুল লোক লস্কর আর উদ্যম লাগে এগুলো তৈরি করতে, ভাবতে গেল থ হয়ে যেতে হয়। খোদ আমেরিকায় এই সব সোপ অপেরা সিনেমার চেয়ে অনেক বেশী জনপ্রিয়। এক সময় সাবান কেম্পানিগুলো বিজ্ঞাপনের ওপর নির্ভর করে এই সব নাটক শুরু হয়েছিল বলেই সোপ নামটি চালু হয়ে গেছে। এখন অবশ্য অন্য সব বিজ্ঞাপনদাতাই

এরকম ধারাবাহিক, প্যাচপেচে সেন্টিমেন্টাল, কিছুটা রহস্য মেশানো নাটক বানায়। ইদানীং এইসব নাটকের মধ্যে 'ডালাস' জনপ্রিয়তার শীর্ষে।

এখানকার ঘরে বসে বসে টিভি দেখাই আমার একমাত্র কাজ। এ শহরে আমার চেনা কেউ নেই, সুতরাং কোথাও ঘুরে বেড়াবার প্রশ্ন নেই। গাড়ি না থাকলে এই শীতে পথে ঘোরাঘুরির প্রশ্ন ওঠে না। সুতরাং টিভি-তেই আমি বিশ্বদর্শন করতে চাইলুম। অবশ্য আমেরিকান টিভি-তে বিশ্বদর্শন খুব সহজসাধ্য নয়। এরা নিজেদের নিয়ে বড় বেশী মগ্ন। এমনকি যাকে এরা বলে 'বিশ্ব সংবাদ' তাতেও পৃথিবীর যে-সব দেশ বা ঘটনায় আমেরিকান স্বার্থ জড়িত, শুধু সে সবই দেখাবে। এদের বিশ্ব সংবাদ দেখলে মনে হয় পৃথিবীতে ভারতবর্ষ নামে কোনো দেশ নেই। আর চীন নামে হঠাৎ একটা নতুন দেশ গজিয়ে উঠেছে। খবরেরও মাঝে মাঝে থাকে বিজ্ঞাপন। আরব দেশে প্রচণ্ড একটি বোমার বিস্ফোরণের পরই কাট। তিন চারটি ছেলে-মেয়ে নাচতে নাচতে একরকম মাখনের জয়গান গেয়ে গেল। তারপরই আবার যুদ্ধের দৃশ্য।

বিজ্ঞাপনের দৃশ্য থেকেও অবশ্য একটা দেশের রুচির অনেকটা পরিচয় পাওয়া যায়। আমেরিকানদের আমরা গরু ও শুয়োরখোর জাতি বলে জানি। কিন্তু ইদানীং নানা বিজ্ঞাপনে গোমাংস ও শূকর মাংসের বিরুদ্ধে প্রচার চলছে। তার মানে এরা ভারতীয় জীবনযাত্রার মান আদর্শ মনে করছে তা নয়। শারীরিক পরিশ্রম নেই বলে ব্লাড-প্রেসার ও কোলেস্টোরল ভীতি এদের সন্ত্রস্ত করে তুলেছে। এতকাল এদেশে মুর্গী ছিল গরীবের খাদ্য ও অবজ্ঞার বস্তু, এখন রব উঠেছে মুর্গী খাও, মাছ খাও, সবুজ শাক-সবজী খাও! হেলথ ফুড নামে নিছক নিরামিষ খাদ্যের দোকানও চলছে খুব। আর এসেছে বিকল্পের যুগ। বেশী কফি খেলে নাকি ক্ষতি হয়, তাই কফির বদলে ডি-ক্যাফিনেটেড কফি। সে বস্তু আমি দু'একবার খেয়ে দেখেছি, অতি অখাদ্য। ভাগ্যিস চায়ের বিকল্প ওরা এখনও তৈরি করেনি। সেই রকম, মাখনের বদলে মার্জারিন, সিগারেটের বদলে তামাক হীন সিগারেট। অ্যালকোহল বর্জিত বীয়ার। মদের বিজ্ঞাপন তো চোখেই পড়ে না, তার বদলে দেখা যায় দুধের বিজ্ঞাপন। একটা ছবি প্রায়ই দেখায়, ধপধপে সাদা একটা দুধের নদী বয়ে চলেছে। সে দৃশ্য দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়।

বিজ্ঞাপনগুলোর মধ্যে সবচেয়ে মজা লেগেছিল একটা কর্মখালির বিজ্ঞাপন দেখে। মার্কিনদেশে এখন ছাত্রছাত্রীদের বাধ্যতামূলক সমর শিক্ষা নেই, অনেক ছেলেমেয়েই আজকাল আর সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিতে আগ্রহী নয়। সেইজন্য সরকার থেকে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় লোভনীয় শর্তে ছেলেমেয়েদের সৈন্যবাহিনীতে আকৃষ্ট করবার জন্য। গান গেয়ে গেয়ে বলা হয়, এসো, এসো

যোগ দাও, কত ভালো মাইনে, কত ভালো খাবার, কত সুন্দর পরিবেশ ইত্যাদি ইত্যাদি ! দুর্ধর্ষ আমেরিকান টমির যে চিত্র অনেকের মনে আঁকা আছে, তার সঙ্গে কি এই বিজ্ঞাপন একটুও মেলে ?

টিভি বিজ্ঞাপনের সবচেয়ে অশ্লীল দিক হলো টাকার ঝনঝনানি। সারাদিন ধরে যে কতবার টাকা কথাটা উচ্চারিত হয় তার ঠিক নেই, টাকা পাইয়ে দেবার কতরকম প্রলোভন, এমনকি সত্যি সত্যি টাকা হাতে গুঁজে দেবার দৃশ্যও দেখা যাবে দিনের মধ্যে পাঁচ সাতবার। কত সামান্য কারণে লোকে হাজার হাজার টাকা পেয়ে যায়। বড় বড় কম্পানিগুলো নির্বাচিত দর্শকদের সামনে ধাঁধা প্রতিযোগিতা চালায়।

আমেরিকান টিভি কিন্তু সব মিলিয়ে বেশ নীতিবাগিশ। মরাল মেজরিটির চাপেই হোক বা যে-কারণেই হোক, যৌন দৃশ্য টি ভি-তে একেবারে নিষিদ্ধ। সাধারণ অনুষ্ঠানে তো বটেই এমন কি কোনো বিজ্ঞাপন চিত্রেও নগ্নতা কিংবা নারীর উন্মুক্ত বক্ষদেশ দেখানো হয় না। তবে চুম্বন যে-হেতু চা-জলখাবারের মতন, তাই সেই দৃশ্য দেখা যায় মুহুর্মুহু। সোপ অপেরায় প্রতি পাঁচ মিনিটে একটি করে দীর্ঘস্থায়ী চুম্বন দৃশ্য থাকবেই। আর নগ্নতার পরিবর্তে যা দেখানো হয়, তাও বেশ বিরক্তিকর। একই রকম স্বল্পবাস ঝাঁক ঝাঁক মেয়ে, যাদের ঠিক মানুষ মনে হয় না। মনে হয় পুতুল। টিভি-তে যে-সব সিনেমা দেখানো হয় তাও নিরামিষ ধরনের। অবশ্য কেব্‌ল কানেকশান নামে আর একটি ব্যাপার আছে। যাতে একটি চ্যানেলে চব্বিশ ঘণ্টাই একটার পর একটা সিনেমা দেখা যায়, তাতে সব রকম ফিলমই থাকে এবং প্রাপ্তবয়স্কদের উপযোগী ফিলম দেখানো হয় বেশী রাত্রে। ক্যানাডার টিভি-তে এই ব্যাপারটি আরও মজার। সেখানকার অনুষ্ঠান ইংরেজি এবং ফরাসী এই দুই ভাষায় হয়, এর মধ্যে ইংরেজি অনুষ্ঠান যৌন দৃশ্য বিরহিত, কিন্তু ফরাসী অনুষ্ঠানে সবই চলে।

সীরিয়াস ধরনের অনুষ্ঠানও কিছু কিছু থাকে এবং সেগুলি খুবই সুচিন্তিত। দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ডেকে এনে নানান বিষয়ে খোলাখুলি আলোচনা। শুধু বক্তৃতা নয়, অজস্র উদাহরণ ছবি সমেত। এ দেশটার একটা গুণ স্বীকার করতেই হবে। আমেরিকায় বসে আমেরিকাকে যত খুশী গালাগালি দেওয়া যায়। এ দেশের প্রেসিডেন্ট কিংবা শাসক দল সম্পর্কে কঠোর সমালোচনা টিভি-তে শোনা যায় অহরহ। সাধারণ মানুষকে ইন্টারভিউ করেও এক একজন খুব নাম করে ফেলে। যেমন ডনেহু-র টকশো খুব জনপ্রিয়। তবে এই সব গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাঝখানেও এমনই ঘন ঘন বিজ্ঞাপনের বাহুল্য থাকে যে সুর কেটে যায়। আসলে, বিজ্ঞাপনের মাঝখানের জায়গাগুলো ভরাট করার জন্যই যেন

অন্য অনুষ্ঠান।

তবে এইসব বিজ্ঞাপনদাতাদের একটা গুণ আছে। ছোটদের অনুষ্ঠানের মাঝখানে শুধু ছোটদের ব্যবহার্য জিনিসের বিজ্ঞাপন এবং সেগুলো এমনই সুন্দর ও মজাদার, যে সেগুলোও আলাদা ভাবে দর্শনীয়। এখানকার টিভি-তে ছোটদের অনুষ্ঠানগুলির কোনো তুলনা নেই। এর মধ্যে মাপেট শো তো জগৎবিখ্যাত এবং ছোটবড় সকলের প্রিয়।

ব্যবসায়িক টিভি'র পাশাপাশি একটি চ্যানেলে সম্পূর্ণ অব্যবসায়িক অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়। এর নাম পাবলিক ব্রডকাস্টিং সিস্টেম। এতে একটাও বিজ্ঞাপন নেই এবং নিছক স্থূল রুচি বা ভাঁড়ামোর কোনো অনুষ্ঠানও এতে থাকে না, জাঙ্গিয়া পরা পুতুল মেয়েদের নাচও নেই। এই অনুষ্ঠানগুলি চলে বিভিন্ন কম্পানির চাঁদায়, তাদের নাম উল্লেখ থাকে শুধু। অনেক বিদেশী অনুষ্ঠানও এরা ধার করে কিংবা কিনে আনে। এই চ্যানেলেই মাঝে মাঝে দেখা যায় ভারতীয় চলচ্চিত্র। মহাকাশ বিষয়ে কার্ল সেগানের 'কসমস' নামে বিখ্যাত অনুষ্ঠানটিও দেখা যায় এই চ্যানেলেই। ক্লাসিক সাহিত্যের চিত্ররূপও প্রায়ই দেখানো হয়। তবু পাবলিক ব্রডকাস্টিং সিস্টেম-এর অনেক অনুষ্ঠান দেখাবার পর একঘেয়ে লাগতে শুরু করে। মনে হয় যেন বড্ড বেশী জ্ঞানের কথা বলছে।

এবং এতগুলো চ্যানেল, এত অনুষ্ঠান বৈচিত্র্য, এত সিনেমা সত্ত্বেও কোনো এক সময় টিভি-র নব ঘুরিয়ে ঘুরিয়েও কোনো একটা অনুষ্ঠানও মনঃপূত হয় না। তখন ইচ্ছে করে টিভি বাক্সটাকে জোরে একটা লাথি কষাই! এই জন্যই একটি টিভি প্রস্তুতকারক কম্পানি বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন, উই অফার কিক্-প্রুফ সেট্‌স!

॥ ৪৪ ॥

অন্য কারুর বাড়িতে একা কয়েকদিন থাকলে মনে হয় আমিও যেন একজন অন্য মানুষ হয়ে গেছি। এই ঘরের কোথায় কী জিনিসপত্র আছে আমি জানি না। এক একবার এক একটা কিছু আবিষ্কার করি। সূর্যর অ্যাপার্টমেন্টে ভ্যাকুয়াম ক্লিনার খুঁজতে যেয়ে আমি পেয়ে গেলুম তিনখানা ভিডিও খেলনা। তাই নিয়ে কিছুক্ষণ সময় কাটলো। টিভি-তে ভিডিও খেলনা খেলতে খেলতে আমার মনে হয় আমি অন্য গ্রহের মানুষ।

মাঝে মাঝে অন্য লোকেরা টেলিফোন করে। প্রথমেই আমাকে সূর্য ভেবে

নিয়ে কথা বলতে শুরু করে। এক এক সময় আমার ইচ্ছে হয় সূর্য সেজে উত্তরও দিতে। কোনো মেয়ে ফোন করলে হয়তো সেরকম করতুমও, কিন্তু সূর্যকে শুধু পুরুষরাই ডাকে।

সূর্যর ঘরে পত্র পত্রিকাই বেশী, বই খুব কম। আজকাল এই এক রকম কালচার তৈরি হয়েছে। ছেলে-মেয়েরা অনেক রকম পত্র পত্রিকা পড়েই সব বিষয়ে জেনে যায়, সাহিত্য পড়ে না। ক্লাসিক্স তো পড়েই না।

একখানা বই পেলুম, সেটাও সাংবাদিকতা ঘেঁষা। তবে বইটি চমৎকার। বইটির নাম 'শ্লাউচিং টুয়ার্ডস বেথেলহেম', লেখিকা শ্রীমতী জোন ভিভিয়ন। শ্রীমতী বলা বোধহয় ঠিক হলো না, ইনি কুমারীও না, বিবাহিতাও না, অর্থাৎ মিস্ কিংবা মিসেস নন, এম এস। বাংলায় এর প্রতিশব্দ বোধহয় এখনো তৈরি হয়নি।

বইটি নোটবুক ধরনের। এতে আছে কিছু কিছু সাম্প্রতিক ঘটনা ও বিশেষ কয়েকটি ব্যক্তি সম্পর্কে স্কেচ। সাধারণ বিবরণ নয়। বেশ অন্তর্ভেদী চরিত্র-চিত্রণ, ভাষাও খুব গভীর। এই বইটিতে আমি এক নক্শাল নেতার সন্ধান পেয়ে চমকে উঠলুম। না, লেখাটি ভারতীয় কোনো বিপ্লবী সম্পর্কে নয়, আমেরিকান নক্শাল নেতা মাইকেল ল্যাসকি সম্পর্কে। আমাদের দেশে যেমন সি পি আই (এম-এল) দল আছে, এ দেশেও সেই রকম আছে সি পি উ এস এ (এম-এল) দল। আমেরিকার কমুনিস্ট পার্টি অনেক পুরোনো। এখন তা কয়েকটি ভাগে বিভক্ত। এর মধ্যে এই এম-এল গোষ্ঠী পুরোনো আদি কমুনিস্ট পার্টিকে 'শোধানবাদী বুর্জোয়া ক্লিক' মনে করে। অবিকল আমাদের দেশের মতন।

দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ায় ওয়াট্স শহরে একটি বইয়ের দোকানে এই দলের শাখা অফিস। দোকানটির নাম, 'ওয়ার্কার্সি ইন্টারন্যাশনাল বুক স্টোর', ভেতরে মস্ত বড় কাস্তে-হাতুড়ি মার্কা পতাকা ও মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন-স্ট্যালিন-মাও সে-তুং-এর ছবি। কমরেড ল্যাসকি এই দলের জেনারাল সেক্রেটারি, তিনি ঐ দোকান চালান ও 'পিপ্‌লস্ ভয়েস' ও 'রেড ফ্ল্যাগ' নামে দুটি পত্রিকা বার করেন। আমেরিকায় "শ্রমিক অভ্যুত্থান"-ই এঁদের লক্ষ্য।

জোন ভিভিয়ন যখন মাইকেল ল্যাসকির সাক্ষাৎকার নিতে যান, তখন তিনি ঐ মেয়েটিকে এফ বি আই-এর এজেন্ট ভেবেছিলেন। তবু তিনি সাক্ষাৎকারটি দিতে রাজি হন, কারণ এই বাজারী কাগজে এই সব লেখা বেরুলে জনগণ এই বিপ্লবী পার্টি সম্পর্কে বেশী করে জানবে। ল্যাসকির ধারণা, মার্কিন সরকার যে-কোনোদিন তাঁদের পার্টিকে নিষিদ্ধ করবে। পার্টি ওয়ার্কারদের মারধোর

কারাবাস এমনকি গুপ্ত-হত্যার জন্য তৈরি থাকতে বলেছেন। অবশ্য, এঁরাও অন্যরকমভাবে তৈরি আছেন, এদের পার্টি অফিসে, অর্থাৎ ঐ বইয়ের দোকানের পেছনে রাখা আছে কয়েকটি শট্‌গান ও রিভলবার। আমেরিকায় অস্ত্র রাখা বে-আইনী নয়।

লেখাটি পড়বার পর লক্ষ্য করলুম, এর রচনাকাল ১৯৬৭। আমাদের দেশেও মোটামুটি ঐ সময়েই নক্শাল আন্দোলন শুরু হয়েছিল না ? ল্যাসকি সাহেবের বয়েস তখন ছিল ছাব্বিশ, এখন তিনি কোথায় আছেন জানি না।

লেখাটি পড়তে পড়তে আমার একটা পুরোনো কথা মনে পড়লো। আগেরবার নিউ ইয়র্কে গ্রীনিচ্ ভিলেজে এক বাউণ্ডুলেদের আড্ডায় একদিন নানারকম গান হচ্ছিল, এক সময় কয়েকজন 'ইন্টারন্যাশনাল' শুরু করতেই আমিও গলা মিলিয়েছিলুম। ছাত্র জীবনে ঐ গান আমরা অনেক গেয়েছি তাই মুখস্থ। ওদের তারপর আমি ঐ গানের বাংলা ভাষা, "জাগো, জাগো সর্বহারা" (সম্ভবত নজরুলের অনুবাদ) গেয়ে শোনালুম।

সেই আড্ডায় উপস্থিত ছিল কবি অ্যালেন গীন্সবার্গ। সে আমাকে পরে আড়ালে বললো, 'ওহে নীলু চন্দর, আমরা এই গান গাইছি বটে, কিন্তু তুমি যেন আর অন্য কোথাও গেও না। তুমি বিদেশী, তোমার পেছনে গোয়েন্দা লেগে যেতে পারে। তোমার ভিসাও বাতিল করে দিতে পারে। আমি অবাক হয়ে বলেছিলুম, কেন ? ইট্স আ ফ্রি কান্ট্রি ! এখানে কোনো রকম গান গাওয়ায় নিষেধ আছে নাকি ? অ্যালেন বলেছিল, গানের জন্য তো কিছু বলবে না, অন্য কোনো ছুতোয় তোমাকে জ্বালাতন করবে। জানো তো, শালারা (অ্যালেন অবশ্য শালা বলেনি, অন্য গুরুতর গালাগালি দিয়েছিল) সব সময় কমুনিস্ট-জুজু খোঁজে !

সেই সময়ে নিজের দেশে অ্যালেন গীন্সবার্গ বামপন্থী হিসেবে পরিচিত ছিল। যে-কোনো জায়গায় সুযোগ পেলেই সে আমেরিকার সরকার ও ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার কঠোর সমালোচনা করেছে। কিন্তু সে কমুনিস্ট নয়, কারণ, সে অতীন্দ্রিয় অনুভূতিতে বিশ্বাসী, সমকামী এবং চরম বাক-স্বাধীনতাপন্থী। চেকোশ্লোভাকিয়া সফরে গিয়ে সে বিতাড়িত হয়েছিল, কারণ সেখানে সে বাক স্বাধীনতার পক্ষে বক্তৃতা দিয়েছিল। আবার পোল্যাণ্ডে পেয়েছিল বুদ্ধিজীবীদের কাছ থেকে সংবর্ধনা।

অ্যালেন জাতে ইহুদী। কুখ্যাত ইহুদী-হন্তা আইখম্যান যখন ধরা পড়ে এবং তাকে কী রকম শাস্তি দেওয়া হবে এই নিয়ে যখন জল্পনা-কল্পনা চলছিল, তখন অ্যালেন বলেছিল, কোনো শাস্তি না দিয়ে আইখম্যানকে জেরুজালেম শহরের

মেয়র করে দেওয়া উচিত। ইহুদীদের সেবা করলেই ওর পাপ-মুক্তি হবে।

এবারে অনেক চেষ্টা করেও আমি অ্যালেন গীন্‌সবার্গের দেখা পেলুম না। গেছোবাবার মতন সে যে কখন উত্তরে কখন দক্ষিণে যায় তার আর ঠিক নেই। আমি যখন ক্যালিফোর্নিয়ায়, সে তখন কলোরাডোতে, আমি নিউ ইয়র্ক ছেড়ে শিকাগোয় আসবার পরই খবর পেলুম সে নিউ ইয়র্কে কবিতা পড়তে গেছে।

অ্যালেনের সেই নিউ ইয়র্কের কবিতা পাঠের বিবরণ পড়লুম 'টাইম' সাপ্তাহিকে। প্রতিবেদক বেশ-ঠাট্টা ইয়ার্কি করেছে। বিদ্রূপের সঙ্গে বলেছে যে সেই বিপ্লবী কবি এখন ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, পোশাক ভদ্রলোকের মতন, গলায় টাই পর্যন্ত বেঁধেছে, কবিতাগুলোও শান্ত আর ভদ্র ধরনের। টিভি'র ছবি তোলার সময় আলোর ফোকাস ঠিক মতন তার মুখে পড়ছে কিনা সে ব্যাপারেও খেয়াল আছে টনটনে ইত্যাদি।

অ্যালেনের টাইপরা ছবি দেখে আমিও প্রথমে অবাক হয়েছিলুম। কলকাতার রাস্তায় সে পায়জামা-পাঞ্জাবি পরে ঘুরে বেড়াতো আর নিউ ইয়র্কের রাস্তায় মৃতবন্ধুর ট্রাউজার্স আর গেঞ্জি পরে, গালভর্তি দাড়ি।

পরে ভেবে দেখলুম, এটাই তো স্বাভাবিক। যে-বয়েসে যা মানায়। অ্যালেন গীন্‌সবার্গের বয়েস এখন প্রায় ষাট, এখন তো সুস্থির হবারই সময়। একবার নিউ ইয়র্কের এক কাব্য পাঠের আসরে কয়েকজন চিৎকার করে বলেছিল, আপনার এসব কবিতার মানে কী? মানে বুঝিয়ে দিন! অ্যালেন জামা-প্যান্টের সব বোতাম খুলে মঞ্চের ওপর সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে বলেছিল, এই হলো আমার কবিতার মানে। আর একবার অ্যারিজোনায় এক সমালোচকের নাকে ঘুঁষি মেরে বলেছিল, এবারে আমার কবিতার মানে বুঝলে তো? এসব তার ছোকরা বয়েসের কথা। এখনো সে যদি এরকম কিছু করে, তবে সেটা হবে অত্যন্ত ভাল্‌গার ব্যাপার, বুড়ো মানুষের খোকামি! এখন সে শান্ত হয়েছে, তার কবিতাও অনেক ঘন সংবদ্ধ হয়েছে।

এখানকার প্রথাসিদ্ধ লেখক যাঁরা, অর্থাৎ যাঁরা কলেজে পড়ান কিংবা ফাউণ্ডেশানের টাকা নিয়ে সাহিত্যচর্চা করেন, তাঁরা অ্যালেন গীন্‌সবার্গকে পছন্দ করেন না কেউ। নাম শুনলেই তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠেন। এরকম দু'একজনের কাছে আমি অ্যালেনের খোঁজ করতে গিয়েই এ ব্যাপারটা টের পেয়েছি। কেউ কেউ ঠোঁট বেঁকিয়ে বলেছে, ও, অ্যালেন? দ্যাখো গিয়ে সে বোধহয় আগামীবার মার্কিন প্রেসিডেন্টের পদে দাঁড়াবার জন্য তৈরি হচ্ছে!

এই ঈর্ষার কারণ অ্যালেনের অসাধারণ জনপ্রিয়তা। এখনো সে কবিতা পাঠ করতে দাঁড়ালে অল্প বয়সী ছেলে-মেয়েরা মুগ্ধ হয়ে শোনে। তার কবিতার

লাইন অনেকেই কথায় কথায় মুখস্থ বলে। বিশুদ্ধ কবিতা রচনা থেকে অ্যালেন কখনো সরে যায়নি।

খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন দেখে এখানকার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্য সভায় গেলুম একদিন। সকলের জন্য দ্বার অবারিত। এখানকার সব বিশ্ববিদ্যালয়েই নিয়মিত লেখকদের ডেকে এনে সাহিত্য সভা করে। এটা লেখকদের একটা উপার্জনের পথও বটে।

এই সভাটিতে জনা পাঁচেক মাঝারি ধরনের লেখক ছিলেন। তার মধ্যে দু'জনের নাম আমার পূর্ব পরিচিত। ভ্যান্‌স বুর্জালি এবং ডনাল্ড যাস্টিস। যথাক্রমে উপন্যাস ও কবিতা লেখার জন্য এঁরা দু'জনেই পুলিটজার পুরস্কার পেয়েছেন। অর্থাৎ আমাদের দেশের আকাডেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখকদের সমতুল্য। আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল ইদানীংকালের উপন্যাস ও ছোটগল্পের গতি প্রকৃতি।

কিন্তু কথাবার্তা শুনে আমার চোখ ছানাবড়া হবার উপক্রম।

পাঁচজন লেখক উপন্যাস-গল্প সম্পর্কে দু'চারটে মামুলি কথা বলার পরই তাঁরা শুরু করে দিলেন তাঁদের ট্রেডের নিজস্ব কথাবার্তা। অর্থাৎ বই ছাপার আজকাল কত ঝামেলা, প্রকাশকরা কত রকম গণ্ডগোল করে, ঠিক মতন টাকাকড়ির হিসেব দেয় না, সুপার মার্কেটগুলোতে শুধু সস্তা চটকদার বইগুলোই সাজিয়ে রাখে, সীরিয়াস বই রাখতেই চায় না, বড় বড় পত্র-পত্রিকায় সমালোচনা বার করা দিন দিন শক্ত হয়ে উঠছে, আর এই হতচ্ছাড়া টিভি কম্পানিগুলো কত লোককে টক শো-তে ডাকে। লেখকদের ডাকে না ইত্যাদি ইত্যাদি!

ও হরি, তা হলে সাহেব লেখকদেরও এই অবস্থা! ইংরেজিতে কথা বললেও আমার মনে হচ্ছিল এরা সবাই বাঙালী লেখক! আমরা যে ভাবতুম, সাহেব মানেই বড় লোক আর তাদের হাজার রকম সুবিধে! মহারাষ্ট্রের লেখকদের ধারণা হিন্দী লেখকদের অবস্থা ভালো, হিন্দী লেখকরা ভাবে বাঙালী লেখকদের অবস্থা ভালো, বাঙালী লেখকরা ভাবে ইংরেজিতে যারা লেখে একমাত্র তারাই স্বর্গসুখের অধিকারী। আসলে, ইংরেজিতেই দু'পাঁচজন লেখকই খুব বেশী বিত্তবান, তাও তারা থ্রিলার কিংবা হোটেল—এয়ারপোর্ট জাতীয় জিনিস লেখে। বাদবাকি সব লেখকদেরই চাকরি করতে হয় এবং প্রকাশকদের সঙ্গে ঠাণ্ডা লড়াই চালাতে হয়। পৃথিবীতে সব দেশের লেখকদেরই কি এই অবস্থা? একমাত্র সুইডেনের এক লেখকের মুখে শুনেছিলুম। তাঁর কোনো নালিশ নেই। তাঁর দেশের সরকার লেখকদের যে সম্মানের ব্যবস্থা করেছে, তার চেয়ে বেশী আর কিছু চাওয়া যায় না। সেখানকার লাইব্রেরি থেকে যে-সব লেখকদের বই

পাঠকরা নেয়, তার জন্যও সেই লেখকরা রয়ালটি পান।

আমেরিকায় একটি তরুণ কবিদের কাব্য পাঠের আসরেও আমি এই ধরনের আলোচনা শুনেছিলুম। বড় বড় পত্রিকায় কবিতা ছাপানো কত শক্ত, সে-রকম ভালো কাগজই বা কোথায়, বড় শহরের তুলনায় ছোট শহরের কবিরা তেমন পাত্তা পায় না সম্পাদকদের কাছে ইত্যাদি। এ যে অবিকল কলেজ স্ট্রিট কফি হাউসের কথাবার্তা!

এক সময় আমি আমেরিকান সাহিত্যের বেশ ভক্ত ছিলুম। কিন্তু সল বেলোর পর সে-রকম কোনো বড় লেখকের আর সন্ধান পাইনি। তাও সল বেলোকেও প্রকৃত অর্থে আন্তর্জাতিক লেখক বলা চলে কিনা সন্দেহ, তাঁর লেখা বড্ড বেশী রকম আমেরিকান। বিশেষত ইহুদী প্রথা ও সমাজ ঘেঁষা ডিটেইলসের প্রাবল্য এক এক সময় বিরক্তি ধরিয়ে দেয়। জন আপডাইকের ব্যাবিট সিরিজের লেখাগুলো একসময়ে ভালো লেগেছিল, এখন তার লেখায় এত বেশী রগরগে যৌন ব্যাপার থাকে যে মনে হয় এসব তো ছেলেমানুষী ব্যাপার! এই বাহ্য, আগে কহো আর! আপডাইকের একটি ভ্রমণ কাহিনী পড়েও বেশ হতাশ হলুম। কোনো ঔপন্যাসিক যখন ভ্রমণ কাহিনী লেখেন, তখন বোঝা যায় তাঁর চিন্তার ব্যাপকতা ও ভাষার ওপর দখল কতখানি। আপডাইক শুধু ইয়ার্কি-ঠাট্টা করেছেন। মেয়ে গাইডের সঙ্গে শোয়া যায় কি যায় না, এই চিন্তা যেন পাশ্চাত্ত্য লেখকদের একটা ব্যাধি হয়ে দাঁড়িয়েছে, কত লোকের ভ্রমণ কাহিনীতেই যে এটা পড়তে হয়! এমনকি গুণ্টার গ্রাসও এই কাণ্ড করেছেন। আপডাইক রাশিয়া সম্পর্কে লিখতে গিয়ে সেখানকার সুটকেশ কত খারাপ এই নিয়ে বাজে রসিকতা করেছেন আগাগোড়া।

একজন কালো-লেখিকা গল্প পড়ে শোনালেন একদিন। লেখিকাটি ইদানীং বেশ নাম করেছেন, বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে খাতির করে এনেছে। সে গল্প শুনে আমার মনে হলো, বাংলা ভাষায় এরকম গল্প অনেক আগেই ঢের লেখা হয়ে গেছে। সদ্য নাম করা আরও অনেকের লেখা পড়তে পড়তে আমি ভাবি, এসব কী লিখছে এরা, এর চেয়ে বাংলা সাহিত্যে অনেক ভালো লেখা হচ্ছে।

কী জানি, আমার আবার বাংলা-বাংলা বাতিক হয়ে গেল কিনা।

॥ ৪৫ ॥

কয়েকদিন ধরেই আমি খাঁচার মধ্যে বন্ধ সিংহের মতন ছটফট করছি ঘরের মধ্যে। অবিরাম তুষারপাতের জন্য পায়ে হেঁটে বাইরে বেরুবার কোনো উপায় নেই। এ শহরে আমার কোনো বন্ধু নেই যে আমায় তার গাড়িতে কোথাও

লিফ্‌ট দেবে। এমন পয়সাও নেই যে টেলিফোনে ট্যাক্সি ডাকতে পারি। সুতরাং আমি বন্দী।

অবশ্য আমার চেহারার সঙ্গে সিংহের কোনই মিলই নেই। সত্যের খাতিরে খাঁচায় বন্দী বাঁদরের সঙ্গেই আমার উপমা দেওয়া উচিত। কিন্তু চেহারা যতই খারাপ হোক, কেই-ই বা নিজেকে বাঁদরের সঙ্গে তুলনা দিতে চায়, হোলোই বা বাঁদর আমাদের পূর্বপুরুষ!

তাপাঙ্ক নেমে গেছে শূন্যের নিচে কুড়ি বাইশে। রাস্তার দু'পাশে দু'তিন ফুট বরফ জমে আছে। গাড়ি চলাচলের জন্য অবশ্য রাস্তার মাঝখানটা কিছুক্ষণ অন্তর অন্তর পরিষ্কার করে বালি ছড়িয়ে দেওয়া হয়। রাস্তার ঐ কালোত্বটুকু বাদ দিলে বাকি সবই সাদা ধপধপে। বাড়ির মাথায় বরফ, গীর্জার চূড়ায় বরফ, পাইন গাছগুলি বরফে ঢাকা। ছোট ছোট নদী ও হ্রদগুলোও জমে গেছে। জানালার ধারে দাঁড়িয়ে এই শ্বেত দৃশ্যপট দেখতে দেখতে এখন আমার একঘেয়ে লাগে।

আমি যে কেন এখানে পড়ে আছি তা আমি নিজেই জানি না। সঙ্গে রিটার্ন টিকিট আছে, যে-কোনো মুহূর্তে ফিরে যেতে পারি। এক একদিন খুব মন কেমন করে, আবার ভাবি, ফিরে গেলেই তো ফুরিয়ে গেল, আর তো আসা হবে না! দেশে তো কেউ আমার জন্য পায়েসের বাটি সাজিয়ে প্রতীক্ষা করে নেই। তা ছাড়া, মনের মধ্যে মাঝে মাঝে একটা কাঁটার খোঁচা টের পাই, একটা বিশেষ জায়গা এখনো আমার দেখা হয়নি। সে জায়গাটা আমি দেখতে চাই না, অথচ না দেখেও ফিরে যেতে পারছি না।

আমি যে এখানে আছি, আমার অনুপস্থিত আশ্রয়দাতা তা জানেই না। সূর্যর ফিরে আসার কথা ছিল এতদিনে, কিন্তু ফেরেনি।

আমিও ওর নাইজিরিয়ার ঠিকানাটা নিয়ে রাখিনি, তাই চিঠি লিখতে বা টেলিফোন করতে পারছি না। এখানে অবশ্য আমার খরচ লাগছে না প্রায় কিছুই। সূর্যর ভাঁড়ারের চাল-ডাল এখনো ফুরোয়নি। আমি দিব্যি খিচুড়ি খেয়ে চালিয়ে দিচ্ছি।

এ শহরে ক'জন বাঙালী আছে তা টেলিফোন গাইড দেখে অনায়াসেই বার করা যায়। যে-হেতু সূর্যর ঘরে পাঠ্য বই বিশেষ নেই তাই মাঝে মাঝে আমি টেলিফোন বইখানাই পড়ি, এই পুঁচকে শহরের টেলিফোন গাইড বইটি কলকাতার টেলিফোন গাইডের চেয়ে মোটা। পড়তে পড়তে আমি একজন মুখার্জি, দু'জন দাস, একজন সরকার, একজন মিস রায়চৌধুরীর সন্ধান পেলুম। মুসলমান নামও বেশ কয়েকটি আছে, এরা পৃথিবীর অনেক দেশেরই অধিবাসী হতে পারে, কিন্তু বাঙালী মুসলমানের নাম দেখলে আমি চিনতে পারি। একজন

প্যালেস্টিনীয় গেরিলার সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল, তার নাম আখমেদ, এক ইরানী মহিলাকে চিনি যার নাম তাহেরে সফরজাদে, এক মিশরী নাট্যকারকে চিনি যার নাম হ্যনি এলকাডি। এরকম নাম বাঙালী মুসলমানদের হয় না, কিন্তু সিরাজুল ইসলাম কিংবা রফিকুল আলম নির্ঘাৎ বাঙালী।

ছাপার অক্ষরে বাঙালীদের সন্ধান পেলেও আমার কোনো সুবিধে হলো না। আমার চরিত্রে এই দোষ আছে, অচেনা লোকের সঙ্গে যেচে ভাব জমাতে পারি না। অনেকে বেশ পারে, তাদের আমি ঈর্ষা করি।

এই রকমভাবে কয়েকটা দিন কেটে যাবার পর এসে গেলেন আমার উদ্ধারকর্তা।

সূর্যর ঘরে টেলিফোন প্রায়ই বাজে, নানান বিদেশী কণ্ঠ ওর খোঁজ নেয়। মাঝে মাঝে আমি টেলিফোন ধরিও না, আপনমনে রুনু রুনু করে বেজে যায়। এক সকালে পরপর তিনবার টেলিফোন বাজতে আমি বিছানা ছেড়ে উঠে গিয়ে রিসিভার তুলে গম্ভীর গলায় বললুম, হ্যালো?

ওপাশ থেকে একটি অকপট বাঙাল ভাষায় শোনা গেল, সুর্য্যিভাইডি, ফ্যারা হইলো কবে? শরীল টরিল ভালো আছে নি?

আমি বললুম, সূর্য এখনো ফেরেনি। কবে ফিরবে জানি না।

—আপনে কেডা?

—আমি সূর্যর বন্ধু। নিউইয়র্কে ওর সঙ্গে দেখা হয়েছিল, ও আমাকে ওর এই অ্যাপার্টমেন্টের চাবি দিয়ে গেছে।

—এ শহরে বাঙালী আইল অথচ আমি জানি না, এ তো বড় তাজ্জব কথা! কী নাম আপনের?

—আজ্ঞে, নীললোহিত।

—এ আবার কেমনধারা নাম! পদবী কী?

—ধরে নিন আমার পদবী লোহিত!

—ধইরা নেবো? পদবী কি ধরার জিনিস? এ তো বাপ, ঠাকুর্দার ব্যাপার। লোহিত পদবী জন্মে শুনি নাই।

—মেদিনীপুরের লোকেদের খাঁড়া, ধাড়া, বাঘ, হাতী এইরকম পদবী হয় না? তা হলে লোহিত হতে বাধা কী?

—ব্যাপারটা তেমন সুবিধার ঠ্যাকতাছে না। আপনে মশায় বার্গলার না তো? সূর্যির ঘরে অইন্য মানুষ। আপনি কী উদ্দেশ্যে আইছেন এখানে? কোথায় চাকরি পাইছেন?

—চাকরি পাইনি, বেড়াতে এসেছি।

—বেড়াইতে? এই ডিসেম্বর মাসে? খুবই সন্দেহজনক! আপনে ঘরেই থাকেন, বাইরাবেন না, আমি উইদিন ফিফটিন মিনিটস্ আইতাছি।

আমি বেশ সন্তুষ্ট চিত্তেই ভদ্রলোকের প্রতীক্ষা করতে লাগলুম। বিদেশে এসেও যে-লোক এমন ভাবে বাঙাল ভাষাটি আঁকড়ে রেখেছে সে মহাশয় ব্যক্তি নিশ্চয়ই।

কাঁটায় কাঁটায় ঠিক পনেরো মিনিটের মাথায় এসে হাজির হলেন ভদ্রলোক। দরজা খুলে আমি একটু চমকেই উঠলুম, বাঙাল ভাষা শুনলেই একজন ঢিলেঢালা গোঁছের মানুষের চেহারা মনে আসে। কিন্তু প্রথম দর্শনে এঁকে দেখে প্রায় সাহেব মনে হয়। টকটকে গৌরবর্ণ, বেশ দীর্ঘকায়, নিখুঁত সুট-টাই পরা, বয়েসে প্রায় প্রৌঢ়ই বলা চলে।

তীক্ষ্ন নজরে প্রথমে আমার আপাদমস্তক পর্যবেক্ষণ করে তিনি ঘরে ঢুকে এলেন, চতুর্দিকে ঘুরে সব কিছু যাচাই করে দেখে তিনি বললেন, বার্গলারির কোনো প্রুফ তো দ্যাখতে পাইতেছি না। আমার নাম শম্ভু মুখার্জি, আমি এখানের সকল বাঙালী সন্তানের লোকাল গার্জিয়ান। রহস্যময় আগন্তুক, আপনে কেডা সেইটা খুইল্যা কন্ তো!

আমি হাসতে হাসতে সংক্ষেপে আমার পরিচয় জানালুম।

শম্ভু মুখার্জি নীরবে সবটা শুনে বললেন, লালন ফকিরের একটা গান আছে, জানো? মনের মতন পাগল খুঁইজে পাইলাম না! এই এতদিনে আমি পাইছি, একখান পাগল! হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ,

তারপর তাঁর বিশাল হাত দিয়ে আমার কাঁধ চাপড়ে দিয়ে আবার বললেন, পাগল না হইলে কেউ এই ধাদ্ধারা গোবিন্দপুরে ডিসেম্বর মাসে আসে, না একা একা ঘরের মধ্যে বইস্যা থাকে? এখন চলো আমার সঙ্গে! ধড়া-চূড়া পইরা নাও! ওভারকোট আছে তো, নাকি তাও নাই?

সেদিনটা সারাদিনই আমি কাটিয়ে দিলাম শম্ভু মুখার্জির বাড়ি। সিডার র‍্যাপিড্স-এর উপকণ্ঠে ওঁদের সুদৃশ্য নিজস্ব গৃহ, সেখানে ঢুকলেই বোঝা যায় ওঁরা এখানকার পুরোনো বাসিন্দা। শুনলাম, এদেশে ওঁদের কেটে গেছে উনিশ বছর। শম্ভু মুখার্জি বিশালদেহী পুরুষ হলেও তাঁর স্ত্রী বিনতা বেশ ছোট্টখাট্টো হাসি খুশী। বিনতাবৌদি পুরো ঘটি, একটিও বাঙাল কথা বলেন না। এই দম্পতিটি নিঃসন্তান। রামকৃষ্ণ মিশনের দুটি গরিব ছাত্রের পড়াশুনোর খরচ চালাবার জন্য এঁরা নিয়মিত টাকা পাঠান।

শম্ভু মুখার্জি কাছাকাছি এক বিশ্ববিদ্যালয়ের নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের অধ্যাপক। রীতিমতন পণ্ডিত মানুষ। আবার অবসর সময়ে ছবি আঁকেন।

বিনতা বৌদিও পড়ান একটি বিকলাঙ্গদের স্কুলে, যা মাইনে পান তা সেই স্কুলকেই দান করেন।

এসব কথা আমি জানতে পারলুম আস্তে আস্তে অন্যদের মুখে। আমার খেয়ালই ছিল না যে আজ রবিবার। ছুটি ছাটার দিনে অনেকেই আসে এ বাড়িতে আড্ডা দিতে। শুধু বাঙালীরা নয়, যে কোনো ভারতীয়রই এ বাড়িটি একটি আড্ডাস্থল। যে-কোনো ভারতীয় ছাত্র যদি হঠাৎ বিপদে পড়ে কিংবা কোনো সেমেস্টারে অ্যাসিস্ট্যান্টশীপ না পায়, তা হলে শম্ভু মুখার্জি দম্পতি অতি গোপনে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন তাদের দিকে।

বিনতা বৌদি রান্না করতে এবং খাওয়াতে ভালোবাসেন। আর শম্ভুদা ভালোবাসেন তাস খেলায় হেরে যেতে এবং সেই উপলক্ষে কৃত্রিম রাগারাগি করতে। একটু বেলা পড়তেই এসে হাজির হলো নির্মল সরকার, অনন্য দাস, সুধীর পটনায়ক, সিরাজুল ইসলাম, সুরেশ যোশী। তাস খেলায় হেরে গিয়ে শম্ভুদা সবাইকেই কাঠ বাঙাল ভাষায় গালাগাল দেন। এই দিলদরিয়া আড্ডাবাজ মানুষটিকে দেখতে দেখতে আমার মনে হয়, ইস, সৈয়দ মুজতবা আলী যদি এঁকে দেখতেন, তা হলে কী দুর্দান্ত একটা চরিত্র বানিয়ে ফেলতে পারতেন।

আমার অনুমান নির্ভুল, সিরাজুল ইসলাম আর রফিকুল আলম দু'জনেই বাঙালী, একজন পশ্চিম বাংলার, অন্যজন বাংলাদেশের। এর মধ্যে রফিকুল আমায় চেপে ধরল, আপনি একা একা কাটাচ্ছেন কেন ? আমার ওখানে চলে আসুন। আরো অনেকেই এই প্রস্তাব দিল, শম্ভুদা বিনতাবৌদি তো বটেই। কিন্তু আমি রাজি হলুম না। আসলে একা থাকতে আমার ভালোই লাগে। আমি সাধুসন্ন্যাসী নই। দিনের পর দিন নির্জনতা সহ্য করতে পারি না ঠিকই, কিন্তু দিনের কিছুটা অংশ শুধু নিজের মুখোমুখি বসে থাকাটা আমি বেশ উপভোগ করি।

সূর্যর অ্যাপার্টমেন্টেই রয়ে গেলুম বটে, কিন্তু প্রতিদিনই কারুর না কারুর বাড়িতে নেমন্তন্ন লেগেই রইলো। সকলেরই গাড়ি আছে, তারা আমায় নিয়ে যায়, পৌঁছে দেয়।

প্রচণ্ড শীতেও এখানকার অফিস-কাছারি-দোকানপাট সবই খোলা থাকে, তবে বেশীদূর ঘোরাঘুরি বা বেড়ানোর ব্যাপার বন্ধ হয়ে যায়। কিছু ডাকাবুকো সাহেবের কথা আলাদা, এই শীতেও তারা পাহাড়ে যায় স্কি করতে। বেশীর ভাগ ভারতীয়েরই এমন শখ নেই। তারা কাছাকাছি আড্ডা দিতে যায়। এই শীতের সময় হাইওয়েতে রাত্তিরবেলা যদি গাড়ি খারাপ হয়ে যায়, তা হলে ধনে-প্রাণে মৃত্যু অসম্ভব কিছু না। কাগজে এরকম খবর মাঝে মাঝেই বেরোয়।

শীতের মধ্যে বেরুবার ঝক্কি-ঝামেলাটা বেশ বিরক্তিকর। বাইরে বরফ পড়লেও বাড়ির মধ্যে গরম, স্রেফ একটা গেঞ্জি পরে কাটিয়ে দেওয়া যায়। বাইরে বেরুতে হলে সেই গেঞ্জির ওপরে পরতে হবে শার্ট, তারপর সোয়েটার বা জ্যাকেট, তার ওপরে ওভারকোট, হাতে চামড়ার দস্তানা, মাথায় টুপী, পায়ে গরম মোজা আর লম্বা জুতো। এত সব মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের জন্য, শুধু বাড়ি থেকে বেরিয়ে গাড়িতে উঠতে হবে—ঐ কয়েক পা যাবার জন্য এত সতর্কতা। গাড়ির মধ্যে আবার গরম। যে-বাড়িতে পৌঁছোবো, সে-বাড়িও গরম। সেখানে গিয়েই আবার সব খুলে ফেলতে হবে।

পরের শনিবার সন্ধেবেলা শম্ভুদার বাড়িতে বিরাট পার্টি হলো। সর্বভারতীয় সম্মেলন তো বটেই, কয়েকজন সাহেব-মেমও এসেছে। এই পার্টিতে হলো আমার এক নতুন অভিজ্ঞতা। এখানেই আমি প্রথম সাক্ষাৎ পেলুম একটু শিক্ষিত, শ্বেতাঙ্গ আমেরিকান বেকার যুবকের।

আমি অল্প কয়েকমাস আগে ভারত থেকে এসেছি এবং শিগগিরই ভারতে ফিরে যাবো শুনে এই যুবকটি বেশ আগ্রহের সঙ্গে আলাপ করতে লাগলো আমার সঙ্গে। ছেলেটিকে সবাই ডিক্ বলে ডাকছিল। (বাংলা রামা-শ্যামা-যদুর ইংরেজি হলো টম-ডিক-অ্যাণ্ড হ্যারি। আজকাল বাঙালীদের মধ্যে রাম-শ্যাম-যদু নাম বিশেষ শোনা যায় না, কিন্তু এদেশে টম-ডিক-হ্যারি এখনো অজস্র) ডিকের বয়স তিরিশের কাছাকাছি, মাঝারি উচ্চতা, মাথার চুল কোঁকড়া। অধিকাংশ আমেরিকানের মুখেই একটা অহংকারী আত্মপ্রত্যয়ের ভাব থাকে, সেই তুলনায় এর মুখখানি বেশ বিনীত আর তৈলাক্ত। সেই দেখেই আমার সন্দেহ করা উচিত ছিল, কিন্তু ছেলেটি আমায় পরিচয় দিল যে সে টিভি-তে সোপ-অপেরার স্ক্রিপ্ট লেখে, ছোটখাটো ভূমিকায় অভিনয়ও করে।

ডিক্ খুব সিনেমায় উৎসাহী, পৃথিবীর মধ্যে ভারতেই সবচেয়ে বেশী সিনেমা তৈরি হয় কেন, সে সম্পর্কে ওর খুব কৌতূহল। আমি আবার এই সব ব্যাপার খুবই কম জানি। হুঁ-হাঁ দিয়ে কাজ চালাতে লাগলুম। ডিক্ বাংলা ফিল্ম্ সম্পর্কেও কিছু খবর রাখে। কথায় কথায় ও আমায় জিজ্ঞেস করলো, তুমি সত্যজিৎ রায়কে চেনো ? তিনি তো ক্যালকাটা বেজ্‌ড, তাই না ? তোমার সঙ্গে আলাপ আছে নিশ্চয়ই ?

সত্যজিৎ রায় পৃথিবীবিখ্যাত মানুষ, আমাদের কাছে অনেক দূরের লোক। দূর থেকে তাঁকে দু'একবার দেখেছি বটে কিন্তু কখনো কথা বলার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারিনি। কিন্তু এই সব ক্ষেত্রে একটু আধটু মিথ্যে কথা বলার লোভ সংবরণ করা শক্ত। আমি সঙ্গে সঙ্গে মাথা নেড়ে বললুম, হ্যাঁ হ্যাঁ চিনি !

ছেলেটিও তৎক্ষণাৎ বললো, তুমি সত্যজিৎ রায়কে বলে ওঁর কোনো ফিল্মে আমার একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দিতে পারো!

এবার আমার আকাশ থেকে পড়ার মতন অবস্থা। চাকরি? সত্যজিৎ রায়ের কাছে? আমি তার ব্যবস্থা করে দেবো? আমতা-আমতা করে বললুম, মানে, সত্যজিৎ রায়ের নিজস্ব ইউনিট আছে, তা ছাড়া দেশ বিদেশের অনেকেই ওঁর সঙ্গে কাজ করার জন্য উন্মুখ শুনেছি, সেইজন্য সুযোগ পাওয়া খুবই শক্ত।

—তুমি তা হলে অন্য কোনো বাংলা ছবিতে আমার একটা কাজ জোগাড় করে দিতে পারবে? আমার কিছু কিছু অভিজ্ঞতা আছে, আমার বেশী টাকা চাই না, আমি কষ্ট করেও থাকতে পারবো।

আমি মনে মনে ভাবলুম, বাংলা সিনেমার যা দুরবস্থার কথা শুনেছি, অনেক টেকনিশিয়ানই খেতে পায় না, সেখানে একজন আমেরিকান পোষা তো অসম্ভব ব্যাপার। তা ছাড়া এক বর্ণ বাংলা-না-জানা সাহেব নিয়ে বাংলা সিনেমা করবেই বা কী?

ডিক্ বললো, তোমায় আমার বায়ো-ডাটা আর কিছু কিছু ক্রিডেনশিয়ালস্ দিয়ে দিতে পারি, তুমি যদি ইণ্ডিয়াতে আমার জন্য একটা চাকরির চেষ্টা করো—

আমি একটা অছিলা দেখিয়ে উঠে পড়লুম তার পাশ থেকে, তবু সে সঙ্গ ছাড়ে না। বারবার ঐ একই কথা বলতে লাগলো।

অনেক রাত্তিরে পার্টির বেশীর ভাগ লোক চলে যাবার পর শম্ভুদার সঙ্গে আমরা কয়েকজন বসলুম জমিয়ে আড্ডা দিতে। বিনতাবৌদি জিজ্ঞেস করলেন, ঐ ডিক্ তোমাকে অত কথা কী বলছিল?

আমি বললুম, আমার কাছে চাকরি চাইছিল! ভেবে দেখুন ব্যাপারটা, ভারতে কোটি কোটি বেকার, আমি স্বয়ং বেকার, আর আমার কাছেই কিনা চাকরি চাইছে একজন আমেরিকান!

বিনতা বৌদি বললেন, এখন এদেশেও ষোলো পার্সেন্ট বেকার!

সিরাজুল বললো, সাবধান, ও কিন্তু সুযোগ পেলেই টাকা ধার চাইবে। আমার কাছ থেকে পঁচিশ ডলার নিয়েছে।

শম্ভুদা বললেন, ছেলেটা খুব কষ্টে পড়েছে। একটা কলেজে চাকরি করতো, কী কারণে যেন চাকরি গেছে আমাদের ইউনিভার্সিটিতে আপাতত কোনো পোস্ট খালি নেই, আমি চেষ্টা করছি ওর জন্য···ওর বৌটাও পালিয়েছে ওকে ছেড়ে, একটা আট বছরের ছেলেকে নিয়ে ও ট্রেলার হাউসে থাকে, খুব টানাটানির মধ্যে পড়েছে—

আমি বললুম, ও যে বলছিল, টিভি'র নাটকের স্ক্রিপ্ট লেখে, অভিনয় করে?

শম্ভুদা বললেন, ধুৎ! সে সব বাজে কথা। কয়েকটা স্ক্রিপ্ট পাঠিয়েছে, একটাও নেয়নি ওরা। দু'একটা কমার্শিয়ালে শুধু মুখ দেখানো অভিনয় করেছে, তাতে কী হয়!

পরদিন সকালেই ডিক আমার কাছে এসে হাজির। সঙ্গে একগাদা কাগজপত্র। ওর নানান যোগ্যতার সার্টিফিকেটের কপি। বারবার বলতে লাগলো ইনিয়ে বিনিয়ে, ইণ্ডিয়াতে গিয়ে কাজ করার খুব ইচ্ছে, তুমি যদি একটা কাজ যোগাড় করে দিতে পারো, মাইনে বেশী চাই না, অন্তত তিনশো ডলার হলেই আমি চালিয়ে নিতে পারবো—।

তিনশো ডলার ও দেশে খুবই সামান্য টাকা, মাস চালানো কঠিন। কিন্তু ভারতীয় মুদ্রায় তা সাতাশ শো টাকা। অত টাকা এদেশে ক'জন রোজগার করে!

এ ক্ষেত্রে নিরুপায় হয়ে আমায় মিথ্যে স্তোক বাক্য দিতেই হলো, হ্যাঁ হ্যাঁ, চেষ্টা করবো, আমি নিশ্চয়ই চেষ্টা করবো তোমার জন্য—।

॥ ৪৬ ॥

আর কয়েকদিন পরেই ক্রিসমাস। চতুর্দিকে সাজ সাজ রব। প্রত্যেক পরিবারে পুজোর বাজার চলছে পুরোদমে। কয়েকদিন তুষারপাত বন্ধ আছে, বরফ-ঠিকরোনো রোদ্দুরে অতিরিক্ত ঝলমল করছে প্রকৃতি। এই যে বরফ জমে আছে এখন, এই বরফ গলতে শুরু করবে সেই মার্চ-এপ্রিলে। কিন্তু ততদিন আমি থাকবো না। আমার মনের মধ্যে যাই যাই রব উঠে গেছে। ঠিক করে ফেলেছি, ক্রিসমাস আর থার্টি ফার্স্ট ডিসেম্বরের উৎসব দেখেই ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাবো।

বাইরে অত ঠাণ্ডা, কিন্তু কাল রাতে আমার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল দারুণ গরমে। ঘামে ভিজে গিয়েছিল সারা শরীর। বিছানা ছেড়ে ওঠে সেন্ট্রাল হিটিং ব্যবস্থা একেবারে বন্ধ করে রেখেছিলুম কিছুক্ষণের জন্য। সারাক্ষণ কৃত্রিম গরম বাতাস ঢোকানো হচ্ছে ঘরে, এক এক সময় শরীরে খুব অস্বস্তি হয়, তখন মনে হয়, এর চেয়ে ঠাণ্ডায় কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করে আসাও ভালো। কাল রাত দুটোর সময় আমি ঠাণ্ডা জলে স্নান করেছিলুম।

সকালে ভাবছিলুম, আজ একটু পায়ে হেঁটে ঘুরে আসবো। এমন সময় মুখার্জিদার ফোন এলো।

—ওহে নীলুচন্দর, ঘুম ভাঙছে? চা খাওয়া হইছে?

—গুড মর্নিং মুখার্জিদা। অ্যাম অ্যাট ইওর সার্ভিস।
—বইস্যা বইস্যা কী করত্যাছো ?
—সিম্পলি ডে ড্রিমিং !
—আমি ডে ময়েন যাইত্যাছি, একখান্ লেকচার আছে। যাবা নাকি আমার লগে ?
—ডে ময়েন ?
—হ, ভালো জায়গা। বী রেডি উইদিন হ্যাফ অ্যাওয়ার। আই'ল পিক ইউ আপ !

ফোন ছেড়ে আমি ঝিম মেরে বসে রইলুম কিছুক্ষণ। আমার নিয়তি !

ভেবেছিলুম আমেরিকার আর যেখানেই যাই, আয়ওয়া শহরে যাবো না। ও জায়গাটা আমার নিষিদ্ধ এলাকা। কিন্তু ডে ময়েন যেতে হলে আয়ওয়া শহরের পাশ দিয়েই যেতে হবে। আমার নিয়তিই আমাকে টেনে এনেছে এই পর্যন্ত। মুখার্জিদার প্রস্তাবটি যে প্রত্যাখ্যান করবো, সে রকম মনের জোরও নেই।

মুখার্জিদার দুটি গাড়ির মধ্যে আজ এনেছেন মার্সিডিজ বেঞ্জখানা। ঝকঝকে নতুন। মুখার্জিদার চেহারাটিও পাক্কা সাহেবের মতন, ইংরেজিও বলেন দারুণ চোস্ত। এই লোকটির মুখে একেবারে নিপাট বাঙাল ভাষা শুনলে কেমন যেন অস্বস্তি লাগে। মুখার্জিদা মদ টদ খান না এবং গাড়ি চালাবার সব রকম নিয়ম কানুন মেনে চলেন। মুখার্জিদার পাশে বসলেই সীট বেল্ট বাঁধতে হয়।

হাইওয়েতে পড়বার পর মুখার্জিদা জিজ্ঞেস করলেন, কী বেরাদর, আইজ মুখখান বাঙলার পাঁচের মতন গম্ভীর কইর‍্যা আছো ক্যান ?

আমি একটু চমকে উঠে বললুম, কই না তো ?
—দ্যাশের জন্য মন কান্দে ?
—আপনার কাঁদে না ?
—না রে ভাইডি। আমার কোনো দ্যাশ নাই। সে দুঃখের কথা আর কী কমু।

এরপর কিছুক্ষণ আমি মুখার্জিদাকে একলাই কথা বলতে দিলুম। আমার আজ সত্যিই আড্ডার মুড নেই। রোড সাইন দেখে বুঝতে পারছি, আয়ওয়া সিটি আর বেশী দূরে নেই। সব হাইওয়ের চেহারাই এক, সুতরাং চেনা কিছুই চোখে পড়ছে না।

হঠাৎ মন ঠিক করে ফেললুম। মুখার্জিদাকে বললুম, দাদা, একটা কথা বলবো ? আপনি ডে ময়েন থেকে কখন ফিরবেন ?
—সাতটা আটটা হবে। ক্যান, তোমার তাড়া আছে নাকি ?

—না। সে জন্য নয়। আপনি বরং এক কাজ করুন। আমাকে আয়ওয়া সিটিতে নামিয়ে দিয়ে যান। ফেরার সময় আবার আমায় তুলে নিয়ে যাবেন। ডে ময়েন শহরে আমার চেনাশুনো কেউ নেই, আপনার বক্তৃতা শুনেও আমি কিছুই বুঝতে পারবো না। সেরকম বিদ্যাবুদ্ধি আমার নেই। বরং আয়ওয়া শহরটা ঘুরে দেখি।

মুখার্জিদা দারুণ অবাক হয়ে বললেন, আয়ওয়া সিটি ? সেখানে দেখার আছেটা কী ? পুঁইচকা একখান শহর, ল্যাজা নাই মুড়া নাই। ডে ময়েন অনেক বড়, ভালো ভালো দোকানপাট আছে…
—না দাদা, আমি এখানেই নামবো।
—আয়ওয়া সিটিতে চেনা কেউ আছে ?
—হয়তো চেনা কারুকে পাবো না। কিন্তু জায়গাটা আমার খুব চেনা। গাছ-পালা, বাড়ি-ঘরগুলোকেও চিনি।

মুখার্জিদা নিরাশ হয়ে বললেন, যাবা না আমার লগে ? আমি একলা একলা যামু ? চলো না ভাইডি, অনেক কিছু খাওয়ামু। ওয়াইল্ড রাইস খাইছো কখনো ?

তবু আমি নেমে পড়লুম প্রায় জোর করে। ওয়াইল্ড রাইসের লোভ দেখিয়ে কোনো কাজ হলো না, ঐ চালের ভাত আমি অনেকবার খেয়েছি। এ একরকম বুনো ধান, কেউ চাষ করে না, জলা জায়গায় জন্মায়, লাল ইণ্ডিয়ানরা খুঁজে আনে। লম্বা লম্বা চাল হয়, একটু হলদে ধরনের। তাতে অপূর্ব সুন্দর একটা গন্ধ। আশ্চর্য ব্যাপার, এই আয়ওয়া শহরেই প্রথম একজন ওয়াইলড রাইস রেঁধে খাইয়েছিল আমায়।

ঠিক হলো, ইউনিভার্সিটির ইউনিয়ানের রেস্তোরাঁ থেকে ঠিক রাত আটটার সময় মুখার্জিদা আমায় তুলে নিয়ে যাবেন ফেরার সময়।

অনেক দিন আগে এই ছোট্ট শহরে আমি এক বছর থেকেছি। এখানকার রাস্তার প্রতিটি ধুলোও আমার চেনা, যদিও এদেশের রাস্তায় ধুলো থাকে না। তা ছাড়া আমার ধারণা ঠিক নয়, যে শহরটাকে আমি চিনতুম, সেটা আর নেই। এদেশে সব কিছুই বড় দ্রুত বদলায়। তখন আয়ওয়া সিটি ছিল একটা ছোট্ট, ছিমছাম নিরিবিলি শহর, অধিকাংশ বাড়িই কাঠের দোতলা। এখন সেসব বাড়ি আর প্রায় চোখেই পড়ে না, এদিকে সেদিকে বড় বড় বাড়ি। চারদিকে ছিল ছোট ছোট পাহাড় আর নিবিড় জঙ্গল, এখন পাহাড়ের গায়ে গায়েও বাড়ি উঠেছে, জঙ্গলের মধ্য দিয়ে বড় বড় রাস্তা। দোকান ছিল মাত্র দু'তিনটে, এখন রীতিমতন একখানা ডাউন টাউন, সেখানে সার সার দোকান ও ট্যাভার্ন।

যেখানে ছিল বাস স্টেশন, সেটা ভেঙে সেখানে গড়ে উঠেছে সুদৃশ্য শপিং মল। সেখানে, এমনকি একটা ভারতীয় জিনিসপত্রেরও দোকান রয়েছে দেখছি।

রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ালুম অনেকক্ষণ। একটা লোকও আমায় চেনে না। আগে রাস্তায় বেরুলেই দু'তিনজন অন্তত একজন মুখ-চেনা চোখে পড়তো, মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে জিজ্ঞেস করতো, হাই!

শুধু আয়ওয়া নদীটি একই রকম আছে। রোগা, কালো জল। নদীর দু'পাশের দৃশ্য বদলে গেছে, সেই নির্জনতা আর নেই, নতুন ব্রীজও তৈরি হয়েছে গোটা তিনেক, তবু নদীটিকে চেনা লাগলো। তার কিনারে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলুম, নদী, তুমি কেমন আছো? আমায় চিনতে পারো?

এই নদীর ধার দিয়ে বিকেলবেলা আমি আর মার্গারিট হাঁটতুম। এই রকম শীতের বেলায়। এখনও যেমন, তখনও তেমন নদীর জলে ভাসতো চাঁই চাঁই বরফ, কোথাও কোথাও একেবারে শক্ত হয়ে জমে যাওয়া। দু'ধারে পপলার গাছের সারি। হাঁটতে হাঁটতে মার্গারিট আমায় শোনাতো ফরাসী ভাষা, আমি ওকে শেখাতুম বাংলা। আমি জানি না, এর ফরাসী কী? জ্য ন সে পা! তাড়াতাড়িতে বলতে হয় জ্যন্সেপা! এবার বলো, জ্য পাঁঝ দ্‌ক, জ্য সুই! আমি চিন্তা করি, তাই আমি বেঁচে আছি।

মার্গারিটের ফরাসী ঠোঁটে বাংলা শোনাতো বড় মধুর। আ-মি সসেজ কাবো! আ-মি জ-ল কাবো! আ-মি চু-মু কাবো! স-ব কা-বো? হাউ অ্যাবসার্ড! হাউ সুইট!

একেবারে পাগলী ছিল মেয়েটা। কবিতা পাগল। দিনরাত কবিতা-তন্ময়! যে-কোনো দৃশ্য, যে-কোনো ঘটনা দেখলেই জিজ্ঞেস করতো, বলো তো, কার কবিতায় ঠিক এরকম আছে?

আমি কি অত পারি? আমার তো অত কবিতা জ্ঞান নেই। সুতরাং ও-ই শোনাতো আমাকে। আমার ঘরে পাশাপাশি বসে ও আমাকে গীয়ম্ অ্যাপোলোনিয়েরের কবিতা পড়ে শোনাতো ঘণ্টার পর ঘণ্টা। অ্যাপোলিনিয়েরের একটি কবিতায় দুষ্মন্ত শকুন্তলার প্রণয় কাহিনীর উল্লেখ থাকায় ও বলেছিল, তুমি আমায় কালিদাসের শকুন্তলা শোনাও! শুধু কাহিনীটা বললে হবে না, কালিদাসের রচনা ওকে পড়ে শোনাতে হবে। দেশ থেকে বাংলা কালিদাস গ্রন্থাবলী আনিয়ে দিনের পর দিন আমার অক্ষম ইংরেজিতে ওকে অনুবাদ করে শুনিয়েছি।

যে-বাড়িটায় আমি থাকতুম, খুব ইচ্ছে হলো সেই বাড়িটা দেখবার। ঠিকানা এখনো মুখস্ত আছে। এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল বাড়িটার নাম ক্যাপিটল।

তার চারদিকে চারটে রাস্তা। আমার বাড়ি ছিল তিন শো তিন নম্বর সাউথ ক্যাপিটলে। এক বছর যেখানে থেকেছি, সেই রাস্তা ভুলে যাওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। তবু আমি পথ চিনতে পারছি না। সাউথ ক্যাপিটল রাস্তাটা ধরে হাঁটতে হাঁটতেও দিশেহারা হয়ে যাই। এ যে সব কিছুই অন্যরকম। আমার বাড়িটা গেল কোথায়? আমার বাড়িটা ছিল রেল স্টেশনের দিকে। পথ চলতি দু'একজন ছাত্রকে রেল স্টেশনের কথা জিজ্ঞেস করলে তারা চিন্তিত মুখে থমকে থাকে। রেল স্টেশান? কখনো এর কথা শুনিনি তো? ছাত্র মানেই নতুন আবাসিক, তাই চেনে না। এবার জিজ্ঞেস করলুম একজন বয়স্ক লোককে। তিনি বললেন, রেল স্টেশন? হ্যাঁ ছিল বটে এককালে। এখন তো সেটাতে আর কিছু হয় না। এখান থেকে রেল উঠে গেছে!

কোনো শহর থেকে রেল স্টেশান উঠে যাবার কথা কেউ আগে শুনেছে? আমরা তো জানি নতুন নতুন রেল স্টেশন হয়, পুরোনোরা উঠে যায় না। আমেরিকাতে ট্রেন ব্যাপারটাই এখন মুমূর্ষু!

অনেকক্ষণ ঘোরাঘুরির পর বুঝতে পারলুম, সাউথ ক্যাপিটলের অর্ধেকটা আছে, আর বাকি অর্ধেকটা উধাও হয়ে গেছে। সেই রাস্তা ও সেখানকার সব বাড়ি ঘর ভেঙে-গুঁড়িয়ে সেখানে উঠেছে অনেকগুলো মাল্টিস্টোরিড অ্যাপার্টমেন্ট হাউস। সেই বাড়িটিতে আমার প্রথম যৌবনের অনেক স্মৃতি ছিল। বাড়িটি আর ইহলোকে নেই, মার্গারিটও নেই।

মার্গারিট থাকতো হস্টেলে অর্থাৎ ডর্মে। সেই সময় ছাত্র ও ছাত্রীদের আলাদা আলাদা ডর্ম ছিল, এখন তারা ইচ্ছে করলে একসঙ্গেই থাকতে পারে।

এক একদিন রাত একটা দেড়টায় আমি মার্গারিটকে ওর ডর্মে পৌঁছে দিতে আসতুম। প্রায় কাছাকাছি আসবার পর ও বলতো, এবার তুমি একলা ফিরবে? চলো, আমি তোমায় খানিকটা এগিয়ে দিয়ে আসি।

আমি যতই বারণ করি, সে পাগলী কিছুতেই শুনবে না। জোর করে আসবেই। অনেকখানি চলে আসে। তখন আমি পুরুষ হয়ে সেই নিশুতি রাতে একটি যুবতীকে কী করে একলা ছেড়ে দিই! আবার আমি ফিরে যাই ওর সঙ্গে। আবার ও আমাকে এগিয়ে দিতে চায়। প্রথম যৌবনের সেই সব উল্টো-পাল্টা খেলা।

মার্গারিটের মনটা ছিল জলের মতন স্বচ্ছ। টাকা পয়সার কোনো হিসেবই বুঝতো না। যে-কেউ চাইলে ওর যা কিছু সম্বল এক কথায় দিয়ে দিতে পারতো। এমন প্রায়ই হয়েছে, আমাদের দু'জনের কাছে একটাও পয়সা নেই, ঘরে কোনো খাবার নেই, আমরা খালি পেটে কবিতা পড়ে কাটিয়েছি। খিদের

জ্বালা খুব অসহ্য হলে ঠিক খাওয়ার সময় কোনো বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হয়েছি, যাতে সে কিছু খেতে বলে। আমাদের বাড়ির নিচের তলাতেই থাকতো পোল্যাণ্ডের একটি ছেলে, নাম ক্রিস্তফ, সে খুবই ভালো মানুষ, কিন্তু একটু কৃপণ স্বভাবের। আমি আর মার্গারিট দু'জনে মিলে যে কত কৌশলে ক্রিস্তফের ঘাড় ভেঙেছি!

একদিন তিনজন দৈত্যাকার কালো মানুষকে মার্গারিট নিয়ে এসেছিল আমার ঘরে। তারা নাকি রাস্তা হারিয়ে ফেলেছে। আমি স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলুম, ওরা বদ্ধ মাতাল আর ওদের মতলব খুব খারাপ। মার্গারিটকে সে কথা বললে ও বিশ্বাসই করতে চায় না। ওর ধারণা, পৃথিবীতে কোনো খারাপ মানুষ নেই।

সেই রকমই কোনো লোককে বেশী বেশী বিশ্বাস করায় মার্গারিটের কিছু একটা সাঙ্ঘাতিক পরিণতি হয়েছিল। তাকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। আমাকে সেই ঘটনার পূর্ণ বিবরণ কেউ জানায়নি। পল এঙ্গেল বলেছিলেন, সে বড় মর্মান্তিক ব্যাপার, সে তোমার শুনে কাজ নেই।

আমি আয়ওয়া শহরে আসতে চাইনি, কারণ আমি ভেবেছিলুম, মার্গারিটের স্মৃতির কষ্ট আমি সইতে পারবো না। কিন্তু একলা একলা অনেকক্ষণ ঘোরাঘুরি করার পর আমি হঠাৎ উপলব্ধি করলুম, কই, তেমন তো কষ্ট হচ্ছে না? আমি তো সব কিছুই স্বাভাবিকভাবে নিতে পারছি। তবে কি আমার হৃদয় খুব কঠিন? সময়ের ব্যবধান কি এতখানি ভুলিয়ে দিতে পারে? ভুলি নি কিছুই, কিন্তু দুঃখের বদলে মার্গারিটের স্মৃতি আমার কাছে মধুর হয়ে আসছে।

॥ ৪৭ ॥

এই শহরটির অনেক কিছু বদলে গেলেও একজন মানুষ বদলায়নি। তাঁকে দেখার পর আমি দারুণ চমকে উঠেছিলুম। মানুষের শরীর এত অবিচলিত থাকতে পারে?

রাস্তার টেলিফোন বুথ থেকে টেলিফোন করলুম পল এঙ্গেলকে। প্রথমে তিনি অবাক হয়ে দু'তিনবার বললেন কে? কে? তারপর আমায় চিনতে পেরে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোথা থেকে কথা বলছো, কলকাতা? দিল্লি? লণ্ডন?

আমি যখন বললুম এই আয়ওয়া শহর থেকেই, তখন পল একটা বিরাট লম্বাভাবে বললেন, হো-য়া-ট? তুমি এক্ষুনি আমার বাড়ি চলে এসো। না, না, তুমি নিজে আসতে পারবে না। তুমি কোথায় আছ? সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকো, আমি তোমায় তুলে আনছি।

শীতের জন্য বেশীক্ষণ রাস্তায় থাকা যায় না, সেই জন্য আমি মাঝে মাঝেই কোনো না কোনো দোকানে ঢুকে শরীর গরম করে নিচ্ছিলুম। এখানকার দোকানে কিছু না কিনেও ঘুরে বেড়ালে কেউ কিচ্ছু বলে না। এখন আমি রয়েছি বুক স্টোরে। আগেই বলেছি, আয়ওয়া শহরটি খুবই ছোট, ধরা যাক মানকুণ্ডু কিংবা সোনারপুরের মতন। তবু এখানকার মতন এত বড় বইয়ের দোকান সম্ভবত কলকাতা শহরেও একটি নেই।

পল এঙ্গেল মানুষটি বড় অদ্ভুত। ইনি নিজে একজন কবি, খুব একটা উঁচু জাতের নন্ যদিও, আমেরিকার আধুনিক কবিদের চোখে ইনি, ধরা যাক, কালিদাস রায়। কিন্তু, পল এঙ্গেল সাহিত্যকে প্রাণের চেয়ে বেশী ভালোবাসেন। ওঁর মতে, পৃথিবীর সমস্ত সাহিত্যিকরাই এক জাতির লোক এবং সবাই সবাই-এর আত্মীয়। সেই জন্য উনি প্রতি বছর একটা আত্মীয় সমাবেশ ঘটান এই ছোট শহরে। প্রধানত ব্যক্তিগত উদ্যোগে এবং এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় উনি চালু করেছেন ইন্টার ন্যাশনাল রাইটিং প্রোগ্রাম। সেই প্রোগ্রামে পৃথিবীর নানান দেশের লেখকদের নেমন্তন্ন করে এনে এখানে অতিথি করে রাখা হয় তিন চার মাস। চীন, রাশিয়া, পোল্যাণ্ড, হাঙ্গেরি থেকেও লেখকরা আসেন প্রতি বছর। ভারত থেকেও অনেক লেখক এসেছেন, বাংলা থেকে বিভিন্ন বছরে এসেছেন শঙ্খ ঘোষ, জোতির্ময় দত্ত, সৈয়দ মুজতবা সিরাজ প্রমুখ। পলের সঙ্গে আমার আলাপ হয় কলকাতায় বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনের মাঠে। অনেক বছর আগে।

পল একটা স্টেশন ওয়াগন নিয়ে এসে হাজির হলেন সাত মিনিটের মধ্যে। তাঁকে দেখে আমি তাজ্জব। হিসেব মতন পলের বয়েস এখন হাওয়া উচিত বাহাত্তর, কিন্তু আমি অনেকদিন আগে যে-রকম দেখেছিলুম, চেহারাটা এখনও ঠিক সেইরকমই আছে, দীর্ঘকায় মানুষটির শরীরে বার্ধক্যের ছাপ লাগে নি! আমাকে দেখে দ্রুত এগিয়ে এসে সোজা জাপটে ধরলেন। চেঁচিয়ে বলতে লাগলেন হোয়াট আ প্লেজান্ট সারপ্রাইজ!

তারপর জিজ্ঞেস করলেন, তোমার ল্যাগেজ কোথায়?

আমি লাজুক মুখে বললুম, কিছু নেই সঙ্গে!

—তার মানে?

—আমি ঘুরতে ঘুরতে আসছি। থেমে থেমে। আপাতত আসছি সিডার র‍্যাপিডসের এক বন্ধুর বাড়ি থেকে। আয়ওয়া আসবো কিনা ভাবছিলুম। অবশ্য তোমার সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করতুম ঠিকই—

পল চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। তরপর নরমভাবে বললেন, মার্গারিট

ম্যাডিউ ?

আমি ঘাড় নাড়লুম।

পল বললেন, আমারও মনে আছে মেয়েটিকে। বড্ড সরল ছিল। এত সরল মানুষের বোধহয় আর জায়গা নেই এ পৃথিবীতে। পৃথিবীটা দিন দিন যেন আরও নিষ্ঠুর হয়ে যাচ্ছে। চলো। গাড়িতে ওঠো।

আয়ওয়া নদীর ধার দিয়ে এসে পলের গাড়ি একটা টিলার ওপরে উঠলো। দু' পাশে জঙ্গল। ঢেউ খেলানো টিলার পর টিলা চলে গেছে, তারই একটার ওপরে পলের নতুন বাড়ি। আগের বার আমি যখন এখানে আসি তখন পল ছিল এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক, তার বাড়িটিও ছিল মাঝারি মডেস্ট ধরনের। রিটায়ার করার পর পল এই বাড়িটি কিনেছে, এটা বেশ বড় আর ছড়ানো, সঙ্গে সুইমিং পুল আছে। পল এঙ্গেল এদেশের একজন সচ্ছল মধ্যবিত্ত আমেরিকান, কিন্তু তার তুলনায় আমি আমেরিকা-কানাডার অনেক বাঙালীর এর চেয়ে ঢের বড় বাড়ি দেখেছি। পলের দু'খানি অতি সাধারণ গাড়ি, এর চেয়ে প্রবাসী বাঙালীরা আরো চাকচিক্যময় গাড়ির মালিক।

বাড়ির মতন পলের স্ত্রীও নতুন। এই নতুন স্ত্রীর নাম হুয়ালিং, ইনি একজন চীনে মহিলা এবং লেখিকা। চীনে এবং ইংরেজি এই দুই ভাষাতেই লেখেন। হুয়ালিং খুবই হাস্য ঝলমল নারী এবং ব্যবহারে উষ্ণতা আছে। আমার হাত চেপে ধরে বললেন, তোমার কথা পলের মুখে অনেকবার শুনেছি।

তারপর একটু দুষ্টু হেসে হুয়ালিং বললেন, পল আজকাল বড্ড বেশী পুরোনো গল্প বলে!

পল অট্টহাস্য করে বললেন, তা হলেই বুঝতে পারছো, তোমাকে বিয়ে করার আগের দিনগুলো কত ভালো ছিল!

হুয়ালিং-এর বয়েস নিশ্চয়ই পঞ্চাশের বেশী, কারণ তাঁর আগের পক্ষের দুটি সাবালিকা মেয়ে আছে। কিন্তু হুয়ালিং-এর গায়ের ত্বক বালিকার মতন মসৃণ। শুনেছি চীনেদের নাকি দেরিতে জরা আসে।

পলেরও আগের পক্ষের দুটি মেয়ে। আমি চিনতুম তাদের। খবর নিয়ে জানলুম, বিয়ে করে তারা দু'জনেই এখন বিদেশে থাকে। পলের ছোট মেয়ে সেরার সঙ্গে আমার বেশ বন্ধুত্ব ছিল। এই ক'বছরের মধ্যেই সে মোট চারবার বিয়ে করেছে।

পলের আগের পক্ষের স্ত্রী মেরির সঙ্গে ছিল আমার দারুণ ভাব। কারণ, প্রথম দিন আমি তাকে ভুল করে মা বলে ডেকে ফেলেছিলুম। এ-দেশে কোনো মহিলাকে মা বলা একটা দারুণ অপরাধ। আমি সবে প্রথম দিন এসেছি, কাঠ বাঙাল ইংরেজি আদব-কায়দা জানি না। একজন বয়স্কা মহিলাকে কী বলে ডাকবো ভেবে পাইনি। এদেশে সবাই সবার নাম ধরে ডাকে কিন্তু আমার বাধো বাধো লাগছিল, তাই সম্বোধন করেছিলুম মাদার বলে! মেরি অবশ্য রাগে নি। হেসেই খুন হয়েছিল সে ডাক শুনে। তারপর কত লোকের কাছে যে আমার সেই বাঙালত্বের গল্প শুনিয়ে আমায় নাজেহাল করেছে! তবে, মেরি আমায় ডেকে ডেকে খাওয়াতো প্রায়ই।

মেরি ছিল পাগলি। কখন যে রেগে উঠবে তার ঠিক নেই। একবার ক্রিস-মাসের রাতে সে আমাদের উপোস করিয়ে রেখেছিল। সেদিনই টি ভি-তে সে কলকাতা সম্পর্কে একটা তথ্যচিত্র দেখাচ্ছিল এখানে। আমরা সবে খেতে বসেছি এমন সময় মেরি অগ্নিমূর্তি হয়ে এসে বললে, কলকাতায় কত মানুষ খেতে পায় না, কত মানুষ সারা রাস্তায় শুয়ে থাকে, আর তোমরা এখানে বসে বসে এত খাবার খাচ্ছো? তোমাদের লজ্জা করে না? এই বলে সে খাবারের পাত্রগুলো তুলে তুলে আছড়ে ফেলেছিল মেঝেতে।

মেরি এখন বেঁচে নেই। মেরির একটা শখ ছিল বাদুড়ের ছবি জমানো। পৃথিবীর নানান জাতের বাদুড়ের প্রায় হাজার খানেক ছবি ছিল তার। আমায় সে বলেছিল ভারতীয় বাদুড়ের ছবি পাঠাতে। আমি পাঠাতে পারি নি। আমার চেনা ফটোগ্রাফারদের বাদুড়ের ছবির কথা বললেই তারা শুধু হেসেছে।

হুয়ালিং যতই আমেরিকায় বসবাস করে আধুনিকা হোক, তাঁর শরীরে আছে প্রাচ্য দেশীয় রক্ত, একটু একটু সংস্কারও রয়ে গেছে। এরই মধ্যে এক ফাঁকে তিনি জানিয়ে দিলেন যে, পলের স্ত্রী মারা যাবার পর এবং তিনি নিজেও বিধবা হবার পর তারপর তাঁদের বিয়ে হয়েছে। আমি পলের আগেকার স্ত্রীকে চিনতুম বলেই বোধহয় আমাকে এই কথা জানাবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন তিনি।

পল একটু জোরে কথা বলেন, দারুণ জোরে জোরে হাসেন, তাঁর হাঁটার সময়ে কাঠের ফ্লোরে দুপ্ দুপ্ শব্দ হয়। একে বলবে বাহাত্তুরে?

পল পৃথিবী ভ্রমণ করেছেন বেশ কয়েকবার, কলকাতাতেও এসেছেন দু'বার। হুইস্কির বোতল খুলে শুরু করলেন কলকাতার গল্প। সেই যে গঙ্গার ধারে বার্নিং ঘাট, সেখানে রবীন্দ্রনাথ টেগোরকে ক্রিমেট করা হয়েছিল, কী যেন সেই জায়গাটার নাম?

—নিমতলা।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। স্পষ্ট মনে আছে। গঙ্গা নদী, জানো তো হুয়ালিং, আমাদের মিসিসিপির চেয়েও চওড়া, অবশ্য তোমাদের ইয়াংসিকিয়াং আরও বড়, কিন্তু গঙ্গা হচ্ছে হোলি রিভার, সেখানে একবার ডিপ নিলেই সব পাপ কেটে যায়—

হুয়ালিং বললেন, জানি !

—নিউ ইয়র্কের সেন্ট্রাল পার্কের মতন কলকাতার মাঝখানে একটা হিউজ এরিয়া আছে, কী যেন নাম, না, না, বলো না, মনে পড়েছে, মইডান্ ! তাই না। তার পাশের রাস্তাটার নাম চৌরিঙ্গি। ঠিক বলি নি ? আর একটা রাস্তা, যেখানে কফি হাউস আছে, সেই কফি হাউসে ইয়াং রাইটাররা যায়, খুব ক্রাউডেড রাস্তা, অনেক বইয়ের দোকান, রেলিং-এর গায়ে পুরোনো বইয়ের দোকান।

আমি বললুম, পল, তোমার তো আশ্চর্য স্মৃতি শক্তি।

হুয়ালিং আবার দুষ্টু হাসি দিয়ে বললেন, জানো তো, পল এই কথাটা শুনতে খুব ভালোবাসে।

—কোন্ কথাটা ?

—এই যে, 'তোমার তো আশ্চর্য স্মৃতিশক্তি !'

পল বললেন, লোকে কি আমায় খুশী করার জন্য মিথ্যে কথা বলে ? আমার মেমারি তো সত্যিই ফ্যানটাসটিক।

—কিন্তু এইসব গল্প যে আমরা আগে অনেকবার শুনেছি !

—তাহলে শোনো, নীললোহিতের সঙ্গে আমার এখানকার গল্প বলি। নীলু, তোমার মনে আছে সেই ভ্যান অ্যালেনের পোশাকের ঘটনা !

আমি বললুম, সে কখনো ভোলা যায় ?

—চলো, কাল তোমায় অনেক জায়গায় নিয়ে যাবো।

—কাল ? আমার যে আজই ফিরে যাবার কথা ?

—আয়ওয়া থেকে তুমি আজই ফিরে যাবে ? তুমি কি ক্রেজি হয়ে গেছো নাকি ?

হুয়ালিং জিজ্ঞেস করলেন, ভ্যান অ্যালেনের গল্পটা কী ? সেটা তো আগে শুনিনি।

পল বললেন, তুমি তো ভ্যান অ্যালেনকে চেনো। একদিন তার বাড়িতে গেছি আকাশের তারা দেখতে—

হুয়ালিং বাধা দিয়ে বললেন, তুমি চুপ করো, গল্পটা নীললোহিতকে বলতে দাও !

ভ্যান অ্যালেন আয়ওয়ার সবচেয়ে বিখ্যাত মানুষ। নোবেল প্রাইজ পাওয়া বিজ্ঞানী। তাঁর অনেক মৌলিক আবিষ্কার আছে। আকাশে তিনি একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড আবিষ্কার করেছেন, তার নামই দেওয়া হয়েছে ভ্যান অ্যালেন'স বেল্ট।

এই ভ্যান অ্যালেন পল এঙ্গেলের বন্ধু। আগেরবার পল আমাকে প্রায়ই নিয়ে যেতেন ভ্যান অ্যালেনের বাড়ি। অত বড় বিজ্ঞানী, কিন্তু নিরহঙ্কার মাটির মানুষ তিনি। আমাদের তিনি আকাশের নক্ষত্র জগৎ দেখাতেন আর জটিল বিজ্ঞানের কথা এমন সরলভাবে বোঝাতেন যে আমার মতন মূর্খও তা অনেকটা বুঝে যেত।

একদিন সেই রকম নক্ষত্র দেখা চলছে, চমৎকার চাঁদনী রাত। ভ্যান অ্যালেনের বাড়িতে সেদিন কেউ নেই। আমাদের খাওয়া হয়নি। হঠাৎ তিনি বললেন, চলো, আজ সবাই মিলে বাইরে কোথায় খেয়ে আসি। তারপর তিনি মাইল পঞ্চাশেক দূরের একটা রেস্তোরাঁর নাম করে বললেন, ওখানকার হাঙ্গেরিয়ান গুলাশ্ খুব ভালো হয় শুনেছি। আর স্যালাড দেয় পঁচিশ রকম।

এ প্রস্তাব শুন পল খুব একটা উৎসাহ দেখালেন না। আমার দিকে কয়েকবার তাকিয়ে তিনি বন্ধুকে বললেন, ভ্যান, ইউ নো, দেয়ার ইজ আ লিট্‌ল প্রবলেম।

সমস্যাটা আমি তৎক্ষণাৎ বুঝে গেলুম। গ্রীষ্মকাল, আমি পরে ছিলুম হাওয়াই শার্ট, ট্রাউজার্স আর চটি। কোনো কোনো রেস্তোরাঁয় তখনকার দিনে পুরো দস্তুর পোশাক পরে যাওয়ার নিয়ম ছিল। টাইটা অনেকে বর্জন করলেও ডিনারের সময় জ্যাকেট পরা অবশ্য পালনীয়। আমার জন্য ওঁদের যাওয়া হবে না ভেবে আমার দারুণ অস্বস্তি লাগছিল।

বড় বৈজ্ঞানিকরা এই সব ছোটখাটো সমস্যা চট করে বুঝতে পারেন না। ভ্যান অ্যালেন বারবার জিজ্ঞেস করতে লাগলেন, কেন, কেন, কী হয়েছে ? কী প্রবলেম ?

পল তাঁকে কয়েকবার অন্য কোনো ছোট রেস্তোরাঁর নাম বলার পর শেষ পর্যন্ত আসল কথাটা খুলেই বললেন। তা হলে আমাকে আবার বাড়ি গিয়ে পোশাক পরে আসতে হয়, আমার বাড়ি উল্টো দিকে কুড়ি মাইল।

ভ্যান অ্যালেন বললেন, তাতে কী হয়েছে, আমাদের এই তরুণ ভারতীয় বন্ধুটি দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে তো আমারই সমান। আমার জুতো ওর পায়ে লেগে যাবে।

এই বলে তিনি তক্ষুনি নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে আমায় দিলেন ওঁর জুতো-মোজা আর কোট। হাওয়াই শার্টের ওপর কেউ জ্যাকেট পরে না, সেই জন্য আমার হাওয়াই শার্টটাই গুঁজে নিলুম প্যান্টে। জামা গুঁজে পরার পর বেল্ট না পরলে চলে না। একটা বেল্টও পেয়ে গেলুম। সেটা সবে কোমরে গলিয়েছি এমন সময় পল দারুণ বিস্ময়ে বলে উঠলেন, নীলু, নীলু, তুমি কি জানো, তোমার কোমরে এখন ভ্যান অ্যালেন্‌স বেল্ট ?

গল্পটা শুনে খুব হাসলেন হুয়ালিং। এই রকম আরও অনেক গল্পে সন্ধে ঘনিয়ে এলো। শীতের বেলা, দেখতে দেখতে অন্ধকার হয়ে যায়। আমি ওঠবার

কথা বলতেই পল আবার এক ধমক দিলেন। বললেন, এখানে অনেক দেশের লেখকরা এসে আছেন। আজ এ বাড়িতে পার্টি আছে, সবাই আসবে। তুমি থাকো, তোমার সঙ্গে ওদের আলাপ করিয়ে দেবো।

থাকতেই হলো। সাড়ে ছ'টা বাজতে না বাজতেই আসতে লাগলেন লেখক লেখিকারা। বিভিন্ন রকম চেহারা, কত রকম তাদের পোশাকের বৈচিত্র্য। এদের মাঝখানে আমি এক হংস মধ্যে বকো যথা!

হঠাৎ দেখি শাড়ি পরা এক মহিলা। দারুণ জমকালো সাজ-সজ্জার জন্য প্রথমটায় চিনতে পারি নি। তারপরই বুঝলাম কবিতা সিংহ।

আমি ছুটে গিয়ে বললুম, কবিতাদি!

॥ ৪৮ ॥

পল এঙ্গেলের অনুরোধে আমি কয়েকদিন থেকে গেলুম আয়ওয়ায়। যাত্রায় এই প্রথম আমার কোনো সাহেবের আতিথ্য গ্রহণ। গত কয়েক মাস আমি শুধু বাঙালীদের বাড়িতেই কাটিয়েছি নানান জায়গায়, কখনো পুরোনো বন্ধুদের বাড়িতে, কোথাও বা নতুন বন্ধুত্ব পাতিয়ে। আগেরবার যখন আমি এদেশে এসেছিলুম, তখন বেশীর ভাগ সময় সাহেবদের সঙ্গেই কাটিয়েছি, বাঙালীদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল খুব কম।

মুখার্জিদাকে সেই রাত্তিরেই খবর দিয়ে দেওয়া হলো, পরের দিন গাড়ি পাঠিয়ে সিডার র‍্যাপিডস থেকে আনানো হলো আমার সুটকেস। আয়ওয়াতে আমি জায়গা পেলুম ইউনিভার্সিটি গেস্ট হাউসে। মফঃস্বল শহরের এই ছোট বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথিশালায় ঘর আছে প্রায় ষাট-সত্তরটা, ব্যবস্থা প্রায় হোটেলের মতন, তবে আমাকে পয়সা দিতে হবে না এই যা!

আমার চারতলার ঘরের জানলা দিয়ে দেখা যায় আয়ওয়া নদী। এই নদীটি মোটেই দেখতে সুন্দর নয়। কিন্তু একে সুদৃশ্য করার চেষ্টা করা হয়েছে অনেকভাবে, কিছুদূর অন্তর অন্তর এক একটা সেতু, প্রত্যেকটিরই গঠন আলাদা, আর দু'পাশের লাগানো হয়েছে নানারকম গাছ। উইলো, পপলার, চেরী এই সব গাছ চিনতে পারি, এক একটা গাছ দেখলে দেবদারু মনে হয়। সেগুলো আসলে সাইপ্রেস। অ্যামস্টারডামে এই সাইপ্রেস গাছ অনেক দেখেছি। ভ্যান গঁঘের ছবিতেও অহরহ দেখা যায়।

আর আছে নানারকম বুনো ফুল। আমি আগে থেকেই জানি এ দেশে হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় বুনো ফুলের গন্ধ খোঁজা নিরাপদ নয়। কী একটা ফুল নাকের

কাছে এনে ঘ্রাণ নিলেই হে ফিভার নামে এক উৎকট জ্বর হবেই। সুতরাং ফুল দেখতে হয় দূর থেকে। অবশ্য ফুলের দিন এখন নয়, এখন সবই বরফে ঢাকা।

আয়ওয়া শহরটিকে বলা চলে যৌবনের শহর। যে-হেতু ইউনিভার্সিটিই এখানে প্রধান ব্যাপার, তাই রাস্তায়-ঘাটে, দোকানে-বাজারে, সিনেমা-রেস্তোরাঁয় শুধু তরুণ তরুণী। বৃদ্ধ-বৃদ্ধা কচিৎ দেখা যায়, আর শিশু তো অতি দুর্লভ বস্তু!

আস্তে আস্তে কয়েকজন লেখক-লেখিকার সঙ্গে পরিচয় হলো। কবিতা সিংহ একদিন আমায় নেমন্তন্ন করে খাওয়ালেন। কবিতাদি আছেন মে ফ্লাওয়ার নামে একটি বিশাল অ্যাপার্টমেন্ট হাউসে, এলসা ক্রস নামে একটি মেক্সিকান কবির সঙ্গে একটা অ্যাপার্টমেন্ট ভাগাভাগি করে। কবিতাদি তাঁর ঘরটা চমৎকার সাজিয়েছেন নদীর ধার থেকে কুড়িয়ে আনা নানানরকম গাছের ডাল আর লতাপাতা দিয়ে, নিজের হাতে আঁকা কয়েকটা ছবিও লাগিয়েছেন দেওয়ালে।

কবিতাদির চেহারাটিও এই শীতের দেশে এসে আরও সুন্দর হয়েছে। কাশ্মীরি মেয়েদের মতন একটা পোশাক পরেছেন, তার ওপর নতুন ঝকঝকে ওভারকোট, মাথায় কোঁকড়া কোঁকড়া চুল, ঠিক যেন মেমসাহেব।

যত্ন করে রান্না করেছেন নানারকম পদ। খেতে বসে কবিতাদি বললেন, তোমায় দেখে কী দারুণ চমকে গিয়েছিলুম, নীলু। তোমায় এখানে দেখতে পাবো, আশাই করিনি। তুমি তো একটা উড়নচণ্ডী আমি জানি, পায়ে হেঁটে হেঁটেই কলকাতা থেকে এই পর্যন্ত চলে এলে নাকি?

আমি বললুম, হেঁটে আসবো কেন? যোগবিদ্যা শিখে নিয়েছি তো, তাই আমি এখন ইচ্ছে করলেই হাওয়ায় উড়তে পারি।

কবিতাদি একটু হেসে বললেন, জানো তো সুনীল আর স্বাতীও এখানে এসেছে। ওরা অবশ্য এখন নেই, কোথায় যেন বেড়াতে গেছে।

আমি বললুম, আমার সঙ্গে নিউইয়র্কে একবার দেখা হয়েছিল, তখন ওঁরা আপনার কথা বলেছিলেন। আপনার এখানে কেমন লাগছে, কবিতাদি?

কবিতাদি বললেন, কী ভালো যে লাগছে, তা তোমায় কী বলবো! কত দেশের লেখক-লেখিকাদের সঙ্গে আলাপ হচ্ছে, কতরকম মানুষ, পল আর হুয়ালিং আশ্চর্য ভালো মানুষ। কী চমৎকার একটা লম্বা ছুটি বলো তো? এটা যেন একটা দৈব উপহার। এ এমন ছুটি, যাতে ইচ্ছে মতন অনেক কাজ করতে ইচ্ছে করে। জানো তো, আমি রোজ লাইব্রেরিতে গিয়ে অনেক কিছু নোট নিই। এমন মন দিয়ে পড়াশুনো করতে পারিনি অনেকদিন। আর একটা দারুণ খবর

তোমায় শোনাচ্ছি, নীলু ! এখানকার পুরোনো খবরের কাগজ ঘাঁটতে ঘাঁটতে আমি আবিষ্কার করলুম, রবীন্দ্রনাথ একবার এসেছিলেন এই শহরে। এই খবর আমি আগে কোথাও পড়িনি। কোনো রবীন্দ্র গবেষক জানে না।

আমি বললুম, সত্যিই তো। আমিও এ খবর কখনো শুনিনি ! তবে ডিলান টমাস এসেছিলেন শুনেছি ! ডিলান টমাসকে কবিতা পড়ার জন্য এখানকার বিশ্ববিদ্যালয় আমন্ত্রণ জানিয়েছিল, তিনি বদ্ধ মাতাল অবস্থায় ট্রেন থেকে প্ল্যাটফর্মে আছাড় খেয়ে পড়ে যান। পরদিন সেইরকম মাতাল অবস্থায়ই তাঁকে ট্রেনে তুলে দেওয়া হয়।

কবিতাদি বললেন, আয়ওয়া জায়গাটা ছোট হলে কী হবে, পৃথিবীর সব দেশের লেখকরা এখানে আসেন। আমার তো ইচ্ছে করে এখানে অনেকদিন থেকে যাই, তবে ছেলেমেয়েদের জন্য মাঝে খুব মন কেমন করে। সপ্তাহে একখানা অন্তত চিঠি না পেলে এমন ছটফট করি…)।

কবিতাদির অ্যাপার্টমেন্ট-সঙ্গিনী ভারী অদ্ভুত মেয়ে। ছোট্ট খাট্টো মিষ্টি চেহারা, মুখে সব সময় হাসি লেগে আছে, কথা বলে নরম গলায়। মেক্সিকোতে এই এলসা ক্রসের কবি হিসেবে বেশ নাম আছে। ওর সঙ্গেও আলাপ হলো। এলসা এরই মধ্যে দু'বার বিয়ে ও দু'বার ডিভোর্স করেছে, দুটি ছেলেমেয়ে আছে তার। আধুনিক সাহিত্যিকদের মতন এক সময় সে প্রচুর মদ খেতো, সিগারেট-গাঁজা টানতো। মেক্সিকোতে পিয়োটি নামে আরও একটি মারাত্মক নেশার দ্রব্য আছে, তাও সে চেখে দেখেছে। কিন্তু শুধু অতৃপ্তি আর বিপর্যয়ই পেয়েছে তার বদলে। এখন সে শান্তির সন্ধানে মহারাষ্ট্রীয় গুরু স্বামী মুক্তানন্দের শিষ্যা হয়েছে। এলসা এখন কোনোরকম নেশা করে না, নিরামিষ খায়। তার ঘরে তার গুরুর ছবি, আর শিবঠাকুরের ছবি। শুধু নিজেই সে গুরুর কাছে দীক্ষা নিয়ে ক্ষান্ত হয়নি, হিন্দুত্ব প্রচারের ব্রতও নিয়েছে। এখানেও সে আধ্যাত্মিক বিষয়ের ক্লাস নেয়।

অমন মিষ্টি একটি মেয়ের সঙ্গে একদিন আলাপের পরেই আমি তাকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলতে লাগলুম, পাছে সে আমাকেও হিন্দু বানিয়ে ফেলে !

প্রায় কুড়িজন লেখক লেখিকা এসেছেন এখানে, তার মধ্যে মূল চীন থেকেই তিন চারজন। এঁদের মধ্যে প্রধান হলেন মাদাম ডিংলিং। এই মাদাম ডিংলিংকে দেখতে অবিকল আমার দিদিমার মতন। তফাৎ শুধু এই, ইনি শাড়ি পরেন না, পরেন পাজামা আর কুর্তা। বয়েস প্রায় চুয়াত্তর, শুনেছি শরীরে ক্যানসার রোগ বাসা বেঁধেছে, তবু কী অসাধারণ এঁর জীবনীশক্তি, দিব্যি পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়ান। দেখা হলেই মাথা ঝাঁকিয়ে তুর তুর করে অনেক কথা বলে যান, তার

এক বর্ণও আমি বুঝি না। মাদাম ডিংলিং ইংরিজির ই-ও জানেন না। কিন্তু যখন আমার গায়ে ওঁর স্নেহময় হাতখানি রাখেন, তখন একটা আত্মীয়তা টের পাই।

মাদাম ডিংলিং এক সময় বিপ্লবের ডাকে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন, তখন তিনি সতেরো বছরের যুবতী। তারপর তিনি জীবনের ঘূর্ণাবর্তে কত জায়গায় যে গিয়েছেন এবং থেকেছেন তার ঠিক নেই। তিনি ছিলেন মাও সে-তুং ও প্রখ্যাত লেখক লু সুনের বান্ধবী। চিয়াং কাইসেকের আমলে তিনি দীর্ঘকাল জেল খেটেছেন। তারপর চীনের বিপ্লব ঘটে যাবার পর তিনি গণ্য হন প্রথম সারির লেখিকা হিসেবে। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় তাঁকে আবার জেল খাটতে হয়, সে বড় সাঙ্ঘাতিক কারাবাস, তিনি যাতে লিখতে না পারেন সেজন্য এক চিলতে কাগজও দেওয়া হয়নি তাঁকে, তাঁকে কাজ দেওয়া হয়েছিল মুর্গী পালন করার। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ভুল ভ্রান্তির যাবতীয় দায় দায়িত্ব এখন গ্যাং অব ফোর-এর নামে চালালেও, মাদাম ডিংলিং-এর মতে, মাও সে-তুং-এরও যথেষ্ট দায়িত্ব ছিল। মাদাম ডিংলিং পরিষ্কার ভাষায় বলেন, তাঁর শ্রদ্ধেয় বন্ধু মাও সে-তুং-এর সেই সময়কার ভুলে চীনের অগ্রগতি অন্তত দশ বছর পিছিয়ে গেছে। এই ভুলের সমালোচনা করেছিলেন বলেই তিনি বন্দী হয়েছিলেন।

এখন মাদাম ডিংলিং চীনের প্রধান লেখিকা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। তাঁর এক একটি বইয়ের প্রথম সংস্করণ ছাপা হয় কয়েক লক্ষ, তিনি কোনো জনসভায় গেলে মানুষের ভিড় ভেঙে পড়ে।

মাদাম ডিংলিং দুবার বিয়ে করেছিলেন। বর্তমানে তিনি এক অবিবাহিত পুরুষ বন্ধুর সঙ্গে থাকেন। সেই চীনা ভদ্রলোকও এসেছেন এখানে, তিনি খুব ভাঙা ভাঙা ইংরিজি জানেন। মাদাম ডিংলিং-এর কথা তিনি অনুবাদ করে বুঝিয়ে দেন। ভারতবর্ষের প্রতি মাদাম ডিংলিং-এর খুব শ্রদ্ধা, উনি রবীন্দ্রনাথের লেখা পড়েছেন ও পছন্দ করেছেন। আরও দু'একজন বাঙালী লেখকের সঙ্গে ওঁর দেখা হয়েছে পিকিং-এ কিন্তু এমনভাবে সেই নাম উচ্চারণ করলেন যে আমি কিছুতেই ধরতে পারলুম না তাঁরা কে। মনোজ বসু, মৈত্রেয়ী দেবী হতে পারেন।

একটা ব্যাপারে আমার খুব মজা লাগছিল, উনি ভারতের প্রসঙ্গ উঠলেই বলেন, উঃ কী প্রাচীন তোমাদের সভ্যতা ! তোমাদের গান শুনলেই বোঝা যায় কয়েক হাজার বছরের সাধনা ও ঝংকার মিশে আছে তার মধ্যে।

আমরা মনে করি চীনের সভ্যতাই খুব প্রাচীন, আর চীনেরা মনে করে ভারতীয় সভ্যতা খুব প্রাচীন। মাদাম ডিংলিং কট্টর সাম্যবাদী কিন্তু প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি তাঁর বিপুল শ্রদ্ধা।

আমি মাদাম ডিংলিং-এর অটোগ্রাফ নিলুম। তারপর বললুম, আপনার

ঠিকানাটাও দিন, যদি কোনোদিন চীনে যাই আপনার সঙ্গে দেখা করবো। মাদাম ডিংলিং চীনে ভাষায় নাম সই করলেন, তাঁর সঙ্গী তলায় ইংরেজিতে ঠিকানা লিখলেন শুধু বেইজিং। বললেন, বেইজিং-এ গিয়ে যে-কোনো লোককে জিজ্ঞেস করলেই মাদাম ডিংলিং-এর সন্ধান দিয়ে দেবে।

এরপর, মাদাম ডিংলিং ঠিক আমার দিদিমার মতনই ভঙ্গিতে রসিকতা করে বললেন, আমার আয়ু বোধহয় আর বেশীদিন নেই। তবু, তুমি যদিআসো, সেই অপেক্ষায় আমি বেঁচে থাকবো।

আর একজন দক্ষিণ আফ্রিকার কালো লেখকের সঙ্গে আলাপ হলো, তার নাম সিপো। ঠিক আলাপ বলা যায় না, এক তরফা কথা। সিপো'র মুখে একটা তিক্ততার ছাপ। মধ্যবয়েসী এই শিক্ষিত মানুষটির সর্ব অঙ্গে অপমানের জ্বালা। সব সময় সেটা প্রকাশ না করে পারেন না। শুধু গায়ের রঙের জন্য এঁরা নিজের দেশে থেকে প্রতিনিয়ত নির্যাতিত হচ্ছেন। সিকো বললেন, সাহিত্য ? সাহিত্য আমাদের জীবন মরণের প্রশ্ন। আমরা কালো লোক, তাই আমাদের দেশে আমাদের কোনো কিছু লেখার অধিকার নেই। কোনো বই ছাপলে আমাদের শ্বেতাঙ্গ সরকার সেই বই বাজেয়াপ্ত করে, লেখককে জেলে ভরে, প্রেসের মালিককে শাস্তি দেয়। তবু আমরা লিখে যাচ্ছি।

নাইজিরিয়ার লেখক এনডুবিসির চোখ দুটো সব সময় লাল টকটকে। একদিন সকালবেলা তাকে একজন জিজ্ঞেস করলো, এই সাত সকালেই তুমি নেশা করে বসে আছো ? দৈত্যের মতন বলশালী চেহারার মানুষটি শিশুর মতন সরলভাবে হেসে বললো, না। স্বাধীনতার আগে ব্রিটিশের জেলে আমার পা দুটো বেঁধে উল্টো করে ঝুলিয়ে রেখেছিল সারাদিন। সেই থেকে আমার চোখ এরকম হয়ে গেছে। এনডুবিসি এক ফোঁটা মদ্য পান করে না।

আমি হোটেল-মোটেলে খাই বলে কবিতাদি আমায় প্রায়ই নেমন্তন্ন করতে লাগলেন। একদিন তাঁর ঘরে দেখা পেলুম স্থানীয় দুটি বাঙালীর। রঞ্জিত চ্যাটার্জি আর রবীন ঘোষাল। দু'জনেই যাদবপুরের ছাত্র ছিল। রঞ্জিত বিয়ে করেছে ভাবনা নামে একটি অতি শান্ত ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতী গুজরাটি মেয়েকে। রঞ্জিত আর রবীন দু'জনেই চাকরিও করে আবার পড়াশুনো ও গবেষণা চালাচ্ছে। কবিতাদিকে আর আমাকে পেয়ে এরা আনন্দিত হয়েছে ঠিকই, আবার মনের মধ্যে সর্বক্ষণ একটা অস্বস্তি। ভালো করে আড্ডা দিতেও পারছে না। পরদিন ভোরবেলাই কাজে দৌড়োতে হবে। দু'জনেই বারবার বলতো লাগলো, আপনারা তো বেশ মজায় আছেন কবিতাদি। আমাদের এরা যে কী খাটিয়ে মারে তা জানেন না। একটুও বিশ্রাম নেই, সর্বক্ষণ কাজ, কাজ আর কাজ।

এই কাজ আর ব্যস্ততার কথা আমেরিকার সর্বত্র শোনা যায়। শব্দ দুটো আমার কানে নতুন লাগে। দেশে থাকতে তো এই দুটো শব্দ প্রায় শোনাই যায় না।

॥ ৪৯ ॥

ক'দিন বাদে আবার ফিরে এলুম সূর্যর অ্যাপার্টমেণ্টে। মুখার্জিদা ক্রিসমাসের আগের রাতে তাঁর বাড়িতে নেমন্তন্ন করে রেখেছিলেন আগে থেকেই। এবং বলে রেখেছিলেন, আয়ওয়া থেকে আমি যেদিন ফিরবো, সেদিন ওঁকে খবর দিলেই উনি আমাকে গাড়ি করে নিয়ে আসবেন।

কিন্তু মুখার্জিদাকে আর জ্বালাতন করিনি, বাসেই চলে এলাম। বাস স্টেশন থেকে সুটকেসটা হাতে ঝুলিয়ে হেঁটেই চলে এলুম বাড়িতে। এর মধ্যে শীত অনেকটা সহ্য হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে মাথায় টুপী পরতে ভুলে যাই। তবে গ্লাভ্‌স না পরলে চলে না, আঙুলগুলো কয়েক মিনিটে অবশ হয়ে যায়।

অ্যাপার্টমেণ্টের দরজার চাবি খুলতে গিয়ে মনে হলো, কী যেন নেই! কী নেই ?

সঙ্গে সঙ্গে দুম করে কেউ যেন একটা ঘুঁষি মারলো আমার বুকে। মাথার মধ্যে বজ্রপাত হলো। আমার কাঁধের ঝোলা ব্যাগটা ?

বাস থেকে নামার সময় সুটকেসটা ঠিকই নিয়েছি পেছন থেকে, কিন্তু ঝোলা ব্যাগটা রেখেছিলুম মাথার ওপর র‍্যাকে, সেটার কথা একদম মনে পড়েনি।

ইচ্ছে হলো, তক্ষুণি দৌড়ে চলে যাই। কিন্তু দৌড়ে কোনো লাভ নেই, গ্রে হাউণ্ড বাস এই দশ মিনিটে অন্তত দশ মাইল দূরে চলে গেছে।

দৌড়ে টেলিফোনের কাছে যেতে গিয়ে আমি ডাইনিং টেবিলে খুব জোর একটা ধাক্কা খেলুম। কিন্তু তখন ব্যথা বোধ করারও সময় নেই। টেলিফোনের পাশেই দেয়ালে-সাঁটা একটা কাগজে সূর্য কতকগুলো জরুরি টেলিফোন নাম্বার লিখে রেখেছে। তার মধ্যে গ্রে হাউণ্ড বাস স্টেশনের নম্বর নেই। সূর্য ভালো চাকরি করে, সে সব সময় প্লেনেই যাতায়াত করে নিশ্চয়ই। সুতরাং টেলিফোন গাইড ঘাঁটতে হলো।

তারপর টেলিফোনের বোতাম টিপেই আমি ব্যস্ত ভাবে জিজ্ঞেস করলুম, আয়ওয়া থেকে যে-বাসটি একটু আগে এসেছিল, সেটা কি ছেড়ে গেছে ?

ওপাশ থেকে একটি মেয়ের ঠাণ্ডা গলা ভেসে এলো, আয়ওয়া থেকে কোন বাস ? কত নম্বর ? কুড়ি মিনিটের মধ্যে দুটি বাস এসেছে!

নম্বর ? এই রে, বাসের নম্বরটা তো খেয়াল করিনি। টিকিটে নম্বর লেখা

থাকে না, এক টিকিটে যে-কোন বাসে চড়া যায়। দূর পাল্লায় বাসে উঠলে বাসের নম্বর মনে রাখা খুবই দরকার কারণ মাঝে মাঝে নামতে হয়, তখন অনেক বাসের মধ্যে নিজের বাসটি খুঁজে নিতে হয়। কিন্তু এসেছি মাত্র এক স্টেশন, সেই জন্য মাথা ঘামাইনি।

আমি ব্যাকুল ভাবে বললুম, দেখুন, আমি একটা হ্যাণ্ড ব্যাগ ফেলে এসেছি, খুবই দরকারি সব জিনিস আছে, সেটা না পেলে আমি খুবই বিপদে পড়ে যাবো—।

ওপার থেকে মহিলাটি বললো, আয়ওয়া থেকে আসা একটি বাস এখনো দাঁড়িয়ে আছে, আপনি একটু ধরুন, আমি দেখে আসছি। কী রঙের ব্যাগ ছিল?

—খয়েরি রঙের, ভেতরে একটা ক্যামেরা, আর আমার প্লেনের টিকিট, তিন প্যাকেট ক্যামেল সিগারেট আর···

মহিলাটি একটুবাদে লাইনে ফিরে এসে বললেন, না। ও বাসে ওরকম কোনো ব্যাগ নেই। আগের বাসটি ছেড়ে গেছে।

—তা হলে কী হবে?

মহিলাটি নির্লিপ্ত গলায় বললেন, আপনার ঠিকানাটা বলুন, সন্ধান পেলে আপনার বাড়িতে পাঠিয়ে দেবো।

—বাসটা ছেড়ে চলে গেছে, আর কী করে সন্ধান পাবেন?

—বাসটা কোথাকার ছিল?

—নিউ ইয়র্কের।

—তা হলে এর পর শিকাগোয় থামবে। সেখানে খবর পাঠিয়ে দিচ্ছি।

—দয়া করে যদি একটু বিশেষ চেষ্টা করেন! ঐ ব্যাগটির মধ্যে আমার প্লেনের টিকিট আছে, ইন্টারন্যাশনাল ফ্লাইটের—

—নিশ্চয়ই চেষ্টা করবো।

টেলিফোন রেখে আমি নিঝুম হয়ে বসে রইলুম।। যেন আমি সর্বস্বান্ত হয়ে গেছি। ব্যাগটা যদি না পাওয়া যায়, তা হলে আমি ফিরবো কী করে? আমার টিকিট···।

তাড়াতাড়ি স্টুকেসটা খুললুম। উল্টে ফেলে দিলুম সব জিনিসপত্র। যাক, পাশপোর্টটা আছে। অনেকদিন পাশপোর্ট দরকার হয়নি। তাই বার করিনি। প্লেনের টিকিটটা কেন সুটকেসে রাখিনি? হ্যাণ্ডব্যাগটা যে হারাবে তা কি জানতুম? আমার শেষ সম্বল আর ছাপ্পান্নটি ডলার, তাও ঐ ঝোলার মধ্যে, আমার মানি ব্যাগ বা পার্শ ব্যবহার করার অভ্যেস নেই, টাকা রাখি বইয়ের মধ্যে। আজ যদি ওভারকোটের পকেটেও রাখতুম!

ক্যামেরা ট্যামেরা গেছে তার দুঃখ নেই, কিন্তু প্লেনের টিকিটটা গেছে বলেই খুব অসহায় বোধ করতে লাগলুম। ওটার জন্য সব সময় মনে একটা জোর ছিল, যখন খুশী ফিরে যাবার স্বাধীনতা ছিল!

বাসটা শিকাগো পৌঁছতে চার-পাঁচ ঘণ্টা লাগবে, তার আগে কিছুই জানা যাবে না। এই সময়টা কী ভাবে কাটাবো? অনর্থক বসে বসে চিন্তা করে তো লাভ নেই, তাই আমি শুয়ে পড়লুম। ওভারকোট কিংবা জুতো মোজাও খুলতে ইচ্ছে করলো না। মনের যদি একটা সুইচ থাকতো, তা হলে এখন সেটা অফ করে দিতুম। কিংবা সে-রকম কোনো ঘুমের ওষুধ, যা খেলে এক নিমেষে ঘুমিয়ে পড়া যায়। ভীষণ রাগ হচ্ছে নিজের ওপর। এ রকম ভুল যে-করে তার বেঁচে থাকার অধিকার নেই। ব্যাগটা যদি ফেরৎ না পাই, তা হলে কত রকম যে ঝামেলায় পড়বো, তা ভাবতেই পারছি না।

ফেরৎ পাবো কী? আগে জানতুম, এ দেশে কোনো কিছুই হারায় না। এটা ডাকাতদের দেশ, এখানে কেউ ছিঁচকে চুরি করে না। কিন্তু সেই সুদিন আর নেই। নিউ ইয়র্কে একটি মেয়ের হাত থেকে ব্যাগ ছিনতাই-এর ঘটনা তো আমি নিজের চোখেই দেখেছি।

মুখার্জিদাকে ফোন করা উচিত। উনি এ দেশে এতদিন আছেন, উনি নিশ্চয়ই জানবেন কী ভাবে খোঁজ খবর করতে হয়। কিন্তু নিজের দীনতার কথা বা নির্বুদ্ধিতার কথা কি সাধ করে অন্য কারুকে জানাতে ইচ্ছে করে?

খবরের কাগজ খুললুম। কিছুতেই মন বসে না। টিভি খুললুম, সব কিছুই উৎকট বাঁদরামো মনে হচ্ছে। মনের মধ্যে ঢং ঢং করে অবিরাম বাজছে একটিই প্রশ্ন, যদি ফেরৎ না পাই? যদি ফেরৎ না পাই?

ওভারকোটের সব কটা পকেট উল্টে দিলুম। অনেক খুচরো পয়সা জমে আছে। ডাইম আর কোয়ার্টারগুলো আলাদা করে সাজিয়ে নিলুম। সব মিলিয়ে আট ডলার পঁচাত্তর সেন্ট, আরও খুচরো এক সেন্ট আছে কুড়ি পঁচিশটা। এই এখন আমার যথা সর্বস্ব! কথাটা উপলব্ধি করামাত্র খিদে পেয়ে গেল।

ঠিক পাঁচ ঘণ্টা পরে ফোন করলুম স্থানীয় বাস স্টেশনে। এবারে ফোন ধরেছে একজন পুরুষ।

—আমার হ্যাণ্ড ব্যাগটার কোনো খবর পেয়েছেন?

—কিসের হ্যাণ্ডব্যাগ?

—দেখুন আমি আয়ওয়া থেকে

—আয়ওয়ার বাস এখনো আসেনি, আধঘণ্টা পরে আসবে!

—না, শুনুন, অনুগ্রহ করে আমার ব্যাপারটা শুনুন—।

ডিউটি বদলে গেছে, আগের মহিলাটি নেই, এই পুরুষটি আমার ঘটনা কিছুই জানেন না। সব কিছু শোনার পর বললেন, না, শিকাগো থেকে কোনো খবর তো আসেনি, একটু আগেই একটা ফোন এসেছিল, কোনো হ্যাণ্ডব্যাগের কথা বলেনি—।

—দয়া করে ওদের যদি আর একবার জানান। হ্যাণ্ডব্যাগটাতে আমার খুবই দরকারি জিনিসপত্র আছে

—আপনি নিজেই শিকাগো বাস স্টেশনে ফোন করতে পারেন।

—দেখুন, আমি বিদেশী, ভারতবর্ষীয়, যদি একটু সাহায্য করেন, আমি বাসের নম্বরও জানি না, আমি অতি নির্বোধের মতন কাজটি করেছি বটে, কিন্তু ব্যাগটা খুঁজে পাওয়া আমার খুবই দরকার!

আমি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি, লোকটি অন্য একটা টেলিফোন তুলে আর কারুর সঙ্গে কথা বলছে, আমার কথা শুনছেই না।

আমি তবু নাছোড়বান্দার মতন বকবক করে যেতে লাগলুম। লোকটি এক সময় বললো, আপনার নাম ঠিকানা বলুন, খোঁজ পেলে জানাবো!

—আপনার আগে যিনি ডিউটিতে ছিলেন, তিনি সব জানেন। আমার নাম এই...

—ও, হ্যাঁ, একটা স্লিপ লেখা আছে দেখছি। আপনার ব্যাগটার বর্ণনা দিন, আপনার ফোন নম্বর দিন, কোনো খবর পেলে নিজেরাই জানাবো। হ্যাঁ, শিকাগো আর নিউ ইয়র্কে খবর দিচ্ছি।

একটি বিনিদ্র রাত্রি কাটাবার পর পরদিন সকালে মুখার্জিদাকে সব ব্যাপারটা খুলে বলতেই হলো।

মুখার্জিদা তাঁর বাড়ি থেকে সব মিলিয়ে প্রায় গোটা পনেরো ফোন করলেন। তাতেও বিশেষ কিছু সুরাহা হলো না। আমার বিমান কেম্পানির কাছ থেকে জানা গেল যে আমার জন্য একটা ডুপ্লিকেট টিকিট ইস্যু করানো যেতে পারে কিন্তু তার আগে, যেখান থেকে আমার টিকিট ইস্যু করা হয়েছে, অর্থাৎ কলকাতা অফিস থেকে আগে খবরাখবর আনতে হবে। তার জন্য সময় লাগবে।

মুখার্জিদা আমায় উপদেশ দিলেন যে, হয় আমার কোনো ট্রাভেল এজেন্টের শরনাপন্ন হওয়া উচিত কিংবা নিজেই শিকাগো গিয়ে যেন তদ্বির শুরু করি। আজকাল কোনো কাজই তাড়াতাড়ি হয় না।

ট্রাভেল এজেন্টের কাছে গেলে তাকে পয়সা দিতে হবে, আর শিকাগো যাওয়ার ভাড়াও আমার কাছে নেই। মুখার্জিদা এতটা জানেন না। সে কথা আমি মুখ ফুটে বলতেও পারলুম না।

বাস স্টেশন থেকে আমার হ্যাণ্ড ব্যাগ সম্পর্কে কোনো নতুন খবর পাওয়া গেল না। নিউ ইয়র্ক বা শিকাগোতেও সেরকম কোনো ব্যাগ জমা পড়েনি।

দ্বিতীয় দিন কেটে যাবার পর আমি নিশ্চিন্ত হলুম যে আমার ঝোলা ব্যাগ অন্য কারুর ঘাড়কে পছন্দ করে ফেলেছে। এদেশের ছেলেমেয়েরা ঘন ঘন বিয়ে বদলায়, আমার ব্যাগেরও সেরকম শখ জেগেছে নিশ্চয়ই। নইলে, ওর গায়ে আমার ঠিকানা লেখা ছিল, অনায়াসেই ফিরে আসতে পারতো।

মুখার্জিদা অতিশয় সহৃদয় মানুষ, কিন্তু মরে গেলেও আমি তাঁর কাছ থেকে টাকা ধার চাইতে পারবো না। এর আগেই কয়েক জায়গায় গল্প শুনেছি, আমাদের দেশ থেকে কেউ কেউ এদেশে বেড়াতে এসে জিনিস পত্র কেনাকাটির লোভে এখানকার কারুর কাছ থেকে টাকা নিয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়ে যায়, দেশে ফিরে তার মা-বাবা বা বাড়ির লোককে ভারতীয় মুদ্রায় ধার শোধ করে দেবে। তারপর দেশে ফিরে অনেকেই সে কথা বেমালুম ভুলে যায়। আমাকেও যদি এরা সেরকম ভাবেন?

তা ছাড়া দেশে ফিরে সঙ্গে সঙ্গে শোধ দেবার সামর্থ্যও আমার নেই। এদিকে ডুপ্লিকেট টিকিটের ব্যাপারেও কোনো ভরসা পাচ্ছি না।

কিন্তু খুচরো ন'ডলারে আমার আর কতদিন চলবে? সূর্যদার ভাঁড়ারের চাল-ডাল ধ্বংস করতে করতে প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। চিনি ছিল না। চা খাওয়ার জন্য একদিন চিনি কিনতেই হলো। এদেশের দোকানে কম-ওজনের কিছু পাওয়া যায় না। চিনির প্যাকেট দু' পাউণ্ডের। অগত্যা কিনতেই হলো। তারপরেই অবশ্য মনে হলো, ম্যাকডোনাল্ডের দোকানে কফি খেতে গেলে টেবিলের ওপর অজস্র ছোট ছোট চিনির প্যাকেট পড়ে থাকে। তার যত খুশী নেওয়া যায়। ষাট সেণ্ট দিয়ে এক কাপ কফি খেতে গিয়ে ওভারকোটের পকেট ভর্তি বিনে পয়সার চিনি নিয়ে আসলেই হতো। এই সব ভালো ভালো বুদ্ধি পরে মাথায় আসে।

রাত্তিরবেলা খুব মন খারাপ লাগছিল। অনেকক্ষণ দোনামনা করার পর কানাডার দীপকদাকে একটা ফোন করলুম।

ফোন ধরলেন জয়তীদি। খানিকটা অবাক হয়ে বললেন, কী ব্যাপার, এত রাত্তিরে টেলিফোন? অনেক দিন তোমার পাত্তাই নেই। আমরা ভাবছিলুম, তুমি হারিয়ে গেলে কিনা। সেই যে তোমার বাস অ্যাকসিডেণ্ট হয়েছিল, তারপর থেকে তো তোমার আর কোনো খবরই পাইনি!

আমি কাঁচুমাচু ভাবে বললুম। জয়তীদি, দীপকদা আছেন? ওঁর সঙ্গে আমার একটা দরকার আছে!

—তোমার দীপকদা তো নেই। একটা কনফারেন্সে গেছেন, ভ্যাঙ্কুবারে।

তিন দিন পরে ফিরবেন।

আমি নিরাশ ভাবে বললুম, নেই?

—কেন, কী দরকার? আমাকে বলা যায় না?

—না, মানে,আমার প্লেনের টিকিটটা হারিয়ে ফেলেছি। দীপকদার তো এক বন্ধুর ট্র্যাভেল এজেন্সি আছে শুনেছিলুম। উনি যদি সেই বন্ধুকে বলে আমার একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারতেন!

জয়তীদি উদ্দাম ঝর্নার মতন হাসতে হাসতে বললেন, টিকিট হারিয়ে ফেলেছো? অ্যাঁ? বেশ হয়েছে! টিকিট হারালে কি আবার বিনা পয়সায় টিকিট পাওয়া যায় নাকি? তুমি পাগল! সে কেউ দেবে না! এখন কী হবে? থাকো, ঐ মিড ওয়েস্টে বন্দী হয়ে? ওখানে চাষ-বাস শুরু করো। তোমার আর দেশে ফেরা হবে না!

এদিকে আমার এই করুণ অবস্থা আর জয়তীদি মোটেই সেটাকে কোনো গুরুত্বই দিচ্ছেন না। খালি ঠাট্টা ইয়ার্কি করতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত আমি বললুম, ঠিক আছে, জয়তীদি তিন দিন পর দীপকদা ফিরলে আমি আবার ফোন করবো।

রিসিভার রেখে দিয়ে আরও দমে গেলুম। এই হৃদয়হীনা রমণীর সঙ্গে আর কোনোওদিন কথা বলবো না! এই বিশাল দেশে যে আমি কপর্দক শূন্য, তা উনি বুঝলেন না! পুরুষ মানুষরা হঠাৎ অসহায় অবস্থায় পড়লে মেয়েরা সেই ব্যাপারটা বেশ উপভোগ করে। দীপকদা আবার এখন বাড়ি নেই। উনি থাকলে একটা কিছু ব্যবস্থা করতেনই। এই তিন দিন আমি কী করে কাটাবো?

রাত মাত্র ন'টা। কিছুই করতে ইচ্ছে করছে না। খিদে পেয়েছে, কিন্তু বিছানা ছেড়ে উঠে দুটি চাল-ডাল ফুটিয়ে নেবারও উৎসাহ নেই। খালি মনে হচ্ছে, আমার মুক্তি নেই, আমার মুক্তি নেই!

এই কটা মাসে কত রকম মানুষের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। অনেকের কাছ থেকেই আশাতীত সহৃদয়তা পেয়েছি। এদেশের বাঙালীরা অনেকেই বেশ সচ্ছল। হাজার খানেক ডলার দিয়ে কয়েকজন অবশ্যই আমাকে সাহায্য করতে পারেন। সূর্যর টেলিফোন যত খুশী ব্যবহার করতে পারি, যদি টেলিফোন তুলে কারুর কাছে চাই···। কিন্তু টেলিফোন করতে হাত ওঠে না। কারুর কাছে টাকা চাওয়া, ওঃ, সে যে এক অসম্ভব শক্ত কাজ। বারবার মনে পড়ছে মাইকেলের একটা লাইন, "প্রবাসে দৈবের বশে জীবতারা যদি খসে···"

পরদিন বেলা এগারোটায় একটা ফোন এলো। সাহেবের গলা শুনে ধ্বক করে উঠলো আমার বুক। তবে কি ফিরে এলো আমার ব্যাগ?

সাহেবটি জিজ্ঞেস করলো, তোমার নাম নীললোহিত?

আমি সোৎসাহে বললুম, হ্যাঁ। আপনি বাস স্টেশন থেকে বলছেন?

লোকটি বললো, না, আমি বলছি এয়ারপোর্ট থেকে। তোমার নামে একজন···লেট্‌স সী, খুব শক্ত নাম, মিসেস জ-য়া-টি স-রো-সো-য়া-টি একটি প্লেনের টিকিট পাঠিয়েছেন। ক্যানাডার এডমান্টনের। তোমার ফ্লাইট বিকেল সাড়ে পাঁচটায়। তুমি এখানকার কাউন্টারে এলেই টিকিট পেয়ে যাবে!

আমি তখনও বুঝতে পারছি না ব্যাপারটা। টিকিট পাঠিয়েছে? আমার জন্য? ক্যানাডা থেকে? জয়াটি কে? ওঃ হো, জয়তী সরস্বতী! জয়তীদি, জয়তীদি!

॥ ৫০ ॥

ডেনভার এয়ারপোর্ট থেকে প্লেন বদল করে যেতে হবে এডমান্টনে। মাঝখানে হাতে রয়েছে সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা সময়।

এয়ারপোর্টের বাইরে বেরিয়ে যে শহরটা ঘুরে দেখে আসবো তার উপায় নেই। পকেট ঢনঢন। কলোরাডো রাজ্যটিই অতি মনোরম। ছোট ছোট পাহাড়, নিবিড় জঙ্গল আর নদী মাতৃক এই রাজ্যটির সৌন্দর্যের খ্যাতি আছে সারা পৃথিবীতে। আমার কলোরাডো ঘুরে দেখার খুব ইচ্ছে ছিল, হলো না।

আর কয়েক ঘণ্টা বাদে আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছেড়ে চলে যাবো, আর কোনোদিন এখানে আবার আসবো কি না কে জানে! হাতে সময় আছে, তাই হিসেব করতে বসলুম, কী কী দেখা বাকি থেকে গেল এ যাত্রায়।

কাছেই গ্র্যাণ্ড কেনিয়ান এই বিশ্ববিখ্যাত উপত্যকাটি সত্যিই প্রকৃতির এক মহান বিস্ময়। যারা এ দেশ ভ্রমণ করতে আসে, তাদের দ্রষ্টব্য তালিকায় প্রথমেই গ্র্যাণ্ড কেনিয়ানের নাম থাকে। আমি ছবিতে, চলচ্চিত্রে অনেকবার গ্র্যাণ্ড কেনিয়ান দেখেছি, কিন্তু দু'দুবার এসেও চাক্ষুষ দেখার সৌভাগ্য হলো না। প্রথমবার ভেবেছিলুম, অনেকদিন তো থাকবো, কোনো এক সময় দেখে নিলেই হবে। তারপর হঠাৎ ফিরে গেছি। এবারে পাঁচটা মাস কেটে গেল ঝড়ের বেগে, এখন আমি সর্বস্বান্ত। অবশ্য পয়সা থাকলেও এই শীতের মধ্যে গ্র্যাণ্ড কেনিয়ান দেখা সম্ভব হতো না।

অ্যারিজোনার মরুভূমি দেখে গতবার খুব ভালো লেগেছিল। এ এক অন্যরকম মরুভূমি। আগাগোড়া রুক্ষ নয়, মধ্যে মধ্যে রয়েছে অসংখ্য বিরাট ক্যাকটাস। এই সাউয়ারো ক্যাকটাসগুলো এক একটা দোতলা-তিনতলা বাড়ির

সমান উঁচু। অপূর্ব সেই দৃশ্য। ইচ্ছে ছিল সেখানে একবার যাবো।

টেক্সাসের দিকে তো যাওয়াই হলো না। ওয়েস্টার্ন ছবিতে কতবার যে টেক্সাস দেখেছি, সেখানে আমার পায়ের চিহ্ন পড়লো না। যদিও জিন্‌স আর গেঞ্জি কিনে রেখেছিলুম। রেড ইণ্ডিয়ানদের একটা এনক্লেভ-ও আমার দেখে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল।

আমেরিকার যে চারটি রাজ্যকে সাদার্ন স্টেট্‌স বলে, সেখানে কখনো যাইনি। এরা এখনো নাকি কালো লোকদের ওপর খড়্গহস্ত, কত নৃশংসভাবে যে এখানে নিগ্রোদের খুন করা হয়েছে তার ঠিক নেই। অথচ, এই দক্ষিণ রাজ্যের নাগরিকরাই তাদের ভদ্রতার জন্য বিখ্যাত!

যাওয়া হলো না পাশের রাজ্য মেক্সিকো-তে। যদিও সেখানকার দু'একজন বন্ধু নেমন্তন্ন করে রেখেছিল। কিউবা দেখারও একটা অদম্য শখ রয়ে গেল আমার মনে। এক সময় ফিদেল কাস্ত্রো ছিল আমার হীরো। হেমিংওয়ের লেখা কিউবার অনেক বর্ণনা পড়েও মন টেনেছে। এই ডেনভার এয়ারপোর্ট থেকেই কিউবাগামী বিমানের জন্য ঘোষণা শুনতে পেলুম কয়েকবার। কিন্তু আমার যাবার উপায় নেই।

দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলিতে যাওয়া খুবই শক্ত আমি জানি। আমাদের দেশ থেকে কেউ, বিনা কাজে, শুধু ভ্রমণের জন্য ওখানে গেছে, এমন শুনিনি। তবু ব্রাজিল, উরুগুয়ে, আর্জেন্টিনা, পেরু এই সব রোমাঞ্চকর নামগুলি আমায় হাতছানি দেয়।

বসে বসে এইসব ভাবতে ভাবতে আমি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা একটি পদ্যে নিজস্ব সুর দিয়ে গুণ গুণ করে গাইতে লাগলুম :

ইচ্ছা সম্যক্ জগর্দশনে
কিন্তু পাথেয় নাস্তি
দু'পায়ে শিক্লি, মন উড়ু উড়ু
এ কী দৈবের শাস্তি!

বেশীক্ষণ এ গানটা গাওয়া গেল না, কারণ সুরটা তেমন যুৎসই রকমের করুণ হয়নি। তাই এরপর আমি গাইতে শুরু করলুম দ্বিজেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ ভাইয়ের লেখা :

কী পাইনি
তার হিসাব মিলাতে মন মোর নহে রাজি...

কিন্তু একলা বসে বসে গান গেয়ে তো বেশী সময় কাটানো যায় না। তাই উঠে পায়চারি করতে লাগলুম খানিকটা। ডেনভার এয়ারপোর্টটি বিরাট, এখানে রয়েছে অজস্র দোকানপাট, ওপর তলায় একটা ছোটখাটো মিউজিয়াম পর্যন্ত রয়েছে। অনেক খাবার দোকান, কিন্তু আমি বাইরে থেকে দেখেই চক্ষু সার্থক করছি।

সিডার র‍্যাপিডস্ ছেড়ে আসতে হয়েছে খুবই তাড়াহুড়োর মধ্যে। মুখার্জিদা এয়ারপোর্টে পৌঁছে দিয়েছে এবং বারবার জিজ্ঞেস করেছেন, তোর ব্যাগ হারাইছে, পয়সা কড়ি ঠিক আছে তো? অসুবিধা থাকলে লুকাইস না, খুইল্যা ক! লজ্জার কিছু নাই, আমি তোরে বেনিফিট অব ডাউটে দুই তিনশো ডলার ধার দিতে পারি।

আমি জোর দিয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে বলেছিলুম, না, না, আমার কোনো অসুবিধে নেই।

মুখার্জিদার পরামর্শে স্থানীয় পুলিশ স্টেশনে একটা ডায়েরি করিয়ে এসেছি আমার ব্যাগ হারাবার বিষয়ে। প্লেনের টিকিট পুনরুদ্ধার করতে হলে এটা নাকি দরকার। সূর্যকে সব খবর জানিয়ে একটা চিঠি লিখে রেখে এসেছি। জয়ন্তীদি হঠাৎ কেন টিকিট পাঠিয়ে দিলেন তা জানবার জন্য দু'বার ওঁকে টেলিফোন করেছিলুম। বাড়িতে পাইনি। ওঁর ছোট মেয়ে ছুটকি কিছুই বলতে পারেনি। যাই হোক, টিকিট নষ্ট করার কোনো মানে হয় না বলে আবার যাত্রা শুরু করে দিয়েছি।

অনেকক্ষণ ধরেই লক্ষ্য করছিলুম, দুটি শাড়ী পরা মেয়ে ও একটি ধুতি পরা ছেলে হাতে কয়েকটি বই নিয়ে ব্যস্ত যাত্রীদের পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কী সব বোঝাচ্ছে। ছেলেমেয়ে তিনজনেরই পায়ে চটি। এটা অবিশ্বাস্য লাগে। বাইরে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা হলেও বিমানবন্দরের মধ্যে স্বাভাবিক উত্তাপ। কিন্তু ওরা তো কখনো বিমানবন্দরের বাইরেও যাবে, তখন কি চটি পড়ে বরফের ওপর দিয়ে হাঁটবে?

মেয়ে দুটি পরে আছে সাধারণ ছাপা শাড়ী, ছেলেটির গায়ে গেরুয়া রঙের চাদর। তার মস্তক মুণ্ডিত, মাঝখানে একটি টিকি। ওদের চিনতে ভুল হয় না। ওরা কৃষ্ণ কনসাসনেস-এর স্বেচ্ছাসেবক ও স্বেচ্ছাসেবিকা। ওরা চাঁদা তোলে না, যতদূর জানি, এ দেশে রাস্তায় ঘাটে চাঁদা তোলা নিষিদ্ধ, ওরা নিজস্ব প্রকাশনীর বই বিক্রি করতে চাইছে। উদ্দেশ্য শুধু বই বিক্রি নয়, বৈষ্ণব দর্শনের সম্প্রচার।

ভগবৎ দর্শন বা ধর্মের ব্যাপারটা আমি কিছু বুঝি না, কোনো আগ্রহ নেই। বিরাগও নেই, ও ব্যাপারে আমি উদাসীন। কিন্তু দূর থেকে ওদের দেখতে দেখতে আমি ভাবছিলুম, কোন্ টানে ওরা ধর্মের কাছে এতখানি নিবেদন করতে

পেরেছে নিজেদের। তিনটি আমেরিকান ছেলেমেয়ে। বয়েস তিরিশের বেশি নয়, এই ডিসেম্বরের সন্ধেবেলা কতরকম আমোদ প্রমোদেই তো সময় কাটাতে পারতো। তার বদলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে নিরলসভাবে এয়ারপোর্টের এ মাথা থেকে ওমাথা হেঁটে চলেছে, জাঁদরেল চেহারার অতিশয় ব্যস্ত মানুষদের বোঝাতে চাইছে শ্রীকৃষ্ণের মহিমা। এ পর্যন্ত একটা বইও বিক্রি হতে দেখিনি। কেউ ওদের কথা মন দিয়ে শুনছেও না। তবু ওদের ধৈর্য নষ্ট হচ্ছে না। যে-কোনো কাজেই এমন নিঃস্বার্থ নিষ্ঠা দেখলে শ্রদ্ধা জাগেই।

আমি যদিও ধুতি পরে নেই, তবু আমার মুখে একটা দুর্মর বাঙালী ছাপ আছে নিশ্চয়ই। ওদের মধ্যে দুটি ছেলেমেয়ে ঘুরতে ঘুরতে এক সময় আমাকে দেখতে পেয়ে থমকে দাঁড়ালো। মুখে ফুটে উঠলো আগ্রহের হাসি। কাছে এগিয়ে এসে ছেলেটি পরিষ্কার বাংলায় আমায় জিজ্ঞেস করলো, আপনি কি কলকাতা থেকে আসছেন?

আমি মাথা নেড়ে হাঁ বলতেই ছেলেটি আমার হাতে দু'খানি বই দিয়ে বললো আপনি এই বই দুটি দেখেছেন? অবশ্য এসব আপনার পড়া আছে নিশ্চয়ই.

একটি বেদের সংকলন আর একটি গীতার অনুবাদ। ছাপা ও কাগজ অতি চমৎকার, মলাট বেশী রঙচঙে, অনেকটা আমাদের ক্যালেণ্ডারের ছবির মতন।

বই দুটি নাড়তে চাড়তে আমার ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠলো। এরা কি ভাবে বাঙালী মাত্রেই বেদ-উপনিষদ-গীতা পড়েছে? আমি রাজশেখর বসুর অনুবাদে গীতা পড়েও কিছুই বুঝতে পারিনি, বড্ড খটখটে লেগেছে। আর বেদ? আমার মতন ম্লেচ্ছের কি বেদ পড়ার অধিকার আছে?

আমি বললুম, বাঙালী হলেও আমি এসব পড়িনি, অনেক বাঙালীই পড়েনি।

ছেলেটি বললো, তা আমরা জানি। সকলে পড়ে না। কিন্তু বিশ্বে শান্তি আনতে হলে এইসব পবিত্র পুস্তক কি আবার নতুন করে পড়া উচিত নয়?

আমি বললুম, বাঃ, আপনার বাংলা অ্যাকসেন্ট তো চমৎকার!

কথাটা বলে আমি বেশ শ্লাঘা বোধ করলুম। সাহেবদের কাছ থেকে আমাদের ইংরিজি উচ্চারণ সম্পর্কে নানারকম মন্তব্য শুনতে হয়, কোনো সাহেবের বাংলা উচ্চারণ সম্পর্কে মতামত দেবার সুযোগ তো সহজে পাওয়া যায় না।

ছেলেটি লজ্জা পেয়ে বললো, না, না, আমি বাংলা তত ভালো জানি না। বাংলা খুব সুন্দর ভাষা!

আমি কলকাতায় ইস্কনের সাহেব বোষ্টম-বোষ্টমী অনেক দেখেছি, ওঁদের প্রধান কেন্দ্র মায়াপুরেও গেছি বেড়াতে, কিন্তু কখনো ওঁদের কারুর সঙ্গে

আলাপ-পরিচয় হয়নি। এই প্রথম সেই সম্প্রদায়ের দু'জনের সঙ্গে আলাপ হলো ডেনভার বিমানবন্দরে।

ছেলেটি বললো তার নাম মাধব দাস। আর মেয়েটির নাম বিনোদিনী। পূর্বাশ্রমে নিশ্চয়ই ওদের অন্য নাম ছিল। অনেকক্ষণ ঘোরাঘুরি করে ওরা ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিল, তাই গল্প করতে লাগলো আমার পাশে বসে। মেয়েটির মতন এমন লাজুক আমেরিকান মেয়ে আমি আগে আর কখনো একজনও দেখিনি। সে কোনো কথা বলে না, শুধু হাসি হাসি মুখ করে তাকিয়ে থাকে।

ছেলেটি অনেক কিছু জানে। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামকৃষ্ণ, কেশব সেন এই সব নাম বলে যেতে লাগলো টপাটপ। এক সময় সে আমাকে জিজ্ঞেস করলো, তুমি বলতে পারো, ব্রহ্মধর্মে এক সময় বৈষ্ণবদের প্রভাব বাড়লো কী করে?

আমি আবার ইতিহাসে খুব কাঁচা। আমাদের দেশের নাইনটিন্‌থ সেঞ্চুরির ইতিহাস প্রায় কিছুই জানি না। দেবেন ঠাকুর আর বিদ্যাসাগরের মধ্যে কে বয়েসে বড়, তা আমার গুলিয়ে যায়। কেশব সেন খৃষ্টান ছিলেন না ব্রাহ্ম ছিলেন, সে সম্পর্কে আমার স্পষ্ট ধারণা নেই। সুনীলদা এই সব বিষয় নিয়ে একটা ঢাউস বই লিখেছেন, তিনি থাকলে এই সাবজেক্টে একটা লম্বা লেকচার দিতেন নিশ্চয়ই।

আমি আমতা আমতা করে বললুম, ভাই, আমি ঠিক বলতে পারছি না। আপনি কলকাতায় গিয়ে যে-কোনো বাংলার এম-একে জিজ্ঞেস করলেই উত্তর পেয়ে যাবেন।

ছেলেটি নিজেই আমাকে অনেক কিছু বোঝালো। তার মতে ভক্তিই হচ্ছে মুক্তির উপায়। শুদ্ধ ভক্তি মানুষের মনকে একেবারে পরিচ্ছন্ন করে দেয়, ইত্যাদি, ইত্যাদি...। আমি খুব মন দিয়ে শুনছি না বুঝতে পেরেই এক সময় উঠে পড়লো সে। যাবার সময় আমি তাকে বই দুটো ফেরৎ দিতে যেতেই সে বললো, না, না, ও বই আপনার জন্য। আপনি রাখুন।

আমি যতই বলি যে এই বই দিয়ে আমি কী করবো, সে কিছুতেই শুনতে চায় না।

আমি তখন বললুম, দেখুন, কিছু মনে করবেন না, আপনারা তো এই বই বিক্রি করছেন—

আমাকে থামিয়ে দিয়ে সে বললো, না, আমরা বিক্রি করছি না। তবে কেউ যদি আমাদের সাহায্যের জন্য কিছু দেয়, তবে আমরা খুশী হয়েই নেবো।

আমি বললুম, আমাদের তো গোনা গাঁথা ফরেন এক্সচেঞ্জ নিয়ে এদেশে আসতে হয়, সুতরাং আমার পক্ষে এখন কিছুই দেওয়া সম্ভব নয়। কলকাতায়

দেখা হলে কিছু দিতে পারি নিশ্চয়ই—

ছেলেটি বললো, আপনাকে কিছুই দিতে হবে না। আপনি রাখুন বই দুটি অবসর সময়ে পড়বেন। কিংবা অন্য কোনো উৎসাহী ব্যক্তিকে দিয়ে দেবেন।

ওরা চলে যাবার পর আমি একখানা বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছি, একটু পরে ফিরে এলো সেই মেয়েটি। হাতে একটি ছোট কাগজের বাক্স।

নম্র হেসে মেয়েটি বললো, প্রসাদ। আপনার জন্য।

আমি হাত পেতে নিলুম। সেই বাক্সের মধ্যে কয়েকখানা পুরী আর আলু ভাজা আর খানিকটা মিষ্টি। আমি বহুদিন কোনো পূজা-আচ্চার জায়গায় যাইনি, তাই প্রসাদও খাইনি। কিন্তু পয়সার অভাবে আমি অনেকক্ষণ খিদে চেপে বসেছিলুম। সেই ঠাণ্ডা পুরী আর আলু ভাজাই অমৃত মনে হলো আমার কাছে। চোখের নিমেষে শেষ করে ফেললুম। ওরা কী করে বুঝলো যে আমার এমন খিদে পেয়েছে?

খানিক বাদে ফিরে এলো আবার মাধব দাস। আমাকে একটা কাগজ দিয়ে বললো, এতে আমাদের মন্দিরগুলির একটা তালিকা আছে। এই সব জায়গায় গেলে আপনি আমাদের মন্দিরে থাকতে পারবেন আর প্রসাদ পাবেন।

ডেনভারে ইস্কনের মস্ত বড় মন্দির আছে। তাছাড়া সারা আমেরিকা কানাডা জুড়ে যে এদের এতগুলো আশ্রম, এ সম্পর্কে আমার কোনো ধারণাই ছিল না। অন্তত আশী-পঁচাশীটা! গোটা আমেরিকাটাকেই ওরা হিন্দু করে ফেলবে নাকি?

কিন্তু সেই মুহূর্তে ওদের সম্পর্কে আমার কোনো ঠাট্টা-ইয়ার্কি করতে ইচ্ছে হলো না। ওরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বারবার আমায় সাহায্য করতে আসছে। ওদের তো বিন্দুমাত্র স্বার্থ নেই! আমি বরং কৃতজ্ঞতাই অনুভব করলুম।

আমার চোখ অনেকক্ষণ ওদেরই অনুসরণ করতে লাগলো। গ্রে ফ্লানেল সুট পরা অতিশয় কেজো, গম্ভীর চেহারার, বিশালকায় আমেরিকান পুরুষদের কাছে ওরা হিন্দু ধর্মের বই বিক্রি করার অনলস চেষ্টা করে যাচ্ছে। শাড়ী পরা শ্বেতাঙ্গিনী যুবতী ও গেরুয়া চাদর পরা মার্কিন যুবককে দেখে অন্যরা যেন শিঁউড়ে উঠছে, কারুর কারুর মুখে ফুটে উঠছে গভীর অবজ্ঞার ভাব। ঐ ছেলে-মেয়েরা কিন্তু বিরক্ত হচ্ছে না, রেগেও যাচ্ছে না। এত কম বয়েসে এতখানি ধৈর্য ওরা আয়ত্ত করলো কী করে?

তারপর এক সময় আমার প্লেনের ডাক পড়লো। ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমি এগিয়ে গেলুম সিকিউরিটি কাউন্টারের দিকে। ডেনভারের মতন সিকিউরিটির কড়াকড়ি আমি পৃথিবীর আর কোনো বিমানবন্দরে দেখিনি। পকেটের সব খুচরো পয়সা, হাতের ঘড়ি, চাবি, কোমরের বেল্ট পর্যন্ত জমা দিতে

হয়। এক আধ টুকরো ধাতু সঙ্গে নিয়ে সিকিউরিটি বেরিয়ার পার পাওয়া যায় না কিছুতে। কিউবার পলাতকদের জন্যই নাকি এত সতর্কতা।

বিমানটা রানওয়ে দিয়ে ছুটতে শুরু করতেই মনে পড়লো, এবারের মতন আমায় এদেশ থেকে বিদায় নিতে হচ্ছে এখানেই। আর হাজার চেষ্টা করলেও ফিরে আসা যাবে না। ভিসায় ছাপ পড়ে গেছে। সেজন্য কোন দুঃখ হচ্ছে না, চোখের সামনে যেন দেখতে পাচ্ছি ভবিতব্যের উন্মুক্ত দ্বার।

॥ ৫১ ॥

এডমান্টন বিমানবন্দরে চেনা কারুকে পাবো এমন আশা করিনি। দীপকদা নেই, জয়তীদি তো মেয়েদের বাড়িতে ফেলে রেখে এতদূরে আসতে পারেন না। যাওয়ার ব্যবস্থা আমাকেই করতে হবে। ট্যাক্সি নেওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। এখান থেকে দীপকদার বাড়ি অনেক দূর, প্রকৃতপক্ষে ওঁরা থাকেন অন্য একটি শহরে। এখান থেকে দীপকদাদের বাড়ির যা ট্যাক্সি ভাড়া হবে, সে টাকায় কলকাতা থেকে দার্জিলিং-এর প্রথম শ্রেণীর ট্রেন ভাড়া হয়ে যায়। সে টাকা আমার নেই-ও, প্রথমেই বেয়ারিং হয়ে জয়তীদির কাছে উপস্থিত হবার কোনো মানে হয় না। আমার কাছে যা খুচরো পয়সা আছে, তাতে কোনোক্রমে বাসভাড়া কুলিয়ে যাবে। একটা সুবিধে এই, এই বিদেশ বিভুঁই-এ দু'একবার বোকা বনে গেলেও কেউ তো তার সাক্ষী থাকছে না।

ইমিগ্রেশান কাউন্টারে প্রথমেই খানিকটা নাকানি-চোবানি খাওয়ালো আমাকে। মধ্যবয়স্ক সাহেবটি যেন আমাকে নিয়ে ইঁদুর-বেড়াল খেলতে চায়। মুখে মিটি মিটি হাসি আর নানান প্রশ্ন : তুমি তো কয়েক মাস আগেই একবার এডমান্টনে এসেছিলে দেখছি! আবার কেন এলে? এখানে এমন কী দ্রষ্টব্য বস্তু আছে? কার বাড়িতে উঠবে? সে তোমার কে হয়? সে কি তোমায় রিসিভ করতে এয়ারপোর্টে এসেছে? তুমি দেশে কী চাকরি করো? ইত্যাদি ইত্যাদি!

টোরোন্টোয় পাঞ্জাবী শরণার্থীদের নিয়ে নানান গোলমালের কথা কাগজে পড়েছি। ভারতীয় আগন্তুকদের ক্যানাডার সরকার এখন বেশ সন্দেহের চোখে দেখছে। এর মধ্যে ভারতীয়দের জন্য ভিসা ব্যবস্থা চালু হয়েছে। আমার কাছে যদিও মাল্টিপল এনট্রি ভিসা আছে তবু আমার বুক টিপটিপ করছে। যদি রিটার্ন টিকিট দেখতে চায়? সাময়িক ভ্রমণকারীদের কাছে রিটার্ন টিকিট না থাকলে যে এরা ঢুকতেই দেয় না, সেটা তো আমার আগে মনে পড়েনি।

সাহেবটি যে আমায় আটকাতে চায়, তার ভাবভঙ্গি দেখে তা ঠিক মনে হয় না।

যেন আমায় নিয়ে খানিকটা মস্করা করাই তার উদ্দেশ্য। সে আমায় জিজ্ঞেস করলো, আমি আগে কখনো তুষারপাত দেখেছি কি-না! আরও সব অবান্তর প্রশ্ন। শেষ পর্যন্ত আমি দেয়ালে-পিঠ-দেওয়া বেড়ালের মতন ফ্যাঁস করে বললুম, যেতে দেবেন কি না বলুন, না হলে আমি এক্ষুণি ফিরে যাচ্ছি। নেহাৎ আমার এক আত্মীয় এখানে ক্রিসমাসের নেমন্তন্ন করেছেন তাই এসেছি।

সাহেবটি এবারে ভুরু তুলে বললো, ও, ক্রিসমাস? ঠিক আছে যাও, আরও দিন পনেরো থেকে যাও, মেরি ক্রিসমাস!

সে আমার পাসপোর্টে ছাপ মেরে দিল, টিকিট দেখতে চাইলো না। ততক্ষণে আমার গেঞ্জি ঘামে ভিজে গেছে!

বাইরে বেরিয়েই দেখি একটি পরিচিত মুখ। ভট্টাচার্যি সাহেব! আদি ও অকৃত্রিম বাংলা-হাসি দিয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কী ব্যাপার, এত দেরি হলো কেন?

—বিমলবাবু আপনি?

—কী করবো, দীপক সরস্বতী নেই এখানে, জয়তী বললো... আমারও এদিকে একটা কাজ ছিল...।—আপনি কষ্ট করে এতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছেন, আমার জন্য!

—আরে মশাই, থামুন তো! খুব ভালো সময় এসেছেন, চমৎকার শীত পড়েছে, জমিয়ে আড্ডা দেওয়া যাবে!

আমি আগেরবার এসেছিলুম বেশ গরমকালে। তখনও বিমলবাবু বলেছিলেন, খুব ভালো সময়ে এসেছেন! অর্থাৎ জীবনের সব অবস্থা থেকেই বিমলবাবু আনন্দ খুঁজে নিতে জানেন। গল্প করতে করতে পৌঁছে গেলুম বাড়ি।

জয়তীদি জিজ্ঞেস করলেন, ফ্লাইট লেট ছিল? তোমার দেরি দেখে আমি ভাবছিলুম, টিকিটটা ঠিক পেলে কি-না!

—আপনি হঠাৎ টিকিটটা পাঠালেন কেন, জয়তীদি?

—তুমি শুধু শুধু ওখানে বসে থেকে কী করতে? টিকিট হারিয়েছে। টাকা পয়সাও সব হারিয়েছে নিশ্চয়ই?

মেয়েদের কিছু একটা ইন্সটিংক্ট থাকে, যাতে তারা ঠিক বুঝতে পারে। আমি হেসে বললুম, টাকা পয়সা আর বিশেষ কিছু ছিলও না। এবারে বাড়ি ফিরে যাবো ভাবছিলুম, এর মধ্যে টিকিটটা হারিয়ে গেল।

জয়তীদি বললেন, বেশ হয়েছে! আমাদের বাড়িতে থাকো, রান্না করবে, বাসন মাজবে, বাচ্চাদের দেখা শুনো করবে, তার বদলে কিছু মাইনে পাবে

—আমায় যে মাত্র পনেরো দিনের ভিসা দিয়েছে এবারে?

—তবে তো আরও ভালো। ভিসা ফুরিয়ে যাবার পর যদি ধরা পড়ো, তাহলে জেল খাটবে। তারপর একদিন এদের খরচেই হয়তো দেশে ফিরে যাবে! ক্যানাডার জেলখানা খুব ভালো, দেখো!

—বাঃ, তাহলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের ব্যবস্থা হলেই তো ভালো!

পরদিনই ফিরে এলেন দীপকদা। আমিই তাঁকে দরজা খুলে দিলুম। আমায় দেখে তিনি যেন ভূত দেখলেন!

—কী ব্যাপার। তুমি?

আমি যতদূর সম্ভব মন-গলানো হাসি দিয়ে বললুম, এই তো, আবার চলে এলুম!

—আবার এডমান্টনে? এই শীতের মধ্যে? জানো, আর কয়েকদিনের মধ্যেই শূন্যের নিচে তিরিশ-চল্লিশ হয়ে যাবে? এখন ক্যালিফোর্নিয়ার দিকে গেলে বরং তোমার ভালো লাগতো।

—ভেতরে আসুন, দীপকদা, তারপর সব কথা বলছি।

দীপকদা দুপদাপ করে পায়ের বরফ ঝাড়লেন, ভেতরে ঢুকে হাতের গ্লাভস খুলে ফেলে বললেন, উঃ, এই সময়টায় ঘোরাফেরা করা এক ঝকমারি। বাড়ির বাইরে থাকতে একটুও ইচ্ছে করে না। তাই একদিন আগেই ফিরে এলুম।

দুই মেয়ে ছুটে এলো বাবার কাছে। জয়তীদি সাড়া দিলেন রান্নাঘর থেকে। আমি কিছুক্ষণের জন্য এই দাম্পত্য দৃশ্যটি থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে চলে গেলুম টিভি'র ঘরে।

খানিক পরে যখন দেখা হলো, ততক্ষণে দীপকদা আমার ব্যাপারটা সব শুনে ফেলেছেন। উনিও জয়তীদির মতন গম্ভীরভাবে বললেন, দ্যাখো, আমার গিন্নি টিকিট পাঠিয়ে তোমাকে ইউ এস থেকে নিয়ে এসেছেন বটে, কিন্তু এখান থেকে ভারতবর্ষে তোমাকে টিকিট কেটে ফেরৎ পাঠাবার ক্ষমতা আমাদের নেই। সে অনেক টাকার ধাক্কা। তাছাড়া এই উইণ্টারে রিসার্ভেশন পাওয়াই শক্ত! গিন্নী তোমায় যে এখানে আনিয়েছেন, ভেবো না, সেটা তোমাকে দয়া দেখাবার জন্য। এর মধ্যে বিশেষ স্বার্থ আছে। আমাদের একজন কাজের লোকের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। আমি সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকব, জয়তীও ইউনিভার্সিটিতে কোর্স নিয়েছে! জানো তো, এদেশে যা আগুন লাগার ভয়, কক্ষনো বাচ্চা ছেলে-মেয়েদের একা বাড়িতে রাখা চলে না। বেবি সীটারেরও সাঙ্ঘাতিক খরচ। সুতরাং তোমায় আমরা থাকা-খাওয়ার বিনিময়ে রাখতে পারি।

আমি বললুম, শুধুই থাকা-খাওয়া? বিড়িটিড়ি খাওয়ার জন্য কিছু অন্তত হাত খরচ দেবেন না? আর বছরে দুবার জামা-কাপড়?

দীপকদা বললেন, আমার অনেক পুরোনো জামা-টামা আছে, সেজন্য চিন্তা নেই। হাত খরচের কথাটা বিবেচনা করতে হবে।

জয়ন্তীদি বললেন, না, না, ওর হাতে পয়সা দেওয়া ঠিক নয়। যখন তখন সব জিনিস হারিয়ে ফেলে। বিড়িটিড়ি কিংবা ওর নেশার জিনিস যা লাগে তা আমরাই কিনে দেবো।

আমি বললুম, আমি কিন্তু মাছ ছাড়া ভাত খেতে পারি না।

দীপকদা বললেন, ওসব চলবে না। গরু-শুয়োর যা দেবো, তাই সোনামখ করে খেতে হবে!

জয়ন্তীদি বললেন, ভাত? আমরা মোটে সপ্তাহে একদিন ভাত খাই!

আমি বললুম, ইস্ জয়ন্তীদি, আপনারা কি গরীব! আমরা কিন্তু কলকাতায় প্রত্যেকদিনেই ভাত খাই আর মাছের দাম খুব বেশী হলেও কুচো মাছ অন্তত জুটে যায়। আপনাদের গরু-শুয়োরের মতন অখাদ্য খেয়ে বেঁচে থাকতে হয়!

জিয়া আর ছুটকি এতটা বাংলা বোঝে না, ওরা আমাদের এই কথোপকথনের মর্ম টের পেল না।

দু'দিন বাদেই ক্রিসমাস। বৈঠকখানায় শোভা পাচ্ছে ক্রিসমাস ট্রি। সারাদিন ধরেই ঘুরে ফিরে সেটাকে সাজানো চলছে। এটাই নিয়ম, ক্রিসমাস ট্রি সাজাতে হয় অন্তত দিন দশেক আগে থেকে, অনেকটা দুর্গা পুজোর প্রস্তুতির মতন। সুপার মার্কেটগুলোর সামনে ডাঁই করা থাকে ঝাউগাছের টুকরো, যার যেমন পছন্দ সেই রকম ছোট বড় এক একটা টুকরো কিনে নিয়ে যায়।

ক্রিসমাস ইভ-এ দীপকদাদের নেমন্তন্ন আছে ওঁদের এক পাঞ্জাবী বন্ধুর বাড়িতে। অনেকদিন আগে থাকেই ঠিক করা। এইসব পার্টিতে একজন অতিরিক্ত লোককে নিয়ে যাওয়া মোটেই অসঙ্গত নয়। সুতরাং দীপকদা ধরেই নিয়েছিলেন আমি যাবো। কিন্তু আমি শেষ মুহূর্তে বেঁকে বসলুম।

মনটা কী রকম ফাঁকা ফাঁকা লাগছে, এখন একগাদা অচেনা মানুষের মধ্যে গিয়ে ভদ্রতার হাসি হাসতে আমার ইচ্ছে করছে না। অনেকেই জিজ্ঞেস করবে, আমি দ্বিতীয়বার কেন এডমাণ্টনে এলুম? কী উত্তর দেবো!

দীপকদা অনেক অনুরোধ করলেন, জয়ন্তীদি বকুনি দিলেন পর্যন্ত। মেয়েরা বললো, চলো, চলো, তবু আমি অনড় রইলুম। আমি বললুম, আপনারা ঘুরে আসুন, রাত দুটো-তিনটে যাই বাজুক। আমি ঘুমোবো না, দরজা খুলে দেবো।

বাড়ি ফাঁকা হয়ে যেতেই আমি বেশ আত্মবিশ্বাস ফিরে পেলুম। গৃহস্বামীর সেলার থেকে বার করে আনলুম এক বোতল ইটালিয়ান ড্রাই ওয়াইন। দুটি গেলাসে সেই ওয়াইন ঢেলে, দু'হাতে গ্লাস দুটো তুলে ঠোকাঠুকি করে বললুম, চিয়ার্স।

এক এক সময় নিজেকেই নিজের সান্নিধ্য দিতে বেশ লাগে।

দু'রকম গলার আওয়াজ করে আমি কথাও বলতে লাগলুম নিজের সঙ্গে। যেন সত্যিই আমার বুকের মধ্যে দুটি সত্তা আছে, তারা বেশ পরস্পরবিরোধী যুক্তিও ফাঁদতে পারে।

জানলার পর্দা সরিয়ে দিতেই দেখতে পেলুম এক অপরূপ দৃশ্য। খুব পাতলা, পালকের মতন তুষার পাত হচ্ছে। কিংবা যেন খসে পড়ছে চাঁদের বুড়ির চরকার তুলো। আকাশ ঠিক দেখা যাচ্ছে না, তবু যেন মনে হচ্ছে আজ একটা নীল রঙের চাঁদ উঠেছে। পৃথিবী অদ্ভুত নিঃশব্দ।

বেশ তরতরিয়ে কেটে যেতে লাগলো সময়। একটুও নিঃসঙ্গতা বোধ হলো না। গোঁফ গজাবার পর থেকেই আমি প্রত্যেক ক্রিসমাস ইভের রাত্রিই বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে প্রচুর হৈ-হল্লা করে কাটিয়েছি। এই প্রথম এমন বিশেষ দিনে আমার একা এই রাত্রি যাপন। বেশ উপভোগ করতে লাগলুম ব্যাপার।

টিভি খোলাই ছিল, কিন্তু সেদিকে চোখ ছিল না বিশেষ। ঠিক রাত বারোটা বাজার সময় ঘোষণা করতেই আমার খেয়াল হলো। এদেশের পার্টিতে এই সময় আলো নিবিয়ে দেওয়া হয়, যার যাকে ইচ্ছে চুমু খেতে পারে। আমিও নিবিয়ে দিলুম আলো, নিজের ডান হাতে সশব্দে একটা চুমু খেলুম। তারপর গৃহসজ্জার বেলুনগুলো একটার পর একটা ফাটাতে লাগলুম জ্বলন্ত সিগারেট দিয়ে।

তার একটু পরেই টেলিফোন বাজলো। নিশ্চয়ই দীপকদা চেক করতে চাইছেন আমি ঘুমিয়ে পড়েছি কি না। দৌড়ে গিয়ে ফোন ধরলুম। তারপরই পেলুম পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ খবর।

সিডার র‍্যাপিডস থেকে ফোন করছে সূর্য। সে বললো, সে গতকালই ফিরে এসেছে। ফিরে এসে আমার চিঠি পেয়েছে আর মুখার্জিদার কাছ থেকে সব শুনেছে। আমি কেন আর দু'একদিন থেকে এলুম না ওখানে! এডমাণ্টনে বুঝি বিরাট পার্টি আছে? আমাকে বুঝি পার্টি ছেড়ে এসে ফোন ধরতে হলো?

আমি বললুম, হ্যাঁ, এ বাড়িতে খুব জমজমাট পার্টি চলছে। তোর কী খবর বল!

প্রায় মিনিট পাঁচেক এলেবেলে সংলাপের পর সূর্য বললো, তোর ব্যাগটা ফেরৎ এসেছে। গ্রে হাউণ্ড বাস ডিপো থেকে ফোন করেছিল, আমি গিয়ে নিয়ে এসেছি।

আমি বললুম, ব্যাগ? আমার? এতদিন বাদে?

সূর্য বললো, হ্যাঁ, ওটা নাকি শিকাগোতে পড়ে ছিল। আজই এসেছে এখানে।

—আমার ব্যাগ ? তুই ঠিক বলছিস ? তার মধ্যে আমার প্লেনের টিকিট আছে ? ক্যামেরা ? একটা বইয়ের মধ্যে টাকা—

—সব আছে। কিছুই খোয়া যায়নি।

—সূর্য, আমার ব্যাগটা কে ফেরৎ দিল বল তো ? তাহলে কি সত্যিই ভগবান টগবান বলে কিছু আছে নাকি ?

—ভগবান থাকলেও তোর মতন পাষণ্ডকে দয়া করবে কেন ? তবে গ্রে হাউণ্ড কোম্পানি ভগবানের চেয়ে কম এফিসিয়েণ্ট নয়।

এর পর এমন সব ঘটনা ঘটতে লাগলো যা এক মুহূর্তের জন্য খুব আনন্দের, পর মুহূর্তে দারুণ বিষাদের।

রাত তিনটের সময় দীপকদারা ফিরতেই তো সুখবরটা দিলুম। পরদিন বিকেলেই ব্যাগটা পৌঁছে গেল। দীপকদা বললেন, তোমার টিকিটটা দাও, আমার এজেণ্টকে বলে দেখি, সীট জোগাড় করে দিতে পারবে কিনা। এই শীতে খুব রাস থাকে।

টিকিটটা হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ উল্টে পাল্টে দেখে দীপকদা বললেন, এটা ফিরে পাওয়া না-পাওয়া সমান। এটাকে বাজে কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দিতে পারো।

আমি আঁতকে উঠে বললুম, কেন ?

দীপকদা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, তুমি কী বলো তো ? জীবনে কি এই প্রথম প্লেনে চাপছো ? টিকিটটা একবার পড়েও দেখোনি ?

কাঁচু মাচু গলায় বললুম, কী হয়েছে বলুন তো দীপকদা ? কিছুই বুঝতে পারছি না। টিকিটটা চলবে না ? কিন্তু এটা তো রাউণ্ড ট্রিপের···

—এটা তো আউট ডেটেড টিকিট। তোমাকে চীপ কনসেশানাল রেটের রিটার্ন টিকিট দিয়েছে, এটা মাত্র চার মাস ভ্যালিড। এতে তোমার জার্নির তারিখ উল্লেখ করা আছে, তারপর পাঁচ মাসের বেশী কেটে গেছে। এখন এ টিকিট চলবে না। তুমি এই সামান্য জিনিসটাও আগে খেয়াল করোনি ?

॥ ৫২ ॥

বিলেত দেশটা যেমন মাটির, সেইরকম ঐশ্বর্যের দেশ আমেরিকা-ক্যানাডাতেও দারিদ্র্যের ছায়া উঁকি মারে মাঝে মাঝে। অস্ত্রশস্ত্র ও পেট্রোল ছাড়া অন্যান্য অনেক ব্যবসাতেই মন্দা চলছে। যখন তখন লোক ছাঁটাই হয়। বেকারের সংখ্যাও বাড়ছে দিন দিন, আমার উচিত নয় এদেশে সেই বেকারদের

সংখ্যা বৃদ্ধি করা।

আমার টিকিটটা যদিও বাতিল হয়ে গেছে, আবার নতুন টিকিট কেনার প্রশ্নই না, তবু আমার ফিরে যাবার একটা কিছু ব্যবস্থা করতেই হবে। দেশে যিনি আমায় টিকিটটা দিয়েছিলেন, তিনি অবশ্য বলেই দিয়েছিলেন যে নির্দিষ্ট চার মাসের টিকিট, খুব সস্তা বলেই এ রকম সময় বাঁধা। তবে, কোনো কারণে সময়সীমা পেরিয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকলে ডাক্তারের সার্টিফিকেট দিয়ে ম্যানেজ করা যেতে পারে।

সে কথা দীপকদাকে জানাতেই দীপকদা গম্ভীরভাবে বললেন, সেটা সময় ফুরিয়ে যাবার আগে জানাতে হয় কম্পানিকে। একবার সময় পার হয়ে গেলে আর কিছু করবার উপায় নেই। এখন চুপচাপ বসে থাকো !

আমি বললুম, তা হলে কি একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকবো ? না একটু একটু চিন্তা করবো ?

দীপকদা বললেন, যত ইচ্ছে চিন্তা করতো পারো, কোনো লাভ হবে না।

পুরো দাম দিয়ে কেনা আন্তর্জাতিক বিমান টিকিটের অনেক সুবিধে। সীট কনফার্মড করেও নির্দিষ্ট দিনে ফ্লাইট ধরতে না গেলেও টিকিট নষ্ট হয় না। এক বছর ধরে টিকিটটা ঘুম পাড়িয়ে কাছে রেখে দেওয়া যায়। ইচ্ছে করলেই এয়ার লাইনস বদল করা যায়। যাওয়ার সময় ইওরোপ হয়ে গিয়ে ফেরার সময় জাপান ঘুরে আসতে পারে যাত্রীরা। আমারটা খুব সস্তা বলেই তার তিন অবস্থা। যাওয়া-আসা একই পথে, এয়ার লাইনস বদলাবার উপায় নেই আর সময়সীমা চার মাস।

আমার সনির্বন্ধ অনুরোধে দীপকদা তাঁর ট্র্যাভেল এজেণ্টকে ফোন করলেন। ইনি একজন ভারতীয় ব্যবসায়ী। ইনি বললেন, আমার টিকিটটা একেবারেই অচল, তবে তিনি সস্তায় আমায় আর একটা টিকিট দিতে পারেন, তার দামটা ভারতে ফিরে গিয়ে দিলেও চলবে, যদি দীপকদা আমার জামিন থাকেন।

এ বার্তা শুনে আমি বললুম, হোপলেস ! ফিরে গিয়ে অত টাকা দিতে হলে আমার ব্যাঙ্ক ডাকাতি করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। নভিস ডাকাত হিসেবে আমি নির্ঘাৎ ধরা পড়ে যাবো। তাহলে তো দেখছি আপনার বাড়িতেই আমায় কাজের লোক হয়ে থেকে যেতে হচ্ছে।

এবারে ফোন করা হলো এক সাহেব এজেণ্টকে। সাহেব খানিকটা ভরসা দিয়ে বললেন, যদি কোনো ডাক্তারের সার্টিফিকেট দিতে পারো, তা হলে চেষ্টা করা যেতে পারে।

আমি উল্লসিত হয়ে বললুম, ব্যাস, তা হলে তো হয়েই গেল। ডাক্তারের

সার্টিফিকেট জোগাড় করা এমনকি কি আর শক্ত।

দীপকদা ধমক দিয়ে বললেন, কে তোমায় সার্টিফিকেট দেবে শুনি ? তোমার কি সত্যি অসুখ হয়েছে ? তোমার কী অসুখ হয়েছে শুনি ?

আমি সগর্বে বললুম, অসুখ ? আমার অসুখ হবে কেন ? আমার একেবারে লোহার মতন স্বাস্থ্য !

—তবে ? এ কি ইণ্ডিয়া পেয়েছো যে অফিসের ছুটি নিতে হলেই পাড়ার ডাক্তারকে দু'পাঁচ টাকা দিলেই সার্টিফিকেট পাবে ? এ দেশে কেউ ফল্‌স সার্টিফিকেট দেয় না। ধরা পড়লে সে ডাক্তারের লাইসেন্স কেড়ে নেওয়া হয় সঙ্গে সঙ্গে।

আমি বললুম, কিন্তু অনেক বাঙালী ডাক্তারও তো আছেন এ দেশে।

দীপকদা বললেন, তাঁদের তো আরও বেশী অসুবিধে ! বিদেশে কাজ করছেন, ধরা পড়ার ভয় তাঁদের আরও বেশী থাকবে। এটাই তো স্বাভাবিক। কোনো বাঙালী ডাক্তারকে এ রকম অনুরোধ করে অপ্রস্তুত অবস্থায় ফেলাই অনুচিত।

—তা হলে কী হবে ?

—যে-রকম অবস্থায় ছিলে, সে রকমই থাকবে !

রয়ে গেলাম নিশ্চেষ্টভাবে দু'তিনদিন। তারপর একদিনেই পর পর দুটি কাচের গেলাস পড়ে গেল আমার হাত থেকে। দীপকদা ও জয়তীদি দু'জনেই ভুরু তুলে তাকালেন আমার দিকে। এ রকম কাজের লোককে কতদিন রাখা নিরাপদ সে সম্পর্কে ওঁদের মনে সংশয় দেখা দিয়েছে।

বাধ্য হয়েই দীপকদা ফোন করলেন আরও কয়েক জায়গায়। শেষ পর্যন্ত দু'হাজার মাইল দূরের এক সহৃদয় ডাক্তার, তাঁর নাম জানাতে চাই না, একখানা সার্টিফিকেট পাঠিয়ে দিতে রাজি হলেন। সেটা হাতে পাবার পর দেখা গেল, আমার পায়ের শিরায় থ্রম্বোসিস হয়েছে বলে সেই ডাক্তার মহোদয় সন্দেহ করছেন। এই অবস্থায় আমায় একদম চলাফেরা করা বাঞ্ছনীয় নয়।

এ নাকি এমন এক অসুখ, যা বাইরে থেকে দেখে বোঝবার উপায় নেই। পরীক্ষা করলেও সহজে ধরা পড়ে না।

দীপকদা বললেন, যাও, চুপচাপ শুয়ে থাকো। মেডিক্যাল বোর্ড যদি তোমায় পরীক্ষা করতে চায়, তা হলে পুরো থ্রম্বোসিস রোগীর মতন হাব-ভাব করতে হবে কিন্তু !

আমি মনে মনে চিন্তা করতে লাগলুম, কোনো নাটকে বা সিনেমায় আমি কোনো থ্রম্বোসিস রোগীর অভিনয় দেখেছি কি না। খুঁড়িয়ে হাঁটতে হবে ? ওয়েস্টার্ন ছবিতে পায়ে গুলি খাওয়া নায়ক যে-রকম বুকে হেঁটে হেঁটে এগোয় সে রকম…

সাহেব এজেন্ট সেই ডাক্তারের সার্টিফিকেট দেখে খুশী হয়ে বললেন, বাঃ, বেশ, এই তো চাই। এতেই কাজ হয়ে যাবে। কিন্তু—

আমি ভয়ার্ত গলায় জিজ্ঞেস করলুম, আবার কিন্তু ?

সাহেব বললেন, এরকম অসুস্থ লোককে তো প্লেনে তোলা যায় না। এবারে ফিট সার্টিফিকেট নিয়ে আসুন।

এটা কোনো সমস্যাই নয়। আমি যে ফিট আছি তাতে তো কোনো সন্দেহই নেই। শুধু হাঁটা কেন, আমি লাফিয়ে, দৌড়ে, এমনকি নেচেও আমার ফিটনেস দেখাতে পারি যে কোনো ডাক্তারের সামনে।

দীপকদার এক বন্ধু ডাক্তার অবশ্য সে সব পরীক্ষা নিলেন না। বরং একদিন নেমন্তন্ন করে খাইয়ে তারপর সার্টিফিকেট দিয়ে দিলেন।

সব দেখে এজেন্ট সাহেব বললেন, হ্যাঁ, মনে হচ্ছে আর কোনো গণ্ডগোল নেই। এবারে আমি ভ্যাঙ্কুবারে বিমান কম্পানির কাছে সব কিছু পাঠিয়ে দিচ্ছি।

তারপর আবার প্রতীক্ষা। এবং প্রতীক্ষার অবসানে সুসংবাদ।

দু'দিন বাদেই জানা গেল যে আমার টিকিট মঞ্জুর হয়ে গেছে। এখন যে-কোনোদিন আমি যাত্রা করতে পারি।

এবারে সত্যিই আমার আনন্দে নৃত্য করা উচিত। এতদিনের আশানিরাশার দ্বন্দ্ব মিটে গেল ! কিন্তু এবারেও হরিষের পরেই বিষাদ। বিমান কম্পানি আর একটি দুঃসংবাদও পাঠিয়েছে। আমার আর মাঝপথে কোথাও থামা চলবে না। ক্যানাডা থেকেই সোজা ভারতে ফিরতে হবে।

আমি আর্তনাদ করে বললুম, সেকি ! আমার যে রোমে নেমন্তন্ন আছে। সেখানে গেলে আমার একটাও পয়সা লাগবে না। আমার বন্ধু ভাস্কর বারবার টেলিফোন করে বলেছে ফেরারপথে একবার লণ্ডনে নামতে। আমি লণ্ডনে যেতে না পারলেও ও সপরিবারে রোমে এসে আমার সঙ্গে যোগ দিয়ে সারা ইওরোপ ঘুরবে। তাছাড়া অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত আমায় বিশেষ স্নেহ করেন, তিনি বলে রেখেছেন পশ্চিম জার্মানির উল্‌মে ওঁর বাড়িতে একবার অবশ্যই যেতে। সে সব হবে না !

আমি বললুম, আমার টিকিটে তো রোমের স্টপ ওভার আছেই। সেখানে ওরা আমাকে নামতে দিতে বাধ্য।

…স মাথা নেড়ে বললেন, উহুঁঃ। ও কথা আর এখন

সার্টিফাই করবে না। কেম্পানি জানিয়েছে যে, উনি একবার যখন ও রকম গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, তখন আর ঝুঁকি নেওয়া একেবারেই উচিত হবে না। কোথাও থামলে যদি আবার সেই অসুখ হয়, তা হলে কে দায়ী হবে? সুতরাং ওঁকে এখন আমরা সরাসরি দেশে ফিরিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চাই।

—কিন্তু আমার তো ও রকম অসুখ, মানে, ইয়ে, আমি বলছিলুম যে

—ব্যস, ব্যস, আর ওকথা উচ্চারণও করবেন না। দু'দিন পরের ফ্লাইটেই একটা সীট খালি পাওয়া যাচ্ছে, তাতেই চড়ে বসুন!

বাংলার পাঁচের মতন মুখ করে ফিরে এলুম বাড়ি। জয়তীদি বললেন, কী, সব ঠিকঠাক হয়ে গেল, এখনো মন ভালো হচ্ছে না?

আমি বললুম, কোথায় সব ঠিক হলো। শীতকালের ইওরোপ খানিকটা দেখে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল। ভাস্কর কিংবা অলোকরঞ্জন তো আমার টিকিটের বিচিত্র ব্যাপারটা বুঝতে পারবেন না। ওঁরা ভাববেন, আমি শীতের ভয়ে তাড়াতাড়ি দেশে ফিরে গেলুম!

রাত্তিরবেলা খাওয়ার টেবিলে আমরা অনেকক্ষণ চুপচাপ। এক সময় জয়তীদি মুখ তুলে বললেন, সত্যি তুমি পরশু চলে যাচ্ছো? তোমার মন খারাপ হয়ে গেছে বুঝতে পারছি। টিকিট যখন ঠিক হয়ে গেছে, তখন অত তাড়াহুড়ো করার কী আছে? বরং আর ক'টা দিন থেকে যাও।

আমি বললুম, রোমেই নামা হবে না, তা হলে আর শুধু শুধু এই পচা এডমাণ্টনে আর বেশীদিন থেকে কী হবে?

জয়তীদি বললেন, এডমাণ্টন পচা? তুমি ভারি অকৃতজ্ঞ তো?

—এখন এই বরফ-ঢাকা এডমাণ্টনে আর কী করবার আছে আমার?

দীপকদা বললেন, তোমার যাওয়ার কোনো ঠিক-ঠিকানাই ছিল না, কোনোমতে টিকিটের ব্যবস্থা করে দিলুম, তার জন্য একটা ধন্যবাদ পর্যন্ত দিলে না!

আমি মুখ গোঁজ করে বললুম, কত স্বপ্ন দেখেছি ইটালি যাবার। রোম, ভেনিস।

দীপকদা আর জয়তীদি হাসি মুখে পরস্পরের দিকে তাকালেন। তারপর জয়তীদি বললেন, আচ্ছা, এক কাজ করো। তোমাকে তো অ্যামস্টারডমে নেমে প্লেন বদল করতেই হবে। সেখানে নেমে তুমি তোমার এই প্লেনের টিকিটটা ছুঁড়ে ফেলে দাও।

—তারপর?

—তারপর সেখান থেকে কলকাতার আর একটা টিকিট কেটে বা সিনেমায় আমি

আমার কিছু কথা

আমার একটা স্বপ্নের বাস্তবায়ন হলো এই ওয়েবসাইটের মধ্য দিয়ে। ছোটবেলা থেকেই আমার বইপড়া অভ্যাস। আমার পড়া প্রথম উপন্যাস শ্রী শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পথের দাবী',তখন আমি প্রাথমিক বিদ্যালয়েও ভর্তি হইনি।তারপর থেকে প্রায় ২০ বছর ধরে অসংখ্য বই আমি পড়েছি,সংগ্রহের ইচ্ছা থাকলেও আর্থিক অবস্থা আমাকে সেই সুযোগ দেয় নি। ইন্টারনেটের সাথে পরিচিত হওয়ার পর থেকেই আমি বাংলা বই ডাউনলোডের সুযোগ খুঁজতাম,কিন্তু এক মূর্চ্ছনা ছাড়া আর তেমন কোন সাইট আমি পাইনি। মূর্চ্ছনাতেও নিয়মিত বই আপডেট হয়না বলে আমি নিজেই আমার অতিক্ষুদ্র সামর্থ্যের (এতই ক্ষুদ্র যে গ্রামীনের ইন্টারনেট চার্জ টা আমাকে টিউশনি করে জোগাড় করতে হয়।

তবু আমি আমার চেষ্টা অব্যাহত রাখব, নতুন পুরাতন সমস্ত (বিশেষ করে পশ্চিমবাংলার লেখকদের বই) লেখাই আমি এখানে দেওয়ার আশা রাখি।

আপনাদের কাছে একটা ছোট্ট অনুরোধ, আমাকে একটু সাহায্য করুন,তবে টাকা দিয়ে নয়। আমার এই ওয়েবসাইটে কিছু Google এর বিজ্ঞাপন আছে,যে কোনো একটা বিজ্ঞাপন মাসে একবার (হ্যাঁ,মাসে একবারই,তার বেশী নয়) যদি একটু ১০ মিনিট ব্রাউজ করেন,তাহলে আমি একটু উপকৃত হই। আপনাদের পছন্দের বইগুলো যদি ডাউনলোড চান তাহলে মেসেজবক্সে আমাকে মেসেজ দেবেন। আমি চেষ্টা করব বইটা দেওয়ার। যদি সফটওয়্যার দরকার হয়,তাহলে যান http://www.download-at-now.blogspot.com/ এই ঠিকানায়। সব সফটওয়্যার সিরিয়াল/ক্রাক/কিজেন যুক্ত। কোন সফটওয়্যার তৈরী করার দরকার হলেও আমাকে বলতে পারেন,আমি একজন সফটওয়্যার ডেভেলপার।

মোবাইল: ০১৭৩৪৫৫৫৫৪১
ইমেইল: ayan.00.84@gmail.com